একশ

বাংলা

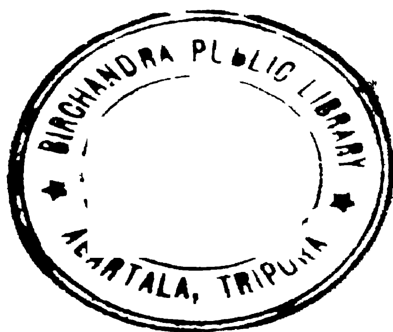
শিশির বসু

একশ বছরের
বাংলা থিয়েটার

একশ বছরের বাংলা থিয়েটার

প্রথম খণ্ড

শিশির বসু



নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

প্রকাশক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

দাম : তিরিশ টাকা

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৩

উৎসর্গ

শতবর্ষের খ্যাত ও অখ্যাত শত-সহস্র মঞ্চসেবীর

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

বাংলা
সাধারণ রঙ্গালয়ের
শতবর্ষপূর্তি
উপলক্ষে রচিত

ভূমিকা

জীবন-সায়াহ্নে একটি ভাবনা আমাকে প্রায়শঃ বিষণ্ণ ক'রে তোলে—তা, একালের মানুষের আত্ম-সর্বস্বতা। বর্তমান যুগ যেন একান্তভাবেই নিজেকে নিয়ে মগ্ন। পিছন ফিরে তাকানোর তার মুহূর্তের অবসর নেই। অথচ, অতীততো কেবল ভারবাহী আবর্জনা নয়, তার অভিজ্ঞতাই বর্তমানের পথ চলার পাথেয়। সেই পরম সত্যকে ভুলে মানুষ নিছক বর্তমানকে নিয়ে মেতে থাকে আর পরিণামে দিশাহারা হয়।

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্ম হয়েছিল। সেদিন সহায়সম্বলহীন যে ক'টি তরুণ কেবলমাত্র অদম্য মনোবল সম্বল ক'রে এই মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, যাঁদের অসাধারণ ত্যাগ ও প্রতিভাকে ভিত্তি ক'রে আজকের রঙ্গালয়ের বাড়-বাড়ন্ত, একালের ক'জন নাট্যামোদী তাঁদের সন্ধান রাখেন ? গিরিশচন্দ্র-অর্দ্ধেন্দুশেখর-অমৃতলালের কথা বাদ দিলে আধুনিক যুগের ক'জন নাট্যরসিক ভুবনমোহন নিয়োগী, শরৎচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর প্রভৃতির নাম শুনেছেন ? অথচ এঁরা না এলে, ক্লেশ-নিন্দার হলাহলটুকু নীলকণ্ঠের মত এঁরা পান না ক'রে গেলে, একালের ভাগ্যে নির্মল অমৃতানন্দ জুটতো না। সেকালের নট-নটীরা অধিকাংশই পবিত্র পরিবেশে লালিত-পালিত হ'ন নি সত্য, চারিত্রিক দুর্বলতার অভাব তাঁদের ছিল না—একথাও অস্বীকার ক'রে লাভ নেই। কিন্তু একটি দুর্লভ সম্পদের অধিকারী তাঁরা ছিলেন, যা একালের নাগালের বাইরে—তা, তাঁদের অনন্য শিল্পপ্রতিভা এবং কান্তিক নিষ্ঠা। তাঁরা যে কেবল শিল্পীই ছিলেন তাই নয়, তাঁরা আমাদের পূর্বপুরুষ। রক্তের সম্পর্কে না হোক, আত্মার সম্বন্ধে তাঁরা আমাদেরই পিতৃ-পিতামহ। শতবার্ষিকীতে 'একশ বছরের বাংলা থিয়েটার' প্রণয়ন ক'রে শ্রীশিশির বসু আমাদের সকলের পূর্বপুরুষদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা-তর্পণ করেছেন। 'বংশধরে'র যোগ্য কর্তব্যই করেছেন তিনি, তাঁর সঙ্গে আমার প্রণামও যুক্ত হোক।

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে পড়ছে। তা হোক, এর প্রয়োজন আছে। ১৯২৩ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৪ বৎসর মঞ্চের সেবা ক'রে এসেছি।

গঞ্জনা, নিন্দা, কুখ্যাতি প্রথম জীবনে কম জোটে নি। আবার পরবর্তীকালে ঈশ্বর ও দেশের মানুষ ধন, মান, খ্যাতি ও ভালবাসা উজাড় ক'রে দিয়েছে। কিন্তু তবুও আজ বেলাশেষের লগ্নে মন পরিপূর্ণতায় ভ'রে ওঠে না কেন? কারণস্বরূপ মনে হয়েছে, মানুষ চায় চিরকালের জন্য বেঁচে থাকতে। জৈবিক অর্থে টিঁকে থাকার কথা বলছি না, বলছি চিরন্তন হয়ে মানুষের স্মৃতিতে বেঁচে থাকা। এই অমরতার অভিলাষই, শিল্পীর শাশ্বত বাসনা। ধন নয়, মান নয়, খ্যাতি নয়, এই গোপন কামনা নিয়েই গায়ক গান গায়, পটুয়া ছবি আঁকে, নট অভিনয় করে। কিন্তু একালের অতীত-বিমুখতায় আমার মনে হয়েছে, এই পৃথিবী থেকে আমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্মৃতিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ভাবীকালের হৃদয় হ'তে। যেমন, পূর্বসূরীদের ভাগ্যে ঘটেছে। কিংবদন্তী নয়, রম্যরচনা নয়—প্রকৃত তথ্যাশ্রয়ী ইতিহাসই কেবলমাত্র পারে শিল্পীর প্রকৃত মূল্যায়ন করতে, সার্থকভাবে বাঁচিয়ে রাখতে। একালের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নয়, সমসাময়িকযুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ক'রে শিল্পীর অবদানের যথার্থতা যাচাই করতে হয়, আর তাতেই রূপদক্ষের অমরতাপ্রাপ্তি ঘটে। সুখের বিষয়, নাট্যগবেষক শ্রীশিশির বসু এই কাজে ব্রতী হয়ে আমাদের দেশের বহুদিনের একটি অভাব পূর্ণ করেছেন। পূর্ববর্তী ইতিহাসলেখকদের গ্রন্থ থেকে ইনি নির্বিচারে উপাদান সংগ্রহ ক'রে দায় সারেন নি। যে নিরলস অধ্যবসায় ও নিষ্ঠাসহকারে পুরাতন পত্র-পত্রিকা, তথ্য-প্রমাণ ঘেঁটে ইনি ইতিহাস রচনা করেছেন, তাতে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারি নি। শিল্পী হিসাবে এর জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞও বটে।

এ পৃথিবীর সঙ্গে হিসাব-নিকাশতো আমার প্রায় শেষ। এখন কেবল আর এক জগতের আহ্বানের অপেক্ষায় আছি। যাবার বেলায় এইটুকু বিশ্বাস অন্ততঃ সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি—আমি এবং আমরা মুছে যাব না, নিশ্চিহ্ন হবো না, বেঁচে থাকবো, চিরন্তন হয়ে থাকবো মানুষের মনে।

শ্রীশিশির বসুর বর্তমান গ্রন্থই আমাকে সে-আশ্বাস দিয়েছে।

অহীন্দ্র চৌধুরী

৩৯।১এ, গোপালনগর রোড
কলকাতা-২৭

লেখকের কথা

বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত মঞ্চেতিহাস 'একশ বছরের বাংলা থিয়েটার' গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হল। বাকী দুই কি তিন খণ্ডে আমাদের দেশের পেশাদার মঞ্চের শতবর্ষের ইতিহাসসঙ্কলন সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা আছে।

প্রারম্ভে, প্রথম খণ্ড সম্পর্কে জ্ঞাতব্য কয়েকটি তথ্য নিবেদন করি :—

এক ॥ প্রতিষ্ঠাকালের ক্রমানুসারে কলকাতার স্থায়ী নাট্যশালাগুলির ইতিবৃত্ত এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে।

দুই ॥ আলোচনাকাল শতবর্ষের মধ্যে সীমায়িত হওয়ায় প্রথম খণ্ডের 'সূচনা'য় প্রাক্ সাধারণ রঙ্গালয় যুগের সৌখিন নাট্যচর্চার ইতিহাস বিশদভাবে বর্ণিত হয় নি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই পর্বের বিস্তৃত এবং প্রামাণ্য বিবরণ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে লাভ করবেন।

তিন ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—এই দুই স্বনামধন্য ইতিহাসবিদের গবেষণালব্ধ বহু তথ্য ও তাঁদের আবিষ্কৃত কিছু কিছু সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি বর্তমান গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বত্র তাঁদের নামোল্লেখ সম্ভব না হওয়ায় এই অবসরে পূর্বসূরীদের ঋণ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্বীকার করছি।

চার ॥ 'অনুসন্ধান', 'নাচঘর' প্রভৃতি সাময়িকপত্রের এবং গিরিশচন্দ্রের কয়েকটি নাটকের যথাক্রমে প্রকাশ ও অভিনয়ের বাংলা তারিখ পঞ্জিকার সাহায্যে ইংরেজীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। পঞ্জিকার বিভিন্নতার জন্য কোনো কোনো ইংরেজী তারিখের ক্ষেত্রে 'একদিনে'র তারতম্য ঘটা বিচিত্র নয়।

পাঁচ ॥ মুদ্রণের সুবিধার জন্য এবং দু'টি রঙ্গালয় মূলতঃ এক হওয়ায় ২৩২-২৩৮ পৃষ্ঠায় পরিশিষ্ট অংশে পৃথক পৃথক শিরোনামার পরিবর্তে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' শিরোনামায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয়-তালিকা এবং অভিনেতৃ সম্প্রদায়ও অন্তর্ভূর্ক্ত করেছি।

ছয় ॥ বীণা রঙ্গভূমির পরিশিষ্টে উল্লিখিত অভিনয়-তালিকায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অভিনীত নাটকগুলি ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামায় চিহ্নিত না ক'রে 'গ' অংশে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা সংযোজিত হয়েছে।

সাত॥ 'মঞ্চসেবী পরিচিতি'তে কেবলমাত্র শতবর্ষের নাট্যকর্মীদের অন্তর্ভুক্তির পরিকল্পনা থাকলেও, বাংলা থিয়েটারের পথিকৃৎ বিবেচনায় গেরাসিম লেবেডেফের কর্মজীবনীও এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে।

আট॥ মুদ্রণপ্রমাদের সংশোধন ব্যতীত সেকালের পত্র-পত্রিকা এবং গ্রন্থাদি থেকে উদ্ধৃত অংশের বানান যতদূর সম্ভব যথাযথ রাখার চেষ্টা করেছি।

নয়॥ অক্লান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মূল রচনায় সর্বত্র বানানের একরূপত্ব (uniformity) বজায় থাকে নি। অনিবার্য কারণে দু' একটি সাংঘাতিক মুদ্রণ-প্রমাদও ঘটে গেছে। যেমন, ১৫৯ পৃষ্ঠায় 'Shooting in the stage'-এর জায়গায় 'Shooting on the stage', ২০১ পৃষ্ঠায় 'পুণা সার্ব্বজনিক সভা'র স্থলে 'পুণা সার্ব্বজনীন সভা' এবং ২১১ পৃষ্ঠায় 'Pygmalion and Galatea'র পরিবর্তে 'Pygmalion and Galatta' মুদ্রিত হয়েছে। এতদ্‌ব্যতীত বানান ভুলের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়। এইজাতীয় ত্রুটির জন্য বিনীতভাবে সহৃদয় পাঠকের মার্জনা ভিক্ষা করি।

দশ॥ সাল, তারিখ সহ যাবতীয় তথ্য যথাসম্ভব প্রামাণ্য রচনা এবং সমকালীন পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত হয়েছে ও লেখা এবং প্রুফ দেখার সময় যথোচিত সতর্কতায় কখনো ভাঁটা পড়ে নি। এতদসত্ত্বেও কোনোপ্রকার ভুল-ভ্রান্তি অথবা অসম্পূর্ণতা সুধীজনের চোখে পড়লে এবং অনুগ্রহ ক'রে প্রকাশকের মাধ্যমে তা আমায় জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের ও সম্পূরণের প্রয়াস পাবো।

এবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পালা। উপাদান সংগ্রহের প্রয়োজনে বহু নাট্যামোদীর দ্বারস্থ হয়েছি। তাঁদের অধিকাংশের সানুগ্রহ সহযোগিতায় আমি ধন্য। শ্রদ্ধেয় নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী মূল্যবান ভূমিকা রচনা ক'রে, বর্ষীয়ান নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় গ্রন্থ পরিচিতি লিখে এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যগবেষক শ্রীরমাপতি দত্ত (হরীন্দ্রনাথ দত্ত) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, দুষ্প্রাপ্য প্রচারপত্র ও আলোকচিত্র প্রভৃতি সরবরাহে আমাকে অনুগৃহীত করেছেন। এই তিন প্রবীণ এবং সর্বজনমান্য মঞ্চসেবী—বিশেষতঃ, শ্রীদত্তের অকৃপণ সাহায্য ব্যতীত বর্তমান গ্রন্থ রচনা সম্ভব হ'ত কিনা সন্দেহ। এঁদের উদ্দেশ্যে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি।

শ্রীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অভিনয়' নাট্যপত্রিকায় প্রথম খণ্ডের কিয়দংশ 'বিলুপ্ত নাট্যশালা' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় 'অভিনয়' পত্রিকায়-প্রকাশিত দু'খানি ছবির ব্লকও বর্তমান গ্রন্থের প্রয়োজনে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর এই অনুগ্রহের জন্য আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী গ্রন্থের প্রচ্ছদাঙ্কন ক'রে আমাকে গৌরবান্বিত করেছেন। আমি তাঁর কাছেও ঋণী। ইত্যবসরে, দুজনকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

অন্যান্য যেসব কলারসিক, সুহৃদ আর শুভানুধ্যায়ীর সক্রিয় সহায়তায় ও অভিমত-উৎসাহে আমি উপকৃত, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য :—সর্বশ্রী ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য (রিডার, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), বৃন্দাবন কুণ্ডু (অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়), কমল সরকার (চিত্র-শিল্পী ও সমালোচক), শঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), ইন্দ্রনাথ মজুমদার (প্রকাশক, 'সুবর্ণরেখা'), বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (কর্মী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ), সুভাষ সমাজদার এবং মতিলাল মাইতি (কর্মী, জাতীয় গ্রন্থাগার). দীপক মিত্র (নাট্যকর্মী) ও অমূল্য সরকার (কর্মী, পূর্ব রেলওয়ে)। সুষ্ঠু প্রকাশনার জন্য 'নাভানা'র কর্মীরা, বিশেষভাবে প্রুফ সংশোধনের ব্যাপারে শ্রীসোমনাথ দে এবং মুদ্রণ তত্ত্বাবধানের কাজে শ্রীঅমরচন্দ্র দাস প্রশংসনীয় তৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন। এই উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

পরিশেষে 'নাভানা'র কর্ণধার শ্রদ্ধেয় শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের প্রসঙ্গ আমার আলোচ্য। মঞ্চেতিহাসের ন্যায় অ-লাভজনক গ্রন্থপ্রকাশে উদ্যোগী হয়ে ইনি যে সহৃদয় ও নির্লোভ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা, অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে। লেখকস্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, শিষ্টাচারী এবং সদাশয় এই মানুষটির হৃদ্য ব্যবহারে আমি মুগ্ধ। তাঁর স্নেহঋণ পরিশোধ করার সাধ্য আমার নেই। শ্রীরায়ের উদ্দেশে রাখি আমার বিনম্র প্রণতি।

নিজের সীমিত শক্তি সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন হয়েই বিনীতভাবে নিবেদন করি, সতর্ক দৃষ্টিতে গ্রন্থের একাধিক অসম্পূর্ণতা দুর্লক্ষ্য নয়। এতদসত্ত্বেও, বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রথম প্রয়াস 'একশ বছরের বাংলা থিয়েটার' নাট্যানুরাগী পাঠকের প্রয়োজনসিদ্ধির সামান্য অনুকূল হলে পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

শিশির বসু

সূচীপত্র

চিত্র ও প্রতিলিপি সূচী

॥ চিত্র ॥

॥ প্রতিলিপি ॥

সূচনা

বাংলা নাটক ও নাট্যশালার জনক একজন বিদেশী। গেরাসিম স্টেপানোভিচ্ লেবেডেফ্ (১৭৪৯-১৮১৭) নামে রুশদেশীয় এই মনীষী ১৭৮৭ সালে কলকাতায় আসেন। মহানগরীতে অবস্থানকালে লেবেডেফ্ দেশীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় 'দি ডিস্‌গাইজ' এবং 'দি লাভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর' নামে দু'খানি ইংরেজী নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন। 'কাল্পনিক সংবদল' নামে ভাষান্তরিত প্রথম নাটকটি ১৭৯৫-৯৬ সালে দু'বার মঞ্চস্থ হয়। ২৫ নম্বর ডুমতলায় (বর্তমান এজরা স্ট্রীটে) লেবেডেফ্ প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী থিয়েটারে দেশীয় পরিবেশে, দেশীয় নট-নটী ও বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে এবং ভারতচন্দ্রের সঙ্গীত সহযোগে এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম অভিনয়ে প্রবেশমূল্য ছিল আট টাকা ও চার টাকা এবং দ্বিতীয় অভিনয়ে এক মোহর। দু'টি প্রদর্শনীই জনাকীর্ণ হয়। এই কাজে লেবেডেফের সহায়ক হন তাঁর ভাষা-শিক্ষক গোলোকনাথ দাস। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁর নাট্যপ্রয়াস বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নি। কঠোর প্রতিবন্ধকতায় দীর্ঘস্থায়ী নাট্যশালা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলেও বাংলা নাটক রচনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে পথিকৃতের সম্মান তাঁরই প্রাপ্য।

এরপর প্রায় চার দশক বাংলা নাটক অভিনয়ের কোনো সংবাদ নেই। দ্বিতীয় কোনো দেশীয় নাট্যশালাও এসময় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। প্রসন্নকুমার ঠাকুরই প্রথম বাঙ্গালী যিনি আমাদের দেশে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু থিয়েটারে' (১৮৩১) অবশ্য ইংরেজী ভাষায় অভিনয় হয়েছে। শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু সর্ব প্রথম নিজস্ব নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয় করান। অভিনীত নাটক— 'বিদ্যাসুন্দর' (১৮৩৫)। তাঁর নাট্যপ্রয়াসের বৈশিষ্ট্য, এতে স্ত্রীলোকেরা অংশগ্রহণ করেছিল। মুদ্রিত বাংলা নাটকের মধ্যে

নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'ই প্রথম মঞ্চস্থ হয়। প্রথম অভিনয়— সিমলায় সাতুবাবুর বাড়ীতে (১৮৫৭)। এই ১৮৫৭ সাল থেকে আমাদের দেশে নিরবচ্ছিন্ন সৌখীন নাট্যচর্চার সুরু। পরবর্তী-কালে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ (১৮৫৭), বেলগাছিয়া নাট্যশালা (১৮৫৮), মেট্রোপলিটান থিয়েটার (১৮৫৯), পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ-নাট্যালয় (১৮৬৫), শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি (১৮৬৫), জোড়াসাঁকো নাট্যশালা (১৮৬৭) প্রভৃতি স্থানে বাংলা নাটকের অভিনয় দেশীয় নাট্যচর্চার ধারাটিকে প্রাণবন্ত ও বেগবান ক'রে তোলে। নতুনবাজারে রামজয় বসাকের বাড়ীতে 'কুলীন কুলসর্বস্ব' (১৮৫৭), বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯), মেট্রোপলিটান থিয়েটারে 'বিধবা-বিবাহ' (১৮৫৯), শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটিতে 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬৭), জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় 'নব-নাটক' (১৮৬৭) প্রভৃতি অভিনয়, নাট্যকাররূপে রামনারায়ণ তর্করত্ন ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের আত্মপ্রকাশ এবং অভিনেতা হিসাবে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মজুমদার প্রভৃতির আবির্ভাব এই পর্য্যায়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

পূর্বোক্ত নাট্যপ্রয়াসের উদ্যোক্তা এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দেশের বিদগ্ধ ও বিত্তশালী ব্যক্তিরা। এইসব নাট্যশালায় সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। কেবলমাত্র গণ্যমান্য এবং আমন্ত্রিত ভদ্রজন অভিনয় দর্শনের সুযোগ পেতেন। ফলে, সৌখীন নাট্যচর্চার এই পর্বে জনগণের সঙ্গে বাংলা থিয়েটারের কোনো ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে ওঠে নি।[১] এই পরিস্থিতিতে সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা

১ "……সখের অভিনয়ে বাঙালী জনসাধারণের নাট্যাভিনয় দেখিবার আগ্রহ তৃপ্ত হয় নাই। এই সকল অভিনয় প্রায়ই কোন-না-কোন অভিজাত-বংশীয় ধনীর উৎসাহে ও সাহায্যে তাঁহার নিজের বাড়ীতে বা বাগানবাড়ীতেই হইত। তাহাতে উদ্যোগকর্তার গণ্যমান্য আত্মীয়বন্ধুবর্গ ও পরিচিত জনেরা

বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছিল। দেশীয় পত্র-পত্রিকাগুলিতে এ-সম্পর্কে লেখা-লিখিও সুরু হয়ে গিয়েছিল সে সময়।[২]

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, সমকালীন পত্র-পত্রিকাগুলির সক্রিয় সহযোগিতা ও প্রেরণা বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করেছিল। বস্তুতঃ, শিশিরকুমার ঘোষ, মনোমোহন বসু, নবগোপাল মিত্র প্রমুখ সেযুগের প্রভাবশালী সাংবাদিকরা পুরোভাগে দাঁড়িয়ে জনমতকে সুগঠিত না করলে এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হত কিনা সন্দেহ।

সাদরে নিমন্ত্রিত হইলেও সাধারণের অবারিত প্রবেশ ছিল না। রবাহূত হইয়া গেলেও বিমুখ হইয়া ফিরিবার ভয় ছিল। সুতরাং তখনকার দিনে ইচ্ছা হইলেই সকলের পক্ষে উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দেখা সম্ভব হইত না। ইহা ছাড়া আর একটি অসুবিধাও ছিল। তখন পর্য্যন্ত বাংলা দেশে অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিকভাবে নাট্যাভিনয় আরম্ভ হয় নাই। কোন ধনী বা বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির উৎসাহে মাঝে মাঝে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা ও অভিনয়ের হুজুক দেখা যাইত বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু, মত-পরিবর্ত্তন বা উৎসাহ-লোপ হইলে সে নাট্যশালাও সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইত, এবং আর একজন নাট্যানুরাগী ব্যক্তির আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না।……" (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

২ 'নব-প্রবন্ধ' পত্রিকার আগস্ট, ১৮৬৭ সংখ্যায় লেখা হয়েছিল:— "……আমরা অভিনয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে সবিশেষ অনুরোধ করি, যে তাঁহারা সকলে একত্র সমবেত হইয়া, কোন একটা প্রকাশ্যস্থলে নাট্যমন্দির প্রস্তুত করুন, বেতনভোগী নট নটী রাখুন, এবং টিকিট বিক্রয় করুন, তাহা দ্বারা অভিনয়ের সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারিবে,……এবং টাকার প্রত্যাশায় অভিনেতৃগণও সবিশেষ মনোযোগ দ্বারা অভিনয় কার্য্যে সুশিক্ষিত হইয়া, দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিতে পারগ হইবেন।—" (ঐ)

সাধারণ রঙ্গালয়ের সূত্রপাত

অর্থলোভে নয়, নাট্যরসপিপাসু সাধারণ মানুষের তৃপ্তিবিধানের মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ব্রতে উদ্যোগী হলেন কলকাতার কয়েকজন মধ্যবিত্ত যুবক। সৌখীন নাট্যাভিনয়ে পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতা ও সুনাম নিয়ে এঁরা কাজে নামলেন। প্রথমে এই দলের নাম ছিল— 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার'। পরে, সম্প্রদায় 'শ্যামবাজার নাট্য সমাজে' রূপান্তরিত হয়। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাধামাধব কর, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রভৃতিকে নিয়ে গড়া এই সংস্থা দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'[৩] এবং 'লীলাবতী'[৪] নাটকের রূপায়ণে বিশেষ প্রশংসা পায়। স্বয়ং নাট্যকার এঁদের অভিনয়ের সুখ্যাতি করে-ছিলেন। সেই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে উদ্যোক্তারা এবার টিকিট বিক্রী ক'রে নিয়মিত অভিনয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। অধিকাংশ সদস্য একমত হলেও, দলের বিশিষ্ট অভিনেতা ও অভিনয় শিক্ষক গিরিশচন্দ্র

৩ ১৮৬৮ সালে সপ্তমী পূজার রাত্রে বাগবাজারে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে প্রথম অভিনয়। চতুর্থ অভিনয় হয় ১৮৭০ সনে শ্রীপঞ্চমীর রাত্রে রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাড়ীতে। এই অভিনয়ের ভূমিকালিপি :— নিমচাঁদ— গিরিশচন্দ্র, অটল— নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনচন্দ্র— অর্দ্ধেন্দু-শেখর, রামমাণিক্য— রাধামাধব কর এবং কাঞ্চন— নন্দলাল ঘোষ। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র এই অভিনয় দেখে সুখ্যাতি করেন।

৪ প্রথম অভিনয়— ১৮৭২, ১১ মে শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়ীর প্রাঙ্গণে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন অর্দ্ধেন্দুশেখর (হরবিলাস ও দাসী), রাধামাধব কর (ক্ষীরোদবাসিনী), গিরিশচন্দ্র (ললিতমোহন), নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (হেমচাঁদ), হিঙ্গুল খাঁ (রঘু উড়িয়া), যোগেন্দ্রনাথ মিত্র (নদেরচাঁদ), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (শারদাসুন্দরী), মহেন্দ্রলাল বসু (ভোলানাথ), মতিলাল সুর (মেজখুড়ো) প্রভৃতি। দীনবন্ধু মিত্র এ অভিনয় দেখেও প্রশংসা করেছিলেন।

এই প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে দলত্যাগ করেন[৫]। গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়েই দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক নিয়ে আত্মপ্রকাশের আয়োজন চলতে লাগলো। সাংবাদিক নবগোপাল মিত্রের পরামর্শে সম্প্রদায়ের নাম রাখা হল—'দি ক্যালকাটা ন্যাশনাল থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি', সংক্ষেপে 'ন্যাশনাল থিয়েটার'।

শিশিরকুমার ঘোষ (সম্পাদক, অমৃতবাজার পত্রিকা), মনোমোহন বসু (সম্পাদক, মধ্যস্থ), নবগোপাল মিত্র (সম্পাদক, ন্যাশনাল পেপার) প্রভৃতি উৎসাহ দিতে রইলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর হলেন অভিনয় শিক্ষক। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক আর ধর্মদাস সুর স্টেজ ম্যানেজার। মাসিক চল্লিশ টাকা ভাড়ায় জোড়াসাঁকোর সান্যাল বাড়ীর নীচের তলা ভাড়া নেওয়া হল। ধর্মদাস সেখানে স্টেজ বানাতে লাগলেন। দর্শকদের জন্য তিন শ্রেণীর আসনের বন্দোবস্ত করলেন উদ্যোক্তারা— দু'টাকা, একটাকা আর আট আনা। প্রথম শ্রেণীর জন্য ভাড়া করা চেয়ার, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য বাঁশের খুঁটির উপর তক্তা দিয়ে তৈরী এক রকম বেঞ্চি এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য দালানের সিঁড়ি ও রক। 'নীলদর্পণে'র রিহার্সাল হত ভুবনমোহন নিয়োগীর গঙ্গার ধারের বাড়ীর দোতালায়।

১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের 'ঘড়িওয়ালা বাড়ী'তে ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্যোগে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের

৫ পরবর্তীকালে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র এ সম্পর্কে বলেছেন :—"ন্যাসানাল থিয়েটার নাম দিয়া, ন্যাসানাল থিয়েটারের উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম ব্যতীত, সাধারণের সম্মুখে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা আমার অমত ছিল। কারণ একেই তো তখন বাঙ্গালীর নাম শুনিয়া ভিন্ন জাতি মুখ বাঁকাইয়া যায়, এরূপ দৈন্য অবস্থা ন্যাসানাল থিয়েটারে দেখিলে কি না বলিবে— এই আমার আপত্তি।..." (নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী— গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

সূত্রপাত হল।[৬] এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন ঃ— অর্দ্ধেন্দু-শেখর মুস্তফী (উড, সাবিত্রী, গোলোক বসু ও জনৈক রায়ত), নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নবীনমাধব), কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বিন্দুমাধব), শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গোপীনাথ), মতিলাল সুর (রাইচরণ ও তোরাপ), মহেন্দ্রলাল বসু (পদী) শশীভূষণ দাস (আমিন, পণ্ডিত মশায় ও কবিরাজ), পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (লাঠিয়াল), গোপালচন্দ্র দাস (আদুরী ও জনৈক রায়ত), যদুনাথ ভট্টাচার্য (জনৈক রায়ত), অবিনাশচন্দ্র কর (রোগ্), গোলোক চট্টোপাধ্যায় (খালাসী), ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (সরলা), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ওরফে বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল (ক্ষেত্রমণি), তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় (রেবতী) এবং অমৃতলাল বসু (সৈরিন্ধ্রী)। পুরুষ অভিনেতারাই স্ত্রী-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মঞ্চাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেন ধর্মদাস সুর এবং যোগেন্দ্রনাথ মিত্র। পত্র-পত্রিকায় সুখ্যাতি বেরুল। ন্যাশনাল থিয়েটারেব প্রচেষ্টার প্রশংসা ক'রে 'সুলভ সমাচার' (১০।১২।১৮৭২) লিখলে ঃ— "কলিকাতা ন্যাসনেল থিয়েট্রিকেল সোসাইটির সভ্যেরা গত শনিবার রাত্রে নীলদর্পণের অভিনয় করিয়াছেন, ইহা উত্তম হইয়াছিল। সভ্যতা যতই বৃদ্ধি হইবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মঙ্গলজনক নির্দ্দোষ আমোদ সকলের সৃষ্টি হইবে। আমাদের দেশে এরূপ সোসাইটি পূর্ব্বে কখন ছিল না,

৬ "ন্যাশনাল থিয়েটার কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় হইলেও, সর্ব্বপ্রথম ঢাকাতেই টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় প্রদর্শিত হয়।…ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতাতেও এইরূপ একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হইয়াছিল। ১৮৬০ সনের প্রারম্ভে আহিরীটোলার রাধামাধব হালদার এবং যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'দি ক্যালকাটা পাবলিক থিয়েটার' নামে একটি সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান-পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই প্রচেষ্টা সফল হয় নাই।" (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

ইঁহারাই প্রথম,...।" পরবর্ত্তীকালে, 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম অভিনয়ের স্মৃতিচারণে অমৃতলাল বসু বলেছেন ঃ— "......অভিনয় আরম্ভ হইল। গোলোক বোস ও উড্ সাহেবরূপে প্রথম দুই দৃশ্যে অর্দ্ধেন্দু দর্শকমণ্ডলীর মন অধিকার করিয়া বসিলেন। করতালি-ধ্বনিতে বৃহৎ অট্টালিকা কম্পিত হইতে লাগিল।... প্রত্যেক অ্যাক্টর যেন নিপুণ শিল্পীর মত দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'কে নিজের মনের মতন করিয়া ষ্টেজের উপর গড়িয়া তুলিল। কোন্ অভিনেতাকে বিশেষভাবে সুখ্যাতি করিব জানি না। বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় সুপুরুষ নগেন্দ্রনাথকে নবীনমাধবের ভূমিকায় যেমন মানাইয়াছিল, তেমন নবীনমাধব আর জীবনে দেখি নাই। অনন্যসাধারণ রূপগুণসম্পন্ন মহেন্দ্র বসু পদী ময়রাণীর ভূমিকায় অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ক্ষেত্র গাঙ্গুলীর মত সরলা কোনও স্ত্রীলোক কখনও সাজিতে পারে নাই। ক্ষেত্রমণির, রেবতীর, সরলার, সাবিত্রীর ও সৈরিন্ধ্রীর বিচিত্র রোদনধ্বনি বাঙ্গালীর বিভিন্ন সমাজ স্তরের বিভিন্ন বয়সের রমণীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ সুস্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিল। পর সপ্তাহে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সৈরিন্ধ্রীর সমালোচনা করিয়া লিখিলেন ঃ— 'তাহার রোদনস্বর অপূর্ব্ব বলিতে হইবে।' রাত্রি বারোটার সময় থিয়েটর ভাঙ্গিয়া গেল। লোকের মুখে সুখ্যাতি আর ধরে না।..." (পুরাতন প্রসঙ্গ) প্রথম অভিনয় রাত্রে দু'শ টাকার টিকিট বিক্রী হয়। নিন্দা-প্রশংসা মিলিয়ে 'নীল-দর্পণে'র কম সমালোচনা হয় নি।[৭] পত্র-পত্রিকাগুলি সামগ্রিকভাবে এই উদ্যমে সাধুবাদই জানিয়েছিল। জনসমর্থনে অনুপ্রাণিত হয়ে সম্প্রদায় পর পর দীনবন্ধু মিত্রের অন্যান্য নাটকগুলি মঞ্চস্থ ক'রে

---

৭ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন, 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের বিদ্রূপাত্মক ও নিন্দাপূর্ণ সমালোচনা ক'রে গিরিশচন্দ্র ছদ্মনামে সংবাদপত্রে দু'খানি পত্র লিখেছিলেন এবং তা 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় ১৯ এবং ২১ ডিসেম্বর, ১৮৭২ প্রকাশিত হয়েছিল।

চললো। অভিনীত হল :—'জামাই বারিক' (১৪।১২।১৮৭২), 'সধবার একাদশী' (২৮।১২।১৮৭২), 'নবীন তপস্বিনী' (৪।১।১৮৭৩), 'লীলাবতী' (১১।১।১৮৭৩) এবং 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৫।১।১৮৭৩)। ন্যাশনাল থিয়েটারের আদি পর্বে দীনবন্ধু মিত্রই মুখ্য নাট্যকার। প্রথম অভিনয়ের কিছু কিছু ত্রুটি পরবর্তী অভিনয়সমূহে সংশোধিত হয়েছে। যেমন, আসন ও আলোক ব্যবস্থার উন্নতি, বিলাতী বাদ্যের পরিবর্তে লক্ষ্ণৌয়ের বাদকদের দ্বারা দেশী বাজনার বন্দোবস্ত, মঞ্চের কাছে ধূমপান অথবা কোনোরকম গর্হিত আচরণ নিষিদ্ধকরণ, মঞ্চ-পরিচালনার সুব্যবস্থার জন্য ম্যানেজিং কমিটির প্রবর্তন প্রভৃতি। টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

'নবীন তপস্বিনী' এবং 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে অর্দ্ধেন্দুশেখর যথাক্রমে 'জলধর' ও 'রাজীবে'র ভূমিকা নিয়েছিলেন। এ দু'টি চরিত্রের অভিনয়ে তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' অভিনয়ের দিন (১৫।১) থেকে সপ্তাহে দু'দিন (বুধবার ও শনিবার) অভিনয়ের রেওয়াজ চালু হল। 'প্রমটিং' প্রথারও প্রবর্তন হয় এই সময়। ঐ তারিখে ইংরেজী থিয়েটারের অনুকরণে ন্যাশনাল কয়েকটি প্যাণ্টোমাইম্ প্রদর্শন করে। এ জাতীয় অভিনয়ে দক্ষ রূপকার ছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর আর বেলবাবু। অর্দ্ধেন্দুশেখরের 'মুস্তফী সাহেব-কা পাকা তামাশা' এ সময়কার একটি উপভোগ্য নাট্যানুষ্ঠান। এতে ইংরেজের রূপসজ্জায় বেহালা হাতে অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে হিন্দী-ইংরেজী মিশ্রিত গানে নকল সাহেবীয়ানাকে ব্যঙ্গ করতেন শিল্পী।[৮]

ন্যাশনাল থিয়েটার যখন সবে প্রতিষ্ঠা অর্জন সুরু করেছে, এমন

---

৮ "এই সময়ে দেব কার্সন নামে একজন ইংরেজ অপেরা হাউসে "Bengali Baboo" লইয়া ব্যঙ্গ করিতেন। তিনি 'ইংলিশম্যান' পত্রে বিজ্ঞাপন দিতেন :—'Dave Carson Sahib Ka Pucka Tumasha'। 'মুস্তফি সাহেব-কা পাকা তামাশা' ইহারই পাল্টা জবাব।" (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

সময় দলে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল। ২২ জানুয়ারি রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' অভিনয়ের বিজ্ঞপ্তি দিয়েও শেষ পর্যন্ত অভিনয় করা সম্ভব হল না। তার আগেই বিবাদ প্রকাশ পাওয়ায় ১৯ তারিখে নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু এবং হেমন্তকুমার ঘোষকে নিয়ে এক সালিশী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এঁদের হস্তক্ষেপে ব্যাপার বেশীদূর গড়ায় নি। অচিরে মিটমাট হয়ে যাওয়ায় ২৫ জানুয়ারি থেকে আবার খুললো থিয়েটার। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আগের মত সম্পাদক রইলেন। ঐদিন রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নব-নাটক' মঞ্চস্থ হয়। এ সময় শিশিরকুমার ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছেন। সম্প্রদায়ের কার্য্যালয় স্থানান্তরিত হয়েছে বাগবাজার রসিকচন্দ্র নিয়োগীর ঘাট থেকে বাগবাজারে ১১নং আনন্দ চ্যাটার্জী স্ট্রীটে। ৮ ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল থিয়েটার শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়শো রুপেয়া' অভিনয় করে। এ নাটকে ছাতুলালের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখর স্মরণীয় নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।[৯] ১৫ ফেব্রুয়ারি মঞ্চস্থ হল 'ভারতমাতা' নামে রূপক নাট্য। 'ভারতমাতা' কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। নাটকটির রচনার পিছনে অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রেরণা এবং সক্রিয় সহযোগিতা ছিল।[১০] পরদিন

৯ "...ন্যাসান্যাল থিয়েটারে "নয়শো রোপেয়া" অভিনয় হইল। যাঁহাদের ধারণা ছিল যে ইংরাজী থিয়েটারে ভিন্ন প্রকৃত অভিনয় হয় না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অমৃতবাজার পত্রিকার প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের সম্মুখে, অর্দ্ধেন্দুকে দেখাইয়া বলেন যে নয়শো রোপেয়ায় "ছাতুলালের" ভূমিকায় এই বাবুটির অভিনয় যাহা দেখিলাম, তাহা যে কোন বিলাতী থিয়েটারে কোন অভিনেতা পারে, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না।" (নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দু-শেখর মুস্তফী—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

১০ "..."ভারতমাতা" প্রভৃতি ন্যাসানাল থিয়েটারে যাহা অভিনীত হইয়াছিল, সে সমস্ত অর্দ্ধেন্দুর প্ররোচনায়।..." (ঐ)

সম্প্রদায় হিন্দু মেলার সপ্তম অধিবেশন উপলক্ষে পাইকপাড়ার উত্তরে নৈনানে হীরালাল শীলের বাগানে 'ভারত রাজলক্ষ্মী' ও অন্যান্য নাটকের ('নীলদর্পণ' প্রভৃতির) অংশ-বিশেষ অভিনয় করেছে।

এরপর, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩ ন্যাশনালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' মঞ্চস্থ হয়। এ নাটকে সর্ত সাপেক্ষে গিরিশচন্দ্র 'ভীমসিংহে'র ভূমিকা গ্রহণ করেন। গিরিশচন্দ্রের কথামত বিজ্ঞাপনে তাঁর নাম না দিয়ে শিল্পীকে Distinguished amateur হিসাবে উল্লেখ করা হল[১১]। অন্যান্য চরিত্রে রূপ দিলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র দাস, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় এবং অমৃতলাল বসু। এঁরা যথাক্রমে বলেন্দ্রসিংহ, ধনদাস, জগৎসিংহ, মন্ত্রী, কৃষ্ণকুমারী, রানী, বিলাসবতী ও মদনিকা সাজেন। এই অভিনয়ের কিছুদিন পরে বর্ষাসমাগমে এবং দলীয় বিবাদের কারণে ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমান পর্য্যায়ে শেষ অভিনয় অনুষ্ঠিত হল ৮ মার্চ, ১৮৭৩।

দলাদলির ফলে সম্প্রদায় শেষ পর্যন্ত দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এক দলে ছিলেন গিরিশচন্দ্র, ধর্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, গোপালচন্দ্র দাস, শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। অন্য দলে অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলবাবু, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। গিরিশচন্দ্ররা স্টেজ ও সিন্ পেয়ে

১১ "…যখন কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় হইয়াছিল, তখন আমায় যোগ দিতে হয়। ভীমসিংহের ভূমিকা আমার উপর অর্পিত হইল।…আমি আমার নাম Amateur বলিয়া বিজ্ঞাপিত না হইলে, অভিনয় করিতে অসম্মত হই।… উক্তরূপ বিজ্ঞাপিত না হইয়া আমি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে একান্ত আপত্তি করায় ভীমসিংহ—By a distinguished amateur প্লাকার্ডে প্রকাশিত হয়।…" (নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী— গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

দলটিকে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে রেজিস্টারি করালেন। অপর দলও এই নামের উপর নিজেদের দাবী ত্যাগ করলো না। তাঁরাও এসময় নাম নিয়েছিল— 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি নেটিভ হাসপাতালের সাহায্যে ২৯ মার্চ, ১৮৭৩ তারিখে টাউন হলে 'নীলদর্পণ' অভিনয় করার পর রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে আসর পাতলেন আর বিরোধী দল 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম ধারণ ক'রে আশ্রয় নিলে লিণ্ডসে স্ট্রীটের অপেরা হাউসে। দুই সম্প্রদায় এর পরে পৃথক পৃথক ভাবে বহু জায়গায় অস্থায়ী মঞ্চে অভিনয় করেছে। ন্যাশনাল দল ঢাকায় গেছে, কলকাতার অপেরা হাউসে অভিনয় করেছে, শেষে আবার চলে এসেছে পুরানো সান্ন্যাল বাড়ীতে। হিন্দু ন্যাশনালও ঢাকা যাত্রা করেছে, হাবড়া, চুঁচুড়া প্রভৃতি জায়গায় অভিনয় দেখিয়েছে। ১৮৭৩-এর মাঝামাঝি সময়ে দু'টি দল একত্র হয়ে দীঘাপতিয়ার রাজকুমারের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে এবং মধুসূদনের অপোগণ্ড সন্তানদের সাহায্যকল্পে অভিনয় করে। তারপর আবার চলে এঁদের পৃথক পৃথক ভাবে মফস্বল ও বহির্বঙ্গ অভিযান। প্রথম স্থায়ী নাট্যশালা বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার (১৬৷৮৷১৮৭৩) পর দুই দলের কয়েকজন উৎসাহী সদস্য সম্মিলিতভাবে উদ্যোগী হয়ে বর্তমান মিনার্ভার জায়গায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার (দ্বিতীয় স্থায়ী নাট্যশালা) স্থাপন করেন (৩১৷১২৷১৮৭৩)।

সাধারণ রঙ্গালয়ের অস্থায়ী মঞ্চে নাট্যচর্চার সেইখানেই ইতি।

স্থায়ী মঞ্চ

বেঙ্গল থিয়েটার
(১৮৭৩-১৯০১)

১৮৭২, ৭ ডিসেম্বর জোড়াসাঁকোর সান্যাল বাড়ীতে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের মাধ্যমে বাংলা দেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের সূচনা হলেও, উদ্যোক্তা 'ন্যাশনাল' বা তার ভগ্নাংশ 'হিন্দু ন্যাশনাল'—কোনো সম্প্রদায়েরই তখন নিজস্ব মঞ্চ ছিল না। এ ব্যাপারে পথিকৃতের সম্মান বেঙ্গল থিয়েটারের প্রাপ্য। পেশাদারী অভিনয়ের ক্ষেত্রে 'বেঙ্গল থিয়েটার' বা 'বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি' আমাদের দেশের প্রথম স্থায়ী নাট্যশালা। এর প্রতিষ্ঠাতা শরৎচন্দ্র ঘোষ ছিলেন সেকালের বিখ্যাত ধনী সাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) দৌহিত্র এবং স্বয়ং একজন সুযোগ্য অভিনেতা। প্রাক্-পেশাদারী যুগে সৌখীন নাট্যচর্চার অন্যতম কেন্দ্রভূমি সাতুবাবুর বাড়ীতে ১৮৫৭ সালে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' এবং 'মহাশ্বেতা' নাটকের অভিনয়ে যথাক্রমে 'শকুন্তলা' ও 'তরলিকা'র ভূমিকায় এঁর নাট্যনৈপুণ্য সমকালীন বিদগ্ধজনের প্রশংসা অর্জন করেছিল। অভিনয় ছাড়া "শরৎবাবু নানা কলাদি বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। তাঁর মতন ঘোড়-সওয়ার আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীতে জন্মেছে কিনা সন্দেহ। ইংরাজদের অনুকরণে তাঁরই বিশেষ উদ্যোগে কাশীপুর অঞ্চলে বাঙ্গালীর একটি নিজস্ব রেশ কোর্শ খোলা হয়; পাখোয়াজ বাজানয় তিনি একজন বড় ওস্তাদ ছিলেন, তাঁর রচিত পাখোয়াজের অনেক বোল এখনও গুণিমহলে প্রচলিত।" (মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪—অমৃতলাল বসু) জোড়াসাঁকোর সান্যাল বাড়ীতে ন্যাশনাল থিয়েটারের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে শরৎচন্দ্র ঘোষ ১৮৭৩ সালে বর্তমান বিডন স্ট্রীট ডাকঘরের জমিতে লিউইসের লাইসিয়াম থিয়েটারের আদর্শে এই

রঙ্গালয় নির্মাণ করেন। প্রথমে, মাটির দেওয়ালাবশিষ্ট খোলার চালা এবং সিমেণ্টের পলস্তারাযুক্ত মাটির প্লাটফরম বানানো হয়। এই কাজে তাঁর সহায়ক হন :— মন্মথনাথ দেব (লাটুবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র, *বিখ্যাত চিত্রকর*), *চারুচন্দ্র ঘোষ* (*শরৎচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, সঙ্গীতজ্ঞ*), বটুবিহারী ব্যানার্জী (ব্যারিস্টার ডব্লুউ. সি. ব্যানার্জীর এক কাকা), প্রিয়নাথ বসু (সাতুবাবু-লাটুবাবুর ভাগিনেয়, শিল্পী), উমেশচন্দ্র দত্ত (শরৎচন্দ্রের ভগিনীপতি), বিহারীলাল দাস, রমানাথ মণ্ডল, হরিদাস দাস (অভিনেতা, 'হরি বৈষ্ণব' নামে খ্যাত), গিরীশচন্দ্র ঘোষ[১] (অভিনেতা, 'ন্যাদাড়ু গিরীশ' নামে পরিচিত), অক্ষয়কুমার মজুমদার (বিখ্যাত সৌখীন অভিনেতা), নিমতলার দত্ত পরিবার এবং সর্বোপরি বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। নাট্যশালা নির্মাণে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা খরচ পড়ে।[২] বাগবাজারের রায় বিহারীলাল মিত্র বাহাদুর অর্থ সাহায্য করেন। ড্রপ সিন আঁকেন মন্মথনাথ দেব ও প্রিয়নাথ বসু। সম্প্রদায়ের ম্যানেজার এবং অবৈতনিক সম্পাদক হন যথাক্রমে শরৎচন্দ্র ঘোষ ও প্যারীমোহন রায়।[৩] সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং পরামর্শাদির জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত সত্যব্রত সামাশ্রমী প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে উপদেষ্টা সমিতি গঠন করা হয়। গিরীন্দ্রনাথ দত্ত, বলরাম দাস, বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনাথ দেব, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিহারীলাল মিত্র, পণ্ডিত সত্যব্রত সামাশ্রমী, ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী, গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রভূষণ চৌধুরী (পরবর্তীকালের প্রখ্যাত অভিনেতা

১ ইনি নাটকও লিখতেন। এঁর রচিত 'ধ্রুব-তপস্যা' নামে একটি নাটক ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

২ দ্র. সুলভ সমাচার— ১৫ এপ্রিল, ১৮৭৩।

৩ নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' (রঙ্গালয়) অনুসারে ইনি ছিলেন্ কোষাধ্যক্ষ।

অহীন্দ্র চৌধুরীর জনক) প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে বেঙ্গল থিয়েটারের ডিরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পঞ্চকোট রাজ্যের আইন-উপদেষ্টার চাকুরী ত্যাগের পর মাইকেল মধুসূদন দত্ত তখন (১৮৭২) কলকাতার বাসিন্দা। উদ্যোক্তারা নাটকের জন্য মাইকেলের শরণাপন্ন হলে তিনি তাঁদের প্রস্তাবে সম্মত হন এবং বিলাতের অনুকরণে অভিনেত্রী নিয়োগের পরামর্শ দেন।[৪] সেইমত জগত্তারিণী, গোলাপ (সুকুমারী দত্ত), এলোকেশী এবং শ্যামা নামে চারজন স্ত্রীলোককে অভিনয়ের কাজে নিযুক্ত করা হয়। সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনেত্রী নিয়োগের ঘটনা এই প্রথম। বারাঙ্গনা সাহচর্যে ভদ্রবংশীয় অভিনেতাদের চরিত্রহানির আশঙ্কায় তৎকালীন সমাজে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'ভারত-সংস্কারক', 'মধ্যস্থ' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে।[৫] আর সম্প্রদায়ের 'দুর্নীতিমূলক' কাজে ক্ষুব্ধ হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নাট্যশালার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন।

৪ "বেঙ্গল থিয়েটার সম্প্রদায় প্রথম হইতেই নাটকের স্ত্রী-ভূমিকাগুলি অভিনয় করিবার জন্য পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামাশ্রমী এবং কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়দ্বয়ের পরামর্শে তাঁহাদের রঙ্গালয়ে বারনারী নিযুক্ত করেন। অর্থাৎ রঙ্গাঙ্গনে বারাঙ্গনা গ্রহণের জন্য বেঙ্গল থিয়েটার সম্প্রদায় সমাজের নিকট প্রথম দায়ী হইলেন।..." (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—কিরণচন্দ্র দত্ত / নাট্যমন্দির—শ্রাবণ, ১৩২০)

৫ অভিনয়ের কাজে বারাঙ্গনা নিয়োগ বেশ কিছুকাল এদেশের একশ্রেণীর মানুষ সুনজরে দেখেন নি। পাবলিক থিয়েটারে অভিনেত্রী প্রথা চালু হওয়ার অর্দ্ধযুগ পরেও তাই, 'সাধারণী'র মত প্রভাবশালী সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে প্রবল বিরূপ মনোভাবের প্রকাশ দেখি ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত 'মেঘনাদবধ' নাটকের সমালোচনায় পত্রিকাখানিতে যে ভাষায় নটীকুলকে আক্রমণ করা হয়েছিল তা, প্রায় অশালীনতার পর্য্যায়ে পড়ে। 'সাধারণী' লেখে :— "... কুক্ষণে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গের রঙ্গভূমিতে বারাঙ্গনা প্রবিষ্ট

আমৃত্যু মাইকেল মধুসূদন দত্তের সঙ্গে বেঙ্গল থিয়েটারের প্রীতির সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। উদ্যোক্তাদের অনুরোধে কবি তাঁদের জন্য 'মায়া-কানন' এবং 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামে দু'টি নাটক রচনা করেন। মধুসূদনের আকস্মিক তিরোধানে অবশ্য শেষোক্ত নাটকটি সম্পূর্ণ হয় নি। মাইকেল যখন মৃত্যুশয্যায়, বেঙ্গল থিয়েটারের কর্মকর্তারা নাট্যরচনার অগ্রিম মূল্যদানে চিকিৎসায় সহায়তা করেন। 'মায়া-কানন' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্যোগে[৬]। দুর্ভাগ্যক্রমে, নাট্যপ্রকাশনা এবং রঙ্গালয়ের উদ্বোধনের পূর্বেই কবির জীবনাবসান ঘটে[৭]। বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির কর্তৃপক্ষ উদ্বোধন রজনীর বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ পরলোকগত নাট্যকারের অপোগণ্ড

করিয়া গিয়াছেন··· ন্যাশনালের প্রমীলা যখন কটিতে কীরীচ আঁটিয়া, দুলিতে দুলিতে বলিতে থাকে "আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে?" তখন মনে হয়, তা বটেত, তোমার বাঁধা হুকা, বারেন্দা কুশলে থাক— তোমার ডর কি? গত বৎসর আমরা ন্যাশনাল থিয়েটারে'র অভিনয় দেখিতে দুই তিনবার যাই; গিরিশের অভিনয় দেখিয়া যেমন আহ্লাদিত হইয়াছি, সেই গিরিশ ঐরূপ মেছোবাজারের প্রমীলা সাজাইয়া রঙ্গভূমির অবমাননা করিতেছেন,— দেখিয়া তেমনই দুঃখ হইয়াছে, ঘৃণা হইয়াছে, লজ্জা হইয়াছে। গোঁপ কামান, দাড়ি কামান, স্বর মোটা, বাপে তাড়ান, এণ্ট্রান্স ফেইল প্রমীলা— স্বীকার করি— শ্লাঘার সামগ্রী নহে। কিন্তু হৃদয় পোড়া, মন পোড়া, লজ্জা পোড়া, ঘর পোড়ানি— মেছোবাজারের প্রমীলার অপেক্ষা লক্ষগুণে ভাল।···" (১|৬|১৮৭৯)

এই প্রতিকূলতার অবসান ঘটে ১৮৮৪ সালে ষ্টারে গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্য-লীলা' অভিনয়ে। নামভূমিকায় বিনোদিনী দাসীর ব্যক্তিত্ব, নিষ্ঠা এবং অসাধারণ নাট্যনৈপুণ্য সামগ্রিকভাবে অভিনেত্রী সম্প্রদায়কে মর্য্যাদার আসনে উন্নীত করে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ষ্টারে পদার্পণ এবং নটীকুলকে আশীর্বাদও সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সহায়ক হয়।

৬ মার্চ, ১৮৭৪।

৭ ২৯ জুন, ১৮৭৩।

সন্তানদের সাহায্যার্থে দিয়েছিলেন। ১৮৭৩, ১৬ আগষ্ট মধুসূদনেরই 'শর্মিষ্ঠা' নাটক দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের যাত্রা সুরু হয়।

বেঙ্গল থিয়েটারের ইতিহাসের সঙ্গে অপর এক নাট্যপ্রেমীর স্মৃতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনি নট ও নাট্যকার বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। বস্তুতঃ, এঁর অকুণ্ঠ সহায়তা ভিন্ন শরৎচন্দ্রের পক্ষে রঙ্গালয় স্থাপনা ও পরিচালনা সম্ভব হত না। প্রতিষ্ঠার সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইনি আলোচ্য মঞ্চের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। সৌখীন নাট্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের অধিকারী এই শিল্প সাধকের অক্লান্ত অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণেই বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়। "......বেঙ্গল থিয়েটারের উন্নতিকল্পে বিহারীলাল আজীবন অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারের তিনি অধ্যক্ষ, নাট্যশিক্ষক, প্রধান অভিনেতা এবং প্রধান নাট্যকারও ছিলেন।... বিহারীলালের নাটকাবলীর অভিনয় করিয়া বেঙ্গল থিয়েটারের যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল ইহা সর্ব্বজনবিদিত। স্বীয় নাটকাদি ব্যতীত স্বয়ং নাট্যকার হইবার কি পূর্ব্বে, কি পরে বিহারীলাল অন্যান্য নাট্যকারের নাটকপ্রহসনাদি সমান যত্নের সহিত শিক্ষা দিয়া অভিনয় করাইতেন। কয়েকখানি কাব্য ও উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াও বেঙ্গল থিয়েটারের নাটকের অভাব মোচন করেন। এক কথায়, গিরিশচন্দ্রের জীবন অর্থে যেমন বঙ্গের সাধারণ নাট্যশালার জীবন বুঝায়, বিহারীলালের জীবন অর্থে বঙ্গের এই একটি বিশিষ্ট নাট্যশালা Bengal Theatre-এর জীবন বুঝায়।......" (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস— কিরণচন্দ্র দত্ত) ১৯০১ সালে বিহারীলালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বেঙ্গল থিয়েটারের বিলুপ্তি ঘটে। পরের দুই দশক মঞ্চটি বিভিন্ন নাট্যসম্প্রদায়কে লিজ দেওয়া হয়।

অবদান

সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি তার বহুবিধ অবদানের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে। আমাদের দেশে পেশাদার অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রথম স্থায়ী নাট্যশালা নির্মাণের এবং অভিনেত্রী প্রথা প্রবর্তনের কৃতিত্ব বেঙ্গলের। মঞ্চে পতিতা রমণী নিয়োগে তদানীন্তন সমাজে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে থিয়েটার কর্তৃপক্ষ সেদিন যে মানসিক দৃঢ়তা ও অটুট মনোবলের পরিচয় দিয়েছিলেন তা, নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী করতে পারে। পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ে সেকালে বেঙ্গল থিয়েটারের জুড়ি ছিল না।[৮] এই শ্রেণীর নাট্যরচনায় এবং পরিবেশনে গিরিশচন্দ্রের তখন অসামান্য খ্যাতি। কিন্তু জনপ্রিয়তার প্রতি-যোগিতায় একদা বেঙ্গলের কাছে তাঁকেও পরাভব মানতে হয়েছিল। ষ্টারে গিরিশচন্দ্রের লেখা 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' ও 'প্রভাসযজ্ঞ' যে, বেঙ্গল থিয়েটারের 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' (রাজকৃষ্ণ রায়) এবং 'প্রভাস-মিলনে'র (বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়) তুলনায় দীর্ঘায়ু হয় নি, গিরিশচন্দ্রের জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং তা স্বীকার করেছেন। কেবল, 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' অভিনয়েই বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির উপার্জিত হয় প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। লক্ষাধিক দর্শক এ নাটক দেখেন।[৯]

৮ "রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার।— ধর্ম্মপ্রাণ পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ে — হিন্দুর প্রাণে বিলুপ্ত ধর্ম্মগৌরব-উদ্দীপনে-ইঁহারাই প্রধান— ইঁহারাই শ্রেষ্ঠ। একথা সর্ব্ববাদীসম্মত— সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য। বিশুদ্ধ ধর্ম্মমূলক নাটকের অভিনয় যদি কেহ দেখিতে চান, স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া নির্দ্দোষ আমোদের সহিত যদি কেহ প্রাণে ধর্ম্মভাবের বিকাশে ইচ্ছুক হন, আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলি— বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির পৌরাণিক নাটকের অভিনয়-দর্শনে প্রকৃতই তিনি পরিতুষ্ট হইবেন।..." (অনুসন্ধান— [illegible] আগস্ট, ১৮৯৮)

৯ দ্র. রাজকৃষ্ণ রায়— সাহিত্য-সাধক চরিতমালা (চতুর্থ খণ্ড)।

পৌরাণিক নাটকে বেঙ্গলের খ্যাতি দেশের প্রধান রাজপুরুষেরও অগোচর ছিল না। তদানীন্তন বড়লাট লিটন সাহেব তাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে 'শকুন্তলা' দর্শনের অভিপ্রায় জানিয়েছিলেন[১০] এবং এই উপলক্ষে সপরিবারে গভর্নর জেনারেলের বেঙ্গল তথা দেশীয় থিয়েটারে পদার্পণ বাংলা মঞ্চের ইতিহাসে 'অভূতপূর্ব' আখ্যায় চিহ্নিত হয়ে আছে। পৌরাণিক নাট্যকুশলতা বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিকে আর এক দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করেছিল। ১৮৯০ সালে প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের অভ্যর্থনায় এই শ্রেণীর নাটক পরিবেশনের কৃতিত্বে 'রয়েল' উপাধি লাভ করে বেঙ্গল।[১১] তদবধি নাট্যশালা 'রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার' নামে পরিচিত হয়। উপরোক্ত দৃষ্টান্তদ্বয় সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে রঙ্গালয়ের কৃতিত্ব এবং বৈশিষ্ট্য ঘোষণা করছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দোবদ্ধ 'মেঘনাদবধ কাব্য' নাটকাকারে গ্রথিত ও মঞ্চস্থ করার দুঃসাহসিকতায় বেঙ্গল থিয়েটারই সর্বপ্রথম উদ্বুদ্ধ হয় আর তাঁদের সেই অভিনব প্রয়াস সফলতা

১০ প্রসঙ্গতঃ, ১২৮৯ সালে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকের দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনে নাট্যকার নন্দকুমার রায় লিখেছেন :— "…ইদানীং পরম সম্মান-ভাজন শ্রীল শ্রীযুক্ত গভর্নর জেনরল লিটন সাহেব বাহাদুর ও তৎপারিষদবৃন্দ বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে ইহার অভিনয় প্রকাশ করিতে আদেশ করেন, তদনুসারে উক্ত নাট্যালয়ে ইহার অভিনয় হয় ; অভিনয়কালে তাঁহারা উপস্থিত থাকিয়া হর্ষলাভ করিয়াছিলেন। সেদিন তথায় বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল।…" (পুরাতন প্রসঙ্গ— বিপিনবিহারী গুপ্ত, দ্বিতীয় বিশ্বভারতী সংস্করণ)

১১ "১৮৯০ সনের ৭ই জানুয়ারি ভারতেশ্বরীর জ্যেষ্ঠপৌত্র প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের অভ্যর্থনার্থ গড়ের মাঠে যে সায়ং-সমিতি হয়, তথায় 'শকুন্তলা'র অভিনয় প্রদর্শন করিয়া বেঙ্গল থিয়েটার "রয়াল" উপাধি ভূষিত হইয়াছিল।" (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা— ষষ্ঠ খণ্ড) এই 'শকুন্তলা'র রচয়িতা কুঞ্জবিহারী বসু।

অর্জনে ব্যর্থ হয় নি।[১২] নিছক চমকপ্রদ ঘটনা হিসাবে নয়, এক গুরুত্বপূর্ণ সূচনার কারণে এই কাব্যের নাট্যরূপ ও পরিবেশনা কৃতিত্বের দাবী করতে পারে। বেঙ্গল মঞ্চে 'মেঘনাদবধ' অভিনয় নাট্যশৈলীর ক্ষেত্রে এক নতুন সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছিল, অনুপ্রাণিত করেছিল রাজকৃষ্ণ রায় এবং গিরিশচন্দ্রকে ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটক প্রণয়নে। উপরোক্ত দুই প্রথিতযশা নাট্যকারের আকাশচুম্বী খ্যাতি অংশতঃ, এই নতুন ছন্দের উপর নির্ভরশীল। বাংলা কাব্যসাহিত্যে ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন :— "......এদেশে কবিবর ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাহির করেন।...... বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে উক্ত কবির মেঘনাদবধ কাব্যখানি নাটকাকারে সজ্জিত হইয়া, সর্ব্বপ্রথমে অভিনীত হয়। তাহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের কোন স্থলেই বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথাবার্ত্তায় কোন নাটক অভিনীত হয় নাই। সেই প্রথম অভিনয়ের সময় আমরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মুখে উক্ত ছন্দের উচ্চারণ ও প্রয়োগাদি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা আজিও মনে জাগিয়া রহিয়াছে।...... অভিনয়কারিদিগের অভিনয়কালে মেঘনাদ-বধের চতুর্দ্দশাক্ষরাত্মক অমিত্রাক্ষর ছন্দ, অঙ্গভঙ্গি ও বাগ্‌ভঙ্গির অনুগত হইয়া, আমাদের কর্ণে কেমন আর একতর নূতন ছন্দের ছাঁচ গড়িয়া দিয়াছিল।...... শুভক্ষণে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ দেখা দিয়াছিল, এবং অভিনয়ক্ষেত্রে অভিনীত হইয়াছিল, নহিলে আধুনিক 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ' বাঙ্গালায় হইত কিনা সন্দেহ।......"

---

১২ সাফল্যের অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে :—"১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে 'মেঘনাদ-বধ' প্রথম অভিনীত হওয়ার পর নগরের গলিতে গলিতে বালকেরাও বীরদর্পে 'মেঘনাদে'র অংশবিশেষ আবৃত্তি করিত।" (অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য— ডঃ অরুণকুমার মিত্র)

বঙ্কিমকাহিনীর রূপায়ণে বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি উল্লেখযোগ্য দক্ষতার পরিচয় দেয়। 'দুর্গেশনন্দিনী' এবং 'রজনী'র অসংখ্য অভিনয়-বিবরণে তার সাক্ষ্য আছে। ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের জনপ্রিয়তার মূলে বেঙ্গল থিয়েটারের অবদান উপেক্ষার নয়। অমৃতলাল বসু লিখেছেন :— "……যে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা আজ সাহিত্যগুরু বলে থাকি, থিয়েটারই তাঁকে সাধারণের চোখের সামনে ফুটিয়ে দিয়েছে।…… বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ তখন বড় বেশী লোকের ভাগ্যে পড়া ঘট্‌তো না। বেঙ্গল থিয়েটার সর্ব্বপ্রথম দুর্গেশনন্দিনী নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করে বঙ্কিমবাবুকে সাধারণের সম্মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।" (রঙ্গভূমি— মাঘ, ১৩০৭) নিষ্ঠার সঙ্গে জাতির প্রতি রঙ্গালয়ের মহান কর্ত্তব্য পালনেও বেঙ্গল দ্বিধান্বিত হয় নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথেব স্বদেশহিতৈষণাব পথিকৃৎ 'পুরু-বিক্রম নাটক' সর্বপ্রথম এই মঞ্চ হতেই দেশবাসীর মনে জাতীয়তার বীজ বপন করে, নাট্যশালার পক্ষে যা নিঃসন্দেহে শ্লাঘার বিষয়। বাংলা থিয়েটারকে একাধিক প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী উপহার দিয়েছে বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি। এঁদের মধ্যে গোলাপ (সুকুমারী দত্ত), বনবিহারিণী (ভুনী), কুসুমকুমারী (প্রহ্লাদ-কুসুম) এবং বিনোদিনী দাসী ইতিহাসে স্মরণীয়া হয়ে আছেন। গায়িকা-অভিনেত্রীরূপে প্রথম তিনজনের অসাধারণ খ্যাতি এই রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার কালে অর্জিত। আর, শেষোক্ত মঞ্চশিল্পীর অনন্য নাট্যপ্রতিভার প্রাথমিক বিকাশক্ষেত্র যে বেঙ্গল, বিনোদিনী দাসীর আত্মচরিতেই তার স্বীকৃতি রয়েছে।[১৩]

১৩ "…আমি মাননীয় ৺শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথমে ২৫৲ পঁচিশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হই।… স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট আমি চিরঋণে আবদ্ধ। এইখান হইতেই আমার অভিনয় কার্য্যে শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নতির প্রথম সোপান। ‥ এই বেঙ্গল থিয়েটারই আমার কার্য্যের উন্নতির মূল ;…" (আমার কথা—বিনোদিনী দাসী)

দীর্ঘকাল একই ব্যক্তির অধিনায়কত্বে পরিচালিত হয়েছে বেঙ্গল থিয়েটার। অসংখ্য উত্থান-পতনে সমাকীর্ণ বাংলা মঞ্চের যাত্রা পথে এ এক আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম! ষ্টারে অমৃতলাল বসুর অবস্থিতি[১৪] ছাড়া সেযুগে এবং পরবর্তী কালেও সমশ্রেণীর ঘটনার দ্বিতীয় নজির নেই। বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির ২৮ বৎসরের আয়ুষ্কাল ছিল প্রতিবেশী মঞ্চের প্রভাব-শূন্য, স্বকীয় পন্থানুসারী এবং স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। বাংলা থিয়েটারের একচ্ছত্র সম্রাট নটগুরু গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং আচ্ছন্ন-কারী প্রতিভাও তাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে নি,[১৫] বিচ্যুত করতে পারে নি নিজস্ব নাট্যপদ্ধতি থেকে। প্রায় তিন দশকের ঐতিহ্যমণ্ডিত এই একই চালের[১৬] এবং একই হালের 'আদি নাট্য-শালা' প্রসঙ্গে তাই, সমকালীন সমালোচকের অনুসরণে মন্তব্য করা অসঙ্গত হবে না—ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বেঙ্গলই একমাত্র বনেদী থিয়েটার।

১৪ অমৃতলাল বসু ২৫ বৎসর কাল ষ্টারের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৫ "…বেঙ্গল থিয়েটারই কেবল সগর্ব্বে বলিবে যে আচার্য্যবর নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের সামান্যমাত্র সাহায্য গ্রহণ না করিয়াও স্বীয় আটাশবর্ষ-কালব্যাপী দীর্ঘজীবন সগৌরবে অতিবাহিত করিয়াছে।…" (বঙ্গীয় নাট্য-শালার ইতিহাস— কিরণচন্দ্র দত্ত/নাট্যমন্দির— শ্রাবণ, ১৩২০)

১৬ "বেঙ্গল থিয়েটারের কথা স্বতন্ত্র; তাঁহাদের পুরাতন চা'ল মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত বদলায় নাই।" (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর— অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

কথা ছিল, মাইকেল মধুসূদনের শেষ সম্পূর্ণ নাটক 'মায়া-কানন'[১৭] দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্বোধন হবে। কিন্তু নানা কারণে শেষ পর্যন্ত তা আর ঘটে উঠলো না। পরিবর্তে, কবির অপর নাটক 'শর্মিষ্ঠা' নিয়ে ১৮৭৩ সালের ১৬ আগস্ট তাঁরা আত্মপ্রকাশ করলেন। আবির্ভাবলগ্নে নতুন সম্প্রদায়ের ভাগ্যে যে অভ্যর্থনা জুটেছিল তা, আর যাই হোক্ উৎসাহব্যঞ্জক মোটেই নয়। পত্র-পত্রিকায় বেঙ্গল থিয়েটারের নাট্যসমালোচনায় অভিনয়ের গুণাগুণের চেয়ে বেশী গুরুত্ব পেল অভিনেত্রী প্রসঙ্গ। ভদ্রবংশীয় যুবকদের বারাঙ্গনা সহযোগে মঞ্চে আবির্ভূত হওয়ার ঘটনা দেশব্যাপী এক প্রবল এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিল। সে যুগের সৌখীন নাট্যচর্চায় এ দৃশ্য একেবারে বিরল না হলেও,[১৮] সাধারণ রঙ্গালয়ের পক্ষে ছিল

১৭ মধুসূদনের মৃত্যুর পর বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্যোগে 'মায়া-কানন' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (পৌষ, ১২৮০)। ভূমিকায় প্রকাশক শরৎচন্দ্র ঘোষ ও অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন :—"পরিশেষে স্বীকার্য্য যে, সংবাদ প্রভাকরের সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন।" এই সূত্রে কেউ কেউ অনুমান করেন নাটকের শেষাংশ ভুবনচন্দ্রের লেখা। মধুসূদন রচনাবলীর (সাহিত্য সংসদ) সম্পাদক ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত প্রসঙ্গতঃ লিখেছেন :— "··· ভুবন মুখোপাধ্যায়ের হাতের স্পর্শ নাটকের সমাপ্তি অংশে অনুভব করা যায়। মার্জিত করতে গিয়ে তিনি নিজের লেখা শেষাংশে কিছুটা যুক্ত করেছেন এরূপ ধারণা করার কারণ আছে।···"

১৮ দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর উদ্যোগে ৬ অক্টোবর, ১৮৩৫ তারিখে অনুষ্ঠিত 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকাভিনয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই অভিনয়ে রাধামণি, জয়দুর্গা এবং রাজকুমারী নামে তিনজন রমণীর অংশ গ্রহণের সংবাদ পাওয়া যায়। (দ্র. হিন্দু পাইয়োনিয়ার— ২২।১০।১৮৩৫)

ব্যাপারটি অকল্পনীয়। তাই, বেঙ্গল থিয়েটার প্রবর্তিত অভিনেত্রী প্রথা মঞ্চে স্থায়ীরূপ নিয়ে সুদূরপ্রসারী কুফলের সৃষ্টি করতে পারে এই আশঙ্কায় দেশের তাবৎ ইতর-ভদ্রজন সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্য রক্ষায় উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। ১৮ আগষ্ট, ১৮৭৩ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখলে :— "...we wish this dramatic corps had done without the actresses. It is true that professional women join the jattras and natches, but we had hoped managers of Bengali theatres would not bring themselves down to the level of the jattrawallas." ঐদিনেরই 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় বলা হল :—"Theatricals are now the rage in Calcutta. A Bengali Theatrical Company has been formed....on last Saturday 16th, the theatre was opened....The Gallery is well arranged and decent. Michael M. S. Dutta's classical drama Sarmistha was selected for the first appearance. The actors performed their parts very creditably. The two women who were professional women were most successful— we wish the drama would have done without actresses." 'ভারত-সংস্কারক' (২২।৮।১৮৭৩) জানালে :— "আজিকালি কলিকাতায় বড় নাটকের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। একদল সাতুবাবুর বাড়ির সম্মুখে একটি নাট্যশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গত শনিবারে তথায় মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রণীত শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। অভিনেতাদিগের মধ্যে দুইজন বেশ্যাও ছিল। এ পর্য্যন্ত আমরা যাত্রা, নাচ, কীর্ত্তন, ঝুমুরেই কেবল বেশ্যাদিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট বংশীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাদিগের অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম। ভদ্র

সন্তানেরা আপনাদিগের মর্য্যাদা আপনারা রক্ষা করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়।" 'শর্মিষ্ঠা'র প্রথম রজনীর ভূমিকালিপি ছিল এই রকম :— দেবযানী-এলোকেশী, দেবিকা-জগত্তারিণী, যযাতি-শরৎচন্দ্র ঘোষ এবং শুক্রাচার্য-বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। প্রথম অভিনয়ের রাত্রে দু'জন অভিনেত্রী শ্যামা ও গোলাপ অংশ গ্রহণ করেন নি। পরবর্তী অভিনয়ে এ নাটকের নামভূমিকায় গোলাপ অবতীর্ণ হতেন। 'শর্মিষ্ঠা'তে বেঙ্গল সুবিধা করতে পারলে না, ভাগ্য ফিরলো 'মোহান্তের এই কি কাজ!'[১৯] নামে সমসাময়িক ঘটনার উপর ভিত্তি ক'রে লেখা এক নাটক পরিবেশনে। নাটকখানির রচয়িতা লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। অভিনয়ের তারিখ— ৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩। প্রসঙ্গতঃ, অমৃতলাল বসু লিখেছেন :— "বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয় চলছে, কিন্তু জমছে না; শেষ বাবা তারকনাথ মুখ তুলে চাইলেন; মোহান্ত মহারাজ এক ষোড়শী এলোকেশী যাত্রীর রূপে মোহিত হলেন, এলোকেশীর স্বামী পত্নী বধ করলেন; কে একজন বাঙ্গালী (ক্রশ্চান বোধহয়) 'মোহান্তের এই কি কাজ' ব'লে নাটক লিখলেন, সেই নাটকের অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের নাম সারা বেঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ল,···। মাইকেলের পরামর্শে নারী এক্‌ট্রেস নিয়েও যে বেঙ্গল থিয়েটার খালি বেঞ্চির সামনে প্লে কচ্ছিল, মোহান্ত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে সেই বেঙ্গলের দরজা থেকে রাত্রির পর রাত্রি শত শত লোক ফিরে যেতে লাগল।" (মাসিক বসুমতী— জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪) এ নাটকে মোহান্তের ভূমিকায় অংশ নিতেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। বটুবিহারী ব্যানার্জী সাজতেন জেলার। 'মোহান্তের এই কি কাজ!' অভিনয়ের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ভুবনমোহন নিয়োগী, অমৃতলাল বসু, ধর্মদাস সুর, নগেন্দ্রনাথ

১৯ কৌতূহলী পাঠকের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে, এই বছরেই জনৈক যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের লেখা ঐ একই নামের নাটক প্রকাশিত হয়।

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ন্যাশনাল সম্প্রদায়ের কর্মীরা 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। ৫ অক্টোবর, ২২ এবং ২৯ নভেম্বর যথাক্রমে 'চক্ষুদান' (রামনারায়ণ), 'রত্নাবলী' (রামনারায়ণ) ও 'কৃষ্ণকুমারী' (মধুসূদন) অভিনয়ের পর ২০ ডিসেম্বর বেঙ্গল থিয়েটার বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'[২০] মঞ্চস্থ করলে। নাট্যরূপ বিহারীলালের। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (অভিরাম স্বামী), শরৎচন্দ্র ঘোষ (জগৎসিংহ), হরি বৈষ্ণব (ওসমান), গোলাপ (বিমলা), জগত্তারিণী (তিলোত্তমা), এলোকেশী (আসমানী) এবং চোয়ে ওরফে চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (আয়েষা)[২১]। বেঙ্গল মঞ্চে 'দুর্গেশনন্দিনী' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। জগৎসিংহের রূপসজ্জায় শরৎচন্দ্র অশ্বপৃষ্ঠে মঞ্চাবতরণ করতেন।

২০ বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত এই 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপ বিহারীলাল প্রদত্ত ব'লে অনেকে উল্লেখ করলেও, জনৈক বিশিষ্ট নাট্যসমালোচক জানিয়েছেন :— "এটি গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যরূপের নকল, প্রসিদ্ধ নট কিরণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক এই থিয়েটারের জন্য সংগৃহীত হইয়াছিল।" (দৃশ্যকাব্য পরিচয়— সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়)

গিরিশচন্দ্র নাটকায়িত 'দুর্গেশনন্দিনী'র পরবর্তী উল্লেখযোগ্য অভিনয় হয় ১৮৭৮, ২২ জুন ন্যাশনাল থিয়েটারে। প্রথম অভিনয় রাত্রে কেদার চৌধুরী ও কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে জগৎসিংহ এবং ওসমান সাজেন। দ্বিতীয় প্রদর্শনী থেকে শিল্পী পরিবর্তন ঘটে। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র জগৎসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ও ওসমান চরিত্রে রূপ দেন মহেন্দ্রলাল বসু।

বিশ শতকের গোড়ায় (১৯০৬, ১১ ফেব্রুয়ারি) মিনার্ভায় নব পর্যায়ে 'দুর্গেশনন্দিনী' (নাট্যরূপ— গিরিশচন্দ্র) খোলা হয়। ওসমান ও আয়েষা রূপে দানীবাবু এবং তারাসুন্দরী স্মরণীয় অভিনয় করেন।

২১ 'বিশ্বকোষ' থেকে স্ত্রীভূমিকাগ্রহণকারী এই পুরুষ অভিনেতার নামটি সংগৃহীত। এই দৃষ্টান্ত থেকে অনুমান করা যায়, অভিনেত্রী নিযুক্ত হওয়ার পরেও বেঙ্গল থিয়েটারের প্রথম যুগে পুরুষ অভিনেতারা নারী চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন।

এ নাটকে ওসমান এবং জগৎসিংহের ভূমিকায় হরি বৈষ্ণব ও শরৎচন্দ্র ঘোষের অভিনয় ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। ন্যাশনাল থিয়েটারে জগৎসিংহের ভূমিকাভিনেতা স্বয়ং গিরিশচন্দ্র এই চরিত্রের রূপায়ণে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন[২২] আর পরবর্তী-কালের কৃতী ওসমান দানীবাবুও হরি বৈষ্ণবের কৃতিত্বকে ম্লান করতে পারেন নি।[২৩]

১৮৭৪, ৩ জানুয়ারি 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিশেষ অভিনয় দেখে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' (৭।১।১৮৭৪) জানালে :— "....The actors, in our opinion, deserve great credit for the manner in which they sustained their respective parts, the distribution of which, no doubt, had been judiciously arranged, for each part fitted its actor, as if it had been specially written for him.

The parts of Juggut Sing, Osman and Beerendro

২২ জগৎসিংহের রূপসজ্জায় শরৎচন্দ্র ঘোষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের স্বীকৃতির উল্লেখ আছে অপরেশচন্দ্রের স্মৃতিকথায়। তিনি জানিয়েছেন :— "ন্যাশন্যালে যখন দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয় হইত তখন গিরিশবাবু জগৎসিংহ সাজিতেন, বেঙ্গলে জগৎসিংহ সাজিতেন স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ। শরৎবাবু একজন বড়দরের অভিনেতা ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের জগৎসিংহের খুব সুখ্যাতি ছিল; কিন্তু তবুও গিরিশচন্দ্রকে বলিতে শুনিয়াছি "দেখ, জগৎসিংহ আমার অপেক্ষা শরৎবাবু ভাল করিতেন।" (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর— অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

২৩ দানীবাবুর জীবনীকার হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত স্বয়ং স্বীকার করেছেন, ওসমানরূপী হরি বৈষ্ণবের "Stature, movements and the representation of the part were unique and have not been surpassed by any actor till today including even the master artist Dani Babu." (The Indian Stage— vol. II)

Sing specially were acted to the full and entire satisfaction of the audience. The others also did their parts of the work well and cleverly· The female actors, however, carried off the palm.······

That native females in the lower walks of life could be so trained, could be made to enter, as it were into the soul of the characters they represented could be disciplined to sustain intelligently and truthfully the most difficult parts was what we could not believe. But we were most agreeably undeceived. The actresses well deserved the repeated applause with which the audience testified their approval. The few songs sung by them were in exceeding good taste.

The hall was densely crowded. More than 200 applications for tickets had to be refused for want of larger accommodation. We would ask the manager to repeat the performance of this most successful drama for a few more nights." জানুয়ারি মাসের ১০, ১৭ এবং ২৪ তারিখে অভিনীত হল যথাক্রমে 'কাদম্বরী' (নিমাইচাঁদ শীল), 'অপূর্ব কারাবাস' ও 'একেই কি বলে বাঙ্গালি সাহেব ?' (গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়)। ৭ মার্চ কালীপদ ভট্টাচার্যের (?) 'প্রভাবতী' মঞ্চস্থ করার পর ঐ মাসেরই ১৪ তারিখে বেঙ্গল থিয়েটার 'বিদ্যাসুন্দর' (যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর) ও 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' (রামনারায়ণ তর্করত্ন) অভিনয় করলে। 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকে মালিনী সাজলে গোলাপ। এইদিন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পারিবারিক অভিনেতৃ সম্প্রদায়ের দু'একজন অবৈতনিকভাবে এই অভিনয়ে যোগ

দিয়েছিলেন। অভিনয় দেখে ১৭ মার্চ, ১৮৭৪ তারিখের 'ইংলিশম্যান' লিখলে :— "গত শনিবার সায়াহ্নে বীডন ষ্ট্রীটের বেঙ্গল থিয়েটারে লোকারণ্য হইয়াছিল। দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু পান্নালাল শীল, চকদীঘির ছক্কনলাল রায় এবং বহু সম্ভ্রান্ত দেশীয় লোককে দেখা গিয়াছিল। জন-ছয়েক সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। সেদিন সুপরিচিত 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক, এবং 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' নামে একখানি প্রহসন অতি নৈপুণ্যের সহিত অভিনীত হয়। প্রত্যেক চরিত্রেরই অভিনয় স্বাভাবিক হইয়াছিল।"[২৪] (অনূদিত) মাইকেল মধুসূদন দত্তর 'মায়া-কানন'[২৫] নাটকের উদ্বোধন হল ১৮ এপ্রিল। নাটকটি কবি তাঁর মৃত্যুশয্যায় বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে, মধুসূদনের

---

২৪ দ্র. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৫ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর Indian Stage-vol. II গ্রন্থে বেঙ্গলে 'মায়া-কানন' নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ ৩০ আগস্ট, ১৮৭৩ নির্ধারিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য :— ১৮৭৩, ৩১ ডিসেম্বর 'কাম্য-কানন' নাটক দিয়ে গ্রেট ন্যাশনালের উদ্বোধন হয়। 'কাম্য-কানন' মধুসূদনের 'মায়া-কানন' নাটকের আদর্শে লেখা। অমৃতলাল বসুর জবানীতে আছে, "as Maya Kanon was not running well, we took Kamya Kanon— C ove desired for." সুতরাং গ্রেট ন্যাশনাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ পর্বে অর্থাৎ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দেই যে বেঙ্গলে 'মায়া-কানন' মঞ্চস্থ হয়েছিল, তাতে সন্দেহ কি ?

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এখানে অমৃতলালের উক্তির বিকৃত ইংরেজী অনুবাদ করা হয়েছে। তাঁর স্মৃতিকথায় আছে :— "বেঙ্গলে তখন 'মায়াকানন' লইয়া নাড়াচাড়া করা হইতেছে; জমাট বাঁধিতেছে না।" 'নাড়াচাড়া' অর্থে অমৃতলাল 'অভিনয়ের তোড়জোড' বোঝাতে চেয়েছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ তাকে নিজের সিদ্ধান্তের অনুকূলে আনার জন্য সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ দিয়েছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বঙ্গী· নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখিত 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার বিজ্ঞাপন দৃষ্টে জানা যায় ১৮ এপ্রিল, ১৮৭৪ বেঙ্গলে 'মায়া-কানন' অভিনীত হয়।

লিপিকার কৈলাসচন্দ্র বসু 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় লিখেছেন :— "...বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় শরৎ ঘোষ মহাশয় মধুসূদন দত্তের উৎসাহ এবং পরামর্শক্রমে প্রথম হইতেই অভিনেত্রী লয়েন। তিনিই নাটক লিখিয়া দিবেন স্থির হয়।

রোগশয্যায় শয়ান থাকিয়া মধুসূদন দুইখানি নাটক রচনা আরম্ভ করেন। দুইখানিই বঙ্গরঙ্গভূমির জন্য লিখিত হইতেছিল। প্রথমখানির নাম মায়াকানন, দ্বিতীয়খানি, বিষ কি ধনুর্গুণ— অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।...রোগশয্যায় কবির লেখনী ধারণে ক্ষমতা না থাকায় আমি তদীয় শয্যাপার্শ্বে বসিয়া 'মায়াকানন' লিখিতাম। মুহুর্মুহুঃ রক্তবমন হইত, রোগের জ্বালা দুঃসহতর হইত, তথাপি নাটক রচনায় বিরতি ছিল না।"[২৬] (১৫।৯।১৮৭৪) পরবর্তী অভিনয় মাইকেল মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' (৪।৭), জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরু-বিক্রম নাটক' (২২।৮) এবং হরলাল রায়ের 'বঙ্গের সুখাবসান' (১৪।১১)। জাতীয় ভাবোদ্দীপক 'পুরু-বিক্রম নাটকে' পুরু, সেকেন্দর শা ও রানী ঐলবিলা সাজলেন যথাক্রমে শরৎচন্দ্র ঘোষ, হরি বৈষ্ণব এবং গোলাপ। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি' গ্রন্থে এই অভিনয়ের উল্লেখ আছে। লেখক জানিয়েছেন :— "...বেঙ্গল থিয়েটারে... নাটকখানি অভিনীত হয়। ছাতুবাবুদের বাড়ীর শরচ্চন্দ্র ঘোষমহাশয় পুরু সাজিয়াছিলেন। শরৎবাবুর একটি অতি সুন্দর শাদা আরব ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটি যেমন তেজীয়ান্ তেমনি সায়েস্তাও ছিল। এই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, তিনি উন্মুক্ত অসি হস্তে স্বল্পপরিসর নাট্যমঞ্চের উপর আস্ফালনপূর্ব্বক ঘুরিয়া-ফিরিয়া, সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিতেন। ঘোড়াটি কিন্তু এমনই ঠাণ্ডা যে, নীচে ফুট্-লাইট্ (foot-light), চারিদিকে গ্যাসের উজ্জ্বল আলোক, দর্শক-গণের ঘন ঘন করতালিধ্বনি, যুদ্ধের বাজনা প্রভৃতি এত গোলমালে

২৬ দ্র. ভারতীয় নাট্যমঞ্চ— হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

ও কিছুমাত্র ভীত বা চকিত হইত না। এইরূপে এই দৃশ্যে বীররসের অতি চমৎকার অবতারণা করা যাইত।” (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি / বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।) নাটকখানি এই বছরেরই ৩ অক্টোবর গ্রেট ন্যাশনালে মঞ্চস্থ হয়।[২৭] সেখানকার ভূমিকালিপি ছিল এইরকম :— সেকেন্দর শা— নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরু — মহেন্দ্রলাল বসু এবং রানী ঐলবিলা— ক্ষেত্রমণি। বছরের শেষে সম্প্রদায় বর্দ্ধমান-মহারাজের আহ্বানে কালনার রাজবাটীতে অভিনয় ক'রে এলেন। অভিনয়ে খুসী হয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক হলেন বর্দ্ধমানের মহারাজা। এই উপলক্ষে বেঙ্গল মঞ্চে ১২ ডিসেম্বর 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিশেষ অভিনয় অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষণীয় করার জন্য কর্তৃপক্ষ জাঁকজমকের ত্রুটি করেন নি। 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' (১৫।১২।১৮৭৪) জানালে :— “BENGAL THEATRE.— we hear that the Maharajah of Burdwan has allowed his name to be connected with the Bengal Theatre as its patron. This concession on the part of the Maharajah was duly celebrated on Saturday last, when the well known and favourite drama, 'Durgesh Nandini,' or the Vir n of the Fortress, was repeated for the 11th time. The Theatre building was neatly decorated inside and out with festoons and flags, and, as usual, a bumper house rewarded the company for their exertions to please the public.” এই সময় মঞ্চের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী গোলাপ

২৭ “পুরুবিক্রম ২২এ আগষ্ট, ১৮৭৪ তারিখে বেঙ্গল থিয়েটারে এবং পরবর্ত্তী ৩রা অক্টোবর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।” (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা / ষষ্ঠখণ্ড)

বেঙ্গল ছেড়ে গ্রেট ন্যাশনালে যোগ দেন।[২৮] বছরের শেষ নাটক হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'মণিমালিনী'। বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয়ের তারিখ— ২৬ ডিসেম্বর, ১৮৭৪।

১৮৭৫ সালের গোড়ায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগীর সঙ্গে অর্থ-সংক্রান্ত বিবাদের ফলে[২৯] সেখানকার ম্যানেজার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন বর্মণ, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, যাদুমণি, কাদম্বিনী প্রমুখ একদল নট-নটীসহ গ্রেট ন্যাশনাল ছেড়ে বেঙ্গলের সাথে যুক্ত হলেন। এঁরা অবশ্য গত বৎসরের শেষের দিকেই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে বেরিয়ে 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী' নাম নিয়ে কলকাতা ও মফস্বলের বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শনী ক'রে বেড়াচ্ছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে এই দলের সম্মিলিত অভিনয় 'সতী কি কলঙ্কিনী?' (নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (?)) ৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হল। গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী আর বেঙ্গল থিয়েটার মিলিতভাবে ১৩ এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে 'কপালকুণ্ডলা' (বঙ্কিমচন্দ্র) ও 'ভীম-সিংহ' (তারিণীচরণ পাল) মঞ্চস্থ করার পর ৬ মার্চ মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' নামালে। মেঘনাদ হলেন কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর লক্ষ্মণ হরি বৈষ্ণব। এঁদের অভিনয়নৈপুণ্য বিদগ্ধজনের প্রশংসা পেয়েছিল। পরবর্তীকালে অমৃতলাল বসু লিখেছেন :— "কিরণ—

২৮ গ্রেট ন্যাশনালে যোগ দিয়ে গোলাপ উপেন্দ্রনাথ দাস বিরচিত 'শরৎ-সরোজিনী' (২।১।১৮৭৫) নাটকে অংশগ্রহণ করেন। ১৮৭৫ সালের আগস্টেই গোলাপকে পুনরায় বেঙ্গল মঞ্চে দেখা যায়।

২৯ গ্রেট ন্যাশনালের ম্যানেজার-পদ থেকে অপসারিত করলে স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন তাঁকে কুড়ি হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন— ১৮৭৪ সালের শেষের দিকে নগেন্দ্রনাথ এইরকম একটি চুক্তিতে ভুবনমোহনকে স্বাক্ষর দিতে বলেন। নিয়োগীমশায় প্রস্তাবে অসম্মত হ'লে দল দ্বিধাবিভক্ত হয়।

৺কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ;— ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ সহোদর। এক সময়ে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হইতে গ্রন্থকার ও তাঁহার সঙ্গে আর কতকগুলি সুদক্ষ অভিনেতা আসিয়া বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেন। তৎকালে বেঙ্গল থিয়েটারে মাইকেলের মেঘনাদবধ নাটকাকারে প্রথম অভিনীত হয়। কিরণচন্দ্র তাহাতে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে মেঘনাদের ভূমিকা অভিনয় করিয়া সহযোগী লক্ষ্মণবেশী হরি বৈষ্ণবের সহিত জনসাধারণকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন।" (অমৃত-মদিরা) আর অনুপম অভিনয় করতেন বিহারীলাল মহাদেব চরিত্রে। এরপর গ্রেট ন্যাশনালের দলত্যাগী নট-নটীরা পুনরায় তাঁদের পুরানো থিয়েটারে ফিরে যান।[৩০] এই সময় (২২।৫) বেঙ্গল মঞ্চে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'গুইকোয়ার নাটক' দর্শক সমাজে সাড়া জাগায়।

২২ মে'র অভিনয়ের পর তিন মাস বেঙ্গল থিয়েটার বন্ধ থাকে।

---

৩০ দলত্যাগীদের মধ্যে মদনমোহন বর্মণ বেঙ্গল থেকে পুনরায় গ্রেট ন্যাশনালে যোগ দেন ১৮৭৫ সালের মে মাসে। (দ্র. ইংলিশম্যান—১৫।৫।১৮৭৫)

অমৃতলাল বসুর গ্রেট ন্যাশনালে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন :— "গত বৎসর যে অমৃতবাবু, নগেন্দ্রবাবু চলিয়া যান, অমৃতবাবু ৩।৪ মাস মধ্যেই ফিরিয়া আসেন।" (ভারতীয় নাট্যমঞ্চ) কেবল তাই নয়, তৎরচিত ইতিহাসে ১৮৭৫, ১৭ জুন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে স্বরচিত 'হীরকচূর্ণ' নাটকে অমৃতলালের অভিনয়েরও উল্লেখ আছে। ব্যাপারটি একেবারেই অসম্ভব। কেননা, গ্রেট ন্যাশনালে এ-নাটকের প্রথম অভিনয় যে ২৫ ডিসেম্বর, ১৮৭৫ হয়েছিল, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র বিজ্ঞাপনের সাহায্যে তা প্রমাণ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, অমৃতলাল পুনরায় গ্রেট ন্যাশনালের সঙ্গে যুক্ত হন ১৮৭৫ সালের আগস্ট মাসে, যখন সেখানে মহাসমারোহে 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় চলছিল সেই সময়। (দ্র. আমার কথা— বিনোদিনী দাসী)

ইতিমধ্যে গ্রেট ন্যাশনালে আবার ভাঙ্গন।[৩১] আবার দলত্যাগ। আবার বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান। এবার এলেন ধর্মদাস সুর ও তাঁর অনুগত নট-নটীরা। নতুন দলের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন উপেন্দ্রনাথ দাস। এঁরা 'দি নিউ এরিয়ান (লেট ন্যাশনাল) থিয়েটার' নামে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন ক'রে ১৪ আগস্ট, ১৮৭৫ বেঙ্গল মঞ্চে আবির্ভূত হলেন। ঐদিন তাঁদের উদ্যোগে উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'[৩২] নাটকের প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। আগন্তুক দলের প্রথম প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।[৩৩]

৩১ এবারে দলত্যাগের কারণ এই :— ১৮৭৫ সালের মে মাসে ধর্মদাস সুরের নেতৃত্বে গ্রেট ন্যাশনাল সম্প্রদায় পশ্চিম-ভ্রমণ সেরে কলকাতায় ফিরলে বিদেশে অর্জিত অর্থ ও উপহারাদি নিয়ে স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে তাঁর গোলমাল বাধে এবং পরিণামে ভুবনমোহন শ্যামপুকুর-নিবাসী জনৈক কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে থিয়েটার লিজ দেন (আগস্ট, ১৮৭৫)। ফলে, ধর্মদাস সুর সদলবলে বেঙ্গল থিয়েটারের সাথে যুক্ত হন।

৩২ নাটকের ভূমিকায় প্রকাশক উপেন্দ্রনাথ দাস জনৈক মৃত 'দুর্গাদাস দাস' কে রচয়িতা হিসাবে উল্লেখ করলেও প্রকৃতপক্ষে, উপেন্দ্রনাথই 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' প্রণয়ন করেন। নাটকখানি যে সেকালে যুগপৎ পাঠক ও সমালোচক মহলে সমাদৃত হয়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে 'বান্ধব' পত্রিকার নিম্নোক্ত মন্তব্যে :—"......সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর রচয়িতা আমাদিগের সকলেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন। তিনি মরিয়াও বাঁচিয়া উঠিয়াছেন। আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার দ্বারা বঙ্গভাষা এবং বঙ্গভূমি বিশেষরূপে উপকৃত ও অলঙ্কৃত হইবে। আমরা এবার তাঁহার সহিতই তাঁহার তুলনা করিলাম ; কিছুদিন পরে হয়তো তাঁহাকে বঙ্গের জীবিত ও মৃত সমস্ত নাটক লেখকের সহিতই তুলনা করিতে বাধ্য হইব।......" (আশ্বিন-কার্তিক, ১২৮২)

৩৩ "An opposition Company commenced their season on saturday last at the Bengal Theatre with the new drama by Babu Upendra Nath Das called Surendra Binodini. It was a great success, but the theatre is too small." (ইংলিশম্যান— ১৭।৮।১৮৭৫)

সে রাত্রের ভূমিকালিপি ছিল এই রকম :— সুরেন্দ্র-নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিরাজমোহিনী-গোলাপ (সুকুমারী দত্ত), বিনোদিনী-বনবিহারিণী (ভুনী) এবং ম্যাজিস্ট্রেট-হরি বৈষ্ণব। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার এ-নাটক মঞ্চস্থ করেছিল ৩১ ডিসেম্বর, ১৮৭৫ তারিখে। ততদিনে উপেন্দ্রনাথ দাস, ধর্মদাস সুর, সুকুমারী প্রভৃতি আবার গ্রেট ন্যাশনালে ফিরে গেছেন। সেখানে মহেন্দ্রলাল বসু, সুকুমারী দত্ত, ধর্মদাস সুর এবং অমৃতলাল বসু যথাক্রমে সুরেন্দ্র, বিনোদিনী, হরিপ্রিয় ও ম্যাজিস্ট্রেট সাজেন। বেঙ্গল মঞ্চে 'নিউ এরিয়ান থিয়েটার' আরো যে-সব নাটকের অভিনয় করেছিল তাদের মধ্যে আছে :— দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বীরনারী' (৪।৯), রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা'[৩৪] (১১।৯) এবং নবীনচন্দ্র সেন বিরচিত 'পলাশীর যুদ্ধ' (২৫।৯)। শেষোক্ত নাটকের সঙ্গে 'মাখাল ফল' নামে একটি প্রহসনও মঞ্চস্থ হয়। আগের মত এই বিচ্ছিন্নতাও কিছুদিনের মধ্যে জোড়া লেগে যায়। বছরের শেষের দিকে এঁরা গ্রেট ন্যাশনালে পুনর্মিলিত হন।

১৮৭৬ সনে বেঙ্গল থিয়েটারের নতুন পাকাবাড়ী তৈরী হল। মাটীর দেওয়াল ও খোলার ছাউনীযুক্ত গৃহে এতদিন এঁদের অভিনয় চলছিল। প্রেক্ষাগারের পরিসরও ছিল নিতান্ত সঙ্কীর্ণ।[৩৫] প্রায় আড়াই বছর থিয়েটার চলার পর সম্প্রদায়ের আর্থিক বনিয়াদ সুদৃঢ় হওয়ায় স্বত্বাধিকারীরা নতুন গৃহ-নির্মাণের সংকল্প নিলেন। 'ইংলিশম্যান' (২৫।১।১৮৭৬) জানালে :—"A New Native Theatre.—we hear that the Bengal Theatre Company are getting up a new theatre in Beadon Street, opposite

৩৪ প্রথম অভিনয়।

৩৫ এই অসুবিধা সম্পর্কে সেকালের পত্র-পত্রিকায় একাধিকবার মন্তব্য করা হয়েছে। (দ্র. ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ— ৭।১।১৮৭৪ এবং ইংলিশম্যান— ১৭।৮।১৮৭৫)

the house of the late Babu Ashutosh Deb. The company expect to open the Theatre next month." বেঙ্গল থিয়েটার নব কলেবর ধারণ করার পর নটী বিনোদিনী গ্রেট ন্যাশনাল থেকে এখানে যোগ দেন। এই সময়কার বেঙ্গল থিয়েটারের বিবরণ আছে তাঁর স্মৃতিকথায়। বিনোদিনী দাসী লিখেছেন :— "……বেঙ্গল থিয়েটারে আগে খোলার চাল ছিল, এবারে গিয়ে দেখলুম, খোলার বদলে করগেট হ'য়েছে, বাইরেরও অনেক বদল হয়েছিল। কিন্তু হ'লে কি হয়। প্লাটফরম সেই মাটির ঢিপিই ছিল। প্লাটফরমের আগাগোড়া মাটি— মাঝে খানিকটা তক্তা বসান, নীচে সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে স্টেজের ভেতর হতে বরাবর অডিটোরিয়ামে যাওয়া যেত। যারা কনসার্ট বাজাত তারা ঐ পথ দিয়েই যাতায়াত করত। মাটির প্লাটফরমের কারণ এই— বেঙ্গল থিয়েটারের স্টেজে অনেক নাটকে ঘোড়া বার করা হ'ত। শরৎবাবুর ঘোড়ার সখ ছিল খুব ; তিনি খুব ভাল সওয়ার ছিলেন,…… ।" (আমার কথা) এই বছরের অক্টোবর মাসে এখানে 'বিদ্যাসুন্দর' মঞ্চস্থ হয়। দ্বিতীয় রজনীর অভিনয় দেখে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' মন্তব্য করে:— "BENGAL THEATRE.—Contrary to apprehensions the second performance of the melodrama, Bidya Sundera, was of a satisfactory nature. The dramatis personee this time acquitted themselves in a creditable manner, and avoided the shortcomings of the previous performance. It is gratifying that since the last remark that appeared in this paper, the management could have improved so greatly the system of acting throughout. Such earnestness and energy on the part of the management deserve special commenda-

tion, and this will ultimately give the institution a creditable footing. The actors and actresses, by their free and off hand colloquy, gave the acting a natural character, and created a pleasing effect on the audience. The acting of Malini, Bidya, Sundera, Vat, and Chapala were so interesting that to pass individual remarks upon each of them would be quite superfluous. The only defect was in the colloquy between Malini and Sundera in the garden scene; and this is to be ascribed to the disturbance caused by some of the Baboos in the upper stalls who should have been at once expelled". (৯।১০।১৮৭৬)

১৮৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে কর্তৃপক্ষ সপ্তাহে তিন রাত্রি অভিনয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং দর্শকদের সুবিধার জন্য মঙ্গল ও বৃহস্পতিবারের প্রবেশমূল্য অর্ধেক করা হল।[৩৬] ১৫ মার্চ বেঙ্গল থিয়েটার লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী বিরচিত 'কুলীনকন্যা অথবা কমলিনী' মঞ্চস্থ করলে। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সমাচারচন্দ্রিকা' বললে :—
"...এতৎ অভিনয়ে কৌলিন্যপ্রথার আচার-ব্যবহারাদি স্পষ্টই দর্শিত হইয়াছিল; বাস্তবিক কুলীন মহাত্মাদিগের কার্য্যকরণসমূহ অতীব ভয়ানক ও কঠোর।...অদ্যকার অভিনয়ে কমলিনী নায়িকা ও দিননাথ নায়ক, কিন্তু ইহাদের প্রণয় এতদূর হইয়াছিল যে, তাহাতে কমলিনীর পিতা জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের কোন অভিমত হয় নাই। ফলতঃ দিননাথের দেশান্তর, সেই সম্বন্ধে কমলিনীর জন্য তাহার অধৈর্য্য-প্রকাশ ও অবশেষে উন্মত্তপ্রাপ্ত এবং কমলিনীরও দিননাথের অদর্শন-জনিত বিরহবেদনা ও অদৃশ্য হওন ও অলীক জনাপবাদ হত্যা—

৩৬ দ্র. সমাচারচন্দ্রিকা— ১০।২।১৮৭৭।

তদ্বিধায়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের তথ্যানুসন্ধান, তৎপরে কালীর মন্দিরে অবস্থিতিকরণ এবং দিননাথের বন্ধু তারানাথের সহ সাক্ষাৎ ও প্রথমে অপরিচিতের ন্যায় সম্ভাষণ এবং চিন্তা কর্তৃক ফটিকচন্দ্রের অভিপ্রায়-সিদ্ধি ও অবশেষে দিননাথের সহ কমলিনীর পরিণয় এবং তজ্জন্য জয়রাম ভাবী জামাতাকে ক্লেশ দেওন জন্য আপনাকে ভর্ৎসনা ইত্যাদি সমস্তই দর্শকমণ্ডলীর পরিতৃপ্তিকর হইয়াছিল।" (২০।৩।১৮৭৭) এই মাসেরই ২৪ তারিখে বেঙ্গল 'মেঘনাদবধ' নাটকের সঙ্গে 'আলিবাবা' নামালে। 'আলিবাবা' দর্শকদের খুসী করতে পারে নি। বরং এর অভিনয়ে রুচিসম্পন্ন দর্শক ক্ষুব্ধই হয়েছিলেন।[৩৭] সুকুমারী দত্ত'র 'অপূর্ব সতী'[৩৮] অভিনীত হল ২৯ মার্চ। পরের নাটক 'রত্নাবলী' (৩১।৩) দেখে 'সমাচারচন্দ্রিকা' জানালে:— "অভিনেতৃগণের মধ্যে উদয়ন, বসন্তক, বাসবদত্তা, রত্নাবলী এবং কাঞ্চনমালার অভিনয় প্রশংসনীয় হইয়াছিল। বসন্তক প্রতি পদে পদে দর্শকদিগকে হাসাইয়াছিলেন। রত্নাবলীর সুস্বর সঙ্গীতে দর্শকমণ্ডলী পরিতৃপ্ত হন।......" (২।৪।১৮৭৭) সঙ্গীত শ্রবণসুখকর হলেও, এই সময় বেঙ্গল থিয়েটারের ঐক্যতানবাদনের মান উন্নত ছিল না এবং নট-নটীদের সাজ-সজ্জার দৈন্য দর্শকচক্ষুকে পীড়া দিত।[৩৯]

৩৭ "... আলিবাবার অভিনয় বাঁদরামী অপেক্ষা অধিক কিছুই নয়।..." (সমাচারচন্দ্রিকা— ২৬।৩।১৮৭৭)

৩৮ সুকুমারী ভবানীপুরনিবাসী জনৈক আশুতোষ দাসের সহায়তায় নাটকখানি লেখেন। (দ্র. অভিনেতৃ কাহিনী— অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত)

৩৯ "... বঙ্গরঙ্গভূমির ঐক্যতানবাদন অতি জঘন্য; ইহার উন্নতি না করিতে পারিলে এবং অভিনেতৃগণের পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন না হইলে বড় সুবিধা হইবে না। বঙ্গরঙ্গভূমিতে নাটকগুলি অভিনয় ভাল হয় এবং এখানে ভাল ভাল অভিনেতৃ আছে, ইহা আমরা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহি, কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে বেশভূষা চাই, বাহ্যিক আড়ম্বর চাই, তবে দশজনে শ্রদ্ধা করিবে।..." (সমাচারচন্দ্রিকা— ২।৪।১৮৭৭)

এপ্রিলে পর পর বঙ্কিমচন্দ্রের তিনখানি নাটক—'মৃণালিনী'[৪০] (১৬।৪), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮।৪) এবং 'দুর্গেশনন্দিনী' (২১।৪) পরিবেশন করলেন কর্তৃপক্ষ। 'মৃণালিনী' অভিনীত হয়েছিল কেবলমাত্র মহিলা দর্শকদের জন্য, ঐ দিন পুরুষদের প্রবেশাধিকার ছিল না। নাটকের ভূমিকালিপি ছিল এইরকম:—পশুপতি—কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবাচার্য—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, দিগ্বিজয়—গিরীশচন্দ্র ঘোষ (ন্যাদাড়ু), মৃণালিনী—বনবিহারিণী (ভুনী), গিরিজায়া—সুকুমারী দত্ত এবং মনোরমা—বিনোদিনী। 'মনোরমা'র ভূমিকায় বিনোদিনীর অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্যে প্রীত হয়ে সেকালের ইংরেজী সংবাদপত্রগুলি তাঁকে 'ফ্লাওয়ার অফ্ দি নেটিভ স্টেজ', 'সাইনোরা' ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করেছিল। এ-নাটকে গিরিজায়া-রূপিণী সুকুমারীর সঙ্গীতদক্ষতায় দর্শকরা মুগ্ধ হতেন। আর অনবদ্য অভিনয় করতেন বিহারীলাল 'মাধবাচার্য' চরিত্রে। 'কপালকুণ্ডলা'য় অংশ নিতেন হরি বৈষ্ণব (নবকুমার), বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (কাপালিক), বিনোদিনী (কপালকুণ্ডলা) এবং সুকুমারী (মতিবিবি)। আর, শেষের নাটকে তখন জগৎসিংহ, ওসমান, কতলু খাঁ, বিমলা, আশমানী, আয়েষা বং তিলোত্তমা সাজতেন যথাক্রমে শরৎচন্দ্র ঘোষ, হরি বৈষ্ণব, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, সুকুমারী, এলোকেশী, বিনোদিনী ও বনবিহারিণী। তিলোত্তমা চরিত্রের মূল অভিনেত্রী বনবিহারিণীর (ভুনী) প্রায়শঃ অনুপস্থিতির জন্য বিনোদিনীকে বহুবার একই অভিনয়ে 'আয়েষা' এবং 'তিলোত্তমা'র যুগ্ম ভূমিকায় রূপ দিতে হয়েছে। বৈচিত্র্যধর্মী ও জটিল চরিত্রের শিল্পসম্মত সার্থক রূপায়ণে বিনোদিনীর তখন প্রচুর

৪০ 'মৃণালিনী'র নাট্যরূপ সম্পর্কে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন:—
'...(The manuscripts according to some being supplied by Babu Kiran Chandra Banerjee, who appeared as Pashupati),..." (The Indian Stage— vol. II)

খ্যাতি। বস্তুতঃ, বেঙ্গল মঞ্চে এই সময়ই তাঁর অনন্য নাট্যপ্রতিভার প্রাথমিক বিকাশ ঘটে, যার পূর্ণতা বিডন স্ট্রীটের ষ্টারে। নট-নটীদের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচকরা কিন্তু তদানীন্তন বেঙ্গল থিয়েটারের মঞ্চ ব্যবস্থাপনার ত্রুটির উল্লেখে বিস্মৃত হন নি। এই প্রসঙ্গে ৪ মে, ১৮৭৭ 'সমাচারচন্দ্রিকা' মন্তব্য করেছে ঃ— " .. বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির ষ্টেজ ম্যানেজমেণ্টের বড় সুবন্দোবস্ত নাই। কোন সময় ঘরের মধ্যে বাগান আসিল, কখন বা ঘরের ভিতর সমুদ্র প্রবেশ করিল—এ সকল অতি জঘন্য। বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির ষ্টেজ তত্ত্বাবধানের দোষে অনেক সময় অনেকে বিরক্ত হন। " বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'সুভদ্রাহরণ' মঞ্চস্থ হল ২৫ এপ্রিল। 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' ও 'পঞ্চপাণ্ডবের বনগমন' (৫।৫) অভিনয়ের পর ১৬ মে বেঙ্গল থিয়েটার 'সতী কি কলঙ্কিনী?' গীতিনাট্যের সঙ্গে 'আয় ঘুরে আয় সোনার চাঁদ' নামে এক নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রহসন নামালে সমালোচনায় চারিদিকে ধিক্কারের রব উঠলো। কর্তৃপক্ষকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ ক'রে 'সমাচারচন্দ্রিকা' লিখলে ঃ— "...আয় ঘুরে আয় সোনার চাঁদ প্রহসনখানি অতি জঘন্য। ইহার নামটি যেরূপ অশ্লীল, অভিনয়ও তদপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে। এই প্রহসনখানি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া রচিত এবং অভিনীত হইয়াছে। এমনকি অভিনয়দর্শনে আমাদিগের বোধ হইল যে, ইহা স্পষ্টত গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটরের অধ্যক্ষ বাবু ভুবনমোহন নেউগীকে এবং উক্ত থিয়েটরের অভিনেতৃ-গণকে বিদ্রূপ এবং গালি দেওয়া হইতেছে। কোন্ ভদ্রলোক পরনিন্দা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন? সুতরাং ইহা যে উপস্থিত ভদ্র দর্শকগণের কষ্টপ্রদ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে অনুমান সন্দেহ নাই।... নাট্যাভিনয় আইনের একটি ধারায় লিখিত আছে, অশ্লীল, নিন্দাজনক অথবা অপবাদজনক কোন নাটক কিম্বা প্রহসনের অভিনয় করিলে নাট্যশালার অধ্যক্ষ, অভিনেতৃ এবং দর্শকগণ দণ্ডার্হ হইবেন। বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির অভিনীত "আয় ঘুরে আয় সোনার চাঁদ" প্রহসনখানি কি

এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট নহে? ..... আমাদের বক্তব্য, বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি "আয় ঘুরে আয় সোনার চাঁদ" নামধেয় যে প্রহসনের অভিনয় করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে পুলিশ কমিস্তনর একটু মনোযোগী হইবেন।..." (১৮।৫।১৮৭৭) প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, পূর্বোক্ত ঘটনার মাত্র কয়েক মাস পূর্বে গ্রেট ন্যাশনালে 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' (১৯।২।১৮৭৬) শীর্ষক এই শ্রেণীর ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক প্রহসন অভিনয়ের সূত্র ধরেই বাংলা থিয়েটারে কুখ্যাত 'Dramatic Performances Act, 1876' বিধিবদ্ধ হয়।

১৮৭৮ সালের জানুয়ারি মাসের ১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত 'শকুন্তলা' অভিনয়ের সমুদয় অর্থ কর্তৃপক্ষ 'পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি'র সাহায্য-ভাণ্ডারে দান করলেন। এই উপলক্ষে তদানীন্তন বড়লাট লিটন সাহেব এলেন বেঙ্গল থিয়েটারে।[৪১] প্রসঙ্গতঃ, 'ইংলিশম্যান'

৪১ বেঙ্গল মঞ্চে বড়লাট লিটন সাহেবের আগমন প্রসঙ্গে সূত্রধার রচিত 'অথ নটঘটিত' গ্রন্থে বলা হয়েছে :— "ন্যাশানাল থিয়েটারের এখন জয়জয়কার, প্রতিযোগিতায় বেঙ্গল থিয়েটার হঠে যাচ্ছে। তখন বেঙ্গল থিয়েটার নিজের নাম জাহির করতে এক চাল চালল। 'পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, গ্র্যাণ্ট-সাহেব তার সম্পাদক, সমিতির জন্য টাকা চাই, গ্র্যাণ্ট-সাহেব চাঁদা সংগ্রহ করছেন। বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তারা গ্র্যাণ্টকে গিয়ে বললেন যে, তাঁরা ওই সমিতির সাহায্যে একটা Benefit Night দেবেন, কিন্তু যে ক'রে হোক বড়লাটবাহাদুরকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য থিয়েটারে আনতে হবে। গ্র্যাণ্ট-সাহেব ব্যবস্থা করলেন, 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় হল; বড়লাট লিটন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে দেখতে এলেন।"

কিন্তু 'শকুন্তলা'র নাট্যকার নন্দকুমার রায় তাঁর নাটকের দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনে যা লিখেছেন তাতে, এর বিপরীত ছবিই ফুটে উঠেছে। তিনি জানিয়েছেন, 'শকুন্তলা'র জনপ্রিয়তায় আকৃষ্ট হয়ে গভর্নর-জেনারেল স্বয়ং নাটকটি দেখার অভিপ্রায় জানান। তিনি লিখেছেন :— "·· ইদানীং পরম সম্মানভাজন শ্রীল শ্রীযুক্ত গভর্নর জেনরল লিটন সাহেববাহাদুর ও তৎ পারিষদবৃন্দ বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে ইহার অভিনয় প্রকাশ করিতে

জানালে :— "The Bengal Theatre— on Friday night, Their Excellencies Lord and Lady Lytton, with Sir Richard Temple accompanied by their respective suites, visited this Theatre and witnessed the play of Sakuntala or the Lost Ring. We understood that this is the first occasion on which viceroy has ever visited a native Theatre. Great pains were unmistakeably taken by the management to make everything pleasant for Their Excellencies and the manner in which the piece was put on the stage reflects much credit on the proprietor. The scenery was very good, the dresses of the artists were effective and the dialogues good, though with somewhat of a tendency to drag, specially in the bee scene in which a young lady and two attendants are concerned at

আদেশ করেন, তদনুসারে উক্ত নাট্যালয়ে ইহার অভিনয় হয, অভিনয়কালে তাঁহারা উপস্থিত থাকিয়া হর্ষলাভ করিয়াছিলেন। সেদিন তথায় বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল।"

সে যাই হোক্, লাটসাহেব অপরের অনুরোধে অথবা নিজের ইচ্ছায়, যেভাবেই অভিনয় দেখে থাকুন—সেকালের দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাপারটি রঙ্গালয়ের পক্ষে গৌরবজনক সন্দেহ নেই। আর, এই গৌরবে গৌরবান্বিত হওয়ার জন্ম প্রতিদ্বন্দ্বী ন্তাশনাল থিয়েটারের পক্ষ থেকেও যে পরোক্ষ চেষ্টা চলেছিল, তার প্রমাণ রয়েছে 'সমাচারচন্দ্রিকা'র নীচের মন্তব্যে :— "...আমরা ইচ্ছা করি, লর্ড লিটন একদিন ন্তাশন্তাল থিয়েটর সন্দর্শন করেন। ন্তাশন্তালের অভিনেতৃগণ যে বঙ্গরঙ্গভূমির অপেক্ষা যোগ্য লোক, তাহার আর সন্দেহ নাই এবং তাঁহাদের অভিনয় দর্শনে যে লর্ড লিটন প্রীত হইবেন, তাহাও নিঃসন্দেহ।" (২১।১।১৮৭৮)

the extraordinary behaviour of a bee of immense dimensions. Lord and Lady Lytton having stayed an hour in the theatre, left a little before 11 o'clock. The theatre was crammed and must have contributed materially to the funds of the society, for the prevention of "cruelty to Animals" in the aid of which, proceeds of the evening were devoted."
(২১।১।১৮৭৮) ১৬ মার্চ মঞ্চস্থ হল বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর'। নামভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করলেন :— হরি বৈষ্ণব (প্রতাপ), শরৎচন্দ্র ঘোষ (ফষ্টর), বনবিহারিণী (দলনী) এবং এলোকেশী (কুলসম)। বেঙ্গল মঞ্চে 'চন্দ্রশেখর' নাটকের অভিনয় এই প্রথম। বিহারীলাল সম্ভবতঃ নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অমৃতলাল বসু ষ্টারের জন্য 'চন্দ্রশেখর' নাটকায়িত করেন। সেখানে নামভূমিকায় অমৃতলাল মিত্রের অভিনয় বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এরপর বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র পুনরভিনয় করলে বেঙ্গল থিয়েটার ৮ জুন।

১৮৭৯, ১৫ জানুয়ারি অভিনীত হল গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'পাষাণ প্রতিমা'। শরৎচন্দ্র ঘোষ ও হরি বৈষ্ণব যথাক্রমে ভীষ্মাচার্য ও রণজিৎ সিং সাজলেন।

১৮৮০-তে বেঙ্গল থিয়েটারের উপর শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট অভিনেতা শরৎচন্দ্র ঘোষ মারা গেলেন।[৪২] তাঁর মৃত্যুর পর রঙ্গালয়ের কর্ণধার হলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

১৮৮১ সনে অভিনীত নাটকের তালিকায় আছে :— জ্যোতিরিন্দ্র-

৪২ দ্র. The Indian Stage (vol. III)— Hemendra Nath Das Gupta.

নাথের 'অশ্রুমতী', বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'রাবণবধ' এবং রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুর্ভঙ্গ'। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর পরিবার-পরিজনদের জন্য থিয়েটার কর্তৃপক্ষ একদিন 'অশ্রুমতী'র বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। সেই অভিনয়ের অন্যতম দর্শক শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণে লিখেছেন :— "... অশ্রুমতী অভিনয় হল, বাড়ির মেয়েরা কেউ দেখতে পেলেন না। তখন পাবলিক স্টেজে গিয়ে মেয়েবা দেখবে, এ দস্তুর ছিল না। কী করা যায়। বাবামশায় বললেন, পুরো বেঙ্গল থিয়েটার এক রাতের জন্য ভাড়া নেওয়া হোক। কেবল আমাদের বাড়ির লোকজন থাকবে সেদিন। অ্যাক্টাররা ছাড়া বাইরের লোক আর-কেউ থাকবে না। সেই প্রথম মেয়েবা ছাড়া পেলে পাবলিক স্টেজে থিয়েটার দেখতে। ছয় বছরের শিশু আমাব মতো, আব অনেক বুড়িদেরও সেই প্রথম থিয়েটার দেখা। অনেক টাকা খবচ কবে এক দিনের জন্য স্টেজ ভাড়া করা হল ; বেঞ্চিটেঞ্চি নয়, ও-সব সরিয়ে বাড়ির বৈঠকখানা থেকে আসবাবপত্র নিয়ে হল্ সাজানো হল। নীচে কার্পেট পেতে ইজি-চেয়ার, ফুলের মালা, আলবোলা, মেয়েদের জন্য চিকের ব্যবস্থা— ঠিক যেন আটচালা সাজানো হয়েছে। স্টেজের অডিটরিয়াম ঘর হয়ে গেল।···বসে আছি, ড্রপসিন পড়ল, তাতে আঁকা ইউলিসিসের যুদ্ধ-যাত্রা। রাজপুত্তুব নৌকোতে চলেছে, জলদেবীদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, পিছনে পাহাড়ের সার— গ্রীক-যুদ্ধের একটা কপি। কোনো সাহেবকে দিয়ে আঁকিয়েছিল বোধ হয়, প্রকাণ্ড সেই ছবি। নৌকো থেকে গোলাপ ফুলের মালা ঝুলছে, কী ভালো যে লাগছে, তন্ময় হয়ে দেখছি। সিন উঠল। ভামশা মন্ত্রী ইয়া লম্বা দাড়ি, রাজপুত্তুর, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, তলোয়ারের ঝক্‌মকানি, হাসিকান্না— ডুবে গেছি তাতে। অভিনয় হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কথা মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে। মলিনা সেজেছিল সুকুমারী দত্ত। স্টেজ-নাম ছিল গোলাপী, সে যা গাইত! বুড়ো বয়সেও শুনেছি তার গান, চমৎকার গাইতে পারত। মিষ্টি গলা

ছিল তার, অমন বড়ো শোনা যায় না। আর কী অভিনয়, এক হাতে পিদিমটি ধরে শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে আসছে, যেন ছবিটি-এখনো চোখে ভাসছে। পৃথ্বীরাজ আর মলিনার গান, এখনো কানে বাজছে সে সুর— এ সুখ-বসন্তে সই কেন লো এমন আপন-হারা বিবশা— ওইটুকু ছেলের মন একেবারে তোলপাড় করে দিলে। ভীল সর্দার সেজেছিলেন অক্ষয় মজুমদার। 'এ চেনী বুঁড়ি' বলে যখন অশ্রুমতীর থুঁতি ধরে আদর করছে, তা ভুলবার নয়। আর ভীলদের মতো সেজে, মাথায় পালক গুঁজে তীরধনুক নিয়ে…অক্ষয়বাবুর নৃত্য, এই নৃত্যতেই ছোটো ছেলের মন একেবারে জয় করে নিলেন। সেই থেকে আমি তাঁকে কমিক অভিনয়ে গুরু বলে মেনে নিনুম।…অশ্রুমতীও বেশ ভালো অভিনয় করেছিল। প্রতাপসিংহের অভিনয়, বাদশার ছেলে সেলিমের অভিনয়, সব যেন সত্যি-সত্যিই রূপ নিয়ে ফুটে উঠছে, অভিনয় বলে মনেই হচ্ছে না।… স্তব্ধ হয়ে দেখছি, অন্য জগতে চলে গেছি। অশ্রুমতী নাটকে না ছিল কী! আর কী রোমান্টিক সব ব্যাপার! মুখে কথাটি নেই, স্থির হয়ে দেখছি, হঠাৎ একটা জায়গায় খটকা লাগল। অভিনয় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, অশ্রুমতী বেশ ভালো অভিনয়ই করেছিল, কিন্তু ওমা, তার পায়ের দিকে চেয়ে দেখি বকলস-দেওয়া বার্নিশ-করা জুতো! অশ্রুমতী হল রাজপুত রমণী, তার পায়ে এ জুতো কী! তবে তো এ আসল নয়, ওই একটুখানি সাজের খুঁতে এত যে ইলিউশন সব ভেঙে গেল। এই প্রথম আমার স্টেজে দেখা নাটক।[৪৩]…" "গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে, মৃদুল মধুর বংশী বাজে", "এখনো এখনো প্রাণ, সে নামে শিহরে কেন?" এবং "ক্যায়্সে কাহারোয়া জাল বিনুরে" —'অশ্রুমতী'র এই তিনখানি গান সেই যুগে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। নাটকের ভূমিকালিপি ছিল এইরকম :— প্রতাপসিংহ—

৪৩ দ্র. ঘরোয়া— অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ।

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, সেলিম— হরি বৈষ্ণব, মলিনা—সুকুমারী ও অশ্রুমতী—বনবিহারিণী। বেঙ্গল মঞ্চে এ-নাটকে একদা স্বয়ং গিরিশচন্দ্র তু'অঙ্ক প্রতাপসিংহ সেজে গেছেন।

১৮৮২ সালের ২২ জুলাই ন্যাশনাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'সীতাহরণ' নাটকের উদ্বোধনের কিছুদিন পর সেখানকার অন্যতম বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্যকার অমৃতলাল বসু ন্যাশনালের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ক'রে বেঙ্গল থিয়েটার লিজ নিলেন।[৪৪] ১৫ সেপ্টেম্বর এখানে নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্নের 'হরিশ্চন্দ্র' মঞ্চস্থ হল। ২৫ ডিসেম্বর বেঙ্গল অমৃতলাল বসু বিরচিত 'ডিস্‌মিস' (প্রহসন) নামালে।

১৮৮৩-র ফেব্রুয়ারিতে ওঁরই লেখা 'ব্রজলীলা' (নাট্যরাসক) বেঙ্গল মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ, 'স্টেট্‌সম্যান' লেখে ঃ— "Bengal Theatre— The opera 'Brojo Lilla' was reproduced at this place of entertainment last Saturday before a large audience. The piece was well

৪৪ বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা'য় এই লিজ গ্রহণের উল্লেখ আছে। তাতে জানা যায়, থিয়েটারের দখল নিয়ে অমৃতলালকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। বিনোদিনী লিখেছেন :—"…এই সময় এখনকার ষ্টার থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার অমৃতলাল বসু আসিলেন। ইহার আগে ইনি বেঙ্গল থিয়েটার লিজ্ লন, তখন বোধহয় আমরা ৺প্রতাপবাবুর থিয়েটারে ; সেই সময়ে কোন কারণবশতঃ জোড়ামন্দিরের পাশে ঐ সিমলাতে আমাদের একটি বাড়ী ভাড়া ছিল। সে বাড়ীতে ভুনীবাবুও প্রায়ই যাইতেন ও কার্য্যানুরোধে কয়েকদিন বাসও করিয়াছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষীয়দের সহিত বিবাদ থাকায় থিয়েটার হাউস দখল করিতে পারিতেছিলেন না। আমরাই দূর দেশ হইতে লাঠিয়াল আনাইয়া দিয়া ভুনীবাবুকে দখল দেওয়াইয়া দিই।…" (আমার কথা) এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, থিয়েটারমহলে অমৃতলাল বসু 'ভুনীবাবু' নামে পরিচিত ছিলেন।

mounted and was a success throughout." (১৯।২।১৮৮৩) এই বছরের জুলাই মাসে বিডন স্ট্রীটে ষ্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হ'লে অমৃতলাল বেঙ্গল থিয়েটার ছেড়ে সেখানে যোগ দেন।

১৮৮৪ সালের উল্লেখযোগ্য নাট্য নিবেদন রাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত 'প্রহ্লাদ-চরিত্র'।[৪৫] ১১ অক্টোবর এ-নাটকের উদ্বোধন হয়েছিল। 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঞ্চসফল নাটক। বেঙ্গল মঞ্চে নাটকখানি অসংখ্যবার অভিনীত হয়ে কর্তৃপক্ষকে প্রচুর অর্থ দিয়েছে। ষ্টারও এই সময় গিরিশচন্দ্রের 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নামায় (২২।১১।১৮৮৪) এবং তাতে অমৃতলাল মিত্র, বিনোদিনী প্রমুখ প্রখ্যাত নট-নটীর অংশ গ্রহণ সত্ত্বেও প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করে বেঙ্গল। বেঙ্গল থিয়েটারের এই সাফল্যের মূলে ছিল নামভূমিকায় কুসুমকুমারী নাম্নী জনৈকা অভিনেত্রীর অসামান্য সঙ্গীতনৈপুণ্য। অপূর্ব কণ্ঠমাধুর্যের গুণে 'প্রহ্লাদ' চরিত্রের রূপদাত্রী কুসুমকুমারী 'প্রহ্লাদ-কুসুম' বা 'প্রহ্লাদকুসী' নামে অভিহিত হতেন। দর্শকদের চমৎকৃত

---

৪৫ নাটকের ভূমিকায় রাজকৃষ্ণ রায় লিখেছেন :—"গত বৎসর [১২৯১ সাল] আশ্বিন মাসে পূজার পরেই একখানি নাটক অভিনয় করিবার জন্য বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানি প্রস্তুত হন। আমি তাঁহাদের ইচ্ছাক্রমে গুরুতর পরিশ্রম করিয়া পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে প্রহ্লাদ-চরিত্র নাটকখানি লিখিয়া দি।... ২৬এ আশ্বিন শনিবার রাত্রিতে ইহার প্রথম অভিনয় করেন। সে সময়ে আমার অবকাশ না থাকাতে প্রহ্লাদ-চরিত্রের অন্তর্গত গীতগুলির মধ্যে ছয়টি গীত লিখিয়া দিবার সময় পাই নাই। কিন্তু এদিকে শীঘ্র অভিনয় করিবার প্রয়োজন হওয়াতে উক্ত থিয়েটার কোম্পানি আমার ইচ্ছাক্রমে ছয়টি গীত রচনা করিয়া অভিনয় আরম্ভ করেন। তারপর আমি পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সময় স্বতন্ত্র ছয়টি গীত রচনা করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি।..."

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, 'রতন আসনে রতন ভূষণে যুগলরতন রাজে' এবং 'তোর নাম রেখেছি হরিবোলা, মনের সাধে ও আমার মন খেল না হরিনামের খেলা'—'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নাটকের এই দু'খানি গান বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। শেষের গানটির রচয়িতা রাজকৃষ্ণ।

করার মত অন্য আকর্ষণও এ-নাটকে ছিল। মঞ্চে হাতির আবির্ভাব তাদের অন্যতম। 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নাটকের ভূমিকালিপি ছিল এই রকম :— হিরণ্যকশিপু— যোগীন্দ্র ঘটক, কয়াধু— বড় রানী, ষণ্ড— কুঞ্জবিহারী বসু, অমর্ক— মথুরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রহ্লাদ— কুসুমকুমারী। নাটকখানির জনপ্রিয়তা যে পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল, ১৪ ডিসেম্বর, ১৮৮৭ তারিখের 'অনুসন্ধান' পত্রিকার নীচের মন্তব্যে তার প্রমাণ মিলবে। পত্রিকাটি লিখেছিল :— "বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি। সংপ্রতি উক্ত রঙ্গালয়ে সমিতির কোন কর্ম্মচারী 'প্রহ্লাদ-চরিত্রে'র অভিনয় দেখিতে যান। তাঁহার মতে প্রহ্লাদেব অভিনয় বাস্তবিকই বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির 'বিজয়-নিশান'। ফলতঃ 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' আজি পর্য্যন্ত পুরাতন হইল না, ইহা কি রঙ্গ-ভূমির অল্প গৌরবের কথা ?"

রাজকৃষ্ণ রায়ের 'দুর্বাসার পারণ' অভিনীত হল ১৮৮৫, ২১ নভেম্বর। এ-নাটকে যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘটক, মথুরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গণেশচন্দ্র ঘোষ, গিরীশচন্দ্র ঘোষ (ন্যাদাড়ু), কালীকিঙ্কর মল্লিক এবং কুঞ্জবিহারী বসু যথাক্রমে ভীম, বিদূষক, দুর্য্যোধন, শকুনি, যুধিষ্ঠির ও চিত্ররথ এবং দুর্বাসার শিষ্য সাজতেন। 'দুর্বাসার পারণ' দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছিল। কৈশোরে এই অভিনয় দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন পরবর্তীকালের কৃতী নট ও নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।[৪৬]

১৮৮৬-তে মঞ্চস্থ নাটকের তালিকায় আছে রাখালদাস ভট্টাচার্য রচিত 'স্বাধীন জেনানা' (৩০।১), রাজকৃষ্ণ রায়ের 'ভীষ্মের শরশয্যা'[৪৭] (১২।৬), 'দশরথের মৃগয়া বা বালক সিন্ধুবধ'[৪৮] (১৮।৯) এবং 'সুরুচির ধ্বজা' (রাখালদাস ভট্টাচার্য) ও 'দুই সতীনের কোন্দল'

৪৬ দ্র. রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ—রমাপতি দত্ত

৪৭ প্রথম অভিনয়।

৪৮ প্রথম অভিনয়।

(৬।১১)। 'ভীষ্মের শরশয্যা' নাটকে ভীষ্মের ভূমিকায় বিহারীলালের অনবদ্য অভিনয় তাঁর নটজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

১৮৮৭-তে 'পাণ্ডব নির্বাসন', 'শ্রীবৎসচিন্তা', 'রুক্মিণীরঙ্গ' এবং 'প্রভাস মিলন' নাটকের উদ্বোধন হল যথাক্রমে ২২ জানুয়ারি, ৯ এপ্রিল, ৩০ মে ও ২৯ অক্টোবর তারিখে। সবগুলিই বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। এদের মধ্যে 'প্রভাস মিলন' অনেক দিন দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছে। ষ্টারে বর্ষীয়ান্ অভিনেতাদের দ্বারা রূপায়িত গিরিশচন্দ্রের 'প্রভাসযজ্ঞ' (৩।৫।১৮৮৫) সে অনুপাতে চলেনি।[৪৯] 'প্রভাস মিলন' অভিনয়ের সুখ্যাতি ক'রে 'অনুসন্ধান' লিখলে ঃ—"বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি।—মধ্যে সমিতির প্রেরিত কোন রিপোর্টার উক্ত রঙ্গভূমিতে প্রভাস-মিলন পুস্তকের অভিনয় দেখিতে যান; প্রভাসের অভিনয় সেদিন অতি সুন্দর হইয়াছিল। ফলতঃ প্রহ্লাদ-চরিত্রের ন্যায় বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি প্রভাসের অভিনয়েও সাধারণকে তুষ্ট করিতে পারিতেছেন, এই বিশেষ প্রশংসার কথা।" (২৭।৩।১৮৮৮)

১৮৮৮ সাল। এ বৎসরও বেঙ্গল বিহারীলালের দু'খানি পৌরাণিক নাটক মঞ্চস্থ করলে। নাটক দু'খানির নাম— 'নন্দবিদায়' এবং 'পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ'। 'নন্দবিদায়' প্রসঙ্গে 'অনুসন্ধান (১৪।৭।১৮৮৮) জানালে ঃ— "বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি। আজকাল উক্ত রঙ্গালয়ে 'নন্দবিদায়' নামক এক নূতন নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। অভিনয় যেরূপ সুন্দর হইতেছে, তাহাতে ইহাও 'প্রহ্লাদচরিত্র' ও 'প্রভাস-মিলন' প্রভৃতির ন্যায় প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, এইরূপ বোধ হয়। বলা বাহুল্য, সমিতির কোন কোন মেম্বর এ অভিনয় দেখিয়াও পূর্ব্বরূপ তুষ্ট হইয়াছেন।" 'পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ' সম্পর্কে পত্রিকাখানির অভিমত ব্যক্ত হল নীচের ভাষায় ঃ— "[বঙ্গ]-রঙ্গ-ভূমি। বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে আজকাল "পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ" নামক একখানি করুণ রসাত্মক

৪৯ দ্র. গিরিশচন্দ্র—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

নাটক অভিনীত হইতেছে। নাটকখানি উক্ত থিয়েটারে অভিনীত সুবিখ্যাত 'প্রভাস মিলন' রচয়িতার প্রণীত বলিয়া পরিচয় পাইয়াছি। এ নব নাটকের অভিনয়ও বেশ সুন্দর হইতেছে। পরীক্ষিতের করুণ ধর্ম্মভাবে পাষাণও বিগলিত হয়; আর, মহামুনি শমীকের শোকপ্রবাহও বড়ই উচ্ছ্বাসময়। দৃশ্যপটের মধ্যে তক্ষক-দংশনে সজীব বৃক্ষের মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মীভূত হওন ও ধন্বন্তরীর কৃপায় পুনবায় পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হওন, অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। তদ্ভিন্ন, অভিনয়-সম্প্রদায় অপরাপর কএকটি পোষাক-পরিচ্ছদ ও দৃশ্যপটের জীর্ণ সংস্কার করিয়াছেন দেখিয়াও সুখী হইলাম।" (১৪।১২।১৮৮৮)

১৮৮৯-র ২ মার্চ অভিনীত হল-'শৈলজা'। সমালোচনা প্রসঙ্গে ১২ মার্চ তারিখের 'অনুসন্ধান' লিখলে :— "বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি।—আজ-কাল উক্ত রঙ্গালয়ে 'শৈলজা' নামক একখানি নূতন সামাজিক নাটকের অভিনয় হইতেছে। এ অভিনয়েও থিয়েটার-কোম্পানীর কিন্তু বেশ পারদর্শিতা দেখা গেল। অধিক কি, নাটকের প্রথমাংশে বরকর্ত্তার অভিনয়েই হৃদয়ে যেরূপ ক্রোধ ও ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছিল, নাটকের শেষাংশেও তাহার বিষময় ফল দর্শন করিয়া অশ্রু সম্বরণ কবিতে পারি নাই। অধিকন্তু নররাক্ষস নররুদ্র ও তাহার 'যেমন দেবা তেম্নি দেবী'-সদৃশা পত্নী যেমন হাসাইয়াছে, তেমনই তাহাদের দেখিয়া হৃদয় জ্বলিয়াছে। ফলতঃ অভিনয়াংশে অনেকেই বাহাদুরী দেখাইয়াছেন—তাঁহাদিগকে দেখিয়া অনেক সময় নাটকোচিত ভাবের প্রতিবিম্ব স্বতঃই মনোমধ্যে অঙ্কিত হইয়াছিল। তবে কথা এই, যদিও শৈলজার শেষ দৃশ্যে আমরা অনবরত কাঁদিয়াছি, তথাপি কিন্তু শৈলজার পূর্ব্বাপর কথাবার্ত্তাগুলি যেন টান-টান—সেই ভাঙা পদ্যে সুর করিয়া কথা কহার ন্যায়, বোধ হইয়াছিল। যাই হোক মোটের উপর অভিনয় দেখিয়া অনেকেই তুষ্ট হইবেন, আশা করা যায়। দৃশ্যের মধ্যে বালির রেলওয়ে ষ্টেসনটি বড়ই মনোরম হইয়াছিল। উপসংহারে অভিনয়াংশে না হউক, অন্ততঃ নাটকাংশেও

অভিনয়ের কিন্তু অনেক দোষ দেখা গেল। তবে সে দোষ নাটক-কারের; সুতরাং অভিনয় সমালোচনায় সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সময়ান্তরে তাহা উল্লেখ করিবার বাসনা রহিল।" বিহারীলালের 'জন্মাষ্টমী' নামলো জুন মাসে। ১৬ নভেম্বর বেঙ্গল থিয়েটার কুঞ্জবিহারী বসু[৫০] বিরচিত 'শকুন্তলা' মঞ্চস্থ করলে। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'অনুসন্ধান' জানালে:— "গত দুই সপ্তাহ হইতে বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমে 'শকুন্তলা' নামক একখানি নূতন 'নাট্যগীতি' অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। মহাকবি কালিদাসের 'শকুন্তলা' এক অপূর্ব্বরত্ন; বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির অধ্যক্ষ বাবু কুঞ্জবিহারী বসু মহাশয় সেই আদর্শরত্নের অনুসরণে এই নাট্যগীতি প্রণয়ন করিয়াছেন। এ অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া বড়ই দুরূহ কার্য্য; কৃতকার্য্য হইবার আশা স্বভাবতঃই অল্প। আর সেই জন্যই প্রথম হইতেই আমাদের শঙ্কা হইয়াছিল যে, কুঞ্জবাবু হয়তো বা এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। কিন্তু এক্ষণে অভিনয় দেখিয়া বুঝিলাম যে, আমরা তাঁহার নিকট যাহা আশা করিতে পারি, তিনি এ বিষয়ে তাহারও অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার এ উদ্যোগ নিষ্ফল হয় নাই। অভিনয় কার্য্য সম্যক সুন্দর হইয়াছিল। গানগুলি এরূপ তান-লয়-যুক্ত সুস্বরে গীত হইয়াছিল যে, সকলেই তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।……দুষ্মন্ত, জেলে ও শকুন্তলা প্রভৃতির অংশও দক্ষতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল। ফলতঃ সেদিনের অভিনয় দেখিয়া আমরা পরিতুষ্ট হইয়াছি। অধিকন্তু অপ্সরকাননের দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। আমরা সেবার 'থিয়েটার রএল' নামক ইংরাজী নাট্যশালায় 'শ্লিপিং বিউটির' (sleeping Beauty) অভিনয়ে যে সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া-ছিলাম, এটি যেন তাহারই অনুকরণ বলিয়া মনে হয়।…" (২৯।১১।১৮৮৯)। এই 'শকুন্তলা' দেখে কৈশোরে মুগ্ধ হয়েছিলেন

৫০ বেঙ্গল থিয়েটারের বিজ্ঞাপন বিভাগের অধ্যক্ষ, নট ও নাট্যকার।

শিল্পসমালোচক অর্দ্ধেন্দুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (ও. সি. গাঙ্গুলী)। পরবর্তীকালে তিনি স্মৃতিচারণে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন:— "...সেই বালক বয়সে প্রথম দেখেছিলাম কুঞ্জবিহারী বসু প্রণীত 'শকুন্তলা' অভিনয়। মথুরবাবু নিজে সাজতেন দুষ্মন্ত। প্রথম দৃশ্যটি এখনও বেশ মনে আছে। ষ্টেজের মধ্য দিয়ে সবেগে একটি হরিণ ছুটে গেল, তার পিছু পিছু দুষ্মন্ত ছুটে এলেন হরিণ শিকার করতে। বড় পিচ-বোর্ডে আঁকা একটি হরিণের ছবি দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে এমন কৌশলে টেনে নেওয়া হত, মনে হত যেন একটি জীবন্ত বাস্তবিক হরিণই ছুটছে। দুষ্মন্ত তার পেছনে দৌড়ে গেলেই দুটি ঋষিবালক তাঁকে বারণ করে করুণ সুরে গান ধরতো—"বোধো না, বোধো না, রাজা, অবলা হরিণী।" প্রথম দৃশ্যের এই গানের জন্য অভিনয় গোড়া থেকেই জমে উঠতো; আমাদের মনে এই দৃশ্যটি খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল। শকুন্তলা কাহিনীর মূল বক্তব্য বুঝবার বয়স তখন হয় নি। এইসব দৃশ্য ও গানই আমাদের অভিভূত করতো।"

১৮৯০ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বেঙ্গল থিয়েটারের 'রয়েল' উপাধি লাভ। ৭ জানুয়ারি গড়ের মাঠে প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের অভ্যর্থনায় সম্প্রদায় পূর্বোক্ত 'শকুন্তলা' নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন ক'রে এই সম্মান পেলেন। এবং এই সময় থেকে নাট্যশালা 'রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার' বা 'রাজকীয় বঙ্গ রঙ্গভূমি' নামে অভিহিত হ'তে থাকে। 'অনুসন্ধান' (১১।২।১৮৯০) জানালে:— "গড়ের মাঠে রাজপৌত্রের সমক্ষে অভিনয় করিয়া 'বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানী' বড়ই যশঃ খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজদরবার হইতে কোম্পানীকে নানা প্রশংসাবাদ প্রদত্ত হইতেছে।" ১ মার্চের নাটক বিহারীলাল বিরচিত (?) 'সীতা-স্বয়ংবর'। কৌতুক নাটক 'নাট্য-বিকার' মঞ্চস্থ হল ২৪ মে। এই প্রহসনে কিছু অভিনবত্ব ছিল। এটি বৈকুণ্ঠনাথ বসুর রচনা।

সন ১৮৯১। মঞ্চস্থ নাটক :— অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'গোবর গণেশ' (৩।৪), বিহারীলালের লেখা 'বাণযুদ্ধ' (১৩।৬) এবং 'বসন্তসেনা' (১৯।১২)। শেষোক্ত নাটক-রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। 'বসন্ত-সেনা' নাটকের উদ্বোধন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অভিনয়ের সমালোচনায় ২৫ ডিসেম্বর, ১৮৯১ 'স্টেট্‌সম্যান' লিখলে :—"ROYAL BENGAL THEATRE—For sometime past the management of this theatre has devoted its efforts to reproducing Sanskrit dramas in Bengalee, and so far the attempt has been very successful both in regard to the manner in which the plays have been staged and acted and the reception they have received from the general public. On Saturday the new play "Basantasena", a reproduction in Bengalee from the Sanskrit of the well known drama "Mrich-chhaketik," was put on the boards for the second (?) time, and the house was crowded in every part, the audience being most enthusiastic in its approval of the acting and fine scenery presented. The story is full of pathos, and those to whom the chief parts were committed acquitted themselves excellently, especially the actress who took the part of the lad Rahasen, who eventually saves his father's life by exposing the vile plots against his parent by the king's brother-in-law."

১৮৯২-এর ২ জুলাই হল রাজকৃষ্ণ রায়ের 'ভীষ্মের শরশয্যা' নাটকের পুনরভিনয়। পরের দিন বেঙ্গল বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রভাস মিলন' নামালে। সেই সঙ্গে ওঁরই লেখা গীতি-রঙ্গ 'মোহ-

শেল' মঞ্চস্থ হল। বছরের শেষের দিকে (১৭।১২) 'শ্রীরামনবমী' অভিনীত হয়েছিল। নাটকখানি কুঞ্জবিহারী বসুর লেখা।

১৮৯৩, ১ এপ্রিল এবং ২১ জুন অভিনীত হয়েছে যথাক্রমে 'তাস্তিয়া ভীল' (শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য) এবং 'রামপ্রসাদ'। এই জুন মাসেই রয়েল বেঙ্গল 'হালি-তুফান' নামে এক নাটক নামালে। 'ব্যাসকাশী' ও 'খণ্ডপ্রলয়' যথাক্রমে ১ ও ২২ জুলাই মঞ্চস্থ হয়ে দর্শকদের প্রশংসা পেল। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'অনুসন্ধান' জানালে :— "রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে— 'ব্যাস-কাশী' ও 'খণ্ডপ্রলয়'। ব্যাসকাশী—গীতিনাট্য, কয়েক সপ্তাহ হইতে উক্ত রঙ্গভূমে অভিনীত হইতেছে। 'কাশীখণ্ড' অবলম্বনে ইহা বিরচিত।··· ভিন্নভাবের হরি-হরের ভজনায় যে কোন সাধকই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না—সেই মহাতত্ত্ব এই গীতিনাট্যে বেশ উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিয়া দেখান হইয়াছে। দর্শকবৃন্দ জ্ঞান ও আমোদ একাধারে ইহাতে ভরপুর উপভোগ করিতে পারিবেন। 'খণ্ডপ্রলয়'— বাস্তবিকই এক্ষণে সমাজে দারুণ খণ্ডপ্রলয় উপস্থিত।··· এ অভিনয় ব্যাপারে, অভিনয়োপযোগী দৃশ্যপট ও সাজ-সরঞ্জামেরও ত্রুটি নাই। গোলদীঘি, গড়ের মাঠ, বিডন পার্ক— সবই সুন্দর! গাউন-পরা বাঙ্গালী বিবিদেরও খুব বাহার! ষোলকলা পূর্ণ! অভিনয়াংশেও ভট্টাচার্য্য ঠাকুর, জমীদার মহাশয়, বিলাতফেরতা যুবক, মুটে প্রভৃতি কেহই কমি যান নাই।" (৩০।৭।১৮৯৩) ১১ নভেম্বর অভিনীত 'নাগযজ্ঞে'র সমালোচনায় পত্রিকাখানি (২৯।১১।১৮৯৩) মন্তব্য করলে :— "রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার।— পৌরাণিক বিষয়ের অভিনয়ে, লোকশিক্ষা, আমোদ ও পুরাণতত্ত্বে জ্ঞানলাভ— ত্রিবিধ ফললাভ হয়। বঙ্গ রঙ্গভূমি মধ্যে মধ্যে এই পৌরাণিক বিষয়-সমূহের অভিনয় করিয়া, প্রকৃতই লোকের অনুরাগ-ভাজন হইতেছেন। তাঁহাদের নূতন নাটক 'নাগযজ্ঞ'ও এপক্ষে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে। আস্তিকের হৃদোন্মত্তকারী হরিগুণগান বড়ই মধুর লাগিয়াছিল। অন্যান্য অভিনেতাগণও স্ব স্ব

অংশ দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন।” বৎসরের শেষ নাটক বিহারীলালের লেখা ‘মুই হ্যাঁদু’ (২৫।১২)। এই সময় রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারের লিজ গিরীন্দ্রনাথ দত্ত ও নবকুমার রাহার নামে। ‘মুই হ্যাঁদু’ প্রসঙ্গে সমালোচকের বক্তব্য ছিল এই রকম ঃ—“রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার।— বড়দিনের দিন হইতে উক্ত রঙ্গালয়ে “মুই হ্যাঁদু” নামক এক নূতন ‘পঞ্চরং’ অভিনীত হইতেছে। “মুই হ্যাঁদু”— ভণ্ড হিঁদুয়ানীর পঞ্চ-চিত্র-সামাজিক-সঙের প্রতিচ্ছায়া। মুখে ‘হিঁদুয়ানী’ ‘হিঁদুয়ানী’ করেন, কিন্তু কাজের বেলায় ম্লেচ্ছের বেহদ্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন— সমাজ-সঙের এমনই কারখানা। রঙ্গভূমি “মুই হ্যাঁদু” পঞ্চরংএ এই কারখানাই দেখাইয়াছেন। দেখিতে দেখিতে ঘৃণা হইয়াছে; দেখিতে দেখিতে ক্রোধ হইয়াছে; দেখিতে দেখিতে মুখে চুনকালী দিতে ইচ্ছা হইয়াছে। এমন সঙও কি আঁকিতে আছে গা! কিন্তু তবুও তো হতভাগ্যদের মুখ পোড়ে না! —এ নিদারুণ কষাঘাতেও তো মতিচ্ছন্নের মতি-বিভ্রম ঘুচে না? রঙ্গভূমি এ বড় বিষম সঙই দিয়াছেন! সঙের সঙগিরির মাত্রা এতটা না বাড়াইলেও, বোধহয় চলিত। কিন্তু যা হ'বার, তা'তো হইয়াই গিয়াছে। তবে ইহাতেও যাহার চক্ষু না ফুটিবে, তাহারা তো সমাজের বার সঙের স্বজাতি। তাহাদিগের কথায় আর মনুষ্য-সমাজের প্রয়োজন কি? ফলতঃ সামার্থ্যানুরূপ সঙের আমদানীতে উদ্যোগ আয়োজনে ও আসবাব-পোষাকে— কোনদিকেই রঙ্গভূমি কৃপণতা করেন নাই। সঙ-দর্শনামোদীগণ- এ সঙ দেখিতে ভুলিবেন না বোধহয়।” (অনুসন্ধান—২৭।১।১৮৯৪) ‘মুই হ্যাঁদু’ প্রহসনে একটি বিশিষ্ট চরিত্রে রূপ দিতেন সুকুমারী।

১৮৯৪ সালের প্রথমে রয়েল বেঙ্গল রাজকৃষ্ণ রায়ের মঞ্চসফল নাটক ‘প্রহ্লাদ-চরিত্র’ পুনরভিনয়ের আয়োজন করলে। সেই অভিনয় সম্বন্ধে ‘পুরোহিত’ পত্রিকার অভিমত হল এই রকম ঃ— “রয়েল্ বেঙ্গল্ থিয়েটার। সুকবি রাজকৃষ্ণ রায়ের যে “প্রহ্লাদচরিত্র” এই

রঙ্গভূমির "কীর্ত্তিস্তম্ভ"— তাহার অভিনয় সেদিন দেখিতে গিয়াছিলাম। শ্রীকৃষ্ণের জীবদ্দশায় অর্জ্জুনের যে তেজোগর্ব্ব ছিল, তাঁহার অন্তর্দ্ধানে যেমন তাহার খর্ব্বতা ঘটে, বুঝি প্রহ্লাদ চরিত্রেরও সেই অবস্থা বা হয়। ফলে, পূর্ব্বের মত ইহা আমাদের তত ভাল লাগে নাই। অভিনয় মন্দ হইয়াছিল বলিতেছি না— তাহা বলিতে কোন ক্রমেই পারি না। তবে পূর্ব্বের তুলনায় যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিতে হইল। অনেক দিন পরে এই রঙ্গালয়ে সেদিন গিয়া একটী নূতন অথচ ভাল বিষয় দেখিলাম। সেটী— নূতন ধবণের পারিপাট্যযুক্ত ঐকতান-বাদন। খোলের সঙ্গে সঙ্গতে যে বাদ্য শুনিয়াছি, তেমন কুত্রাপি শুনি নাই। খোল বিনা আরও দুই তিনটা উত্তম গৎ শোনা গিয়াছিল। প্রহ্লাদ-চরিত্রেব পর "খণ্ডপ্রলয়" দেখা গেল। অভিনয় উত্তমই হইয়াছিল। তবে প্রহ্লাদবেশীকে 'বাঙাল্‌নী'-মূর্ত্তিতে আগত দেখিয়া প্রহ্লাদ চরিত্রের গুরুত্ব কমিয়া গেল। প্রহ্লাদের কমনীয়তা ও ঋজুতা— বাঙাল্‌নীর মুখরতা ও অসরলতা— উভয়েব কত পার্থক্য।" (এপ্রিল-মে, ১৮৯৪)

এই সময় এমাবেল্ড থিয়েটারের লেসী ও ম্যানেজাব মহেন্দ্রলাল বসু এমাবেল্ড ছেড়ে সুকুমারী দত্ত প্রমুখ কয়েকজন নট-নটীকে নিয়ে রয়েল বেঙ্গলে যোগ দেন। সেই সঙ্গে সিটি থিয়েটারের বিশিষ্ট নট প্রবোধচন্দ্র ঘোষ এবং কিছুদিন পবে ষ্টার থেকে প্রমদাসুন্দরীও[৫১] এঁদের সাথে মিলিত হন। নববলে বলীয়ান, শক্তিশালী শিল্পীসমৃদ্ধ রাজকীয় বঙ্গ রঙ্গভূমিতে এঁদেব সম্মিলিত অভিনয় 'মৃণালিনী' অনুষ্ঠিত হল ১০ জুন। অভিনয়ের সুখ্যাতি করলে 'পুরোহিত' (মে-জুন, ১৮৯৪) এই ব'লে ঃ—"রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার—২৮শে জ্যৈষ্ঠ

---

৫১ প্রমদাসুন্দরী ষ্টার থেকে রয়েল বেঙ্গলে যোগ দেন ১৮৯৪ সালের শেষের দিকে। এই বছরের ৮ সেপ্টেম্বর প্রথম অভিনীত' চন্দ্রশেখর' নাটকে সুন্দরীর ভূমিকায় ষ্টারে ওঁর শেষ অভিনয়। রয়েল বেঙ্গল থেকে উনি পুনরায় ষ্টারে প্রত্যাবর্তন ক'রে 'রাজসিংহ'তে চঞ্চলকুমারী সাজেন (১১।১।১৮৯৬)।

রবিবারে এই রঙ্গভূমিতে মৃণালিনীর অভিনয় হইয়াছিল। এমারেল্‌ড থিয়েটর হইতে কয়েকটি উত্তম অভিনেতা ও অভিনেত্রী এই নাট্য-শালায় মিলিত হওয়ায় ইহার অভিনয় অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বঙ্গ-রঙ্গ-মঞ্চের সেই প্রবীণ ও প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা তো ছিলেনই। মাধবাচার্য্য, পশুপতি, হেমচন্দ্র ইত্যাদির অভিনীত অংশ নিতান্ত হৃদয়গ্রাহী। বাবু মহেন্দ্রলাল বসু পশুপতির ও বাবু বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মাধবাচার্য্যের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বহুকাল হইতেই স্বনামখ্যাত। পশুপতি, মাধবাচার্য্য, গিরিজায়া, মৃণালিনী— ইঁহাদের অভিনয় স্বাভাবিক। স্বাভাবিক অভিনয়ই প্রকৃত অভিনয়। সেই অভিনয়েরই সুখ্যাতি করিতে হয়। কি কণ্ঠধ্বনি, কি অঙ্গ-সঞ্চালন, কি ভাবভঙ্গী— কোন বিষয়েই ঐ পাত্রপাত্রীদের অস্বাভাবিক ভাব ছিল না। একের সহিত অন্যের তুলনা করিবার আবশ্যক নাই। মৃণালিনী ও মনোরমার মধ্যে কে উৎকৃষ্ট, কে উৎকৃষ্টতর, তৎ-সম্বন্ধে দর্শকদের মতভেদ শুনিয়াছি; গিরিজায়া যে উৎকৃষ্টতম— ইহা নির্ব্বিবাদমত। অপরাপর অভিনয়ও ভাল বটে।" ১৮ আগস্ট মঞ্চস্থ হল বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'হরি-অন্বেষণ'। ২৩ আগস্ট তারিখের 'অনুসন্ধান পত্রিকায় এ-নাটকের সমালোচনা বেরুল। পত্রিকাখানি লিখলে ঃ— "গত শনি-বার রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে "হরি-অন্বেষণ" নাটকের অভিনয় দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। ··· বঙ্গ রঙ্গভূমির প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাস মিলনে যে অনুপম ধর্ম্মভাবের সূচনা করিয়াছিলেন, হরি-অন্বেষণে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ··· অভিনয় নির্দ্দোষ না হইলেও মনোজ্ঞ হইয়াছিল। বেদিনীগণের নৃত্যগীত, কাঁকনী বেদিনীর ক্ষুধাতুর শিশুগণের করুণ সঙ্গীত এবং ব্যাধগণের তাণ্ডব নৃত্যগীত সকলেরই মনোহরণ করিয়াছিল। কাল্‌কা ব্যাধের বিশুদ্ধ তানলয়যুক্ত হরি-গুণ-গান শ্রবণ করিলে প্রেমিক আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে।" এ-

নাটকে সুকুমারী 'মায়া'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। সেপ্টেম্বর মাসে আবার বঙ্কিমচন্দ্র! এবার 'বিষবৃক্ষ'। ভূমিকালিপি ঃ— নগেন্দ্র— মহেন্দ্রলাল বসু, দেবেন্দ্র— মথুরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সূর্যমুখী— সুকুমারী দত্ত, শ্রীশ— হরিদাস দাস, কমলমণি— প্রমদাসুন্দরী এবং কুন্দ— হরিমতি। রয়েল বেঙ্গলে 'বিষবৃক্ষ' সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। 'স্টেট্‌স-ম্যান' জানালে ঃ—"……The manner in which Bisbṛkṣa was played on Sunday last fully satisfied the anticipation that had been excited. Most of the parts were well-filled but special mention may be made of the actor who represented the character of Nagendra the husband who falls a victim to the poison-tree and to the actresses who represented the characters of wronged-wife and her innocent rival. The actor who appeared as Debendra should, however, have been entrusted with a less important part."[৫২] অভিনয় সম্পর্কে 'অনুসন্ধান' পত্রিকার মন্তব্য ঃ—"বেঙ্গলে—বিষবৃক্ষ। বঙ্গ রঙ্গভূমে বঙ্কিমের বিজয়-কেতন বিষবৃক্ষের অভিনয় হইতেছে। দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনীর অভিনয়ে বঙ্গ রঙ্গভূমি যে অনুপম সাফল্যলাভ করিয়াছেন, বিষবৃক্ষের অভিনয়ে ততদূর কৃতকার্য্য না হইলেও ইহাতে অভিনেতৃগণের গুণপনার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত যেরূপ করুণা রসে পরিপূর্ণ, অভিনয়ও অনেকস্থলে তদনুরূপ হইয়াছিল। সূর্য্যমুখী, কমলমণি ও হীরার অভিনয় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সুতরাং মনোহর হইয়াছিল। কুন্দনন্দিনী আরও একটু মৃদু ও লজ্জাবনতা হইলে ভাল হইত; ইহার হাবভাব আরও একটু সংযত হইলে অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা-

---

৫২ দ্র. The Indian Stage (vol. III)— Hemendra Nath Das Gupta.

লাভ করিতে পারিবে। মোটের উপর কুন্দের অভিনয়ও ভাল হইয়াছিল। পুরুষদিগের মধ্যে দেবেন্দ্রের অভিনয়ে আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি ; ইহার গানগুলি বিশেষ মনোজ্ঞ হইয়াছিল ; নগেন্দ্র অভিনয়ে সিদ্ধহস্ত ; কিন্তু ইঁহার 'ন্যাশন্যালী' ধরণের সুরের জন্য সময়ে সময়ে ইঁহার অভিনয় একটু অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল।" (২০।৯।১৮৯৪)
নভেম্বরে রয়েল বেঙ্গল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরু-বিক্রম নাটকে'র পুনরভিনয়ের আয়োজন করলে। ২২ নভেম্বর 'অনুসন্ধান' এ-নাটকের দীর্ঘ সমালোচনায় লিখলে :—"বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমে পুরু-বিক্রম।— পুরু-বিক্রম নাটকের নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার প্রণেতা। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ পুরুরাজ ইহার নায়ক ; বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি ভীমকাণ্ড-গুণান্বিতা ক্ষত্রিয়-ললনা ঐলবিলা ইহার নায়িকা। গ্রীস দেশের অধীশ্বর মহাপরাক্রান্ত আলেক্‌জান্দার পারস্যাধিপতি দারায়ুসকে পরাভবপূর্ব্বক যখন আপনার বিজয়ী-চমূ ভারতবর্ষ অভিমুখে অগ্রসর করেন, তখন অসহায় ও গৃহ-বিচ্ছেদে হীনবল হইয়াও পুরুরাজ যে কিরূপ অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা গ্রীকদিগের বর্ণিত বৃত্তান্ত পাঠে চমৎকৃত হইতে হয়। আজ দুই সহস্র বৎসর পরে হীন-বীর্য্য ভারতবাসীর সম্মুখে সেই দৃশ্যধারণ করিয়া বঙ্গ রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। মহৎজনের কার্য্যকলাপ আলোচনা জাতীয় চরিত্র গঠনের এক অমোঘ উপায়, ইতিহাস ও রঙ্গভূমি এইরূপ আলোচনার প্রসূতিস্বরূপ। অবিরত একপ্রকার ধর্ম্ম ও সমাজসম্বন্ধীয় অভিনয়ের মধ্যে ভারতের এক অতীত, ভারতবাসীর অধুনা কল্পনাতীত, গৌরবের ঘটনা স্মরণ ও গায়িকার মুখে ভারতের কীর্ত্তিগাথা শ্রবণ করিয়া, আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়েও এক অভিনব শক্তি অনুভূত হইয়াছিল। পুরুরাজের বীরত্বব্যঞ্জক বপু, অশ্বারোহণে সৈন্যগণের প্রতি উৎসাহজনক উক্তি, ঐলবিলার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইলেও বীরোচিত ধৈর্য্য, ও আলেক্‌জান্দারের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের ভয়ঙ্করী প্রতিমূর্ত্তি,

সমস্তই দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। আর ঐলবিলা-স্বভাবের ফুল্লকুসুম, রণসজ্জায় ভূষিতা—পঞ্চনদের রাজনৈতিক গগনের ধ্রুব-তারা; জন্মভূমির প্রতি কি অন্তর্নিহিত প্রেম, কাপুরুষ তক্ষশীলের প্রতি কি ঘৃণা-ব্যঞ্জক দৃষ্টি, আর বীবের প্রতি কেমন ভালবাসা মিশ্রিত ভক্তিভাব! এইরূপ নারী ব্যতীত কি কোন জাতির উন্নতি হয়! এতদ্ভিন্ন সেকেন্দর সাহব অভিনয়ও অতি সুন্দর হইয়াছে। তক্ষশীলের সহিত তাহার ভগিনীর প্রেমালাপ অকচিকব ও অস্বাভাবিক বলিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে নাটকখানি ইহার জন্য দায়ী। অভিনয়ে গানের সংখ্যা কিছু কম হইয়াছে বলিয়া অনেকেব বিশ্বাস। এ অভাব পূবণ কবা কর্তৃপক্ষগণের একেবাবে অসাধ্য নহে। আমরা সকলকে এই নূতন অভিনয় দেখিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ কবিতেছি। ইহাতে ভাবিবার ও শিখিবাব অনেক জিনিষ আছে।" বছবের শেষ নাটক, 'যমের ভুল'। প্রহসনটির লেখক বিহাবীলাল চট্টোপাধ্যায়। ২৫ ডিসেম্বর এ-নাটক রয়েল বেঙ্গল থিয়েটাবে অভিনীত হয়েছিল।

সন ১৮৯৫। বছরের সুরুতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' অভিনয়। তারিখ— ২ ফেব্রুয়ারি। নাট্যরূপ বিহাবীলালের। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'অনুসন্ধান' (২১।২।১৮৯৫) পত্রিকার মন্তব্য :— "রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে "রজনী"।— স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের "রজনী" আজ নবভাবে অভিনব বেশভূষায় রঙ্গভূমে অভিনীত। "রজনীর" এরূপ দৃশ্য-মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। বঙ্গ বঙ্গভূমি "রজনীর" অভিনয়ে যথেষ্ট ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন— বুঝা গেল। অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মধ্যে অনেকেই প্রশংসার যোগ্য। "রজনী" বরাবর আপনার স্বাভাবিক ভাব রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। রঙ্গভূমির অন্যতম অধ্যক্ষ বাবু কুঞ্জবিহারী বসু মহাশয়, সরকার মহাশয়ের অংশ অতি দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন; তাঁহার গাম্ভীর্য্য-মিশ্রিত হাস্য-রসের অভিনয়ে কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। ফলতঃ রজনী 'বঙ্গ রঙ্গভূমি'র প্রশংসার

জিনিষ হইয়াছে।" 'রজনী'র ভূমিকালিপি ছিল এই রকম :—শচীন্দ্র — মহেন্দ্রলাল বসু, অমরনাথ— হরিদাস দাস, রজনী— সুকুমারী দত্ত এবং লবঙ্গলতা— নিস্তারিণী। নাটকখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 'রজনী'র বিজ্ঞাপনেও চমৎকারিত্বের পরিচয় মিলতো।[৫৩] এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে মহেন্দ্রলাল রয়েল বেঙ্গল ছেড়ে চলে গেলেন।[৫৪] ৬ জুলাই মঞ্চস্থ হল নগেন্দ্রনাথ ঘোষের 'দানলীলা'। নাটক দেখে সমালোচনা করলে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' :—"DANLILA at the Bengal.— A new debutant in the field of drama has appeared in the person of Babu Nagendra Nath Ghose, whose "Danlila" was put on the boards of the Bengal Theatre on Saturday last, before an appreciative audience. The piece has been well mounted, and the various actors and actresses creditably acquitted themselves. Some of the scenes were really striking and were much applauded. The songs which are all sweet, were both sweetly sung

৫৩ 'রজনী'র বিজ্ঞাপনে কর্তৃপক্ষ বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের লেখা নীচের কবিতাটি উদ্ধৃত করতেন :—

"চোখে চোখে ভালবাসা পদ্মপাতা জল।
ক্ষণে চায় ক্ষণে ধায় নিরাশ কেবল॥
মনে মনে ভালবাসা প্রেম বলি গণি।
প্রেমের প্রতিমা অন্ধ দুঃখিনী রজনী॥"

৫৪ রয়েল বেঙ্গল ছেড়ে মহেন্দ্রলাল মিনার্ভার সাথে যুক্ত হন। সেখান থেকে উনি যান ক্লাসিকে। মধ্যে কয়েকমাস ব্যতীত ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা (১৬।৪।১৮৯৭) হ'তে মৃত্যু (৮।৩।১৯০১) পর্যন্ত মহেন্দ্রলাল বসু এই রঙ্গালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। জীবনের শেষ কয় বৎসর উনি ক্লাসিক থিয়েটারের বাড়ীতেই বসবাস করেন।

and much appreciated by the audience, among whom were several European ladies and Gentlemen. We wish the author and Theatre every success." (৮।৭।১৮৯৫) ৩১ আগষ্টের নাটক 'রক্ত-গঙ্গা'। নভেম্বরে বিহারী-লাল নাটকায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' অভিনয় করলে রয়েল বেঙ্গল। প্রসঙ্গতঃ, 'অনুসন্ধান' (৩০।১১।১৮৯৫) জানালে :— "রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার।— "সীতারাম"— বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম'-নাটকাকারে গ্রথিত করিয়া, সংপ্রতি উক্ত রঙ্গালয়ে অভিনীত হইতেছে। স্বর্গীয় কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় মহোদয়ের "বীণা রঙ্গভূমিতে" বহুদিন পূর্ব্বে একবার 'সীতারামের' অভিনয় দেখিয়াছিলাম। সাধারণের সন্তোষের জন্য, বঙ্গ রঙ্গভূমি সাধ্যমত আয়োজনের ক্রুটি করেন নাই। সকলকেই বঙ্গ রঙ্গভূমির 'সীতারাম' নাটকের অভিনয় দেখিতে অনুরোধ করি।"

১৮৯৬ সালে অভিনীত নাটকের তালিকায় আছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ'[৫৫] (১৮।১), 'ধ্রুব' (৮।৮) এবং 'নরোত্তম ঠাকুর' (১৯।১২)। শেষের দু'টি বিহারীলালের রচনা। মধ্যে, ৫ সেপ্টেম্বর রয়েল বেঙ্গল এক বিশেষ অভিনয়ের অনুষ্ঠান ক'রে সমুদয় বিক্রয়লব্ধ অর্থ পরলোকগত স্বত্বাধিকারী শরৎচন্দ্র ঘোষের বিধবা পত্নীর হাতে তুলে দিলেন। ৩০ ডিসেম্বরও এক বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল। সেদিন মাদ্রাজের কংগ্রেস প্রতিনিধিদলের উপস্থিতিতে সম্প্রদায় 'শকুন্তলা' ও 'মোহ-শেল' মঞ্চস্থ করে। মৃত শরৎকুমার ঘোষের বিধবা পত্নীর আবেদনে হাইকোর্টের নির্দেশানুসারে এই বৎসরের কিছু সময় রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার বন্ধ ছিল।

১৮৯৭, ১৩ মার্চ 'দেবী চৌধুরাণী'।[৫৬] ১২ জুন 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অভিনয়। অভিনয় প্রসঙ্গে সাময়িকপত্রের মন্তব্য :— "কৃষ্ণকান্তের

৫৫ এই অভিনয়ের সাতদিন পূর্বে ষ্টারে 'রাজসিংহ' খোলা হয় (১১।১।১৮৯৬)। নাট্যরূপ দেন অমৃতলাল বসু।

উইল।— রাজকীয় বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে সংপ্রতি "কৃষ্ণকান্তের উইলে"র অভিনয় হইতেছে। গত শনিবার আমরা এই অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিনয় আশাতীত সুন্দর হইয়াছে। পৌরাণিক নাটক অভিনয়েই রাজকীয় বঙ্গ রঙ্গভূমির সবিশেষ কৃতিত্ব ছিল; অধুনা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতির অভিনয়ে, সামাজিক নাটকেও বিশেষ পারদর্শিতা দেখা গেল। ভ্রমর, গোবিন্দলাল ও রোহিণীর অভিনয় অতি স্বাভাবিক ও সুন্দর হইয়াছিল। 'বারুণী-জল-তলে রোহিণী' দৃশ্য-দেখিবার উপযুক্ত। বেঙ্গলের বনেদী চাল; বনেদী বন্দোবস্ত। আমরা সকলকেই এই অভিনয়টি দেখিতে অনুরোধ করি।" (অনুসন্ধান—২৩।৬।১৮৯৭) তিনমাস অবকাশের পর, রয়েল বেঙ্গল ৬ নভেম্বর 'পরশুরাম' নামালে। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করলেন কুঞ্জবিহারী বসু (বিদূষক), যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘটক (হৈহয়-বংশীয় রাজা), মথুরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মন্ত্রী শুকনাস), শশীন্দ্রনাথ দে (জামদগ্ন্য-শিষ্য), সুকুমারী (মহাশ্বেতা) এবং গণেশচন্দ্র ঘোষ (পরশুরাম)। 'অনুসন্ধান' (২৪।১১।১৮৯৭) লিখলে:— "...... আমরা অভিনয় দেখিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল। "পরশুরাম" শিক্ষোপযোগী সুন্দর সুন্দর ঘটনায় এবং মনোমুগ্ধকর সুললিত সঙ্গীতের যথাযোগ্য সমাবেশে-বড়ই প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। কয়েকটি দৃশ্যপটও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "পরশুরামে"— দেখিবার, শিখিবার এবং শুনিবার বিষয় অনেক আছে। আমরা সকলকে এই অভিনয় দেখিতে অনুরোধ করি।"

সন ১৮৯৮-এ 'পরশুরামে'র পুনরভিনয় (১২।২) ব্যতীত 'দরফ খাঁ' এবং 'প্রমোদ-রঞ্জন' নামে দু'টি নাটকের অভিনয় সংবাদ পাওয়া যায়। প্রথম নাটকে 'মাইমুনি'র ভূমিকায় অংশ নিতেন সুকুমারী।

---

৫৬ ফেব্রুয়ারিতে সিটি সম্প্রদায় এমারেল্ড স্টেজে 'দেবী চৌধুরাণী' মঞ্চস্থ ক'রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখায়। প্রতিযোগিতায় রয়েল বেঙ্গলও এই নাটক নামায়।

'প্রমোদ-রঞ্জন' ক্ষীরোদপ্রসাদের লেখা। এতে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু (নেপা বোস) চঞ্চলকুমার সাজতেন। নাটক দু'টির অভিনয় তারিখ যথাক্রমে ১৯ ফেব্রুয়ারি ও ২৫ সেপ্টেম্বর।

১৮৯৯ সালের ২৬ আগস্ট মঞ্চস্থ হল ক্ষীরোদপ্রসাদ বিরচিত 'বভ্রুবাহন'। অভিনয়-দর্শনে নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলে 'অনুসন্ধান'। লিখলে ঃ— "……বুঝিলাম—বহু দিনের পর বাঙ্গালায় একখানি নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে। বুঝিলাম— আমাদের বহুদিনের পোষিত আশা-মুকুল আজি প্রস্ফুটিত। বুঝিলাম— বর্ষ-চতুষ্টয়-কাল প্রতিভার যে ক্ষীণ আলোক-রেখা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম, সেই প্রতিভা আজি প্রভান্বিত। আজকাল সচরাচর রঙ্গমঞ্চে যে সকল নাটকের অভিনয় হয়-সে আর নাটক নয় ; সে কেবল-বিলাসী-বিমোহন বারাঙ্গনার বপু-সঞ্চালন, সে কেবল-বিষকুম্ভ পয়োমুখী যোড়শী সুন্দরীর চটুল চাহনি, সে কেবল— উচ্ছৃঙ্খল নট-নটীর উদ্দাম বচন-বিন্যাস। তবে যে সময়ে সময়ে তাহাতেও উৎসাহ প্রদান করি, তবে যে সময়ে সময়ে তাহারও প্রশংসা করি, সে কেবল-ভবিষ্যতের উচ্চতর আশায় বুক বাঁধিয়া, সে কেবল সরল-বক্ররেখা অঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রপট-চিত্রণ সম্ভাবনায়।

সেই চিত্র আজি চিত্রিত হইয়াছে— সেই আশা আজি মিটিয়াছে। তাই আজি আমাদের আনন্দের অবধি নাই। নাটককার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়— সুলেখক, সুপণ্ডিত, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ এম-এ উপাধিধারী, কলিকাতার বিখ্যাত কলেজের বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অধ্যাপক। কিন্তু সর্ব্বোপরি— আজি হইতে তিনি প্রখ্যাতনামা সুনিপুণ নাট্যকার। শতাব্দীর মধ্যে দেশে দুই-একজন উচ্চশ্রেণীর নাটককার জন্মগ্রহণ করেন ; ক্ষীরোদপ্রসাদ ক্রমশঃ সেই ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। এক 'বভ্রুবাহন' নাটকের অভিনয় দেখিয়া, তাঁহার প্রতি এই উচ্চ ধারণার সমাবেশ হইয়াছে। কিদৃশ ঘটনায়, কিদৃশ লিপি-চাতুর্য্যে, কিদৃশ চরিত্র চিত্রে, এই নাটকের সৌন্দর্য্য-

স্রোত উথলিয়া উঠিয়াছে,— এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে তাহার পরিচয় আর কি দিব? একবার দেখিয়া আসুন— দেখিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করিয়া আসুন— 'বভ্রুবাহন' কি উপাদেয় অনুপম সৌন্দর্য্য সুষমায় সুশোভিত হইয়াছে। ...” (৬।৯।১৮৯৯)

১৯০০, ১৩ জানুয়ারি উদ্বোধন হল নতুন নাটকের, পণ্ডিত দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'সুকন্যা।'

১৯০১ সাল। এ বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি খোলা হয়েছে 'যমুনা' ও 'দাওয়াই'। ১৬ মার্চ রয়েল বেঙ্গল 'নীহার' মঞ্চস্থ করলে। ক্ষীরোদ-প্রসাদের 'প্রমোদ-রঞ্জন' নাটকের পুনরভিনয় হল ৩১ মার্চ। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিলেন ঃ— গণেশচন্দ্র ঘোষ (প্রমোদ), শশীন্দ্রনাথ দে (রঞ্জন), ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (চঞ্চল), হরিমতি (শান্তি) এবং নগেন্দ্রবালা (মুক্তি)। রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারের শেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয় এই।

অস্বীকার করার উপায় নেই, উনিশ শতকের শেষ কয় বৎসর রয়েল বেঙ্গলের পক্ষে সুসময় নয়। ইতিমধ্যে মহেন্দ্রলাল প্রমুখ প্রথম সারির শিল্পীরা এখান থেকে একে একে বিদায় নিয়েছেন। সুকুমারীর আবির্ভাবও অনিয়মিত। সত্যকারের প্রতিভাবান কোনো নট-নটীই সে সময় আর এই মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত নেই। উপযুক্ত নাট্যকারের অভাবে শেষের দিকে রয়েল বেঙ্গলকে এমন সব নাটক মঞ্চস্থ করতে হয়েছে, অভিনয় বা সাহিত্যমূল্যের দিক থেকে যা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। থিয়েটারের নিজস্ব নাট্যকার বিহারীলাল অবশ্য বহু মঞ্চসফল নাটকের জন্মদাতা কিন্তু ১৮৯৪ সালের পর তাঁর লেখনীও উল্লেখযোগ্য কিছু প্রসব করে নি। ওদিকে তখন হাতি-বাগানের ষ্টার (১৮৮৮), মিনার্ভা (১৮৯৩) এবং ক্লাসিক (১৮৯৭) নিত্য নতুন চমকপ্রদ অবদানে দর্শককুলের মনোহরণ ক'রে চলেছে। পূর্বোক্ত তিন মঞ্চে অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, দানীবাবু, তিনকড়ি, কুসুমকুমারী

প্রমুখ দিক্‌পাল অভিনেতা-অভিনেত্রীর বর্ণাঢ্য সমাবেশে ও তাঁদের প্রতিযোগিতামূলক মনোজ্ঞ অভিনয়ে এবং মঞ্চআঙ্গিকের নিরন্তর বৈচিত্র্যে রঙ্গরস-প্রার্থীরা কৃতার্থ, পুলকিত চিত্ত। সবার উপরে মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তিতে বিরাজ করছেন নটগুরু গিরিশচন্দ্র। এই পারিপার্শ্বিকতায় রয়েল বেঙ্গলের পূর্বার্জিত প্রতিষ্ঠা ধীরে 'ধীরে হ্রাস পেতে সুরু করেছিল। স্বত্বাধিকারী শরৎ ঘোষের বিধবা পত্নীর সঙ্গে লিজ গ্রহীতাদের অধিকার সংক্রান্ত বিরোধের উল্লেখও এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। অভিযোগ পরিশেষে, আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল এবং হাইকোর্টের নির্দেশে থিয়েটার কিছুদিন বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন লেসীরা। এই আত্মকলহ যে, সম্প্রদায়ের ভেতরের চেহারা আরো দুর্বল ক'রে তুলেছে তা, সহজেই অনুমেয়। পূর্বোক্ত নানা কারণে রয়েল বেঙ্গলের ভিত যখন টলোমলো, ঠিক সেই সময় ২০ এপ্রিল, ১৯০১ নাট্যশালার প্রাণপুরুষ বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর আঘাত তার পক্ষে বড়ই মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়ালো। নানান দুর্যোগের মধ্যে অমায়িক, স্থিরবুদ্ধি ও বিচক্ষণ মানুষটি প্রাণপণ চেষ্টায় কোনোক্রমে রঙ্গালয়ের অস্তিত্বটুকু বজায় রেখে চলছিলেন, যাঁর অবর্তমানে নাট্যামোদীরা তাও হারালেন। বিহারীলালের তিরোধানে সম্প্রদায়ের অবস্থা হল চালকবিহীন নৌকার মত। যোগ্য কর্ণধারের অভাবে ভিতর ও বাহিরের আঘাতে পর্যুদস্ত রয়েল বেঙ্গল আর মেরুদণ্ড সোজা ক'রে দাঁড়াতে পারলে না। প্রায় তিন দশকের ঐতিহ্যমণ্ডিত নাট্যশালা বন্ধ হয়ে গেল।

পরিশিষ্ট

ক. অভিনয়-তালিকা

শর্মিষ্ঠা	মধুসূদন দত্ত	১৬।৮।১৮৭৩
মোহান্তের এই কি কাজ !	লক্ষ্মীনারায়ণ দাস	৬।৯।১৮৭৩
চক্ষুদান	রামনারায়ণ তর্করত্ন	৫।১০।১৮৭৩
রত্নাবলী	”	২২।১১।১৮৭৩
কৃষ্ণকুমারী	মধুসূদন দত্ত	২৯।১১।১৮৭৩
দুর্গেশনন্দিনী	নাট্যরূপ-বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	২০।১২।১৮৭৩
দুর্গেশনন্দিনী		৩।১।১৮৭৪
কাদম্বরী	নিমাইচাঁদ শীল	১০।১।১৮৭৪
অপূর্ব কারাবাস	—	১৭।১।১৮৭৪
একেই কি বলে বাঙ্গালি সাহেব ?	গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়	২৪।১।১৮৭৪
প্রভাবতী	কালীপদ ভট্টাচার্য (?)	৭।৩।১৮৭৪
বিদ্যাসুন্দর	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	১৪।৩।১৮৭৪
যেমন কর্ম তেমনি ফল	রামনারায়ণ তর্করত্ন	”
মায়া-কানন	মধুসূদন দত্ত	১৮।৪।১৮৭৪
পদ্মাবতী	”	৪।৭।১৮৭৪
পুরু-বিক্রম নাটক	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	২২।৮।১৮৭৪
বঙ্গের সুখাবসান	হরলাল রায়	১৪।১১।১৮৭৪
দুর্গেশনন্দিনী		১২।১২।১৮৭৪
মণিমালিনী	হরিমোহন মুখোপাধ্যায়	২৬।১২।১৮৭৪
সতী কি কলঙ্কিনী ?	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (?)	৬।২।১৮৭৫
কপালকুণ্ডলা	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৩।২।১৮৭৫
ভীমসিংহ	তারিণীচরণ পাল	২৭।২।১৮৭৫
মেঘনাদবধ	মধুসূদন দত্ত	৬।৩।১৮৭৫
গুইকোয়ার নাটক	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২২।৫।১৮৭৫
সুরেন্দ্র-বিনোদিনী	উপেন্দ্রনাথ দাস	১৪।৮।১৮৭৫

বীরনারী	দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৪।৯।১৮৭৫
বঙ্গবিজেতা	রমেশচন্দ্র দত্ত	১১।৯।১৮৭৫
পলাশীর যুদ্ধ	নবীনচন্দ্র সেন	২৫।৯।১৮৭৫
মাথাল ফল	—	”
বিদ্যাসুন্দর		অক্টোবর, ১৮৭৬
কুলীনকন্যা অথবা কমলিনী	লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী	১৫।৩।১৮৭৭
মেঘনাদবধ		২৪।৩।১৮৭৭
আলিবাবা	—	”
অপূর্ব সতী	সুকুমারী দত্ত	২৯।৩।১৮৭৭
রত্নাবলী		৩১।৩।১৮৭৭
মৃণালিনী	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৬।৪।১৮৭৭
কপালকুণ্ডলা		১৮।৪।১৮৭৭
দুর্গেশনন্দিনী		২১।৪।১৮৭৭
সুভদ্রাহরণ	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	২৫।৪।১৮৭৭
দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ	—	৫।৫।১৮৭৭
পঞ্চপাণ্ডবের বনগমন	—	”
সতী কি কলঙ্কিনী ?		১৬।৫।১৮৭৭
আয় ঘুরে আয় সোনার চাঁদ	—	”
শকুন্তলা	নন্দকুমার রায়	১৮।১।১৮৭৮
চন্দ্রশেখর	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৬।৩।১৮৭৮
দুর্গেশনন্দিনী		৮।৬।১৮৭৮
পাষাণ প্রতিমা	গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫।১।১৮৭৯
অশ্রুমতী	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৮১
রাবণবধ	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	”
হরধনুর্ভঙ্গ	রাজকৃষ্ণ রায়	”
হরিশ্চন্দ্র	নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্ন	১৫।৯।১৮৮২
ডিসমিস	অমৃতলাল বসু	২৫।১২।১৮৮২

ব্রজলীলা	অমৃতলাল বসু	ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩
প্রহ্লাদ-চরিত্র	রাজকৃষ্ণ রায়	১১।১০।১৮৮৪
দুর্বাসার পারণ	”	২১।১১।১৮৮৫
স্বাধীন জেনানা	রাখালদাস ভট্টাচার্য	৩০।১।১৮৮৬
ভীষ্মের শরশয্যা	রাজকৃষ্ণ রায়	১২।৬।১৮৮৬
দশরথের মৃগয়া		১৮।৯।১৮৮৬
বা		
বালক সিন্ধুবধ	”	
সুরুচির ধ্বজা	রাখালদাস ভট্টাচার্য	৬।১১।১৮৮৬
দুই সতীনের কোন্দল	—	”
পাণ্ডব নির্বাসন	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	২২।১।১৮৮৭
শ্রীবৎসচিন্তা	”	৯।৪।১৮৮৭
রুক্মিণীরঙ্গ	”	৩০।৫।১৮৮৭
প্রভাস মিলন	”	২৯।১০।১৮৮৭
নন্দবিদায়	”	১৮৮৮
পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ	”	”
শৈলজা	—	২।৩।১৮৮৯
জন্মাষ্টমী	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	জুন, ১৮৮৯
শকুন্তলা	কুঞ্জবিহারী বসু	১৬।১১।১৮৮৯
শকুন্তলা (নির্বাচিত দৃশ্য)		৭।১।১৮৯০
সীতা-স্বয়ংবর	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (?)	১।৩।১৮৯০
নাট্যবিকার	বৈকুণ্ঠনাথ বসু	২৪।৫।১৮৯০
গোবর গণেশ	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	৩।৪।১৮৯১
বাণযুদ্ধ	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	১৩।৬।১৮৯১
বসন্তসেনা	—	১৯।১২।১৮৯১
ভীষ্মের শরশয্যা		২।৭।১৮৯২
প্রভাস মিলন		৬।৭।১৮৯২
মোহ-শেল	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	”
শ্রীরামনবমী	কুঞ্জবিহারী বসু	১৭।১২।১৮৯২

তান্তিয়া ভীল	শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য	১।৪।১৮৯৩
রামপ্রসাদ	—	২১।৬।১৮৯৩
হালি-তুফান	—	জুন, ১৮৯৩
ব্যাসকাশী	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	১।৭।১৮৯৩
খণ্ডপ্রলয়	”	২২।৭।১৮৯৩
নাগযজ্ঞ	—	১১।১১।১৮৯৩
মুই হ্যাঁদু	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	২৫।১২।১৮৯৩
প্রহ্লাদ-চরিত্র		প্রথমার্দ্ধ, ১৮৯৪
মৃণালিনী		১০।৬।১৮৯৪
হরি-অন্বেষণ	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	১৮।৮।১৮৯৪
বিষবৃক্ষ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪
পুরু-বিক্রম নাটক		নভেম্বর, ১৮৯৪
যমের ভুল	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	২৫।১২।১৮৯৪
রজনী	নাট্যরূপ—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	২।২।১৮৯৫
দানলীলা	নগেন্দ্রনাথ ঘোষ	৬।৭।১৮৯৫
রক্ত-গঙ্গা	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	৩১।৮।১৮৯৫
সীতারাম	নাট্যরূপ—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	নভেম্বর, ১৮৯৫
রাজসিংহ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮।১।১৮৯৬
ধ্রুব	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	৮।৮।১৮৯৬
নরোত্তম ঠাকুর	”	১৯।১২।১৮৯৬
শকুন্তলা		৩০।১২।১৮৯৬
মোহ-শেল		”
দেবী চৌধুরাণী	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৩।৩।১৮৯৭
কৃষ্ণকান্তের উইল	”	১২।৬।১৮৯৭
পরশুরাম	—	৬।১১।১৮৯৭
পরশুরাম	—	১২।২।১৮৯৮
দরাফ খাঁ	—	১৯।২।১৮৯৮
প্রমোদ-রঞ্জন	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	২৫।৯।১৮৯৮
বভ্রুবাহন	”	২৬।৮।১৮৯৯

সুকন্যা	দামোদর মুখোপাধ্যায়	১৩।১।১৯০০
যমুনা	—	১৬।২।১৯০১
দাওয়াই	—	”
নীহার	—	১৬।৩।১৯০১
প্রমোদ-রঞ্জন		৩১।৩।১৯০১

খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায়

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র ঘোষ, হরিদাস দাস (হরি বৈষ্ণব), বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (চোয়ে), অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন বর্মণ (অর্কেস্ট্রা-পরিচালক), গিরীশচন্দ্র ঘোষ (ন্যাদাড়ু), কুঞ্জবিহারী বসু, যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘটক, মথুরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল বসু, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, গণেশচন্দ্র ঘোষ, কালীকিঙ্কর মল্লিক, শশীন্দ্রনাথ দে, ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু (নেপা বোস), এলোকেশী, জগত্তারিণী, শ্যামা, গোলাপ (সুকুমারী দত্ত), যাদুমণি, কাদম্বিনী, বনবিহারিণী (ভুনী), বিনোদিনী, কুসুমকুমারী (প্রহ্লাদ-কুসুম), বড়রানী, প্রমদাসুন্দরী, হরিমতি, নিস্তারিণী এবং নগেন্দ্রবালা।

গ. বিজ্ঞাপন

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

SUCCESS ! SUCCESS ! SUCCESS !

হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

"না শস্ত্র গ্রহণাদকুণ্ঠ পরশোস্তস্যাপি জেতা মুনেঃ
—পাণ্ডুসূনুভিরয়ং ভীষ্মঃশরৈঃশায়িতঃ।"

ROYAL BENGAL THEATRE

রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার

Saturday the 2nd July at 9 P.M.

শনিবার ১৯এ আষাঢ় রাত্রি ৯ ঘটিকার সময়।

REVIVAL OF BABU RAJKRISHNA RAY'S
Highly-successful ever-favourite Mythological Play

BHISMER SARASAJYA

কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত সেই সর্ব্বজনপ্রশংসিত,
সংবাদপত্র সমাদৃত
"নিতুই নূতন" পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য

ভীষ্মের শরশয্যা

This is an entertainment for variety, originality
and refinement without Parallel.

রাজকৃষ্ণবাবুর "ভীষ্মের শরশয্যা" বঙ্গীয় সাহিত্য-সাগরের
একটি অমূল্য অত্যুজ্জ্বল রত্ন বিশেষ !

PLEASE MARK :—

The Gràceful Gestures of the "Martial Boys !"

THE CLOSE COMBAT IN CHARIOTS !

The Arrowy-bed of the Hero with its
sorrowful surroundings !

স্মরণ রাখিবেন :—

পঞ্চবীর-বালকের সংগ্রাম-সঙ্গীত !

অর্জ্জুন ও ভীষ্মের দ্বৈরথ-যুদ্ধ !

শরশয্যার অপূর্ব্ব দৃশ্য !

বিদুরের অপূর্ব্ব ভক্তি-রসাত্মক অভিনয় !

The Tasteful TABLEAU of Radha & Krishna

IN THE BRINDABAN

Magnificient Mountings !

বৃন্দাবনধাম—শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি !

গোপিনীগণের মধুর সঙ্গীত !

SCENERIES AND DRESSES

ALL NEW ! ALL GRAND ! ALL IN PERFECTION !

দৃশ্যপট ও পরিচ্ছদ সমস্তই নূতন ও মনোহর !

সহৃদয় নাট্যামোদী মহোদয়গণ ! এই বিশাল বিশ্বমাঝে ভীষ্ম-লীলা দেখিয়া যান, করুণ রসের সহিত ভক্তি রস মিশিয়া হৃদয়কে আপ্লুত করিবে— নয়নমন প্রেমানন্দে পরিপূরিত হইবে।

NEXTDAY, SUNDAY at 6-30 P.M.

পরদিন রবিবার অপরাহ্ন ৬৷৷০ ঘটিকার সময়।

PROVAS MILAN

বঙ্গ রঙ্গ ভূমির কীর্ত্তি স্তম্ভ

প্রভাস মিলন

তৎপরে সেই সর্ব্বজন-প্রশংসিত গীতিরঙ্গ

মোহ-শেল

Kunja Bihary Bose—Manager
Advertising Department

By order of the Managing Committee
B. L. Chatterjee—Manager

অরোরা থিয়েটার
(১৯০১-১৯০২)

রয়েল বেঙ্গলের বিলুপ্তি হ'লে সেই মঞ্চ লিজ নিয়ে নতুন থিয়েটারের পত্তন করলেন গুরুপ্রসাদ মৈত্র। নাম দিলেন—'অরোরা'। প্রবীণ নট ও পরিচালক নীলমাধব চক্রবর্তী (ষ্টার থেকে বেরিয়ে এসে সিটি সম্প্রদায় গড়ে যিনি বীণা এবং এমারেল্ডে কিছুদিন অভিনয় করেছিলেন) তখন ভেসে বেড়াচ্ছেন। গুরুপ্রসাদ তাঁকে এনে ম্যানেজারের গদীতে বসালেন। মিনার্ভা, বেঙ্গল এবং সিটির প্রাক্তন শিল্পীদের সাহায্যে দল গড়লেন নীলমাধব চক্রবর্তী। বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে ১৯০১, ১৭ আগস্ট ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'দক্ষিণা' দিয়ে বেঙ্গল মঞ্চে অরোরা থিয়েটারের উদ্বোধন হল। 'দক্ষিণা'র ভূমিকালিপি ছিল এই রকমঃ— ভৈরব-শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু), সুষমা-কুসুম (বিষাদ) এবং সুরমা-হরিমতি। পরের দিন এঁরা অভিনয় করলেন ক্ষীরোদপ্রসাদেরই 'জুলিয়া'। সঙ্গে অমৃতলাল বসু বিরচিত নক্সা 'কৃপণের ধন'। ২৫ আগস্টের নাটক 'আলিবাবা' (ক্ষীরোদপ্রসাদ)। এতে আবদাল্লা সাজলেন রাণুবাবু। ঐ তারিখেরই 'বেল্লিক বাজার' (গিরিশচন্দ্র) প্রহসনে নীলমাধব চক্রবর্তীকে তুকড়ি সেন রূপে দেখা গেল। ১৮ সেপ্টেম্বর 'চৈতন্যলীলা' (গিরিশচন্দ্র) ও 'বিবাহ বিভ্রাট' (অমৃতলাল) অভিনয়ের পর ৫ অক্টোবর, ১৯০১ অরোরা নতুন নাটক 'সাধনা' মঞ্চস্থ করলে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (৫।১০।১৯০১) জানালেঃ—
"AURORA THEATRE—Today the above company will for the first time put on their stage "Sadhana" or devotion, a new melodrama. Next day "Dakshina"

and "Defamation" will be staged. We hope a full house on the occasion". এ মাসের ১৬ তারিখে অভিনীত হল গিরিশচন্দ্রের 'আগমনী'। ৩০ অক্টোবরের অভিনয়সূচীতে ছিল 'বিল্বমঙ্গল', 'হীরার ফুল' (গিরিশচন্দ্র) এবং 'তাজ্জব ব্যাপার' (অমৃতলাল)। ২ নভেম্বর অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ এবং প্রিয়নাথ ঘোষ ক্লাসিক থেকে অরোরায় চলে এলেন। তিন কৃতী অভিনেতার যোগদানের ফলে, নতুন থিয়েটারের শক্তি বৃদ্ধি পেল সন্দেহ নেই। সুদক্ষ শিল্পী সমন্বয়ে ১৬ নভেম্বর নীলমাধব বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী'র পুনরভিনয়ের আয়োজন করলেন। সংবাদপত্র মারফৎ ঘোষণা করা হল :— "Those among the Play-going public who had witnessed with admiration the representation of this piece by the late "City Theatre" a few years ago will find an exact replica of it on the present occasion". (অমৃতবাজার পত্রিকা—১৫।১১।১৯০১) নীলমাধব চক্রবর্তী নিলেন তাঁর বিখ্যাত ভূমিকা 'ভবানী পাঠক'। অন্যান্য চরিত্রে দেখা গেল :— অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী (হরবল্লভ), প্রবোধচন্দ্র ঘোষ (ব্রজেশ্বর), গোলাপসুন্দরী (প্রফুল্ল), কুসুমকুমারী (নিশা) এবং হরিমতি (দিবা) প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠ নট-নটীদের। জনপ্রিয় এই বঙ্কিমকাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন অতুলকৃষ্ণ মিত্র। ১৮৯৭ সালে এমারেল্ড মঞ্চে নাটকখানি মঞ্চস্থ ক'রে সিটি সম্প্রদায় দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছিলেন। সেই সব কৃতী শিল্পীরা এবার এখানে। সুতরাং, অরোরা'র 'দেবী চৌধুরাণী' যে সাফল্যমণ্ডিত হবে তাতে আশ্চর্য্য কি! অভিনয়ের সুখ্যাতি ক'রে ৭ ডিসেম্বর, ১৯০১ তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' জানালে :— "Aurora Theatre.—we are glad to have to announce to the public that we are receiving letters from the visitors of the Aurora Theatre which highly

be speak the exquisite music, dances and the scenes and performances witnessed by them, on the night of the 1st instant. Such public appreciation of its plays and performances, its amusements and entertainment does much credit to the management of the profession....." অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'শরসুন্দরী' ('লেডি অব্ দ্য লেক' অবলম্বনে) খোলা হল ১৪ ডিসেম্বর। পরের দিন 'দেবী চৌধুরাণী'র সঙ্গে কয়েকটি নাটকের নির্বাচিত দৃশ্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়েছে। সংবাদপত্রে বেরুল :— "The Aurora Theatre.— To-night this Company will appear in their full compliments and stage the new play "Sara-Sundari" or the Lady of the Lake dramatised in Bengali by Babu Atul Krishna Mitra. Next day they will give a performance of "Devi Chaudhurani", the well-known production of Bankim, and choicest scenes and songs from some of the best plays will be enacted. We hope the performances will be attended with success and will draw a crowded house". (অমৃতবাজার পত্রিকা—১৪।১২।১৯০১) ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে অরোরা 'মাধবী' এবং 'পশুশাসন' নামালে। শেষেরটি অতুলকৃষ্ণ মিত্রের লেখা এক নক্সা।

১৯০২-এর জানুয়ারির শেষে ম্যানেজারের পদ থেকে নীলমাধব চক্রবর্তী অপসৃত হলেন। ২৫ জানুয়ারি হ'তে ঐ দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন স্বত্বাধিকারী গুরুপ্রসাদ মৈত্র স্বয়ং। এই সময় ক্লাসিক থিয়েটারের খুব নামডাক। নায়িকারূপে সেখানে তারাসুন্দরী সুনামের সঙ্গে অভিনয় ক'রে চলেছেন। অরোরার শক্তিবৃদ্ধির জন্য

তাঁকে সেখান থেকে ভাঙ্গিয়ে আনা হল।[১] তারাসুন্দরী এলেন ২৯ জানুয়ারি।[২] এসে ঐদিন গিরিশচন্দ্রের 'নল-দময়ন্তী'তে দময়ন্তী সাজলেন। নল, কলি এবং বিদূষকরূপে দেখা দিলেন যথাক্রমে প্রিয়নাথ ঘোষ, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ এবং অক্ষয় চক্রবর্তী। এই সময় জনৈক এস্. সি. দাসের নাম সহকারী ম্যানেজার হিসাবে ঘোষিত হ'তে থাকে। ৫ ফেব্রুয়ারি 'বিল্বমঙ্গল' অভিনীত হল। চিন্তামণি-তারাসুন্দরী। ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে নীলমাধব চক্রবর্তী পুনরায় পূর্বপদে বহাল হলেন। এরপর তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' অবলম্বনে রচিত অমৃতলাল বসুর নাটক 'সরলা' (১৬।২) খোলা হয়। ভূমিকা-লিপি ছিল আকর্ষণীয় ঃ— শশিভূষণ— নীলমাধব, বিধুভূষণ— প্রবোধ ঘোষ, গদাধর— রাণুবাবু, নীলকমল— অক্ষয় চক্রবর্তী, রমেশ— প্রিয়নাথ ঘোষ, সরলা— কুসুম, প্রমদা— গোলাপ এবং শ্যামা— তারাসুন্দরী। একদা ১৮৯৪ সালে বীণা মঞ্চে এই 'সরলা'র অভিনয়ে

১ তারাসুন্দরীর ক্লাসিক ত্যাগ ও অরোরায় যোগদানের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা অমরেন্দ্রনাথের জীবনী গ্রন্থে। প্রসঙ্গতঃ, লেখক রমাপতি দত্ত জানিয়েছেন ঃ—"ক্লাসিকের এই গৌরবময় যুগে, অরোরা থিয়েটার ক্লাসিক হইতে তারাসুন্দরীকে ভাঙ্গাইয়া লইয়া যান। তারাসুন্দরীর যাইতে একান্ত অনিচ্ছা ছিল এবং সে সময় যদি অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার সামান্য কিছু মাহিনা বাড়াইয়া দিতেন, তাহা হইলে তিনি ক্লাসিকেই থাকিতেন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ তখন আত্মশক্তিতে অসীম আস্থাবান্, তাই তিনি তারাসুন্দরীর সামান্য বেতন বৃদ্ধির প্রার্থনায় কর্ণপাতও করিলেন না, ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে তারা অরোরায় চলিয়া গিয়া, সেখানে খুব সুখ্যাতির সহিত···অভিনয় করিতে লাগিলেন।" (বঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ)

২ উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে তারাসুন্দরীর অরোরায় যোগদানের তারিখ ১ ফেব্রুয়ারি ব'লে উল্লেখিত। কিন্তু 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ২৯ জানুয়ারি, ১৯০২ তারাসুন্দরীর অরোরায় 'নল-দময়ন্তী' নাটকে দময়ন্তীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা।

সিটি থিয়েটার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল।[৩] বর্তমানে সেই সব কৃতী শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করায় নাটকখানি পূর্বের জনসমাদরে বঞ্চিত হল না। রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কালপরিণয়' নাটকের উদ্বোধন করলে অরোরা ১৫ মার্চ। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' জানালে ঃ— "Aurora Theatre.— A new society drama entitled "Kal Parinoya," was put on board the stage of this popular place of amusement on Saturday night last, before a large and appreciative audience. The book is a master-piece, and the repeated out bursts of applause from the auditorium declared the performance a signal success. It is a note-worthy fact, that in these days of dramatic chaos and bewilderment, the Aurora Company have made it a point to maintain the best traditions of the stage by sticking to the exhibition of some of the excellent flowers of the Bengali dramatic literature. The piece will be repeated to-night and we expect a profuse public patronage on the occasion." (২২।৩।১৯০২) 'কালপরিণয়' নাটকে প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, প্রিয়নাথ ঘোষ, অক্ষয় চক্রবর্তী, তারাসুন্দরী ও হরিমতি যথাক্রমে জগদীশ, মণীন্দ্র, শম্ভু, মোক্ষদা এবং কিশোরী সাজতেন। মোক্ষদা চরিত্রের অভিনয়ে তারাসুন্দরী বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।[৪] এই

---

৩ "...সরলায় সিটির প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বাড়িতেছে দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। "সরলা" তারকনাথের অক্ষয় কীর্ত্তি। তাহার অভিনয়ে সিটি থিয়েটার, গ্রন্থকারের প্রতিপত্তি সম্পূর্ণ অক্ষত রাখিয়াছেন।..." (পুরোহিত —১৩০১, জৈ্যষ্ঠ / মে-জুন, ১৮৯৪)

৪ "এই মোক্ষদার ভূমিকাটি শ্রীমতী তারাসুন্দরী এতদূর সুন্দর অভিনয়

অভিনয়ের সময় নীলমাধব চক্রবর্তী আবার ম্যানেজারের পদ থেকে অপসৃত হয়েছেন। স্বত্বাধিকারী গুরুপ্রসাদ মৈত্র নিজেই তখন ম্যানেজার। নীলমাধব চলে যাওয়ায় সম্প্রদায়ের শক্তি যেটুকু হ্রাস পেল (বিশেষতঃ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে) উনি তা পূরণ করার জন্য নিয়ে এলেন স্বনামধন্য নট ও নাট্যশিক্ষক অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীকে। অর্দ্ধেন্দুশেখর অরোরায় ১৯০২, মে মাসে যোগ দেন।[৫] ১৭ মে তাঁর শিক্ষকতায় মনোমোহন রায়েব 'রিজিয়া' খোলা হল।[৬]

করিয়াছিল যে কলিকাতার বিখ্যাত জমিদার ৺অনাথনাথ দেব মহাশয় তাঁহার এই অভিনয় দেখিয়া একখানি স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছিলেন। অরোরা থিয়েটার হইতেই শ্রীমতী তারাসুন্দরীর সুখ্যাতি একেবারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং তারা যে একজন প্রতিভাময়ী সুদক্ষা অভিনেত্রী তাহা সকলে জানিতে পারে।" (বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ)

৫ "..অর্দ্ধেন্দুবাবু যখন অরোরা থিয়েটারে যোগদান করেন তখন অরোরা থিয়েটারে রিজিয়া নাটকের পুরাদস্তুর মহলা চলিতেছিল। শ্রীমতী তারাসুন্দবী এই নাটকে রিজিয়ার ভূমিকা মহলা দিতেছিল। সঙ্গীত সমাজের ৺নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী রিজিয়ার শিক্ষাপ্রদান করিতেছিলেন। কিন্তু মুস্তোফী সাহেব আসিয়া সে শিক্ষা ইংরাজীভাবাপন্ন বলিয়া শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে তাহা একেবারে ভুলিয়া যাইতে উপদেশ দেন এবং স্বয়ং আগাগো না নূতন করিয়া শিক্ষাপ্রদান করেন।" (বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী)

৬ সেই সময়কার 'রঙ্গালয়' পত্রিকায় নাটক ও অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল :— "বইখানি দেখিলাম— অনুবাদমাত্র, স্কটের 'কেনিল-ওয়ার্থ' উপন্যাসটির হুবহু অনুবাদ— সুতরাং পুস্তকের সুখ্যাতি যাহা তাহা স্কটের প্রাপ্য, এবং অখ্যাতিটি অনুবাদকের প্রাপ্য। অখ্যাতির কথা নাই বলিলাম। ইতিহাসের রিজিয়া এবং রিজিয়া পুস্তকের রিজিয়া দুইটি স্বতন্ত্র চরিত্র। অভিনয় ব্যাপারে চাতুরী দেখাইয়া ধনী করিয়াছিল— কেবল রিজিয়া। আর কাহারও অভিনয়চাতুরী উল্লেখযোগ্য নহে। তবে বীরেন্দ্র এবং পান্নালালের অভিনয় মন্দ হয় নাই। আর নাচের একটা নূতন কায়দাও দেখিয়াছি বটে।"

অরোরা থিয়েটারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাট্যনিবেদন এই 'রিজিয়া'[৭]—তারাসুন্দরী ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের যুগ্ম অভিনয়-নৈপুণ্যে যা স্মরণীয় হয়ে আছে। নামভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন তারাসুন্দরী। ঘাতকের একটি ক্ষুদ্র চরিত্রে অর্দ্ধেন্দুশেখরকে দেখা গেল।[৮] তারাসুন্দরীর অভিনেত্রী জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি—'রিজিয়া'।[৯] এই চরিত্রের রূপায়ণে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার তুলনা মেলা ভার। ২৫ মে গিরিশচন্দ্রের 'আবু হোসেন' নাটকে আবু হোসেন হলেন অর্দ্ধেন্দু। এটি তাঁর বিখ্যাত ভূমিকা।[১০]

৭ "...এই থিয়েটারে যতগুলি নাটক অভিনীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একমাত্র "রিজিয়া"ই উল্লেখযোগ্য।..." (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর— অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

৮ "...'রিজিয়া' পালায় সকলকে নাটকের পাঠ শিখিয়ে এবং বড় বড় ভূমিকাগুলি অন্যান্য পাত্রপাত্রীর মধ্যে বিলি ক'রে তিনি নিজে নিলেন ঘাতকের ছোট্ট ভূমিকা। কিন্তু তাঁর অভিনয়গুণে সেই ক্ষুদ্র ভূমিকাই এতটা বিখ্যাত হয়ে উঠলো যে, পরে শ্রেষ্ঠ নট ছাড়া আর কেউ সেই ভূমিকাটি গ্রহণ করতে সাহসী হতো না।" (যাঁদের দেখেছি— হেমেন্দ্রকুমার রায়)

৯ "...বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের গৌরবাস্পদা অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরীর যশোমুকুটে অভিনয়সাফল্যের যতগুলি রত্ন আছে, এই রিজিয়ার ভূমিকায় অভিনয়-নৈপুণ্য তন্মধ্যে মধ্যমণিস্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তখন এবং এখনও রিজিয়া বলিতে তারাসুন্দরীকেই বুঝায়। এ ভূমিকায় এ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইবার সাহসও কেহ করেন নাই। বহুকাল পূর্ব্বে মিনার্ভা থিয়েটারে কোন এক সভায় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই 'রিজিয়া'র উল্লেখ করিয়াই বলিয়াছিলেন যে, ইউরোপ ও আমেরিকার কোন রঙ্গমঞ্চে 'তারা'র রিজিয়ার অভিনয়ের মত অভিনয় তিনি দেখেন নাই।" (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর)

১০ "আবু হোসেনের ভূমিকা গ্রহণে স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় দেশব্যাপী সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।" (গিরিশচন্দ্র—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

অতীতে তাঁর এই অভিনয় দেখার জন্য মিনার্ভায় দর্শকের স্থান সঙ্কুলান হত না।[১১] দলগত শক্তি সেখানকার মত উল্লেখযোগ্য না হ'লেও, অর্দ্ধেন্দুশেখর অরোরায় নিজের পূর্বার্জিত সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখলেন সন্দেহ নেই। নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন রচিত 'একাদশ বৃহস্পতি' অভিনীত হল ২ আগস্ট।[১২] এ-নাটকে দালাল বালকের চরিত্রে তারাসুন্দরীর অভিনয় উপভোগ্য হয়েছিল। অরোরার পরবর্তী অভিনয়—বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী'। তারিখ—২৩ আগস্ট, ১৯০২। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন হরিচরণ আচার্য। ২৩ নভেম্বর নামলো—'প্রফুল্ল' (গিরিশচন্দ্র)। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর (যোগেশ),[১৩] রাণুবাবু (রমেশ), প্রিয়নাথ ঘোষ (সুরেশ), ভবতারিণী (উমাসুন্দরী) এবং তারাসুন্দরী (জ্ঞানদা)। অরোরা'র শেষ নাটক 'পরিতোষ' ১৩ ডিসেম্বর, ১৯০২ খোলা হয়। এতে

১১ গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত 'আবু হোসেন' নাটক মিনার্ভায় ২৫ মার্চ, ১৮৯৩ প্রথম অভিনীত হয়।

১২ "…মোটের উপর একাদশ বৃহস্পতির অভিনয় ভালই হয়। লোকের মনোরঞ্জনের জন্য অরোরার কর্তৃপক্ষেরা যথোচিত যত্ন করিয়া থাকেন।…" (রঙ্গালয়)

১৩ গিরিশচন্দ্র অভিনীত শ্রেষ্ঠ ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখরে অভিনয় কেমন হ'ত, এ-সম্পর্কে একালের নাট্যামোদীদের কৌতুহল স্বাভাবিক। এই চরিত্রে দুই দিকপাল অভিনেতার অভিনয় দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল খ্যাতনামা নাট্য-সমালোচক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের। তিনি লিখেছেন :— "…'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশ একটি বিখ্যাত ভূমিকা। 'যোগেশ'রূপে গিরিশচন্দ্র শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের চরম সীমায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই ভূমিকায় একদিন অর্দ্ধেন্দুশেখরের নাম বিজ্ঞাপিত হওয়াতে আমি দেখতে গেলুম সাগ্রহে। হতাশ হ'তে হলো না। তিনি দেখালেন সম্পূর্ণ নূতন ধারণা। কেবল দুই জায়গায় তিনি গিরিশচন্দ্রের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারেন নি এবং আর কেউ পারবেন বলেও বিশ্বাস হয় না। শুঁড়ীখানার দৃশ্যে এবং শেষ-দৃশ্যে গিরিশচন্দ্র ছিলেন একেবারেই অতুলনীয়।" (যাঁদের দেখেছি)

তারাসুন্দরী, গোলাপসুন্দরী, প্রিয়নাথ ঘোষ এবং রাণুবাবু যথাক্রমে সোহাগ, পরিতোষ, শিরিষচন্দ্র ও বিশ্বম্ভর সেজেছিলেন। 'পরিতোষ' মঞ্চস্থ হওয়ার পর এখানে আর নতুন কোনো নাটক অভিনীত হয় নি। এই বছরের শেষেই অরোরার বিলুপ্তি ঘটলো। নীলমাধব চক্রবর্তী তো আগেই বিদায় নিয়েছিলেন, থিয়েটার উঠে যাওয়ায় অর্দ্ধেন্দুশেখর ষ্টারে চলে গেলেন। বাকী দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো।

পরিশিষ্ট

ক. অভিনয়-তালিকা

দক্ষিণা	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	১৭।৮।১৯০১
জুলিয়া	”	১৮।৮।১৯০১
কৃপণের ধন	অমৃতলাল বসু	”
আলিবাবা	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	২৫।৮।১৯০১
বেল্লিক বাজার	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	”
চৈতন্যলীলা	”	১৮।৯।১৯০১
বিবাহ্ বিভ্রাট	অমৃতলাল বসু	”
সাধনা	—	৫।১০।১৯০১
আগমনী	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৬।১০।১৯০১
বিল্বমঙ্গল	”	৩০।১০।১৯০১
হীরার ফুল	”	”
তাজ্জব ব্যাপার	অমৃতলাল বসু	”
দেবী চৌধুরাণী	নাট্যরূপ-অতুলকৃষ্ণ মিত্র	১৬।১১।১৯০১
শরসুন্দরী	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	১৪।১২।১৯০১
দেবী চৌধুরাণী এবং নির্বাচিত নাটকের দৃশ্য ও সঙ্গীত		১৫।১২।১৯০১
মাধবী	—	২৫।১২।১৯০১
পশুশাসন	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	”
নল-দময়ন্তী	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২৯।১।১৯০২
বিল্বমঙ্গল		৫।২।১৯০২
সরলা	তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘স্বর্ণলতা’ অবলম্বনে অমৃতলাল বসু কৃত নাট্যরূপ	১৬।২।১৯০২
কালপরিণয়	রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫।৩।১৯০২
রিজিয়া	মনোমোহন রায়	১৭।৫।১৯০২

আবু হোসেন	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২৪।৫।১৯০২
একাদশ বৃহস্পতি	নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন	২।৮।১৯০২
রাধারাণী	নাট্যরূপ-হরিচরণ আচার্য	২৩।৮।১৯০২
প্রফুল্ল	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২৩।১১।১৯০২
পরিতোষ	—	১৩।১২।১৯০২

খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায়

নীলমাধব চক্রবর্তী, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু), অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, প্রিয়নাথ ঘোষ, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, কুসুমকুমারী (বিষাদ), হরিমতি, গোলাপসুন্দরী (ছোট), তারাসুন্দরী এবং ভবতারিণী।

ইউনিক থিয়েটার

(১৯০৩-১৯০৪)

বেঙ্গল মঞ্চ থেকে অরোরার নাম মুছে গেল। থিয়েটার উঠে যেতে ম্যানেজার নীলমাধব চক্রবর্তী ক্লাসিকে এবং অর্দ্ধেন্দুশেখর ষ্টারে চলে গেলেন। এরপর এমারেল্ড থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ধনকুবের গোপাললাল শীলের ভাগিনেয় গিরিমোহন মল্লিক[১] বেঙ্গল মঞ্চ লিজ নিয়ে সেখানে 'ইউনিক' নামে এক নতুন সম্প্রদায়ের পত্তন করেন। নট ও নাট্যকার সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দলের ম্যানেজার করা হয়। স্টেজ ম্যানেজার হন ধর্মদাস সুর। পরবর্তীকালের মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী মহেন্দ্রনাথ মিত্র এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন।[২] ১৯০৩, ৬ জুন মিনার্ভা ও অরোরার প্রাক্তন নট-নটীদের সহায়তায় সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'রত্নমালা' নাটক দিয়ে ইউনিক থিয়েটারের উদ্বোধন হল। তারাসুন্দরী, সুশীলাবালা, ক্ষেত্রমোহন মিত্র এবং সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে মন্দারমালা, রত্নমালা, পুরন্দর ও প্রমোদকুমার সাজলেন। পরের দিন মঞ্চস্থ হল 'তরুবালা' (অমৃতলাল) ও 'আবু হোসেন' (গিরিশচন্দ্র)। ২১ জুন 'কপালকুণ্ডলা' ও 'আবু হোসেন' নাটকে মতিবিবি এবং রোশেনা'র রূপসজ্জায় দেখা গেল যথাক্রমে তারাসুন্দরী এবং সুশীলাকে। 'বিবাহ বিভ্রাট' (৫।৭), 'জনা' (১২।৭) এবং 'রিজিয়া' (১৮।৭) প্রভৃতি অভিনয়ের শেষে ইউনিক ৮ আগস্ট নতুন নাটক 'নূরনীহার' মঞ্চস্থ করলে। ১২ আগস্ট এক সাহায্য রজনীর

---

১ ইনি কিছুকাল ষ্টারেরও লেসী ছিলেন (১৯১৮)।

২ "ইতিপূর্ব্বে এই মহেন্দ্রবাবু বেঙ্গল-থিয়েটারে স্থাপিত 'ইউনিক' নামে একটি থিয়েটারে যোগ দেন।" (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর)

আয়োজন ক'রে বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ পরলোকগত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুঃস্থ পরিবারের হাতে তুলে দিলেন কর্তৃপক্ষ।[৩] ১২ সেপ্টেম্বর 'শ্মশান' (মেবার পতন) খোলার পর রাম পাত্র নামক জনৈক চাউল ব্যবসায়ীর চক্রান্তে দলে ভাঙ্গন দেখা দেয়। বিরোধের ফলে ম্যানেজার সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অপসৃত হলেন এবং স্বত্বাধিকারী গিরিমোহন মল্লিক সর্বময় কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে নট ক্ষেত্রমোহন মিত্রের সাহায্যে দলের পুনর্গঠন করলেন। চুনিলাল দেবকে অংশীদার ক'রে আনা হল। দানীবাবুও ক্লাসিক থেকে ইউনিক থিয়েটারে যোগ দিলেন অংশীদার হিসাবে। অবশ্য, ঘটনাচক্রে একরকম বাধ্য হয়েই দানীবাবুকে ক্লাসিক ছাড়তে হয়েছিল।[৪] সে যাই হোক, দু'জন জনপ্রিয় অভিনেতাকে পেয়ে

৩ এই উপলক্ষে 'নবযুগ' (৩০ শ্রাবণ, ১৩১০) লিখেছিল :—"আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, কলিকাতার ইউনিক থিয়েটার, হেমচন্দ্রের দুস্থ পরিবারের সাহায্যকল্পে গত বুধবার একটি বেনিফিট নাইট দিয়াছেন ; ঐ তারিখে যত টিকিট বিক্রয় হইয়াছে, তাহা কবিবর হেমচন্দ্রের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে অর্পিত হইবে। ইউনিক থিয়েটার অল্পদিনের হইলেও জাতীয় সাহিত্যের সম্মানে, সর্ব্বপ্রথমে এরূপ অনুরক্তি দেখিয়া আমরা নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, এবং এজন্য স্বত্বাধিকারী বাবু গিরিমোহন মল্লিক এবং ম্যানেজার বাবু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।..." ২৪ মে, ১৯০৩ হেমচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

৪ প্রসঙ্গতঃ, রমাপতি দত্ত লিখেছেন :— "...ইউনিকের স্বত্বাধিকারী গিরিবাবু, চুণীবাবুকে অংশীদার করিয়া সেখানে লইয়া যান ও দানিবাবুকেও বখরার লোভ দেখাইয়া ক্লাসিক হইতে ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করেন। দানিবাবু নিমরাজি হন। খবরটা অমরেন্দ্রনাথের কানে উঠে। দানিবাবু বেশ কৃতিত্বের সহিত শঙ্করের ভূমিকাভিনয় করিতেছিলেন। শঙ্কর ধরিতে গেলে নাটকের উপনায়কের অংশ। এককথায় কাহাকে দিয়াই বা এমন অংশ অভিনীত করান যায়! এই সকল নানা কথা ভাবিয়া, দানিবাবুর যাওয়ার সংবাদে অমরেন্দ্রনাথ বিশেষ বিরক্ত হন। সেদিন বুধবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর ; অমরেন্দ্র-

ইউনিক থিয়েটারের শক্তি যে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেল তাতে সন্দেহ নেই। এই সঙ্গে এলেন মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু)। তরুণ শিল্পী হিসাবে এঁর খ্যাতিও নিতান্ত মন্দ ছিল না। এছাড়া, ক্ষেত্রমোহন মিত্র তো উদ্যোগ পর্ব থেকে ছিলেনই। আকর্ষণীয় শিল্পীসম্ভারে এবং নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ১৯০৩, ১৮ নভেম্বর ইউনিক থিয়েটারের নবপর্য্যায়ে যাত্রারম্ভ হয়। এইদিন মঞ্চস্থ হয়েছিল 'নল-দময়ন্তী' ও 'আলিবাবা'। শেষের নাটকে আবদাল্লা সেজেছিলেন শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু)। ২১ নভেম্বর 'লহরকুমার' নামে এক তিন অঙ্কের নাটক খোলা হয়েছিল—'বেঙ্গলী'র বিজ্ঞাপনে যা গিরিশচন্দ্রের রচনা ব'লে উল্লেখিত।[৫] পরদিন অভিনীত হল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাটক 'তারাবাই'। ইউনিক থিয়েটারের স্বল্পকালীন জীবনে একমাত্র এই নাটকটিই সর্বাঙ্গীণ সফলতা লাভ করে।[৬] অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন

নাথ সাজঘর হইতে দানিবাবুকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া বলেন,—"হ্যাঁ, দানি, শুনিলাম তুমি নাকি ইউনিকে যাইতেছ? দানিবাবু উত্তর দেন,—"হ্যাঁ। আমি ভাবছিলাম, তোমাকে নোটিস দিব।" শুনিয়া অমরেন্দ্রনাথ বলেন,—"নোটিস দিবার দরকার নাই, তুমি আজই সেখানে চলিয়া যাইতে পার। তোমার পোষাক খুলিয়া দাও, অন্য লোক তোমার পার্ট করিবে।" পোষাক খুলাইয়া লওয়া অভিনেতার পক্ষে বড়ই অপমানের কথা, তাই দানিবাবু অনর্থক কথা না বাড়াইয়া সাজঘরে চলিয়া যান। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে অমরেন্দ্রনাথ কর্তৃক লোক মারফৎ পোষাক খুলিয়া দিতে পুনরায় আদিষ্ট হইয়া, তিনি অগত্যা তাহা পালন করেন এবং যদিও বা ইউনিকে না যাইতেন, অমরেন্দ্রনাথের ব্যবহারে বাধ্য হইয়া তথায় চলিয়া যান।" (রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ)

৫ সম্ভবতঃ, ১৮৮২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত গিরিশচন্দ্রের গীতিনাট্য 'মলিন মালা'র পরিবর্তিত রূপ এটি। কেন না, 'মলিন মালা'র নায়ক চরিত্রের নাম দেখা যায়—লহরকুমার।

৬ "...স্বর্গীয় ডি, এল, রায় মহাশয়ের 'তারাবাই' ইউনিকে খুব সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হয়।...নাটকীয় ঘটনার সাজানোর গুণে এবং অভিনয়

দানীবাবু (পৃথ্বীরাজ), চুনিলাল দেব (সূর্যমল), ক্ষেত্রমোহন মিত্র (জয়মল), তারক পালিত (রায়মল), মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (রাণা সঙ্গ), শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রভুরাও), সুধীরাবালা (শূরতানের রানী ?), প্রকাশমণি (তমসা), তারাসুন্দরী (তারাবাই) প্রমুখ কৃতী নট-নটীরা। 'তারাবাই' নাটকে দানীবাবু "পৃথ্বীরাজের ভূমিকায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। যেখানে প্রভুরাও মিষ্টান্নের সহায়তায় পৃথ্বীরাজকে বিষ খাওয়ায়, সেস্থলে দানীবাবুর অভিনয় হয় অপূর্ব্ব।"[৭] 'তমসা'র রূপসজ্জায় প্রকাশমণিও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'লক্ষ্মণ-বর্জন', 'জনা' প্রভৃতির পর ২৩ ডিসেম্বর নামলো 'বিল্বমঙ্গল'। 'নতুনবাবু' (নক্সা) খোলা হল ২৫ ডিসেম্বর। ২৭ ডিসেম্বর 'কাল-পরিণয়' অভিনীত হয়েছিল।

১৯০৪-এর জানুয়ারিতে চললো পুরানো নাটকের অভিনয়। ৫ মার্চ ইউনিক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'জাহানারা' মঞ্চস্থ করলে। নাটকটি শেক্‌স্‌পিয়রের 'এ মিডসামার-নাইটস্‌ ড্রিম' অনুসরণে লেখা। এরপর আর গিরিমোহন বেশীদিন থিয়েটার চালাতে পারেন নি। ২৩ এপ্রিল, ১৯০৪ তারিখের অভিনয়ের পর ইউনিক বন্ধ হয়ে যায়। গিরিমোহন তাঁর স্বত্ব বিক্রী ক'রে ফেললেন ও অপর দুই অংশীদার দানীবাবু এবং চুনিলাল প্রত্যেকে নিজেদের অংশের বিনিময়ে দেড় হাজার টাকা হিসাবে মূল্য পেয়ে ফিরে গেলেন তাঁদের পুরানো জায়গায়, ক্লাসিকে।[৮] তারাসুন্দরী যুক্ত হলেন মিনার্ভায়, ওখানকার 'সংসার' অভিনয়ের পর। অন্যান্য নট-নটীরাও চারিদিকে ছড়িয়ে- ছিটিয়ে পড়লেন। থিয়েটার উঠে গেল।

মনোজ্ঞ হওয়ায় তাঁহার 'তারাবাই' জমিয়াছিল ভাল।..." (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর)

৭ বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও দানিবাবু— হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

৮ এই সময় ক্লাসিক ছাড়া মিনার্ভার কর্তৃত্বও অমরেন্দ্রনাথের হাতে। তিনি দানীবাবু ও চুনিলাল দেবকে মিনার্ভায় নিযুক্ত করেন।

পরিশিষ্ট

ক. অভিনয়-তালিকা

রত্নমালা	সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬।৬।১৯০৩
তরুবালা	অমৃতলাল বসু	৭।৬।১৯০৩
আবু হোসেন	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	"
কপালকুণ্ডলা	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২১।৬।১৯০৩
আবু হোসেন		"
বিবাহ বিভ্রাট	অমৃতলাল বসু	৫।৭।১৯০৩
জনা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১২।৭।১৯০৩
রিদ্ধিঃ	মনোমোহন রায়	১৮।৭।১৯০৩
নূরনীহার	—	৮।৮।১৯০৩
শ্মশান অথবা মেবার পতন	—	১২।৯।১৯০৩
নল-দময়ন্তী	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৮।১১।১৯০৩
আলিবাবা	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	"
লহরকুমার	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২১।১১।১৯০৩
তারাবাই	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	২২।১১।১৯০৩
বিল্বমঙ্গল	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২৩।১২।১৯০৩
নতুন বাবু	সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৫।১২।১৯০৩
কালপরিণয়	রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭।১২।১৯০৩
জাহানারা	সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫।৩।১৯০৪

খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায়

ক্ষেত্রমোহন মিত্র, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু), দানীবাবু, চুনিলাল দেব, তারক পালিত, মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু), তারাসুন্দরী, সুশীলাবালা, সুধীরাবালা এবং প্রকাশমণি।

গ. বিজ্ঞাপন

1903

Grand Opening Night !

Really something phenomenal to behold !

THE UNIQUE THEATRE
ON THE
STAGE OF THE ROYAL BENGAL THEATRE
No. 9, Beadon Street.

Saturday, 6th June at 9 P.M.

A New Sensational and Charming Drama
IN FIVE ACTS

R A T N A — M A L A
OR
A GARLAND OF GEMS.

Wit ! Hit ! Humour, Mirth, Sentiments of an exalted order and superior taste !

Serious and light,
Hard and soft,
Pathos and sentiments,
Chivalry and songs !

New Scenery and Dazzling Accessories
all up to the mark !

Graceful Dances, Melodious Songs in Solos
and chorus throughout !

Our first scenic Grandeur will repay your
Gate Money with interest !

In a word our every scenic Grandeur will create a sensation in the minds of all the admirers of drama !

Thrilling Sight of a Mysterious Castle !

The sight of the Mysterious Castle of a mysterious community will terrify your heart and make your hairs stand on end !

Our Last Scenic Grandeur

How Magnificient and Charming to the view !

THE ROYAL COURT OF MITHILA.

Here all the Mysteries of the drama
will be solved !

Our concluding soul captivating song
is really unparalleled !

Music like its never got into your ars ere this. The talk of the Town—That the Unique Theatre is a marvel of the 20th Century !

Come one and all and quench your thirst

G. M. Mullick
Proprietor

S. C. Chatterjee
Manager

ন্যাশনাল থিয়েটার

(১৯০৫-১৯১১)

ইউনিক থিয়েটারের বিলুপ্তির পর এক বছরেরও বেশী সময় বেঙ্গল মঞ্চ শূন্য পড়ে ছিল। অবশেষে, সন ১৯০৫-এর ৯ ডিসেম্বর অরোরা-ইউনিকের পুরানো শিল্পী ও কর্মীদের নিয়ে গড়া এক সম্প্রদায় 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে এখানে অভিনয় সুরু করলেন। দলের ম্যানেজার হলেন সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যিনি ইতিপূর্বে ইউনিকের অধ্যক্ষ ছিলেন। রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'অদৃষ্ট' নাটক দিয়ে ঐ তারিখে ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন হল। বড়দিন উপলক্ষে ২৫ ডিসেম্বর এঁরা খুললেন পূর্বোক্ত নাট্যকারের লেখা জাপানী ধাঁচের অপেরা 'চাঁদের হাট'।

ইউনিকের মত এখানেও সতীশচন্দ্র বেশীদিন টিঁকতে পারেন নি। ১৯০৬, ৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর পরিবর্তে ন্যাশনালের ম্যানেজার হলেন জহরলাল দত্ত। নতুন ব্যবস্থাপনায় ১০ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক 'বিশ্বনাথ' মঞ্চস্থ হল। বিহারীলাল দত্তর 'প্যারী-রৌশন' নামে ৩১ মার্চ। ১৩ এপ্রিল 'তরুবালা'তে মানদাসুন্দরী, হরিমতি এবং অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী যথাক্রমে পারুল, তরুবালা ও হীরালাল সাজলেন। ঐ তারিখেই 'আলিবাবা'য় মর্জিনা এবং আবদাল্লারূপে দেখা দিলেন ভুবনসুন্দরী ও শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু)। নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসুর পরেই আবদাল্লার ভূমিকায় রাণুবাবুর খ্যাতি ছিল। উপরোক্ত নট-নটী ছাড়া এই সময় ন্যাশনালের শিল্পীগোষ্ঠীতে আর যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :— কুসুমকুমারী (বিষাদ), কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি। এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে চুনিলাল

দেব এঁদের সাথে যুক্ত হলেন[১] এবং ২২ এপ্রিল 'পৃথ্বীরাজ'[২] (মনোমোহন গোস্বামী) নাটকে তাঁকে জয়চাঁদের চরিত্রে দেখা গেল। নামভূমিকায় নামলেন ওঁরই ভাই নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় রচিত 'বঙ্গবিক্রম' খোলা হয় ১৪ জুলাই। ঐ তারিখের 'বেঙ্গলী' জানালে :— "National Theatre.—To-night a new historical drama, entitled Banga Vikram, depicting Bengali Prowess and chivalry in the Seventeenth Century, will be put on the boards of the National Theatre, for the first time. The play is most opportune and should attract a bumper house." ১ আগস্ট তারাসুন্দরী এসে যোগ দেওয়ায় ন্যাশনালের শক্তি বৃদ্ধি পেল।[৩] ঐদিন তিনি 'বিল্বমঙ্গল' ও 'সংসার' নাটকে যথাক্রমে চিন্তামণি এবং বামা সাজেন। ৪ আগস্ট তারা 'বঙ্গবিক্রম' নাটকে 'অনীতা'র রূপসজ্জায় অবতীর্ণ হলেন। ন্যাশনালে এই ভূমিকায় তারাসুন্দরী

১ ইউনিক থিয়েটারের পতনের পর চুনিলাল ক্লাসিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ক্লাসিক ও মিনার্ভার তদানীন্তন স্বত্বাধিকারী অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নির্দেশে শেষোক্ত রঙ্গালয়ে নিযুক্ত হন। পরে, অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভার স্বত্ব মনোমোহন পাঁড়েকে হস্তান্তরিত করায় চুনিলালকে কিছুদিন মিনার্ভার পরিচালকরূপে দেখা যায়। ক্লাসিকের কর্তৃত্ব হারানোর পর অমরেন্দ্রনাথ যখন কার্জন মঞ্চে গ্র্যাণ্ড থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন (৬।৫।১৯০৫) চুনিলাল তাঁর সঙ্গে ছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ গ্র্যাণ্ড থেকে পুনরায় ক্লাসিকে ফিরে গেলে কিছুদিন তিনকড়ি দাসীকে এনে গ্র্যাণ্ড চালানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর চুনিলাল দেব ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দেন।

২ এই 'পৃথ্বীরাজ' দিয়েই ৬ মে, ১৯০৫ কার্জন মঞ্চে অমরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত গ্র্যাণ্ড থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। চুনিলাল সেখানেও জয়চাঁদ সাজেন।

৩ রিসিভার পরিচালিত ক্লাসিক থেকে তারাসুন্দরী ন্যাশনালে আসেন। তারও পূর্বে উনি মিনার্ভায় ছিলেন।

অনেকদিন অভিনয় করেছিলেন। পরের দিন 'রিজিয়া'তে উনি নিলেন ওঁর বিখ্যাত ভূমিকা রিজিয়া আর প্রবোধচন্দ্র ঘোষ বক্তিয়ার। এই সময় তারাসুন্দরী সীতা (সীতার বনবাস-১৫।৮), শান্তা (তরুবালা-১৫।৮), মতিবিবি (কপালকুণ্ডলা-২৬।৮), যশোদা (প্রভাস মিলন-২৬।৮), দময়ন্তী (নল-দময়ন্তী-৫।৯) প্রভৃতি চরিত্রে অংশ নিতেন। ৮ ডিসেম্বর 'দুর্গাদাস' খোলা হল। গোলিনা হলেন তারাসুন্দরী এবং চুনিলাল দুর্গাদাস। ইত্যবসরে নট ও নাট্যকার মনোমোহন গোস্বামী ন্যাশনালে যোগ দিয়ে নিজের লেখা 'সংসার' নাটকে অবতীর্ণ হয়েছেন। 'দুর্গাদাস' নাটকে উনি নামতেন দিলীর খানের ভূমিকায়।

১৯০৭-এর ফেব্রুয়ারিতে ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালন-ব্যবস্থায় রদবদল ঘটলো। জহরলাল দত্তের জায়গায় বিজনেস্ ম্যানেজার হয়ে এলেন এন. সি. মল্লিক। মল্লিকমশায় কর্ণধার হয়ে ১১মে 'সমাজ' (মনোমোহন গোস্বামী) খুললেন। 'বেঙ্গলী' জানালে ঃ— "National Theatre ঃ— A new social drama called the Samaj, from the pen of Babu Monomohan Goswami, is carded for the first performance to-night at the National Theatre. There will be a crowded house, we doubt not, considering that some of the leading artists of Calcutta have been announced to have helped in the mounting". (১১।৫।১৯০৭) নাটকের ভূমিকালিপি ছিল এইরকম ঃ— পরেশ-মনোমোহন গোস্বামী, সুধীর-চুনিলাল দেব, অনুপমা-তারাসুন্দরী[৪] এবং কমলা-বিনোদিনী (হাঁদি)। ২৫ জুন থেকে আবার ম্যানেজার-বদল। এবার এলেন বিহারীলাল দত্ত। শিল্পীগোষ্ঠীতে তখন

৪ ১৯০৭, ১১ আগস্ট কোহিনূর থিয়েটারের উদ্বোধনের পূর্বে তারাসুন্দরী ন্যাশনাল ছেড়ে সেখানে যোগ দেন।

আছেন :— মনোমোহন গোস্বামী, নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু), মৃণালিনী (খাঁদি) প্রভৃতি। জুলাই মাসে এঁদের সাথে যুক্ত হন নগেন্দ্রবালা দাসী (বুঁচি)। যোগ দিয়েই উনি নতুন অপেরা 'মাল্‌কে-মক্‌বেলে' (৭।৭) সারিণী সাজেন। ১১ আগস্ট 'রহিম শা' (মনোমোহন রায়) খোলা হল।[৫] কোহিনূর এবং মিনার্ভার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ২১ সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল মনোমোহন গোস্বামীর লেখা 'ছত্রপতি শিবাজী' মঞ্চস্থ করলে।[৬] অক্টোবরে এখানে যোগদান করেন সুকুমারী দত্ত। ৬ অক্টোবর তাঁকে 'কপালকুণ্ডলা'য় মতিবিবির ভূমিকায় দেখা গেল। ননীলাল সুর রচিত অপেরা 'দেলেরা'র উদ্বোধন হল ডিসেম্বর মাসের সাত তারিখে। এতে নামভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন নগেন্দ্রবালা (বুঁচি)। এইভাবে ঘটলো ১৯০৭ সালের পরিসমাপ্তি।

বাজার মন্দা দেখে ১৯০৮-এর সুরুতে ন্যাশনাল দর্শকদের বই উপহার দেওয়া সুরু করলে। নতুন অপেরা 'প্রেম প্রতিমা' (ললিত-মোহন চট্টোপাধ্যায়) খোলা হল ২১ মার্চ। 'বেঙ্গলী' (২৫।৩।১৯০৮) লিখলে :— "National Theatre.— On Saturday this popular place of amusement produced r the first

৫ এই তারিখে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত 'চাঁদবিবি' নাটক দিয়ে কোহিনূর থিয়েটারের উদ্বোধন হয়।

৬ ১৯০৭, ১৭ আগস্ট মিনার্ভা গিরিশচন্দ্রের লেখা 'ছত্রপতি শিবাজী' প্রথম অভিনয় করে। নামভূমিকায় অবতীর্ণ হন মিনার্ভার তদানীন্তন অধ্যক্ষ অমরেন্দ্রনাথ। গিরিশচন্দ্র সেই সময় সদ্য প্রতিষ্ঠিত কোহিনূরে। তাঁর পরিচালনায় কোহিনূরে এই নাটক খোলা হয় ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ তারিখে। সেখানে দানীবাবু শিবাজী সাজেন। সে যুগের দুই শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী নট অমরেন্দ্রনাথ ও দানীবাবুর একই নাটকে একই ভূমিকায় এই প্রতিযোগিতামূলক অভিনয় সমকালীন দর্শকদের মধ্যে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

time an opera "Prem Pratima". The house, as expected was full ; and the vast audience often gave loud and hearty applauses. The scenic effect was also excellent." এরপর মে মাসের শেষে ন্যাশনাল থিয়েটার সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। জুন মাসের গোড়া থেকে Elphinstone Bioscope Company এখানে ছবি দেখানো সুরু করে। তবে, এই অবস্থা বেশীদিন থাকে নি। ১৯ আগস্ট হ'তে থিয়েটার পুনরায় চালু হয়েছে।

ওদিকে তখন কোহিনূর ও মিনার্ভার অসীম জনপ্রিয়তা ! বাংলা থিয়েটারের দিকপাল সব নট-নটীবা সে সময় ওই দুই রঙ্গালয়ের সঙ্গে জড়িত আছেন। প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে না পেরে ন্যাশনাল-কর্তৃপক্ষ ২২ আগস্ট থেকে প্রবেশমূল্য হ্রাস করতে বাধ্য হলেন। টিকিটের নতুন হার হল এইরকম :— গ্যালারী-চার আনা, পিট-আট আনা, ষ্টল-এক টাকা, ড্রেস সার্কেল-দু' টাকা। মহিলা-এক টাকা (প্রথম শ্রেণী) ও আট আনা (দ্বিতীয় শ্রেণী)। ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার কর্পোরেশন রাত্রি একটার মধ্যে অভিনয় সমাপ্তির নির্দেশ জারী করায়[৭] অন্যান্য থিয়েটারের মত ন্যাশনালের

৭ দর্শক ও প্রদর্শক উভয় সম্প্রদায়ের নানাবিধ অসুবিধার উল্লেখ ক'রে অভিনয়ের সময়-সংক্ষেপের বিরুদ্ধে তদানীন্তনকালের রঙ্গালয়গুলির পক্ষ থেকে গিরিশচন্দ্র কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। আইনটি যে তারিখে প্রথম চালু হয়, সেই দিনই অর্দ্ধেন্দুশেখরের মৃত্যু ঘটে (১৫।৯।১৯০৮)। ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ মিনার্ভায় অনুষ্ঠিত স্মৃতি সভায় অর্দ্ধেন্দু-স্মরণে গিরিশচন্দ্র যে ভাষণ দেন, তার পরিশেষে তিনি এই নতুন মিউনিসিপ্যাল আইনের বিপক্ষে যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যবহুল বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতা দু'টি পরে পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয়। সমকালীন নাট্য প্রযোজনার একটি মূল সমস্যা ও সেই সঙ্গে তদানীন্তন দর্শকমানসের একটি উল্লেখযোগ্য দিকের প্রকাশ ঘটেছে গিরিশচন্দ্রের সেই গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতায়।

সময়সূচীতেও পরিবর্তন দেখা গেল। 'বঙ্গবিক্রম', 'শ্রীকৃষ্ণ', 'সমাজ', 'প্রহ্লাদ-চরিত্র', 'আলিবাবা', 'নল-দময়ন্তী', 'আবু হোসেন' প্রভৃতি পুরানো নাটকাভিনয়ের ফাঁকে ১৯ সেপ্টেম্বর কর্তৃপক্ষ 'মেহেরারা' নামে এক নতুন অপেরা খুললেন। সেপ্টেম্বরের শেষে ন্যাশনাল থিয়েটারের নাট্যশিক্ষকরূপে নিযুক্ত হলেন চুনিলাল দেব। বিহারীলাল দত্ত অবশ্য ম্যানেজারই রইলেন। মিউনিসিপ্যাল আইনের বিধিনিষেধ শিথিল হওয়ায়[৮] অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে ন্যাশনালের অভিনয়-সময় পরিবর্তিত হয়ে এইরকম দাঁড়ালো :— শনিবার— রাত্রি ৯টা থেকে রাত্রি ৩টা, রবিবার— সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে রাত্রি ৩টা এবং বুধবার রাত্রি ৮টা থেকে রাত্রি ৩টা। হরি‿াদ চ‿ট্টোপাধ্যায় রচিত 'কল্যাণী'র উদ্বোধন হল ১৪ নভেম্বর। 'বেঙ্গলী' জানালে :— "National Theatre.— This troupe of artists who have been attempting at renaissance of the good old days of the Bengal Stage by introducing Prohlad Charitra, Probhash Milan and other plays which marked the palmy days of the Royal Bengal Theatre, the stage where of now goes under the name of the National Theatre are putting on boards to-night a new piece called Kalyani. We

---

৮ রমাপতি দত্ত রচিত অমরেন্দ্রনাথের জীবনী গ্রন্থে দেখি, ১৯১১ সালে অমরেন্দ্রনাথ যখন বেঙ্গল মঞ্চে তৎ প্রতিষ্ঠিত গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে মফস্বল-দর্শকদের সুবিধার জন্য সারারাত্রিব্যাপী অভিনয় প্রথা চালু করেন তখন তাঁকে "প্রতি রজনীতে ১টার পর অভিনয়ের জন্য ২৫৲ করিয়া অর্থদণ্ড দিতে হইত।" (রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ)

মিউনিসিপ্যাল আইনের এই সংশোধিত রূপ অর্থাৎ অর্থদণ্ড স্বীকারে রাত্রি একটার পর বর্দ্ধিত সময় অভিনয় করার স্বাধীনতা সম্ভবতঃ এই সময় (অক্টোবর, ১৯০৮) প্রবর্তিত হয়।

hope it will attract a full house." (১৪।১১।১৯০৮) 'কল্যাণী'র ভূমিকালিপি ছিল এইরকম ঃ— সাঁওতাল সর্দার-চুনিলাল দেব, পার্বতী-নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, গোপীনাথ-অবিনাশ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ-অটলবিহারী ব্যানার্জী, নরেন্দ্র-নারায়ণ-গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী, পরেশ-অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কমলা-সরোজিনী দাসী, ইন্দুমতী-কাননবালা দাসী এবং কল্যাণী-জ্ঞানদাসুন্দরী দাসী। ১৬ ডিসেম্বর তিনকড়ি দাসী ন্যাশনালে যোগদান ক'রে ঐদিন 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে পাগলিনী সাজলেন। নামভূমিকায় প্রবোধচন্দ্র ঘোষকে দেখা গেল। ২৩ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হল 'জনা'। নীলধ্বজ-প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, প্রবীর-চুনিলাল দেব এবং জনা-তিনকড়ি। এ-ভূমিকায় তিনকড়ির তুলনা ছিল না।

১ মে, ১৯০৯ 'ভারত গৌরব'[৯] নাটকের উদ্বোধন রজনী। এতে বৈষ্ণবী এবং রণেন্দ্রর চরিত্রে রূপ দিলেন যথাক্রমে তিনকড়ি ও চুনিলাল দেব। 'শাহ সুজা' খোলা হয়েছিল ২৫ সেপ্টেম্বর। নাটকখানি চুনিলাল দেবের লেখা। এর বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নিতেন ঃ— নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব (শাহ সুজা), চুনিলাল দেব (ইব্রাহিম), কালীচরণ ব্যানার্জী (নাসিরুদ্দিন), প্রবোধচন্দ্র বসু (কমলকুমার), সরোজিনী (পিয়ারীবানু), হরিপ্রিয়া দাসী (বিজলী), নগেন্দ্রবালা দাসী (যোগমায়া) প্রভৃতি। বছরের শেষ নাটক হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'মায়া' (২৪।১২)। 'মায়া'য় চুনিলাল দেবের ভূমিকা ছিল বিশ্বনাথ।

১৯১০, ১৩ এপ্রিল চুনিলাল দেব ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক-চ্ছেদ করেন। একমাত্র স্বত্বাধিকারী হিসাবে বিজ্ঞাপনে তখন বিহারী-

৯ ১৯০৪, ৩০ এপ্রিল অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্র রচিত 'সৎনাম' প্রথম ক্লাসিক থিয়েটারে মঞ্চস্থ করেন কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের আপত্তিতে ২১মে চতুর্থ অভিনয়রজনীতে নাটকখানির অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। 'ভারত গৌরব' সেই 'সৎনাম' নাটকেরই পরিবর্তিত রূপ।

লাল দত্তের নাম প্রচারিত। একক দায়িত্বভার হাতে নিয়ে বিহারী-লাল ১৬ জুলাই নিজের লেখা 'বনবালা' নামে এক নাটক খুললেন। ঐ তারিখের 'বেঙ্গলী'তে বেরুল ঃ— "The National Theatre.— Another excellent treat is offered by the National Theatre, to the play-goers of Calcutta. Mr. Beharilall Dutt, the proprietor, has written a new drama entitled "Banabala" It is a translation of Shakes-pear's Measure for Measure in which the spirit of the immortal Bard of Avon has been kept in tact. Songs, dances and sceneries leave nothing to be desired. The play will be staged to-night at the usual hours." চুনিলাল দেব চলে যাওয়াব পর বিহাবীলালের পক্ষে বেশী দিন থিয়েটার চালানো সম্ভব হয় নি। 'বুদ্ধি কার' (৬।৮), 'স্বর্ণ প্রতিমা' (২৪।৯), 'তুলসীদাস' (১৭।১২) প্রভৃতি মঞ্চস্থ হওয়ার পর নতুন বছরেব গোড়ার দিকে ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল। ১৯১১, ২৯ জানুয়ারি ন্যাশনাল বেঙ্গল মঞ্চে শেষ অভিনয় করে।[১০] ঐদিন 'কল্যাণী' অভিনীত হয়েছিল।

ন্যাশনালের শিল্পীভাগ্য নিতান্ত মন্দ ছিল না। চুনিলাল দেব, সুকুমাবী, তিনকড়ি, তাবাসুন্দরী প্রমুখ প্রথিতযশা নট-নটীরা এর সঙ্গে কোনো না কোনো সময় জড়িত ছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও 'বঙ্গবিক্রম' ও 'কল্যাণী' ছাড়া কোনো নতুন নাটক এখানে জমে নি। বরং

১০ অমরেন্দ্রনাথ তখন ১৯১১, ২২ জানুয়ারির অভিনয়ের পর ষ্টার ছেড়ে দিয়েছেন। কর্তৃপক্ষ তাঁকে এনে ন্যাশনাল থিয়েটারের পুনরুজ্জীবনের শেষ চেষ্টা করেছিলেন এবং উনি এখানে যোগদান :রেছেন এই মর্মে ফেব্রুয়ারি মাসে শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে প্ল্যাকার্ডও পড়েছিল কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত তাঁদের নিরাশ ক'রে স্বয়ং বেঙ্গল মঞ্চ লিজ নিয়ে কয়েক মাস বাদে (১৭।৬।১৯১১) সেখানে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার খোলেন।

'বিল্বমঙ্গল', 'আলিবাবা', 'জনা'র মত পুরানো নাটক মালিককে পয়সা দিয়েছে। কারণ আর কিছুই নয়, উপযুক্ত নাটকের অভাব। অযোগ্য ব্যক্তিরা নাটকের নামে 'ছাই-ভস্ম' যা কিছু লিখতেন, অর্থ কিংবা তদ্বিরের জোরে তা-ই মঞ্চস্থ হত। ফলে, মিনার্ভা অথবা কোহিনূরে যখন দর্শকের স্থান সঙ্কুলান হয় না, প্রবেশমূল্য হ্রাস ক'রেও ন্যাশনালের প্রেক্ষাগৃহ তখন শূন্য। তাছাড়া, প্রতিপক্ষ শিবিরে যে সময় গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল ও অমরেন্দ্রনাথেব মত বহুদর্শী এবং দিকপাল অধ্যক্ষেব সমাবেশ সেক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় রঙ্গালয়কে টিঁকিয়ে বাখা সতীশচন্দ্র, জহরলাল বা বিহাবীলালেব 'কর্ম' ছিল না। সংক্ষেপে বলা চলে, উপযুক্ত নাটক ও যোগ্য কর্ণধাবেব অভাবেই ন্যাশনালেব পতন তরান্বিত হয়েছিল।

পরিশিষ্ট

ক. অভিনয়-তালিকা

অদৃষ্ট	রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৯।১২।১৯০৫
চাঁদের হাট		২৫।১২।১৯০৫
বিশ্বনাথ	—	১০।২।১৯০৬
প্যারী-রৌশন	বিহারীলাল দত্ত	৩১।৩।১৯০৬
তরুবালা	অমৃতলাল বসু	১৩।৪।১৯০৬
আলিবাবা	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	„
পৃথ্বীরাজ	মনোমোহন গোস্বামী	২২।৪।১৯০৬
বঙ্গবিক্রম	হরিসাধন মুখোপাধ্যায়	১৪।৭।১৯০৬
বিল্বমঙ্গল	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১।৮।১৯০৬
সংসার	মনোমোহন গোস্বামী	„
বঙ্গবিক্রম		৪।৮।১৯০৬
রিজিয়া	মনোমোহন রায়	৫।৮।১৯০৬
সীতার বনবাস	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৫।৮।১৯০৬
তরুবালা	অমৃতলাল বসু	„
কপালকুণ্ডলা	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৬।৮।১৯০৬
প্রভাস মিলন	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়	„
নল-দময়ন্তী	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৫।৯।১৯০৬
দুর্গাদাস	মনোমোহন গোস্বামী (?)	৮।১২।১৯০৬
সমাজ	মনোমোহন গোস্বামী	১১।৫।১৯০৭
মাল্‌কে-মক্‌বেল	—	৭।৭।১৯০৭
রহিম শা	মনোমোহন রায়	১১।৮।১৯০৭
ছত্রপতি শিবাজী	মনোমোহন গোস্বামী	২১।৯।১৯০৭
কপালকুণ্ডলা		৬।১০।১৯০৭
দেলেরা	ননীলাল সুর	৭।১২।১৯০৭
প্রেম প্রতিমা	ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়	২১।৩।১৯০৮
মেহেরারা	—	১৯।৯।১৯০৮

কল্যাণী	হরিপদ চট্টোপাধ্যায়	১৪।১১।১৯০৮
বিল্বমঙ্গল		১৬।১২।১৯০৮
জনা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২৬।১২।১৯০৮
ভারত গৌরব	—	১।৫।১৯০৯
শাহ সুজা	চুনিলাল দেব	২৫।৯।১৯০৯
মায়া	হরিসাধন মুখোপাধ্যায়	২৪।১২।১৯০৯
বনবালা	বিহারীলাল দত্ত	১৬।৭।১৯১০
বুদ্ধি কার	কেদারনাথ দাস	৬।৮।১৯১০
স্বর্ণ প্রতিমা	—	২৪।৯।১৯১০
তুলসীদাস	—	১৭।১২।১৯১০
কল্যাণী		২৯।১।১৯১১

খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায়

অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু), কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, চুনিলাল দেব, নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, মনোমোহন গোস্বামী, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বসু, অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অটলবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী, অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানদাসুন্দরী, হরিমতি, ভুবনসুন্দরী (মোহিনী ?), কুসুমকুমারী (বিষাদ), তারাসুন্দরী, বিনোদিনী (হাঁদি), মৃণালিনী (খাঁদি), নগেন্দ্রবালা দাসী (বুঁচি), সুকুমারী দত্ত, তিনকড়ি দাসী, সরোজিনী, কাননবালা দাসী, জ্ঞানদাসুন্দরী দাসী, হরিপ্রিয়া দাসী প্রভৃতি।

গ. বিজ্ঞাপন

Police Case ! Police Case ! ! Police Case ! ! !

MEDALOPHOBIA ! ! !

The fact of our gaining a medal in the Hooghly exhibition created such a heart-burning in the breast of the Minerva Theatre that she run to file a suit in the Police Court. But Mr. Kingsford, our worthy Presidency Magistrate, rejected the application with the following observation :—

The letters produced show that the medal was awarded to the National Company donot contradict the assertion of that company that the award was made on a comparison of the merits of both companies.

The defendent company has not gone beyond the limits of fair advertisement ; no criminal case is made out.

Sec : 203, C. P. C
(Sd) D. H. K
15-4-1907

[২০ এপ্রিল, ১৯০৭ তারিখের
'বেঙ্গলী' থেকে]

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার

(১৯১১)

বেঙ্গল মঞ্চে ন্যাশনাল থিয়েটারের পরমায়ু শেষ হল। এবার এলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। উনি তখন সদ্য ষ্টার ছেড়েছেন। ন্যাশনাল বন্ধ হওয়ার অব্যবহিত পরে কর্তৃপক্ষ ওঁকে এনে থিয়েটারটি পুনরায় চালু করার প্রয়াস পেয়েছিলেন এবং ওঁর যোগদানের সংবাদ বিজ্ঞাপন মারফৎ চারিদিকে প্রচার করাও হয়েছিল কিন্তু নানা কারণে শেষ পর্যন্ত তা আর ঘটে ওঠে নি। পক্ষান্তরে, কয়েকমাসের মধ্যে অমরেন্দ্রনাথ নিজেই লেসী ও ম্যানেজার হয়ে বেঙ্গল মঞ্চে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের পত্তন করলেন। ওঁর পুরানো সহযোগী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়েই দল গড়লেন উনি। বাইরে থেকে এলেন কেবল সুশীলাবালা। তিন হাজার টাকা বোনাস দিয়ে অমরেন্দ্রনাথ ওঁকে মিনার্ভা থেকে এনেছিলেন। এই উপলক্ষে থিয়েটার বাড়ীটির আমূল সংস্কার সাধন করা হয়। স্বত্বাধিকারী অনাথনাথ দেবের তাতে বহু অর্থ ব্যয় হয়েছিল, সন্দেহ নেই।

বেঙ্গল মঞ্চে গ্রেট ন্যাশনালের উদ্বোধনের তারিখ—১৯১১, ১৭ জুন।[১] ঐ দিন এখানে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত 'জীবনে মরণে' (গীতিনাট্য) ও 'আহা মরি' (প্রহসন) অভিনীত হল। নাটক দু'টির ভূমিকালিপি ছিল এইরকম :— 'জীবনে মরণে' ॥ সাহজেনান -অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, তাহের-সুশীলাবালা, রহমৎ আলি-অবিনাশ-

১ এই দিন মহেন্দ্রনাথ মিত্রের মালিকানায় অতুলকৃষ্ণ মিত্র বিরচিত 'রকম ফের' নাটক দিয়ে নবপর্য্যায়ে মিনার্ভার অভিনয় স্বরু হয়। গ্রেট ন্যাশনালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ঐ তারিখে গিরিশচন্দ্র জালিমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আলনাশা-কার্তিকচন্দ্র দে, মেসরু-গোপাল-দাস ভট্টাচার্য, জুলিয়া-বসন্তকুমারী, আমিনা-রানীসুন্দরী, রঙ্গিলা-চারুবালা। 'আহা মরি'॥ কামিনীবান্ধব-মনোমোহন গোস্বামী, হলধর-অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী, কেদার-ক্ষেত্রমোহন মিত্র, মোহিনা-বসন্তকুমারী, বিদ্যুৎবরণী-পুঁটুরানী, চমৎকার-ভূষণকুমারী, পদ্মমুখী-পান্নারানী, রোসি-কোহিনূরবালা। 'জীবনে মরণে' রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'দালিয়া'র নাট্যরূপ।[২] অভিনয় ভালই হয়েছিল। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বঙ্গবাসী' (২২।৭।১৯১১) লিখলে :—"নাট্যকবি শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এখন কলিকাতার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে। তিনি এ থিয়েটারের ম্যানেজার ও প্রোপ্রাইটার। তাঁহার উদ্যোগে, অর্থে, যত্নে, শ্রমে ও অধ্যবসায়ে এই থিয়েটারের নূতন সংগঠন হইয়াছে। এ সংগঠনে থিয়েটার নূতন জীবন পাইয়াছে।…

"আজ কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে "জীবনে মরণে" নামক একখানি নূতন নাটিকার অভিনয় হইতেছে। এ নাটিকাখানি অমরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক বিরচিত।…শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'দালিয়া' নামক একটি গল্প রচনা করেন। অমরেন্দ্রনাথের রচিত নাটিকার ভিত্তি রবীন্দ্রনাথের গল্পটী।…"

"আমরা জীবনে মরণে নাটিকার অভিনয় দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। নাটকে দুইটী মাত্র অঙ্ক আছে; কিন্তু এই দুইটী অঙ্ক ষড়রসে পূর্ণ। নাটিকার আদ্যন্তে প্রেম কাহিনী; কিন্তু পীড়িত পীড়ার ধক্‌ধকানি কট্‌কটানি নাই। প্রেম আছে, পঙ্কিলতা নাই। স্বয়ং

২ পরবর্তীকালে (১৯৩০) প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক মধু বসুর প্রযোজনায় 'দালিয়া'র সৌখীন নাট্যাভিনয় বিদগ্ধজনের প্রশংসা অর্জন করেছিল। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অমরেন্দ্রনাথ আরাকান সম্রাট সাজিয়া থাকেন। দালিয়ার পাগলামীতে যে প্রেমের বিকাশ, অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়ে তাহা অক্ষুণ্ণ। যিনি তাহের সাজিয়া থাকেন, তিনি একজন প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী। এমন অভিনয় পুরুষেও কি করিতে পারে? কি সুন্দর! কি স্বাভাবিক! রঙ্গিলা যে কি রঙ্গময়ী কি বলিব? সে রস রঙ্গময়ী স্বাভাবিক অভিনয়ের সাকার মূর্ত্তি! সে যেন চিরবসন্তের ফুর ফুরে মলয়ানীলে নিত্য নৃত্যময়ী। ধীবর, ধীবরপুত্র, আমিনা, জুলিয়া প্রভৃতি সকলের অভিনয় স্বাভাবিক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। বহুদিন এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় দেখি নাই এবং এমন আমোদ পাই নাই। প্রাসঙ্গিক নৃত্যগীত, হাস্যকৌতুক সবই মনোমদ মধুর। দৃশ্যপটাবলীও স্বাভাবিক সুন্দর।”

‘জীবনে মরণে’ উপভোগ্য হ’লেও ‘আহা মরি’ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচারের অভিযোগ উঠেছিল। ফলে, ২৪ জুন তারিখের অভিনয়ের পর ইংরেজ সরকারের নিষেধাজ্ঞায় প্রহসনটির প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। প্রসঙ্গতঃ, ‘নাট্যমন্দির’ মন্তব্য করলে ঃ—“আহা মরি, নিষিদ্ধ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে ‘আহা মরি’র প্রচার বন্ধ করিবার ঘোষণা করিয়াছেন। প্রকাশ, ‘আহা মরি’ নাকি কোন কোন বকধার্ম্মিকের মনে খোঁচা দিয়াছিল,—তাই তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া, ‘আহা মরি’ বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাদের ক্ষত মানের গোড়ায় ছাই চাপা দিয়াছেন।” ২৮ জুন নামলো ‘বিবাহ বিভ্রাট’। ১ জুলাই ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত প্রহসন ‘বেজায় রগড়’ খোলা হল। এতে রামকমল, পদ্মলাল, ষোড়শীকান্ত, জীবনধন ও মাতঙ্গিনী সাজলেন যথাক্রমে অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, কার্ত্তিকচন্দ্র দে, নীহারবালা এবং বসন্তকুমারী। গ্রেট ন্যাশনাল নবপর্য্যায়ে গিরিশচন্দ্রের ‘বলিদান’ মঞ্চস্থ করলে ৮ জুলাই তারিখে।[৩] বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিলেন ঃ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

৩ গ্রেট ন্যাশনালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মিনার্ভাও সেসময় ‘বলিদান’ নামায়। ১৫ জুলাই, ১৯১১ এই ‘বলিদান’ নাটকে করুণাময়ের ভূমিকায়

(করুণাময়), সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রূপচাঁদ), ক্ষেত্রমোহন মিত্র (মোহিত), সুশীলাবালা (জোবি), বসন্তকুমারী (সরস্বতী) প্রভৃতি। জোবির ভূমিকায় সুশীলাবালা তাঁর পূর্ব সুনাম বজায় রাখলেন। 'মেঘনাদবধ' (২৩।৭) অভিনয়ের পর ২৯ জুলাই গ্রেট ন্যাশনালে মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'বাজীরাও' নাটকের উদ্বোধন হল। নাটকখানি সেকালে দর্শকসমাজে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। অমরেন্দ্রনাথ, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, সুশীলাবালা ও বসন্তকুমারী যথাক্রমে বাজীরাও, রণজী, গৌতমা এবং মস্তানীর চরিত্রে পারদর্শিতা দেখান। এই সময়কাব গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের জনপ্রিয়তার উল্লেখ আছে ১৯ আগস্ট, ১৯১১ তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকায়'। পত্রিকাখানি লিখেছিল :—"Within the short time of its existence, Babu Amarendra Nath Dutt has succeeded in making his theatre an object of great attraction to the people of the Metropolis. The popularity of the Great National Theatre was fully in evidence by the patronage it received by the public both on Wednesday and Thursday last. On both the dates the house was packed to suffocation. Today will be staged the new drama Baji Rao, which has already made a sensation in the city." আর এই জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠে আকস্মিকভাবে অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটার বন্ধ ক'রে ছিলেন। 'কল্যাণী' (১০।৯) ও 'রাণা প্রতাপ' (২৮।১০) মঞ্চস্থ হওয়ার পর ৮ নভেম্বর সুশীলাবালাব 'বেনিফিট নাইট' উপলক্ষে 'বলিদান' এবং 'বিল্বমঙ্গল' বেঙ্গল মঞ্চে গ্রেট ন্যাশনালের শেষ অভিনয়।

অভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্র অসুস্থ হয়ে মঞ্চ থেকে বিদায় নেন এবং কয়েকমাস রোগভোগের পর ১৯১২, ৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রতিষ্ঠা যখন করায়ত্ত সেই সময়, অমরেন্দ্রনাথ হঠাৎ কেন চালু থিয়েটার তুলে দিলেন সে সম্পর্কে মন্তব্য করার আগে কিছুটা পিছনে ফিরে যাওয়া দরকার।

গ্রেট ন্যাশনালের জন্মের পূর্বে অমরেন্দ্রনাথ ষ্টারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৮-এব এপ্রিলে উনি সেখানে যোগ দেন। ষ্টারের এক চতুর্থাংশের মালিক ও প্রধান অভিনেতা অমৃতলাল মিত্র তখন মৃত্যুশয্যায়। অমরেন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা ও কর্মদক্ষতার উপর অমৃতলালের আস্থা ছিল। সেই কারণে, ওঁর মৃত্যুর পর ষ্টারের অস্তিত্ব ও সুনাম যাতে বজায় থাকে সেই উদ্দেশ্যে উনি অমরেন্দ্রনাথকে এই থিয়েটারের সঙ্গে স্থায়ীভাবে জড়িত রাখতে চেয়েছিলেন। অমৃত-লালের ইচ্ছা ছিল, তাঁর অবর্তমানে ষ্টারে তাঁর নিজস্ব এক চতুর্থাংশ মালিকানা যেন অমরেন্দ্রনাথকে দেওয়া হয়। অন্যান্য স্বত্বাধিকারীরা সেই সময় প্রস্তাবটি মেনে নেন। কিন্তু অমৃতলালের মৃত্যুর (২৭।৬। ১৯০৮) পর সেইসব অংশীদারদের এই ব্যাপারে টালবাহানা এবং প্রচ্ছন্ন অনিচ্ছা দেখে, বেশ কিছুকাল অপেক্ষা করার পর ১৯১১-র জানুয়ারিতে অমরেন্দ্রনাথ ষ্টারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন এবং এরই ফলে ও পরে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্ম হয়।

ইতিমধ্যে, উপযুক্ত কর্ণধারের অভাবে ষ্টারের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে গেছে। একসময় অবস্থা এতদূর শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায় যে, কর্তৃপক্ষ থিয়েটারের দরজা বন্ধ ক'রে দিতে বাধ্য হন। একদা, এক চতুর্থাংশ মালিকানা দিতে যাঁদের একান্ত অনিচ্ছা ছিল, ষ্টারের সেই সব স্বত্বাধিকারীরা অনন্যোপায় হয়ে এইসময় অমরেন্দ্রনাথের হাতেই রঙ্গালয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব তুলে দিতে চাইলেন।

সারা দেশজুড়ে তখন অভিনেতা হিসাবে অমরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা। গ্রেট ন্যাশনালের প্রতিটি অভিনয়ে যে কেবল 'হাউস ফুল' যায় তাই নয়-প্রেক্ষাগৃহ ক্ষুদ্র হওয়ায় প্রায় প্রতিদিনই বহু দর্শককে স্থানাভাবে

ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়।[৪] এই প্রস্তাবে তিনি ভাবলেন, গ্রেট ন্যাশনালে স্থানাভাব-সে তুলনায় ষ্টারের লোকধারণের ক্ষমতা অনেক বেশী। সেখানে গেলে অধিকসংখ্যক দর্শককে খুশী করা যাবে এবং তিনিও আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন। তাছাড়া, বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নাট্যশালাটিকে রক্ষার গৌরবও কম নয়।[৫] এইসব নানা বিষয় চিন্তা ক'রে অমরেন্দ্রনাথ "...তাঁহার নব-প্রতিষ্ঠিত থিয়েটার ছয়মাসও না চালাইয়া বন্ধ করিয়া দিয়া সদলবলে ষ্টারে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে এই বন্দোবস্ত হয় যে, ঐদিন হইতে অমরেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে ষ্টার পরিচালিত হইবে ; ভূতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারীগণের কোনও অধিকার বা হস্তক্ষেপ চলিবে না। তাঁহারা বাড়ীভাড়া স্বরূপ প্রতি রজনীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে শতকরা পঁচিশ টাকা কমিশন পাইবেন। বক্রী সমস্তের মালিক ও অধিকারী

---

৪ এইসময় মফস্বল-দর্শকদের সুবিধার জন্য অমরেন্দ্রনাথ সারারাত্রিব্যাপী অভিনয়ের আয়োজন করেন। মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে তখন রাত্রি একটা পর্যন্ত অভিনয়ের সময়-সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। আইন ভঙ্গ করার জন্য অমরেন্দ্রনাথ প্রতি রাত্রে পঁচিশ টাকা হিসাবে জরিমানা দিতেন।

প্রসঙ্গতঃ, অপরেশচন্দ্র যে মন্তব্য করেছেন তাতে শ্লেষে সুরটি সুস্পষ্ট। তিনি লিখেছেন :—"... তখনকার থিয়েটারে সন্ধ্যা হইতে জুড়িয়া প্রত্যুষ (?) বেলা আটটা পর্য্যন্ত কখনও অভিনয় হইত না। এ দীর্ঘরাত্রিব্যাপী অভিনয় আয়োজনের প্রবর্তক অমরবাবু।..." (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর)

৫ "গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে প্রত্যহ 'ফুল হাউস' বিক্রয় হইলেও, বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ তেরশ'ত টাকার বেশী উঠিত না ও প্রতি রজনীতে অসংখ্য দর্শককে স্থানাভাববশতঃ মনঃক্ষুণ্ণ অবস্থায় ফিরিতে হইত। ষ্টার থিয়েটারের মত বড় বাড়ীতে দর্শকের স্থানের অকুলান হইবে না। নিজেরও আয় বাড়িবে, দর্শকমণ্ডলীরও পরিতৃপ্তি হইবে, আবার ষ্টার থিয়েটারও রক্ষা পাইবে— এই ত্রিবিধ কারণে অমরেন্দ্রনাথ গ্রেট ন্যাশানাল ছাড়িয়া দিলেন।"

(রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ)

অমরেন্দ্রনাথ। এইরূপে অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটারের বার আনা অংশীদার হইলেন।"[৬] গ্রেট ন্যাশনাল উঠে গেল।

পূর্বেই বলা হয়েছে, লিজ নেওয়ার সময় অমরেন্দ্রনাথের অনুরোধে বেঙ্গল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী বহু অর্থ ব্যয়ে থিয়েটারবাড়ীর সংস্কার করিয়েছিলেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল, অমরেন্দ্রনাথ এখানে বেশ কিছুকাল স্থায়ী হবেন। কিন্তু সেই মনোবাসনা পূরণ না ক'রে হঠাৎ অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটার তুলে দেওয়ায় মঞ্চমালিক অনাথনাথ দেব অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয়ে ক্ষতিপূরণের দায়ে তাঁব বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অবশ্য, ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আর আদালত অবধি গড়ায় নি। আপোষে দু'পক্ষেব মধ্যে মিটমাট হয়ে যায়।

সে যাই হোক, গ্রেট ন্যাশনাল বন্ধ হয়ে যাওয়াব পব বেঙ্গল মঞ্চ বেশীদিন শূন্য পড়ে থাকে নি। অমবেন্দ্রনাথ চলে যেতে না যেতে মাসখানেকের মধ্যেই ওখানে আসব পাতলেন চুনিলাল দেব। জন্ম নিল — 'গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল থিয়েটার'।

৬ রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ—রমাপতি দত্ত

পরিশিষ্ট

ক. অভিনয়-তালিকা

জীবনে মরণে	রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া' অবলম্বনে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত নাট্যরূপ	১৭।৬।১৯১১
আহা মরি	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	”
বিবাহ বিভ্রাট	অমৃতলাল বসু	২৮।৬।১৯১১
বেজায় রগড়	ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১।৭।১৯১১
বলিদান	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৮।৭।১৯১১
মেঘনাদবধ	মধুসূদন দত্ত	২৩।৭।১৯১১
বাজী[illegible]	মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯।৭।১৯১১
কল্যাণী	হরিপদ চট্টোপাধ্যায়	১০।৯।১৯১১
রাণা প্রতাপ	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	২৮।১০।১৯১১
বলিদান		৮।১১।১৯১১
বিল্বমঙ্গল	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	”

খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায়

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কার্তিকচন্দ্র দে, গোপালদাস ভট্টাচার্য, মনোমোহন গোস্বামী, অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলাবালা, বসন্তকুমারী, রানীসুন্দরী, চারুবালা, পুঁটুরানী, ভূষণকুমারী, পান্নারানী, কোহিনূরবালা, নীহারবালা প্রভৃতি।

৯ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা

গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল থিয়েটার

(১৯১১-১৯১৪)

১৯১০, এপ্রিলে চুনিলাল দেব ন্যাশনাল ছেড়ে কোহিনূরে যান। ন্যাশনালের মত সেখানেও উনি নাট্যশিক্ষক ও অভিনেতারূপে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু কোহিনূরের সঙ্গে চুনিলালের সম্পর্ক কয়েকমাসের বেশী স্থায়ী হয় নি। ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসেই উনি কোহিনূর ছাড়েন। এরপর ১৯১১-র নভেম্বরে অমরেন্দ্রনাথ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার তুলে দিয়ে পুনরায় ষ্টারে অধিষ্ঠিত হ'লে চুনিলালকে আবার বেঙ্গল মঞ্চে দেখা গেল। এবার উনি স্বয়ং লেসী ও ম্যানেজার হয়ে এখানে আসর পাতলেন। জন্ম নিল—'গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল থিয়েটার'। পুরানো ন্যাশনালের নট-নটী নিয়েই অভিনয় সুরু করলেন চুনিলাল দেব।

৯ ডিসেম্বর, ১৯১১ 'রাজলক্ষ্মী' দিয়ে নতুন থিয়েটারের উদ্বোধন হল। ম্যাজিস্ট্রেট, নিশিকান্ত, গোপাল, মাতঙ্গিনী, রাজলক্ষ্মী ও সুরমা'র চরিত্রে রূপ দিলেন যথাক্রমে চুনিলাল, নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, পণ্ডিত অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী, লীলাবতী এবং হরিদাসী। পরদিন সম্প্রদায় মঞ্চস্থ করলে 'কল্যাণী' ও 'জেনানা যুদ্ধ'। ১৭ ডিসেম্বরের নাটক 'পৃথ্বীরাজ' এবং 'রিজিয়া'। প্রথমটিতে চুনিলাল তাঁর পুরানো ভূমিকা 'জয়চাঁদ' নিলেন। 'দেবীচৌধুরাণী', 'আবু হোসেন' ও 'হীরার ফুল' নামলো এই মাসেরই ২০ তারিখে। পূর্বোক্ত নট-নটী ছাড়া এই সময় গ্র্যাণ্ড ন্যাশনালের শিল্পী গোষ্ঠীতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :— ললিতমোহন পাল, গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমারী এবং কুসুম (বিষাদ)। ডিসেম্বরের ২৬, ২৭ এবং ২৮ যথাক্রমে 'তারাবাই', 'জনা' ও 'কপালকুণ্ডলা' অভিনীত হল।

১৩ জানুয়ারি, ১৯১২ 'রাজলক্ষ্মী' দেখে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লিখলে :—"Grand National Theatre.— The performance of the well-known play of Rajlakshmi on Saturday last was attended with marvellous success. Among others the part played by Surama engaged the rapt attention of the audience. Her unflinching devotion to the cause of heroine of drama left nothing to be desired. The victory of chastity and the dispension of justice by the Being on high, stand out prominent throughout every scene of the action and have been delineated with really perfect success. These do indeed strike the keynote of the play." (১৫।১।১৯১২) 'নূরনীহার' মঞ্চস্থ হল ১৭ জানুয়ারি। পুরানো হলেও অপেরাটি গ্র্যাণ্ড ন্যাশনালে অনেকদিন চলেছিল। ২৭ জানুয়ারি প্রবীণ অভিনেতা বরেন্দ্রনাথ দত্তের সাহায্য রজনী উপলক্ষে সম্প্রদায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে। অভিনয়সূচীতে ছিল :— ১। রাজলক্ষ্মী ২। অফিসার (প্যাণ্টোমাইম) এবং ৩। ইম্পিরিয়াল বায়স্কোপ। এই মাসেরই ২৮ তারিখে 'ভ্রমর', 'একাদশ বৃহস্পতি' ও 'বাহবা' অভিনয়ের পর গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল মফস্বলে যায়। কলকাতায় আবার ওঁদের নিয়মিত আসর বসে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে। তবে গিরিশচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ঐদিন কোনো অভিনয় হয় নি। ৩০ মার্চ ওঁরা রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বনবীর' খুললেন। আগের দিন 'অমৃতবাজার পত্রিকা' জানালে :—"Grand National Theatre.— We would draw the attention of the reader to the advertisement published elsewhere, from which it would appear that a new historical drama named "Banobir" by the late Poet Rajkrishna Roy,

is going to be staged on the boards of the National Theatre tomorrow (Saturday). It is hoped this new piece with the pantomime "Officer" following it, will draw a full house". (২৯।৩।১৯১২) এপ্রিল মাসেব শেষের দিকে হরিমতী, গুণদাসুন্দরী, বসন্তকুমারী এবং নগেন্দ্র-বালা (বুঁচি) এখানে যোগ দিলেন। এঁদের নিয়ে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল ৪ মে চুনিলাল দেবের লেখা 'গুলরু জেরিনা' মঞ্চস্থ করলে। এতে দুর্গাধিপের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন চুনিলাল দেব স্বয়ং। ১৯ মে'র নাটক ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রমোদ-রঞ্জন'। নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের 'বেনিফিট নাইটে' (২৫।৫) সম্প্রদায় 'গুলরু জেবিনা'র সঙ্গে গিবিশচন্দ্রের 'ব্রজবিহার' খুললে। ২৬ মে'র অভিনয়-তালিকায় ছিল ঃ—১। রাজলক্ষ্মী, ২। প্রমোদ-রঞ্জন এবং ৩। বুদ্ধি কার। দু'দিনেব প্রদর্শনীতেই দলের পৃষ্ঠপোষক পঞ্চকোট ও কাশীপুরের দুই মহারাজা উপস্থিত ছিলেন। জুন মাসের ৫ তাবিখে মঞ্চস্থ 'নল-দময়ন্তী'র ভূমিকালিপি ছিল এইরকম ঃ— নল-শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়,বিদূষক-কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দময়ন্তী-সোনামণি দাসী। ৮ জুন থেকে গ্র্যাণ্ড ন্যাশনালের কর্তৃপক্ষ দর্শকদের উপহাব দেওয়া সুরু করলেন। রাজকৃষ্ণ রায়ের 'নরমেধ যজ্ঞ' অভিনীত হল ১২ জুন। জুলাই মাসের গোড়ায় আশুতোষ পালিত (স্টেজ ম্যানেজার), নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু (নেপা বোস) ও মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু) যোগদান করায় সম্প্রদায়ের শক্তি বৃদ্ধি পেল। নৃপেন্দ্র-চন্দ্র এসে ৭ জুলাই 'আলিবাবা'য় আবদাল্লা সাজলেন। 'বলিদান' মঞ্চস্থ হওয়ার (২০।৭) পর এলেন কুসুমকুমারী। ১৭ আগস্ট নিযুক্ত হয়ে উনি শ্রীকৃষ্ণ (দোললীলা), জনা (জনা), মর্জিনা (আলিবাবা) প্রভৃতি ভূমিকায় দর্শকদের অভিবাদন করেন। মাসের শেষ তারিখে ঘটলো হরিসুন্দরীর (ব্ল্যাকী) আবির্ভাব। এরপর রীতিমত আকর্ষণীয় শিল্পী সমাবেশে ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১২ গ্র্যাণ্ড ন্যাশনালে

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'জয়দেব' নাটকের উদ্বোধন হয়। নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন চুনিলাল দেব। অন্যান্য যাঁরা বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:— নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু (দিগম্বর), মন্মথনাথ পাল (নিরঞ্জন), কুসুমকুমারী (রানী অরুণা) এবং হরিসুন্দরী (পাটনী)। 'জয়দেব' চুনিলালের শিল্পীজীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ১০ নভেম্বরের নাটক 'পাণ্ডব-গৌরব'। ভূমিকালিপি:— ভীম-চুনিলাল, দণ্ডী-মন্মথনাথ পাল, অর্জুন-শশিভূষণ, সুভদ্রা -কুসুমকুমারী এবং দ্রৌপদী-সোনামণি। ২১ ডিসেম্বর খোলা হল 'নবাবনন্দিনী'। নাটকখানি দামোদর মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে চুনিলাল দেবের লেখা। এতে মানসিংহ, জগৎসিংহ, সোলেমান, ওসমান, অভিরাম স্বামী, আয়েষা ও বিমলা সাজেন যথাক্রমে চুনিলাল, মন্মথনাথ পাল, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নিখিলেন্দ্র-কৃষ্ণ দেব, গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী, কুসুমকুমারী এবং সরোজিনী দাসী। 'নবাবনন্দিনী' প্রথমে মঞ্চস্থ হওয়ার কথা ছিল ১৪ ডিসেম্বর কিন্তু পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে নাটকের কিছু কিছু আপত্তিকর অংশ পরিবর্তনের জন্য উদ্বোধনের তারিখ পিছিয়ে যায়। প্রসঙ্গতঃ, 'অমৃত-বাজার পত্রিকা' (২১।১২।১৯১২) জানায়:—"The Grand National Theatre.— We have been requested to inform the public that the Grand National Theatre was unable to hold the performance of 'Nabab-Nandini' which was announced to take place on Saturday last as the Commissioner of Police sent for its manager and asked him to omit certain objectionable passages from the play. As it was impossible to omit those passages within so short a time, the manager was compelled to withhold the performance and hold that of 'Joydeb.' Now the manager has made

all preparations for holding the said performance of 'Nabab-Nandini' and the public are hereby informed that it is going to take place to-night." ১৯১২-র বড়-দিনের আকর্ষণ ছিল 'মানিকজোড়' (নক্সা)।

১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল দলবল নিয়ে পঞ্চ-কোটের রাজবাড়ীতে অভিনয় করতে যাওয়ায় বেঙ্গল মঞ্চে প্রদর্শনী কিছুদিন বন্ধ রইলো। ফিরে এসে ওঁরা খুললেন নতুন অপেরা— 'পার্বতী পরিণয়' (৮।৩)। এতে মদন সাজলেন কুসুমকুমারী। নারদ-হাঁদুবাবু আর মহাদেব-হরিদাস দেব। ১৬ মার্চ—'চৈতন্যলীলা'। সে রাত্রে কুসুমকুমারী নিমাই চরিত্রে রূপ দিলেন। গ্র্যাণ্ড ন্যাশনালে হরিশ্চন্দ্র সান্যাল বিরচিত 'ভীষ্ম'র উদ্বোধন হল ২৬ এপ্রিল তারিখে। ঐদিনকার 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় বেরুল :—"Grand National Theatre.— This popular Theatrical Company will stage for the first time to-night their new religious drama "Bhisma". It is expected that the scenic representations, music, acting etc., will all be in keeping with the sublimity of the character Bhisma —one of the Grandest, if not the grandest, of our Pouranic heroes. The same Company conclude their Sunday's programme with some choice shows of the Royal Bioscope Co." (২৬।৪।১৯১৩) এ-নাটকে পরশুরাম ও জীতাবতীর রূপসজ্জায় যথাক্রমে চুনিলাল ও কুসুমকুমারী অবতীর্ণ হতেন। ৩ মে 'আলুবক্‌রা' খোলা হয়। রঙ্গনাট্যটি চুনিলাল দেবের লেখা। 'নল-দময়ন্তী' নামলো ১৪ মে। প্রবোধচন্দ্র বসু'র ছিল নলে'র ভূমিকা। এই মে মাসেই কুসুমকুমারী গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল ছেড়ে ষ্টারে যোগ দিয়ে ১ জুন থেকে সেখানকার নিয়মিত শিল্পী পর্য্যায়ভুক্ত হন। ৫ জুলাই 'রূপ-সনাতন' মঞ্চস্থ হয়েছে। ২৩ জুলাই, ১৯১৩

অভিনীত হল ঃ—১। কপালকুণ্ডলা, ২। আবু হোসেন, ৩। তিনটি আপেল, ৪। চোরের উপর বাটপাড়ি এবং ৫। বায়স্কোপ। এরপর বেঙ্গল মঞ্চে বছর খানেক গ্র্যাণ্ড ন্যাশনালের অস্তিত্ব বজায় ছিল। 'ভিখারিণী' (সেপ্টেম্বর। ১৯১৩), 'বলিহারি' (বড়দিন। ১৯১৩), 'প্রেমের পাথার' (৩০।৩।১৯১৪), 'লালা গোলোকচাঁদ' (৩০।৭। ১৯১৪) প্রভৃতি অভিনয়ের পর ১৯১৪-র দ্বিতীয়ার্ধে গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল ষ্টারের সঙ্গে মিলিত অভিনয় সুরু করে। ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ ষ্টারে অমরেন্দ্রনাথের 'বেনিফিট নাইট' উপলক্ষে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল তাতে, গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল সম্প্রদায় অংশ নেয়। এর কিছুকাল পরে চুনিলাল দেব ও তাঁর অনুগত নট-নটীরা ষ্টারের নিয়ামত শিল্পী পর্য্যায়ভুক্ত হন।[১] গ্র্যাণ্ড ন্যাশনালের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়।

১ চুনিলাল ও তাঁর সহযোগী অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ১৭ জুলাই, ১৯১৫ তারিখে ষ্টারে যোগ দেন। (দ্র. রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ)

পরিশিষ্ট

ক. অভিনয়-তালিকা

রাজলক্ষ্মী	—	৯।১২।১৯১১
কল্যাণী	হরিপদ চট্টোপাধ্যায়	১০।১২।১৯১১
জেনানা যুদ্ধ	দীনবন্ধু মিত্র	„
পৃথ্বীরাজ	মনোমোহন গোস্বামী	১৭।১২।১৯১১
রিজিয়া	মনোমোহন রায়	„
দেবী চৌধুরাণী	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২০।১২।১৯১১
আবু হোসেন	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	„
হীরার ফুল	„	„
তারাবাই	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	২৬।১২।১৯১১
জনা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২৭।১২।১৯১১
কপালকুণ্ডলা	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৮।১২।১৯১১
নূরনীহার	—	১৭।১।১৯১২
রাজলক্ষ্মী		২৭।১।১৯১২
অফিসার (প্যাণ্টোমাইম)		„
ইম্পিরিয়াল বায়স্কোপ		„
ভ্রমর	বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসের অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত নাট্যরূপ	২৮।১।১৯১২
একাদশ বৃহস্পতি	নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন	„
বাহবা	চুনিলাল দেব	„
বনবীর	রাজকৃষ্ণ রায়	৩০।৩।১৯১২
গুলরু জেরিনা	চুনিলাল দেব	৪।৫।১৯১২
প্রমোদ-রঞ্জন	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	১৯।৫।১৯১২
গুলরু জেরিনা		২৫।৫।১৯১২
ব্রজবিহার	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	„
রাজলক্ষ্মী		২৬।৫।১৯১২

প্রমোদ-রঞ্জন		২৬।৫।১৯১২
বুদ্ধি কার	কেদারনাথ দাস	„
নল-দময়ন্তী	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৫।৬।১৯১২
নরমেধ যজ্ঞ	রাজকৃষ্ণ রায়	১২।৬।১৯১২
আলিবাবা	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	৭।৭।১৯১২
বলিদান	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২০।৭।১৯১২
জয়দেব	হরিপদ চট্টোপাধ্যায়	১৪।৯।১৯১২
পাণ্ডব-গৌরব	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১০।১১।১৯১২
নবাবনন্দিনী	দামোদর মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে চুনিলাল দেব কৃত নাটক	২১।১২।১৯১২
মানিকজোড় (নক্সা)	—	২৫।১২।১৯১২
পার্বতী পরিণয়	—	৮।৩।১৯১৩
চৈতন্যলীলা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৬।৩।১৯১৩
ভীষ্ম	হরিশ্চন্দ্র সান্যাল	২৬।৪।১৯১৩
আলুবকরা	চুনিলাল দেব	৩।৫।১৯১৩
নল-দময়ন্তী		১৪।৫।১৯১৩
রূপ-সনাতন	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৫।৭।১৯১৩
কপালকুণ্ডলা		২৩।৭।১৯১৩
আবু হোসেন		„
তিনটি আপেল	চুনিলাল দেব	„
চোরের উপর বাটপাড়ি	অমৃতলাল বসু	„
বায়স্কোপ		„
ভিখারিণী	অমলা দেবী	সেপ্টেম্বর, ১৯১৩
বলিহারি	—	বড়দিন, ১৯১৩
প্রেমের পাথার	নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন	৩০।৩।১৯১৪
লালা গোলোকচাঁদ	সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু	৩০।৭।১৯১৪

খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায়

চুনিলাল দেব, নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ললিতমোহন পাল, গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু (নেপা বোস), মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), হরিদাস দেব, প্রবোধচন্দ্র বসু, সরোজিনী, লীলাবতী, হরিদাসী, বসন্তকুমারী, কুসুমকুমারী (বিষাদ), সোনামণি, হরিমতি, গুণদাসুন্দরী, নগেন্দ্রবালা (বুঁচি), কুসুমকুমারী ও হরিসুন্দরী দাসী (ব্ল্যাকী)।

৯ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা

থেসপিয়ান টেম্পেল
(১৯১৫-১৯১৬)

গ্র্যাণ্ড ন্যাশনালের পর থেসপিয়ান টেম্পেলের জন্ম। এর প্রতিষ্ঠাতা ক্ষেত্রমোহন মিত্র। ১৯১৪-তে উনি অভিনেতা হিসাবে ষ্টারে নিযুক্ত ছিলেন। এই বছরের জুনের শেষে ওঁর সেখানকার চাকরী যায়। কয়েকমাস নিষ্কর্মা থাকার পর ক্ষেত্রমোহন নিজে লেসী ও ম্যানেজার হয়ে বেঙ্গল মঞ্চে 'থেসপিয়ান টেম্পেল' খোলেন। নতুন থিয়েটারের সঙ্গে তিনকড়ি দাসীও যুক্ত হন। তবে, তিনি কেবলমাত্র অভিনেত্রী হিসাবেই জড়িত ছিলেন। তাও, অল্প কিছুদিনের জন্য।

১৯১৫, ৭ আগস্ট হরিসাধন মুখোপাধ্যায় রচিত 'নূরমহল' দিয়ে থেসপিয়ান টেম্পেলের উদ্বোধন হল।[১] সেলিম সাজলেন ক্ষেত্রমোহন স্বয়ং। তিনকড়ি হলেন যোধাবাই। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বেঙ্গলী' লিখলে :—"The Historical drama "Nurı ıhal" with which the Temple was opened on Saturday night was an unqualified success, if the enthusiastic cheers of the audience at the close of the play are any criterion. There can be no doubt that the management by their efforts at securing first class talent and suitable stage-gear regardless of expense fully

১ এই তারিখেই কোহিনূর মঞ্চে মনোমোহন পাঁড়ের স্বত্বাধিকারীত্বে এক নতুন 'থিয়েটারের' প্রতিষ্ঠা হয়। স্বরুতে রঙ্গালয়ের নাম ছিল 'মিনার্ভা'। পরে, আদালতের নিষেধাজ্ঞায় নাট্যশালা 'মনোমোহন থিয়েটার' নাম ধারণ করে।

deserved success. The role of Prince Salim was rendered with grace and ease by Babu Kshetra Mohon Mitra, the energetic manager. The part of Salima found a brilliant exponent. The scenic views were all new and good; particularly noticeable among them being the pond in the interior of the Palace. The Temple has made a promising start." (১০।৮।১৯১৫) কিছুদিন পরে তিনকড়ি দাসী এখান থেকে চলে গিয়ে মনোমোহনে যোগ দেন।[২] ১৮ সেপ্টেম্বর সম্প্রদায় 'ঈস্টলিন' (হেনরি উড) অবলম্বনে রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত নাটক 'রমা' খুললে। নামভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন ভূষণকুমারী। মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু) আলাউদ্দীন চরিত্রে রূপ দিলেন। এই নাটকে সেনাপতির চরিত্রে পরবর্তীকালের কৃতী নট ও নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী দর্শকদের প্রথম অভিবাদন করেন। নারায়ণ বসু'র 'হামির' নাটকের উদ্বোধন হল ১৮ ডিসেম্বর তারিখে। ঐদিনকার 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' পত্রিকায় বেরুল :—

".... a new historical drama entitled "Hamir" will be, for the first time, put on the boards of this popular place of amusement to-night. The author is well known as a dramatic writer, and the new production of his is expected to give a good account of itself. The piece is full of sweet songs and thrilling incidents and the theatre-going public who have so long eagerly looked forward to it, will, it is anticipated, enjoy immensely, the performance of this dramatic production." সমালোচকের ভবিষ্যদ্বাণী সফল ক'রে নাটকখানি

২ মনোমোহনে গিয়ে তিনকড়ি ১১ ডিসেম্বর, ১৯১৫ 'বাদশাহজাদী' নাটকে হামিদা সাজেন।

জনপ্রিয় হয়েছিল। 'হামির' খোলার পরের দিন 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'জয়দেব' এবং 'চোরের উপর বাটপাড়ি' মঞ্চস্থ করা হল। ২৪ ডিসেম্বরের অভিনয়-তালিকা ছিল এই রকম:— ১। নূরমহল, ২। পলাশীর যুদ্ধ, ৩। আলিবাবা ও ৪। বায়স্কোপ। পরদিন, বড়দিনের আকর্ষণ হিসাবে 'হামির' এবং 'জয়দেব' নাটকের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ সত্যচরণ চক্রবর্তী বিরচিত 'গ্রেপ্তার' নামে এক নক্সা খুললেন। 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' জানালে:— "....Excellent arrangements have been made at this popular place of amusement for entertaining the playgoing public during the X'mas holidays. The arrangements for the X'mas night surpasses everything else, as besides that sweet and eventful new historical drama "Hamir," there will be put on the boards "Grepter", a new pantomime by Babu Satya Charan Chakarbutty. In speaking of "Hamir," it is sufficient to say that those who did not witness it on Saturday last missed a great treat. The performance of the pa. of Annada, Hamir's five year old son, by that little girl Luxmi is unrivalled." (২৪।১২।১৯১৫) ২৬ তারিখের অভিনয়সূচী:— ১। চাঁদবিবি, ২। রানী দুর্গাবতী, ৩। আবু হোসেন ও ৪। বায়স্কোপ। ২৯ ডিসেম্বর থেসপিয়ান টেম্পেল মঞ্চস্থ করলে:— ১। জয়দেব॥ জয়দেব-রামকালী বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মণ সেন-ক্ষেত্রমোহন মিত্র, অরুণা-সুবর্ণলতা এবং বিমলা-ভূষণকুমারী। ২। পলাশীর যুদ্ধ॥ সিরাজ-ক্ষেত্রমোহন মিত্র ও ক্লাইভ জনৈক বিশিষ্ট অপেশাদার অভিনেতা। ৩। আবু হোসেন॥ খলিফা-ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় এবং বেগম-সুবর্ণলতা ও ৪। বায়স্কোপ। এইভাবে ১৯১৫ সাল শেষ হল।

১৯১৬-র প্রথম দিনটি থেসপিয়ান টেম্পেলের পক্ষে শুভ সূচনা বলা চলে না। পূর্ব ঘোষণা সত্বেও ঐদিন নারায়ণ বসুর 'হামির' অভিনয় করা সম্ভব হয় নি। কেননা, আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়েই সম্প্রদায় তাড়াতাড়ি নাটকখানি খুলেছিল। ফলে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের আপত্তিতে ১ জানুয়ারিব অভিনয় বাতিল হয়ে যায়। পরে, অবশ্য দু'পক্ষের মধ্যে আপোষে মীমাংসা হয়ে গিয়েছিল। মিটমাটেব পর ৮ জানুয়ারি থেকে পুনরায় 'হামির' মঞ্চস্থ হ'তে রইলো। ঐদিন কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' এবং 'উভয় সঙ্কট'ও (রামনারায়ণ তর্করত্ন) নামিয়েছিলেন। 'জয়দেব', 'রানী দুর্গাবতী' আর 'চোরের উপর বাটপাড়ি'র অভিনয় হল পরের দিন অর্থাৎ ৯ জানুয়ারি। এসব খবর জানিয়ে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' (৮।১।১৯১৬) লিখলে ঃ— "Owing to some misapprehension on the part of the managing body of this theatre that new and enchanting drama of Dr. Bose's "Hamir", was staged on X'mas Day before formal sanction had been obtained for the performance thereof from the authorities and the performance of the play had consequently to be abandoned on Saturday last. The sanction has since been obtained and to make amends for last Saturday's disappointment the manager of this theatre has reduced the rate of admission to one half. Besides "Hamir", there have been carded for to-night that excellent drama "Raja-O-Rani" by Sir Rabindra Nath Tagore as well as "Ubhoy Sankat". On Sunday night they present that ever-green religious drama "Joydev" besides "Rani Durgabati" and

"Chorer Upar Batpari". কেবল এইদিন নয়, এরপর থেকে থেসপিয়ান টেম্পেলের সমস্ত অভিনয়ই অর্দ্ধমূল্যে দেখানো হ'তে থাকে। ১২ জানুয়ারির অভিনয়-তালিকা :— ১। দুর্গেশনন্দিনী, ২। পলাশীর যুদ্ধ, ৩। আবু হোসেন, ৪। চোরের উপর বাটপাড়ি, ও ৫। উভয় সঙ্কট। ১৫ ও ১৬ জানুয়ারি অভিনীত নাটকাবলী :— ১। হামির ও ২। চাঁদ বিবি এবং ১। জয়দেব, ২। রাজা ও রানী এবং ৩। আলাদিন। ৫ ফেব্রুয়ারি পুরানো নাটক 'বিষ-বৃক্ষে'র সঙ্গে নতুন প্রহসন 'মুখে মধু' (নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) খোলা হল। পরদিন ১। জয়দেব, ২। বিল্বমঙ্গল ও ৩। পলাশীর যুদ্ধ তৎসহ বায়স্কোপ। 'হামির' নাটকে জাল মেহতা সাজতেন ক্ষেত্রমোহন মিত্র। 'বিষবৃক্ষ'তে দেবেন্দ্র হতেন পূর্ণচন্দ্র ঘোষ এবং নগেন্দ্র-ক্ষেত্রমোহন। রামকালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'জয়দেব' আর 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের নামভূমিকায় দেখা যেত। 'পলাশীর যুদ্ধ'তে সিরাজের ভূমিকা ছিল ক্ষেত্রমোহনের। 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' জানালে :— "···Besides "Hamir" the new drama, Bankim Chandra's master piece "Bish-Briksha" and a new farce "Mukhay Madhu" by Babu Nirmal Chunder Chatterjee will be staged t. night. The attraction ought to be all the greater, as Mr. Purna Chunder Ghose, that veteran actor, will appear in the role of Dabendranath. As regards "Hamir", it is needless to say that it is getting more and more popular everyday, and the play-going public are ever ready to muster strong whenever it holds the boards. The new farce "Muk. ay Madhu" is another attraction.

To-morrow night the ever popular and religious

dramas "Joydeb" and 'Billomangal" besides Nabin Chunder's "Battle of Plassey" and a marvellous display of Bioscopic films form no less an attraction to the lover of dramatic art." (৫।২।১৯১৬) ২০ ফেব্রুয়ারি সাহায্য রজনীতে সম্প্রদায় ১। ভায়োলিনবাদন, ২। জয়দেব, ৩। বিষাদ, ৪। মেঘনাদবধ ও ৫। বায়স্কোপ পরিবেশন করলে। ৪ মার্চ 'ভোজবাজী' নামে এক নতুন নাটকের উদ্বোধন, সেইসঙ্গে 'হামির' ও 'বিষাদ' অভিনয় হল। পরদিন নামলো ১। জয়দেব, ২। দক্ষযজ্ঞ, ৩। আলিবাবা এবং ৪। মুখে মধু। ১৫ মার্চের অনুষ্ঠানসূচী :— ১। ভ্রমর, ২। বিল্বমঙ্গল, ৩। আবু হোসেন ও ৪। চোরের উপর বাটপাড়ি। এই সময় শিল্পীগোষ্ঠীতে ছিলেন হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী), ভূষণকুমারী, হরিমতি (ছোট), স্বুবর্ণলতা, ক্ষেত্রমোহন মিত্র প্রভৃতি। কর্তৃত্ব যথারীতি ক্ষেত্রমোহনের হাতে এবং অর্দ্ধমূল্যেই অভিনয় দেখানো হ'তে থাকে। এপ্রিলের প্রথম দিনে 'নূরমহল' এবং ১৫ তারিখে 'বাজীরাও' ও 'হামির' মঞ্চস্থ হল। 'বাজীরাও'তে রণজীরূপে ক্ষেত্রমোহন এবং নামভূমিকায় দীনবন্ধু মিত্র নামে জনৈক এ্যামেচার অভিনেতা অবতীর্ণ হলেন। পরদিন নামলো 'চাঁদবিবি' ও 'জয়দেব'। এরপর আর থেসপিয়ান টেম্পেলের অভিনয় সংবাদ পাওয়া যায় নি। ২১ এপ্রিল, ১৯১৬ তারিখের প্রদর্শনীর পর থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। ক্ষেত্রমোহন ষ্টারে যোগ দেন।

পরিশিষ্ট

ক. অভিনয়-তালিকা

নূরমহল	হরিসাধন মুখোপাধ্যায়	৭।৮।১৯১৫
রমা	রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮।৯।১৯১৫
হামির	নারায়ণ বসু	১৮।১২।১৯১৫
পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৯।১২।১৯১৫
জয়দেব	হরিপদ চট্টোপাধ্যায়	"
চোরের উপর বাটপাড়ি	অমৃতলাল বসু	"
নূরমহল		২৪।১২।১৯১৫
পলাশীর যুদ্ধ	নবীনচন্দ্র সেন	"
আলিবাবা	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	"
বায়স্কোপ		"
হামির		২৫।১২।১৯১৫
জয়দেব		"
গ্রেপ্তার	সত্যচরণ চক্রবর্তী	"
চাঁদবিবি	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	২৬।১২।১৯১৫
রানী দুর্গাবতী	হরিপদ মুখোপাধ্যায	"
আবু হোসেন	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	"
বায়স্কোপ		"
জয়দেব		২৯।১২।১৯১৫
পলাশীর যুদ্ধ		"
আবু হোসেন		"
বায়স্কোপ		"
হামির		৮।১।১৯১৬
রাজা ও রানী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	"
উভয় সঙ্কট	রামনারায়ণ ত., বস্থ	"
জয়দেব		৯।১।১৯১৬
রানী দুর্গাবতী		"

চোরের উপর বাটপাড়ি		৯।১।১৯১৬
দুর্গেশনন্দিনী	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১২।১।১৯১৬
পলাশীর যুদ্ধ		”
আবু হোসেন		”
চোরের উপর বাটপাড়ি		”
উভয় সঙ্কট		”
হামির		১৫।১।১৯১৬
চাঁদবিবি		”
জয়দেব		১৬।১।১৯১৬
রাজা ও রানী		”
আলাদিন	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	”
বিষবৃক্ষ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫।২।১৯১৬
মুখে মধু	নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	”
জয়দেব		৬।২।১৯১৬
বিল্বমঙ্গল	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	”
পলাশীর যুদ্ধ		”
বায়স্কোপ		”
জয়দেব		২০।২।১৯১৬
বিষাদ	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	”
মেঘনাদবধ	মধুসূদন দত্ত	”
বায়স্কোপ		”
ভায়োলিনবাদন		”
ভোজবাজী		৪।৩।১৯১৬
হামির		”
বিষাদ		”
জয়দেব		৫।৩।১৯১৬
দক্ষযজ্ঞ	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	”
আলিবাবা	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	”
মুখে মধু		”

ভ্রমর	বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস অবলম্বনে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত নাটক	১৫।৩।১৯১৬
বিল্বমঙ্গল		"
আবু হোসেন		"
চোরের উপর বাটপাড়ি		"
নূরমহল		১।৪।১৯১৬
বাজীরাও	মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫।৪।১৯১৬
হামির		"
চাঁদবিবি		১৬।৪।১৯১৬
জয়দেব		"

খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায়

ক্ষেত্রমোহন মিত্র, মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু), যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, রামকালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র (এ্যামেচার), তিনকড়ি দাসী, ভূষণকুমারী, স্বর্ণলতা, হরিসুন্দরী (ব্ল্যাক্‌া) ও হরিমতি (ছোট)।

প্রেসিডেন্সি থিয়েটার

(১৯১৭-১৯১৮)

থেসপিয়ান টেম্পেলের বিলুপ্তির পর বেঙ্গল মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত হল প্রেসিডেন্সি থিয়েটার। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে এই প্রেসিডেন্সি থিয়েটারই প্রথম লিমিটেড কোম্পানী। পি. সি. চ্যাটার্জী সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন। নতুনদের নিয়ে দল গড়লেন কর্তৃপক্ষ। সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'বাঙ্গালী পলটন' এবং 'নিশার স্বপন' (শেক্‌স্‌পিয়রের 'A Midsummer Night's Dream') দিয়ে প্রেসিডেন্সি থিয়েটারের উদ্বোধন হল। তারিখ— ১৩ অক্টোবর, ১৯১৭। অভিনয় দেখে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' লিখলে ঃ— "Presidency Theatre Limited. The above Company opened their business on Saturday last, with an opera, entitled "Nisar Swapan", adapted from Shakespeare's "A Midsummer Night's Dream", and a sensational and timely piece, "Bengalee Paltan". The scenes and the variation of light in accordance with scientific principles were simply charming. The idea is grand, no doubt, and the Company have spared neither money nor trouble to make the performance perfect. The staff of the Company, though almost all new in this line, acquitted themselves well. The timely and novel piece, "Bengalee Paltan" was represented very well. The roles of Mr. S. N. Banerjee and Dr. S. K. Mullick were represented

very well. The main features of the play, were Kebla and his mother. They had a full house in Saturday. Another feature of the Company is their business-like methods. We wish them every success in their venture." (১৮।১০।১৯১৭) ২১ অক্টোবর অভিনীত হল 'প্রফুল্ল', সঙ্গে বায়স্কোপ। ২৮ অক্টোবর 'প্রফুল্ল' ও 'রাজা বাহাদুর' নামলো। যোগেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন ভুবনেশ মুস্তফী[১]। নভেম্বর মাসের তিন তারিখে সম্প্রদায় 'বাবর শাহ' নামে এক নতুন ঐতিহাসিক নাটক খুললে। চমক সৃষ্টির জন্য রৌশন বেগমের ভূমিকায় জনৈকা বিদেশিনী সুন্দরী Rosy-কে নামানো হল। এই সময় থিয়েটার ছাড়া অন্যদিনগুলিতে এখানে Presidency Bioscope নাম দিয়ে ছবি দেখানো হত। ২৫ নভেম্বরের নাটক রাজকৃষ্ণ রায়ের 'মীরাবাই' এবং অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'শ্রীকৃষ্ণ'। 'হাসনুহানা'র উদ্বোধন হল ৮ ডিসেম্বর। নাটকখানি বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের লেখা। ১৫ ডিসেম্বরের অভিনয়ে কর্তৃপক্ষ 'হাসনুহানা'র সঙ্গে 'কুব্জ ও দরজী' জুড়ে দিলেন। বছরের শেষে 'মোহমুক্তি' (২২।১২) নামে এক পৌরাণিক নাটক খুলে প্রেসিডেন্সি সম্প্রদায় আসর জমাবার চেষ্টা করলে কিন্তু থিয়েটার চললো না।

এরপর কিছুদিন বেঙ্গল মঞ্চে বায়স্কোপ দেখানো হ'তে থাকে। অবশেষে, ১৯১৮ সালের ৩০ মার্চ থেকে আবার অভিনয় সুরু করলেন থিয়েটার কর্তৃপক্ষ। এইদিন 'কর্মবীর' (রণেন্দ্রনাথ গুপ্ত) সাথে 'হিরণ্ময়ী' ও 'দোললীলা' মঞ্চস্থ হয়। পরের দিন সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ধর্মপথ' অভিনীত হয়েছে, সেই সঙ্গে 'সরলা'। প্রেসিডেন্সি থিয়েটারের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদে তখন জনৈক কে. রায়। ৬ এপ্রিল তারিখের অভিনয়সূচী :—১। কর্মবীর॥

১ অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর কনিষ্ঠ পুত্র।

পরশুরাম-তারক পালিত (এ্যামেচার) ও রানী-গোলাপসুন্দরী এবং ২। জয়দেব॥ পরাশর-অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিমলা-গোলাপসুন্দরী এবং অর্পণা—চারুশীলা। ৭ এপ্রিল পরিবেশিত হল :—১। ধর্মপথ॥ অনাথকুমার-সন্তোষকুমারী (তেলেনা), ২। সরলা॥ গদাধর-ভুবনেশ মুস্তফী এবং ৩। হাটে-হাটে (হাতে হাতে?)। এরপর প্রেসিডেন্সি থিয়েটারের কোনো অভিনয়-সংবাদ পাওয়া যায় নি। ১৯১৮-র জুলাইয়ের গোড়া থেকে Palladium Cinema নামে একটি প্রতিষ্ঠান এই মঞ্চে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী সুরু করে। পরবর্তীকালে এখানে মঞ্চের বিলুপ্তি ঘটিয়ে স্থায়ীভাবে ডাকঘরের প্রতিষ্ঠা হয়। শোনা যায়, প্রেসিডেন্সি থিয়েটারের পতন এবং ডাকঘর প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৯৩-১৯৫০) এখানে কিছুকালের জন্য 'জর্জ থিয়েটার' নামে এক নাট্য সম্প্রদায়ের পত্তন করেন। সত্যেন্দ্রনাথ নিজেও একজন অভিনেতা ছিলেন এবং বেঙ্গল মঞ্চে তাঁর উদ্যোগে জর্জ থিয়েটারের পতাকাতলে স্বল্পমূল্যে জনপ্রিয় নাটকগুলির পুনরভিনয় হয়।[২]

২ অমরেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র হরীন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের এই তথ্য জানিয়েছেন।

পরিশিষ্ট

ক. অভিনয়-তালিকা

বাঙ্গালী পলটন	সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৩।১০।১৯১৭
নিশার স্বপন	"	"
প্রফুল্ল	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২১।১০।১৯১৭
বায়স্কোপ		"
প্রফুল্ল		২৮।১০।১৯১৭
রাজা বাহাদুর	অমৃতলাল বসু	"
বাবর শাহ	—	৩।১১।১৯১৭
মীরাবাঈ	রাজকৃষ্ণ রায়	২৫।১১।১৯১৭
শ্রীকৃষ্ণ	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	"
হাসনুহানা	বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত	৮।১২।১৯১৭
হাসনুহানা		১৫।১২।১৯১৭
কুব্জ ও দরজী	চুনিলাল দেব	"
মোহমুক্তি	—	২২।১২।১৯১৭
কর্মবীর	রণেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৩০।৩।১৯১৮
হিরণ্ময়ী	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	"
দোললীলা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	"
ধর্মপথ	সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায	৩১।৩।১৯১৮
সরলা	তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণ তা' অবলম্বনে অমৃতলাল বসু কৃত নাটক	"
কর্মবীর		৬।৪।১৯১৮
জয়দেব	হরিপদ চট্টোপাধ্যায	"
ধর্মপথ		৭।৪।১৯১৮
সরলা		"
হাটে-হাটে (হাতে হাতে ?)		"

খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায়

ভুবনেশ মুস্তফী, তারক পালিত (এ্যামেচার), অবিনাশ চট্টোপাধ্যায, রোজি, গোলাপসুন্দরী, চারুশীলা, সন্তোষকুমারী (তেলেনা) প্রভৃতি।

৬ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার

(১৮৭৩— ?)

১৮৭২, ৭ ডিসেম্বর জোড়াসাঁকোর সান্যাল বাড়ীতে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের মাধ্যমে বাংলা দেশে সাধাবণ রঙ্গালয়ের সূত্রপাত। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, অবিনাশচন্দ্র কর, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), ধর্মদাস সুর, অমৃতলাল বসু প্রভৃতিকে নিয়ে গড়া সেদিনের 'ন্যাশনাল থিয়েটাব' কিন্তু পরের বছর মার্চ মাসে দলাদলিব ফলে ভেঙ্গে 'হিন্দু ন্যাশনাল' এবং 'ন্যাশনাল' নামে দু'টি পৃথক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।[১] আলাদা আলাদা ভাবে এঁরা যখন কলকাতা এবং মফস্বলের বিভিন্ন জায়গায় অভিনয় ক'রে বেড়াচ্ছেন সেই সময়, ১৮৭৩ সালের ১৬ আগস্ট বর্তমান বিডন স্ট্রীট ডাকঘরের জায়গায় বাংলাদেশেব প্রথম স্থায়ী নাট্যশালা বেঙ্গল থিয়েটারের জন্ম। আব এই বেঙ্গল থিয়েটারে 'মোহান্তের এই কি কাজ' নাটকের অসম্ভব জনপ্রিয়তা দেখে মূল ন্যাশনাল দলের কয়েকজন কর্মী একটি স্থায়ী রঙ্গালয় নির্মাণে ব্রতী হন।[২]

---

১ 'হিন্দু ন্যাশনাল' দলে ছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। আর, 'ন্যাশনাল' দলের অন্তর্ভুক্ত হন গিরিশচন্দ্র, ধর্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, গোপালচন্দ্র দাস, শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

গিরিশচন্দ্ররা স্টেজ ও সিন্ পেয়ে টাউন হলে অভিনয়ের পর রাজা রাধাকান্ত দেবের নাট মন্দিরে কিছুদিন অভিনয় করেন। এবং 'হিন্দু ন্যাশনাল' থিয়েটার এ সময় লিণ্ডসে স্ট্রীটে অপেরা হাউসে আশ্রয় নেয়।

২ পরবর্তীকালে অর্দ্ধেন্দুশেখর তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন :— "বেঙ্গল

ভুবনমোহন নিয়োগী ছিলেন উত্তর কলকাতার বিখ্যাত ধনী রসিকচন্দ্র নিয়োগীর পৌত্র। বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিকল্পে এঁর অধ্যবসায় এবং ত্যাগ স্মরণীয় হয়ে আছে।[৩] জোড়াসাঁকোর সান্যাল বাড়ীতে পাবলিক থিয়েটারের

থিয়েটারে 'উঃ মোহান্তের এই কি কাজ' নামে নাটক খুব জোরে চলছিল। একদিন রাত্রিতে ধর্ম্মদাসবাবু আর ভুবনবাবু ঐ নাটক দেখতে আসেন। সেদিন এত বিক্রী হয়েছিল যে ৪৲ টাকার টিকিট ৮৲ টাকা দিয়ে কিনতে গিয়েও ওঁরা পান নি। পথে এঁদের সঙ্গে নগেন্দ্রবাবুও মিলিত হন। সেই বিক্রয়ের অবস্থা দেখে বেঙ্গল থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়ে তিনজনে একটা থিয়েটার হাউস করবার পরামর্শ করেন। ভুবনবাবু তখন নাবালক, তবুও তিনিই অর্থ সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হন।" (পঞ্চপুষ্প— আষাঢ়, ১৩৩৭)

বিনোদিনী দাসী রচিত স্মৃতিকথায় এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত মান-অপমানের উল্লেখ আছে। তিনি জানিয়েছেন :— "একদিন ভুবনবাবু ও ধর্ম্মদাসবাবু বেঙ্গল থিয়েটার দেখতে যান ; বোধহয় "পাশ" নিয়েই যান, কিম্বা এই রকম একটা কিছু, জানাশুনা ছিল, বন্ধুভাবেই গিয়ে থাকবেন, ভেতরে গ্রীণরুমের মধ্যেও যান। বেঙ্গল থিয়েটারে তখনকার কর্ত্তৃপক্ষগণ কিন্তু, কি কারণে ঠিক জানি না ওঁদের ভিতরে যাওয়াটা পছন্দ করেন না। একটু বচসাও হয়। এই মনোমালিন্য হ'তেই গ্রেট্ ন্যাশনালের উৎপত্তি। ভুবনবাবু ধনবান ছিলেন ; তিনি নীরবে এ অপমান সহ্য করতে পাল্লেন না, ধর্ম্মদাসবাবুর সাহায্যে তিনি বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে থিয়েটার করলেন।" (আমার কথা)

৩ ভুবনমোহন নিয়োগীর মৃত্যুতে জনৈক নাট্যামোদী লেখেন :— "Bhubon Mohun Neogi, late proprietor of Great National Theatre died at the age of 70 years on the 8th May 1927. In the early seventies of the last century, Bhubon Mohun was the "observed of all observers—the glass of fashion, the mould of form." In the latter part of his life he fell on "evil days and evil tongues." But his power of adaptibility was excellent. When his purse was empty, his old friends bade Adieu to him, he unlike Timon of Athens took to

পত্তন অংশতঃ এঁরই উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে সম্ভব হয়েছিল। স্থায়ী নাট্যশালা স্থাপনের ক্ষেত্রেও ইনি অগ্রণী হন। ভুবনমোহন টাকা দিলেন, দল বাইরে অভিনয় ক'রেও কিছু অর্থ ঘরে আনলো। ধর্মদাস সুর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি অসীম উৎসাহে কাজে নেমে পড়লেন। ৬ নম্বর বিডন স্ট্রীটে (এখন যেখানে মিনার্ভা) সিমলানিবাসী মহেন্দ্র দাসের জমি মাসিক চল্লিশ টাকা ভাড়ায় পাঁচ বৎসরের জন্য লিজ নিয়ে ১৮৭৩ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' নামাঙ্কিত নতুন নাট্যশালার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হল। এই অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়ে 'ইংলিশম্যান' (৩।১০।১৮৭৩) লিখলে :—

"The National Theatre.—The ceremony of laying the foundation-stone of the "Great National Theatre" was held on Monday at half-past four in the afternoon. The spot was well filled with a large number of educated natives. Before the commencement of the ceremony, a European band, with flags bearing the inscription, "The laying of the foundation-stone of the Great National Theatre", etc., came to the spot, playing along Beadon Street, which

daily bath in the Ganges and to devotion to Radha Krishna —the ideal of his life. His days passed sweetly and swiftly away. Proprietor of Modern Theatres donot know what service did Bhubon Mohun towards making public Bengalee stage in Bengal....He was a distinguished litigant and his name appears in Calcutta series of Indian Law Reports. May his ashes rest in peace !" (অমৃতবাজার পত্রিকা—১০।৭।১৯২৭)

served to attract the attention of the passers-by, and drew them in crowds to the place. The business of the day opened with hymns, after which two of the members of the Theatrical Company cited, in a very eloquent and impressive manner, a Sanskrit passage, containing an account of almost all the great men and women of the Indian past, and lamented deeply the wretched condition of her present sons. Then Babu Nobo Gopal Mitra, the Editor of the National Paper, who was elected to preside on the occasion, stood up and addressed the meeting in able speech, congratulating the members on the great success which, after a year's trouble, they had attained in establishing the Theatre on a firm footing, and also recommended them to act such plays as would improve society. The stone was then laid, and after some music, played by the members of the Company, the ceremony was brought to a close."

বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্থায়ী নাট্যশালা তৈরী হয়েছিল তক্তার বেড়া এবং করোগেটের ছাদ দিয়ে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের গৃহ-নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন ধর্মদাস সুর। বাংলাদেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম মঞ্চশিল্পী ইনি। ধর্মদাস কোনো ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য না নিয়ে,[৪] নিজের চেষ্টায় এবং সহকর্মীদের সহায়তায়

৪ ধর্মদাস স্বয়ং এমত উক্তি করলেও অমৃতলাল বসুর স্মৃতিচারণের মাধ্যমে জানা যায়, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র নামধেয় জনৈক নাট্যামোদী সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ন্যাশনাল থিয়েটারের গোড়া পত্তন থেকে বেশ কিছুকাল ধর্মদাসের সহযোগী

অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ের মাঠের লিউইস্ থিয়েটারের[৫] অনুকরণে মাস তিনেকের মধ্যেই বাড়ী তৈরী করে ফেললেন।[৬] ডেভিড গ্যারিক নামে এক ইংরেজ শিল্পীকে দিয়ে ফ্লাটসিন ও ড্রপসিন আঁকানো হল। স্টেজ নির্মাণে খরচ পড়লো তের হাজার টাকা।[৭]

ছিলেন। অমৃতলাল জানিয়েছেন:— "…মঞ্চসম্বন্ধীয় নেপথ্যাচার কার্য্যে তিনি ধর্ম্মদাস সুরের সুদক্ষ সহায় ছিলেন;……ষ্টার থিয়েটারের কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ বর্ত্তমান বাটীই তাঁর স্থপতি বিদ্যার সাক্ষ্য দিতেছে;…" (মাসিক বসুমতী/জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪—অমৃতলাল বসু)

৫ "…৭৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি চৌরঙ্গীর রাস্তাব উপর লুইস সাহেব লুইস থিয়েটার নাম দিয়ে একখানি বাড়ী তৈরী করেন; ৭৫ খৃষ্টাব্দে সপ্তম এডোয়ার্ড প্রিন্স অফ ওয়েলস রূপে ঐ থিয়েটারে প্রবেশ করবার পর ঐ থিয়েটারের নাম হয় লুইসেস থিয়েটার রয়েল।……" (ঐ)

৬ "…এই বাটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য আমি ইংরাজ বা ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য লই নাই; তবে ড্রপ সিন ও আর দু-চারখানি সিন মিঃ গ্যারিক্‌কে দিয়া আঁকান হয়।……" (নাট্য মন্দির—ভাদ্র, ১৩১৭/ধর্মদাস সুর)

৭ গ্রেট ন্যাশনাল প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা অমৃতলাল বসু এই থিয়েটার গড়ার বিস্তারিত ইতিহাস বিবৃত করেছেন ভুবনমোহন নিয়োগীর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধে (মাসিক বসুমতী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪) এবং 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থে। বাংলা থিয়েটারের আদি পর্বের অনেক মূল্যবান তথ্য স্থান পেয়েছে এই দুই রচনায়। তিনি লিখেছেন:—

"……এদিকে মহেন্দ্রনাথ দাসের নিকট হইতে জমি ভাড়া লইয়া আমরা গ্রেট্ ন্যাশন্যাল্ থিয়েটর নাম দিয়া লিউইস্ থিয়েটরের অনুকরণে একখানি কাঠের বাড়ী তৈরী করিলাম।… লিউইস্ থিয়েটরের কর্ত্তৃপক্ষেরা পুরাতন সুলতানার বাড়ীটি ভাঙ্গিয়া অন্যত্র নূতন থিয়েটর স্থাপিত করিলেন। ধর্ম্মদাস, নগেন ও আমি, সুলতানার বাড়ীর মডেল দেখিয়া আসিলাম। ধর্ম্মদাস ঐ মডেলের অনুকরণে নূতন থিয়েটরের বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই-যে, সে কখনও কোথাও engineering শেখে নাই।… এই ষ্টেজ নির্ম্মাণ করাইতে ভুবন নিয়োগীর ত্রয়োদশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।……" (পুরাতন প্রসঙ্গ)

ভুবনমোহন নিয়োগীকে স্বত্বাধিকারী এবং ধর্মদাস সুরকে ম্যানেজার ক'রে অমৃতলাল বসু, দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্র (জনৈক ছাত্র) ও নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'কাম্যকানন' দিয়ে ১৮৭৩, ৩১ ডিসেম্বর কেবলমাত্র পুরুষ অভিনেতাদের নিয়ে গড়া গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার শুভ যাত্রারম্ভ করলে। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের ফলে উদ্বোধন রজনীর অভিনয় সম্পূর্ণ হ'তে পারে নি। পাঁচটি দৃশ্য অভিনীত হওয়ার পূর্বেই উত্তর দিকের প্রবেশ দ্বারে আগুন লাগে এবং ফলে থিয়েটার বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথম অভিনয় রাত্রের সেই দুর্ঘটনার বিবরণ অমৃতলাল এইভাবে দিয়েছেন ঃ— "সে রাত্রে আমাদের থিয়েটর-ভবন দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আমি সেদিন 'কাম্যকাননে'র নায়করূপে অবতরণ করিয়াছি। ষ্টেজের উপরে ভীমা কালী-মূর্ত্তি! নৃমুণ্ডমালিনীর সর্বাঙ্গে

"...লুইসের ছিল, দেল ও ছাত দুই করগেটের, আমাদের হ'ল তক্তার বেড়া, করগেটের ছাত; কেন না, তখন করগেটের চেয়ে তক্তা সস্তা ছিল, আর তখন পুরানো রেল বাজারে বিক্রী হ'ত না, তাই পোষ্টগুলিও চকোর কেটে তৈরী হয়েছিল।

ডেভিড গ্যারিক ব'লে এক জন চিত্রকর কলকাতায় ছিলেন; আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপল হয়ে তিনি এ দেশে আসেন, পরে ঐ কায ছেড়ে স্ব নভাবে চিত্রকর ও ফটোগ্রাফারের কায আরম্ভ করেন। তিনি ৮০ টাকা ক'রে প্রত্যেক-খানির মজুরী নিয়ে চারখানি ফ্লাটসিন আমাদের এঁকে দেন, কাঠ, কাপড, রং সব আমাদের; একখানি গৃহাভ্যন্তর, একখানি রাজসভা, একখানি উদ্যান, একখানি পর্ব্বত ও বন। কাশীর গঙ্গাতীরস্থ দৃশ্য নিয়ে আইরিশ ড্রপ কাপড়ের উপর তিনি একখানি ড্রপসিন এঁকে দেন, এর জন্য তাঁকে মজুরী দিতে হয় সাড়ে ছ'শ টাকার কিছু উপর। সিনে ছাপবার জন্য সোণার পাতই লাগে প্রায় ৭০৲, ৭৫৲ টাকা; সেটি গুটাবার জন্য নিরেট কাঠের মোটা রোলার তৈরী করলে ড্রপসিনখানি গুটুতে নাবাতে এঞ্জিন চালাতে হ'ত; ঘুড়ির লাটাই ধর্ম্মদাসের মাথায় অপেক্ষাকৃত হালকা রোলারের প্ল্যান ঢুকিয়ে দিলে।..."
(মাসিক বসুমতী— জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪)

লাল আলোক-রশ্মি ঈষৎ কাঁপিতেছিল। সম্মুখে চিনির নৈবেদ্য জ্বলিয়া উঠিল। আমি জানু পাতিয়া করযোড়ে বলিতেছিলাম— 'মা কি অগ্নিমূর্ত্তিতে আমার পূজা গ্রহণ করিলেন?'··· অমনি চারিদিক হইতে আগুন! আগুন! ধ্বনি উত্থিত হইল; দুপ্ দাপ্ করিয়া দর্শকগণ লাফাইয়া পড়িতে লাগিলেন। Auditorium-এর দিকে চাহিয়া দেখি আমাদের কাঠের বাড়ীর সম্মুখের দেয়াল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই লেলিহান অগ্নিশিখার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ষ্টেজের উপরে আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলাম। মাথা ঘুরিয়া গেল। সহসা দেখিলাম— দুই হাতে সেই চঞ্চল লোকের ভীড় ঠেলিয়া ব্যায়ামবীর অখিল সেই অনলশিখার সম্মুখীন হইয়া ঘুসি ও লাথি মারিয়া মড়্ মড়্ করিয়া তক্তা ভাঙ্গিতেছে। আমার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। যে য়ুরোপীয় কন্‌ষ্টেবল্ দর্শকবৃন্দের রক্ষার জন্য সে রাত্রিতে তথায় উপস্থিত ছিল, অন্বেষণ করিয়া তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। জনকতক বাঙ্গালী যুবক অখিলকে সাহায্য করিল। কাঠের বাড়ীর এক অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করা হইল।···" (·পুরাতন প্রসঙ্গ)

সংস্কারের জন্য কয়েকদিন থিয়েটার বন্ধ রেখে ১৮৭৪, ১০ জানুয়ারি থেকে গ্রেট ন্যাশনাল আবার অভিনয় সুরু করলে। ঐদিন উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত 'বিধবা-বিবাহ নাটক'[৮] মঞ্চস্থ হয়। মর্মস্পর্শী এই

৮ নানা কারণে নাট্যসমালোচক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য নাটকটিকে মূল্য দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :— "বিধবা-বিবাহ' নাটক, ১৮৫৬ সনে প্রকাশিত হয়। এই নাটকের একটি চরিত্র অবলম্বন করিয়া তাহার রক্তমাংসের দেহের কামনা-বাসনার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া বিধবার জীবনের যে সুগভীর বেদনাটির নাট্যকার সন্ধান দিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়া কেবলমাত্র ইহা এই আন্দোলনের কার্যেই সহায়ক হইয়াছিল, তাহা নহে— সমাজের বাস্তব রূপটি তাহার মধ্য দিয়া ভাষা পাইয়াছিল। ইহার সংলাপের ভাষায়, সমাজ এবং জীবন দর্শনের গভীরতায় ইহা যেমন বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশের ধারায়

নাটকটি সেকালের দর্শকচিত্তে সাড়া জাগিয়েছিল। মনোমোহন বসুর 'প্রণয় পরীক্ষা' (১৭।১), মধুসূদন দত্তর 'কৃষ্ণকুমারী' (২৪।১), 'নন্দ বংশোচ্ছেদ' ও 'উচিত ফল' (৩১।১) প্রভৃতির পর ফেব্রুয়ারির ৭ তারিখে নামানো হল বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'। ৮ ফেব্রুয়ারি গ্রেট ন্যাশনাল সম্পর্কে 'সাধারণী' লিখলে :—"ন্যাশানেল থিয়েটর ছাড়িয়া, কয়েকজন অভিনেতা কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীটে "গ্রেট ন্যাশানেল থিয়েটর" নামে একটি স্বতন্ত্র নাট্যমন্দির স্থাপন করিয়াছেন। "লুইস থিয়েটরের" অনুকরণে ইঁহাদিগের রঙ্গালয় গঠিত হইয়াছে। এখনও উহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হউক, একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাঙ্গালা নাটক অভিনয় যেখানে যত হইয়াছে, এরূপ সুপ্রশস্ত ও সুরম্য রঙ্গস্থল আব কুত্রাপি দেখা যায় নাই। রঙ্গভূমির পারিপাট্য ও উৎকর্ষসাধন জন্য ইহারা যেমন অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, তেমনি শ্রোতৃবর্গের যাহাতে কোনপ্রকার কষ্ট না হয়, তাহাতেও যত্নের ক্রটি করেন নাই। এজন্য ইঁহারা ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই। চিত্রপটগুলিন সুন্দর ও মনোহর হইয়াছে। কিন্তু যে সকল দৃশ্য উহাতে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা এতদ্দেশীয় না হইয়া কিছু বিলাতী বিলাতী হইয়াছে। বোধহয় চিত্রকর এতদ্দেশীয় নয় বলিয়া এরূপ হইয়া থাকিবে।..."

এই সময় সম্প্রদায়ের শক্তি বৃদ্ধি পায়। গ্রেট ন্যাশনাল প্রতিষ্ঠার সময় মূল ন্যাশনালের একটি অংশ রাধামাধব করের নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম নিয়ে জোড়াসাঁকোর সান্যাল বাড়ীতে অভিনয়

একটি বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে, তেমনই এই দেশের সামাজিক জীবনের ইতিহাসেও একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী হইয়াছে।" (বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস— প্রথম খণ্ড)

প্রসঙ্গতঃ, সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত দীনবন্ধু রচনাবলীর ভূমিকায় ডঃ ক্ষেত্র গুপ্তের মন্তব্যটুকুও স্মরণীয়। তাঁর মতে :— "নীলদর্পণের আগে 'বিধবা-বিবাহ'ই একমাত্র গম্ভীর রসের সামাজিক নাটক।"

করছিল। সেই দল থেকে মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) প্রভৃতি বেরিয়ে এসে গ্রেট ন্যাশনালে যোগ দিলেন।[৯] অর্দ্ধেন্দুশেখরকেও এই সময় এখানকার অভিনয়ে অংশ নিতে দেখা গেল। সর্বোপরি এলেন গিরিশচন্দ্র।[১০] আকর্ষণীয় ভূমিকালিপিতে ২১ ফেব্রুয়ারি গ্রেট ন্যাশনালে গিরিশচন্দ্র নাটকায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' মঞ্চস্থ হল।[১১] সে রাত্রে গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, রাধাপ্রসাদ বসাক, বসন্তকুমার ঘোষ, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবং মহেন্দ্রনাথ সিংহ যথাক্রমে পশুপতি, হৃষীকেশ, হেমচন্দ্র, দিগ্বিজয়, ব্যোমকেশ, মাধবাচার্য, বখতিয়ার খিলজী, জনার্দন, লক্ষণীয়, গিরিজায়া, মনোরমা ও মণিমালিনী সেজেছিলেন। লক্ষ্যণীয়, স্ত্রীচরিত্রের রূপদাতারা সকলেই পুরুষ। এঁদের মধ্যে অসাধারণ নাট্যপ্রতিভার গুণে স্মরণীয় হয়ে আছেন ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রেট ন্যাশনালে 'মৃণালিনী'র অভিনয় যে কতদূর হৃদয়গ্রাহী এবং

৯ দ্র. অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর স্মৃতিচারণ— পঞ্চপুষ্প/আষাঢ়, ১৩৩৭।

১০ "...প্রারম্ভে আমার তত্ত্ব হয় নাই, ক্রমে তৎকালে প্রকাশিত অভিনয়যোগ্য নাটক সকল পুরাতন হইয়া আসিল, তাহাতে আর অর্থাগম হয় না। আবার আমার প্রয়োজন পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সকল নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনয় চলিতে লাগিল।..." (নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দু-শেখর মুস্তফী— গিরিশচন্দ্র)

১১ পূর্ববর্তী ইতিবৃত্তকারগণ (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত) গ্রেট ন্যাশনালে 'মৃণালিনী'র প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ নির্দ্দিষ্ট করলেও, আসলে নাটকটি ২১ ফেব্রুয়ারিই প্রথম মঞ্চস্থ হয়। ২১।২।১৮৭৪ তারিখের 'ইণ্ডিয়ান-ডেলী নিউজ' পত্রিকা থেকে আমরা এই তথ্য সংগ্রহ করেছি। ১৪ ফেব্রুয়ারি 'মৃণালিনী'র অভিনয় হয়েছিল জোড়াসাঁকোর ন্যাশনাল থিয়েটারে, গ্রেট ন্যাশনালে নয়।

সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, তার প্রমাণ রয়েছে ১৩ মার্চ, ১৮৭৪ তারিখের 'ভারত-সংস্কারক' পত্রিকার নাট্যসমালোচনায়। পরবর্তী সপ্তাহের অভিনয় (২৮।২) দেখে পত্রিকাখানি লিখেছিল :— "...হৃষীকেশের গৃহে মৃণালিনী মতিমালিনীর (?) সখ্যভাবে আলাপন ও গিরিজায়ার বিদায়ান্তে মতিমালিনীর সহিত মৃণালিনীর হর্ষোৎফুল্ল মুখনির্গত আনন্দোদ্বেলিত স্বরভঙ্গি, আলাপন ও প্রস্থানকালে অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি প্রিয়বয়স্যার নিকট সরলা বঙ্গবালার প্রিয়জনসমাগম সংবাদসুলভ, স্বভাবসিদ্ধ, আকস্মিক আনন্দপ্রকাশের অবিকল প্রতিকৃতি। কাব্যরচয়িতা এস্থলে উপস্থিত থাকিলে স্বীয় সুন্দর কল্পনা ও রচনা-কৌশলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখিয়া চরিতার্থ হইতেন ও যাঁহারা বারাঙ্গনাদ্বারা নিষ্কলঙ্ক বঙ্গাঙ্গনার স্বভাব ও ভাব চিত্রিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাদিগকে রঙ্গাঙ্গনে আনয়ন করেন, তাঁহারাও স্ব স্ব ভ্রান্তিমূলক আত্মশ্লাঘার খর্ব্বতা দেখিয়া নিশ্চয়ই লজ্জিত হইতেন। যাহা হউক, মতিমালিনীর সময়োচিত কুলবালাসুলভ ভাব ও আলাপন অতিশয় প্রশংসনীয়। মৃণালিনীর প্রতি ব্যোমকেশের আসক্তি ও তন্নিবন্ধন অত্যাচারোদ্যম ও ঘৃণিত ভাবব্যঞ্জক শারীরিক বৈলক্ষণ্য এবং গুরুতর আঘাত নিবন্ধন প্রলাপ ও আর্ত্তনাদ এবং অবশেষে যবনকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সভয়ে কম্পন ও পতন এবং মৃত্যুকালে আত্মদুষ্কৃতি স্মরণ ও অঙ্গাদি সঞ্চালন প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া কোন রিপুপরতন্ত্র মূর্খ চঞ্চলমতি ভীরু ভদ্র সন্তানের অনুষ্ঠিত কার্য্য সকলের ন্যায় অবিকল হইয়াছিল। নদী ও টলমলায়মান নৌকা সংযোগে গিরিজায়া ও মৃণালিনীর গমন, উভয়ের সময়োচিত কথোপকথন ও গিরিজায়া কর্তৃক বসন্তকূজনসদৃশ তানলয় বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে সুমধুর সুভাব সঙ্গীত, নদীতীরে পাটনীর গৃহ ও পাটনীর সহিত গিরিজায়ার সখ্যতাসুলভ ভাবব্যঞ্জক কথোপকথন ও সুন্দর সঙ্গীত প্রভৃতি দৃশ্য বিষয়গুলি যুগপৎ বিস্ময়কর ও সাতিশয় প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। উপবন সম্মুখে পশুপতির গৃহ, পশুপতির সহিত মনোরমার

অপূর্ব্ব প্রণয় আলাপন ও প্রাসাদোপরি বৃক্ষশাখা অবলম্বনে মনোরমার বৃক্ষারোহণ ও অবরোহণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান ও শ্মশান সম্মুখে বিকৃতবেশে ও স্থির গম্ভীরভাবে মনোরমার প্রবেশ ও উন্মাদের ন্যায় প্রচণ্ড অগ্নিশিখাতে লম্ফপ্রদান প্রভৃতি দৃশ্য অভিনয়গুলি সাতিশয় বিস্ময়কর ও কৌতুকাবহ হইয়াছিল। উপরিউক্ত দৃশ্য ও শ্রাব্য বিষয়গুলি অতিশয় স্বাভাবিক, উৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল সন্দেহ নাই।……"

২৫ ফেব্রুয়ারি কর্তৃপক্ষ 'নীলদর্পণ' নাটকের এক বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন করলেন। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' জানালে :—"Great National Theatre.—On the night of Wednesday last, the manager of the theatre took the advantage of having a grand special night for acting the well-known and famous tragical drama entitled "Nildarpan." The mournful expressions of the male and female actors, as ryots, were very pathetic, and the torturing scenes of the planters were so heart-rendering that almost the whole audience seemed deeply touched. There was a considerable gathering of respectable native gentlemen. There were a few European ladies and gentlemen, who seemed to highly appreciate the acting, and, on the whole, the performances of the night was a successful one." (২৭।২।১৮৭৪) ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ৪ মার্চ যথাক্রমে 'মৃণালিনী' ও 'নন্দবংশোচ্ছেদ' নাটকের পুনরভিনয়ের পর গ্রেট ন্যাশনাল ৭ মার্চ 'নগরে নবরত্ন সভা' নামালে। পত্রিকায় সমালোচনা বেরুল :—"Great National Theatre.—On the night of last Saturday, this Company played a

humourous farce on their stage, entitled "Noborutno shova" or, the "Meeting of the Nine Jewels." This piece was well received by the audience, and very fairly represented throughout. There was an air about it essentially satirical. The subject was lightly treated and full of reflections on the meeting of the Calcutta Municipal Justices, which were readily accepted by the audience; The characters were admirably fitted for their simple and pleasing acting, and sympathetic voice. On the whole, it may be said that every face beamed and smiled approval." (ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ—১০।৩।১৮৭৪) ১৪ মার্চের নাটক 'কমলে কামিনী'। ১৮ মার্চ দর্শকদের বিনামূল্যে 'নবীন তপস্বিনী' দেখানো হল।[১২] 'কমলে কামিনী'তে মঞ্চে অশ্বের আবির্ভাব ঘটতো। ২৮ মার্চ তারিখের অভিনয়সূচীতে ছিল:—'সধবার একাদশী', 'রাসলীলা', 'ভারতমাতা' এবং 'কমলে কামিনী'র একটি দৃশ্য। গিরিশচন্দ্র নাটকায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র অভিনয় হল ৪ এপ্রিল। পরের সপ্তাহে (১১।৪) দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'। এরপর, এই মাসের ১৮ তারিখে গ্রেট ন্যাশনালে হরলাল রায়ের 'হেমলতা' মঞ্চস্থ হয়। একই দিনে বেঙ্গল থিয়েটার মধুসূদনের 'মায়াকানন' নামায়। সম্ভবতঃ, সেই কারণেই অভিনয় ভালো হওয়া সত্বেও উদ্বোধন রজনীতে 'হেমলতা'য় বিশেষ জনসমাগম হয় নি। এ-নাটকে ঐকতান পরিবেশন করেছিলেন মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সম্প্রদায়।

১২ গ্রেট ন্যাশনালের উদ্বোধন রাত্রে র্ঘটনার ফলে অভিনয় সম্পূর্ণ না হওয়ায়, নিরাশ দর্শকদের কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পরে, কোনো একদিন তাঁদের বিনামূল্যে নাটক দেখানো হবে। তারই ফলশ্রুতি এই অভিনয়।

দলের অবৈতনিক পরিচালক তখন গিরিশচন্দ্র। 'হেমলতা' দেখে বিস্তারিত সমালোচনা করলে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ'। লিখলে:—

"The Great National Theatre.—On Saturday last, the classic drama, Hemlata, was brought on the stage with success, but it did not draw a crowded house, owing, perhaps, to the attraction of the performance of Maya Kanan in the Bengal Theatre, to see which the public had long been anxious. Among the principal characters we noticed two rival kings, Bikram Sing and Tej Sing, of Chitore and Udoypore, respectively, who represented their parts well, but Bikram Sing, on a previous night, as Torap, acted his part with more ease and freedom than on this occasion. Sutto Sokha, the valiant General of Bikram Sing, successfully acted his part; his vehemence of speech and soldier-like bearing deserve great credit; and Monohur, a spy from the king of Udoypore, in disguise, admirably prevailed upon the king of Chitore to aid him, and his acting with natural ease reminded us of a second Iago on the stage. Other male representatives do not call for any special remark. All the female parts in general were satisfactory-we specially notice that of our heroine Hemlata, who represented her part with a becoming dignity, and a thrilling sensation was felt by the whole audience when she appeared before her Royal father to interfere her lover Sutto Sokha,

who was ordered to suffer the extreme penalty o; the law by the king under false conviction; and that of Komola Debi (an amateur) when she bade farewell to Sutto Sokha (not knowing him to be her own son), with the sword and cap of her Royal husband. Sookhasinee, the companion of Hemlata and Tara Debi, the adopted mother of the General, sustained their respective parts creditably.

The last scene was by no means attractive but this, to be attributed only to the defect of the drama, as the author has failed to keep the spirit of the drama, here as well as in some other places, making the play unnecessarily tedious, and thereby marring the pleasures of the audience. The acting in general was satisfactory, as was expressed by the frequent applause. The orchestra, under the leadership of Baboo Mohendra Nath Chatterjee, was sweet and agreeable. We specially notice the good management of Babu Greesh Chunder Ghose, Honorary Director, who has now actually put his shoulders to the wheel, unlike previous occasions, when he held the office as a purely complimentary title." (২১।৪।১৮৭৪)

'হেমলতা' অভিনয়ের পর বেঙ্গল থিয়েটারের মত গ্রেট ন্যাশনালেও অভিনেত্রী নিয়োগ করা হবে কিনা,[১৩] এই নিয়ে

১৩ প্রশ্নটা উঠেছিল এই কারণে যে, "...যাঁরা এতদিন মেয়ে সেজে খুব সুখ্যাতি নিয়ে আসছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই বয়স বেড়ে উঠল, সাজলে মানায় না, সাজতেও আর তাঁরা চান না; বাইরের ছোকরা দেখতেও ভাল,

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ধর্মদাস সুর এবং অর্দ্ধেন্দুশেখরের মতবিরোধ ঘটায় অর্দ্ধেন্দুশেখর এবং মতিলাল সুর 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে আলাদা দল তৈরী ক'রে ঢাকা এবং অন্যত্র অভিনয় করতে চলে গেলেন।[১৪] গ্রেট ন্যাশনালও ২৫ এপ্রিল 'কুসুমকুমারী' (চন্দ্রকালী ঘোষ) ও ৩০মে 'কুলীনকন্যা অথবা কমলিনী' (লক্ষ্মী-নারায়ণ চক্রবর্তী) অভিনয় করার পর কয়েক মাসের জন্য কলকাতায় প্রদর্শনী বন্ধ রেখে মফস্বলে বেরিয়ে পড়লো। অভিনেত্রী নিয়োগের ফলে বেঙ্গল থিয়েটারের তখন খুব নাম-ডাক। সেই সাফল্যের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে মফস্বল থেকে ফিরে কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, হরিদাসী এবং রাজকুমারী নামে পাঁচজন স্ত্রীলোক নিযুক্ত ক'রে[১৫] খুব জাঁকজমকের সঙ্গে গ্রেট ন্যাশনাল ১৯ সেপ্টেম্বর

অভিনয়ও মন্দ করে না, এমন কয়েকজন যোগাড় করা গেছল বটে, কিন্তু দায়িত্ববোধ ব'লে জিনিষটার কোন ভাবই প্রায় তাদের মধ্যে দেখা যেত্না ;…" (মাসিক বসুমতী / জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ / অমৃতলাল বসু)

১৪ দ্র. অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্মৃতিচারণ—পঞ্চপুষ্প / আষাঢ়, ১৩৩৭। কিন্তু হেমেন্দ্রনাথ লিখেছেন এই দলত্যাগ অভিনেত্রী নিয়োগের পরে ঘটে। (দ্র. The Indian Stage— vol. II)

১৫ বেঙ্গলের মত গ্রেট ন্যাশনালের অভিনেত্রী নিয়োগও সমকালীন পত্র-পত্রিকাগুলি অনুমোদন করে নি। 'ভারত-সংস্কারক' লিখেছিল :— "বেঙ্গল থিয়েটরের ন্যায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটর স্ত্রীলোক দ্বারা অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন। সকল সভ্য সমাজেই নাট্যোল্লিখিত স্ত্রীগণের অভিনয় এক্ষণে স্ত্রী-জাতি দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। আমরা সেই সভ্য সমাজের অনুরোধেই এ প্রকার অভিনয়কে উত্তম বলিতে পারি না।" (২।১০।১৮৭৪)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রী প্রথা প্রবর্তনের চার দশক পরেও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :— "…স্ত্রীচরিত্র অকৃত্রিম স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে, এরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতী বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।" (বিচিত্র প্রবন্ধ / ১৩০৯, পৌষ)

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত[১৬] 'সতী কি কলঙ্কিনী ?'[১৭] নামে এক অপেরা নামালে। ইতিমধ্যে অর্দ্ধেন্দুশেখর পুনরায় দলে ফিরে এসেছেন।[১৮] 'সতী কি কলঙ্কিনী ?'র সঙ্গীত এবং নৃত্যশিক্ষক ছিলেন যথাক্রমে মদনমোহন বর্মণ ও কান্তাপ্রসাদ। এঁরা দুজনেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতবিদ্য পুরুষ। বাংলাদেশের পাবলিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত এই অপেরাটির রিহার্সাল মঞ্চে না হয়ে স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগীর চাঁদনীর বৈঠকখানাতে হত। অভিনেত্রীরাও সেখানে যেতেন। এর আগে গ্রেট ন্যাশনালের ম্যানেজার ছিলেন ধর্মদাস সুর। নতুন ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞাপনে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ম্যানেজাররূপে দেখা গেল। ডিরেক্টর হিসাবে নিযুক্ত হলেন দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থসংক্রান্ত গোলযোগের ফলেই পরিচালনার ক্ষেত্রে এই রদবদল ঘটে। 'সতী কি কলঙ্কিনী ?' খোলার সময় গিরিশচন্দ্র গ্রেট ন্যাশনালে ছিলেন না।[১৯] নাটকখানি

১৬ অর্দ্ধেন্দুশেখর স্মৃতিচারণে বলেছেন, অপেরাটি নগেন্দ্রনাথের বড়দাদার (দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের) লেখা। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং অমৃতলাল বসুও এই মত পোষণ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে' কিন্তু নগেন্দ্রনাথই রচয়িতারূপে উল্লেখিত।

১৭ "বৃন্দার প্ররোচনায় রাধিকার কলঙ্কিনী নাম দূর করিবার জন্য গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের যে প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া এই নাটিকাখানি রচিত হইয়াছিল। আয়ান, কুটিলা, জটিলা, কৃষ্ণকালী মূর্ত্তি, শত সহস্র ছিদ্র কলস প্রভৃতি বিচিত্র ঘটনাবলির সমাবেশে ও মধুর সঙ্গীত-লহরীর মধ্যে নাটিকাখানি দর্শক-সাধারণের চিত্তরঞ্জন করিয়াছিল।" (দৃশ্যকাব্য পরিচয়—সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়)

১৮ মাতৃবিয়োগের ফলে অর্দ্ধেন্দু কলকাতায় ফেরেন। এই সময় গ্রেট ন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী ভুবন নিয়োগী মাতৃশ্রাদ্ধের ব্যয়নির্বাহে সাহায্য করায় অর্দ্ধেন্দুশেখর তাঁর থিয়েটারে যোগ দেন।

১৯ "বেঙ্গল থিয়েটারের দৃষ্টান্তে বাধ্য হইয়া যখন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে

মঞ্চস্থ ক'রে গ্রেট ন্যাশনাল খুব সুখ্যাতি পেয়েছিল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১।১০।১৮৭৪) লিখেছিল:—"গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটর এবার যেরূপ আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, এতদিনের পর বুঝি ইঁহারা কৃতকার্য্য হইলেন। বাবু ভুবনমোহন নেউগী ইহাতে বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ইঁহারা যদি এখন ভাল ভাল নাটক পান এবং আবার আত্মকলহ না করেন, তবে ইঁহারা কৃতকার্য্য হইবেন। গত দুই অভিনয়ে লোকে অনেক আশান্বিত হইয়া গিয়াছে।" এ-নাটকে সঙ্গীতনিপুণা অভিনেত্রী যাদুমণি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।[২০]

পরিচালনা খাতে ব্যয় ছিল তখন সামান্য, মাসিক আটশ টাকার মত। এ-সময় স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন থিয়েটার থেকে আয় করেছেন প্রচুর।[২১]

নারী অভিনেত্রী লইয়া, ৺মদনমোহন বর্ম্মণের কৃতিত্বে জাঁকজমকের সহিত 'সতী কি কলঙ্কিনী?' অভিনয় করিয়া যশস্বী হয়, তখন আমার সহিত থিয়েটারের কোন সম্বন্ধ ছিল না।" (বঙ্গ-রঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী—গিরিশচন্দ্র)

২০ "স্ত্রী-অভিনেত্রী প্রবর্ত্তনে এবং সঙ্গীতাচার্য্য মদনমোহন বর্ম্মণের সুমধুর সুর সংযোজনে "সতী কি কলঙ্কিনী" আবালবৃদ্ধবনিতার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। যাদুমণি 'রাধিকা'র ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি যেরূপ সুকণ্ঠী, সেইরূপ সুগায়িকা ছিলেন। বেশীদিন ইনি থিয়েটারে ছিলেন না। মাসিক দুইশত টাকা বেতনে ইনি সুপ্রসিদ্ধ গুণগ্রাহী ও উদারচেতা স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে গান শুনাইতেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল।…" (নাচঘর / শারদীয় সংখ্যা, ১৩৩৭ / অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

২১ "ভুবন সাহস ক'রে প্রথম থিয়েটার-বাটী নির্ম্মাণের জন্য অর্থব্যয় করেছিল বটে, কিন্তু ঐ থিয়েটারও তাকে অনেক অর্থ দিয়েছে। স্ত্রীলোক প্রবেশের পূর্ব্বে যে সব যুবকরা অভিনয় কত্তেন, বেতন তাঁদের মধ্যে কেহই নিতেন না। বেতন শব্দটা উচ্চারণ মাত্রই অনেকে অপমানিত মনে কত্তেন;

২৬ সেপ্টেম্বর 'সতী কি কলঙ্কিনী?'র পুনরভিনয়ের পর ৩ অক্টোবর খোলা হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরু-বিক্রম নাটক'।[২২]

তবে কখন কদাচ কেউ একটু ফূর্ত্তি করবার উদ্দেশ্যে ৫।৭ টাকা নিতেন। তারপর যখন এক্‌ট্রেস এল, তখন দু'চারজন গাইয়ে বাজিয়েকে কিছু দিতে হ'ল, তখনও থিয়েটার চালাবার মাসিক খরচা শ আষ্টেক টাকার ওপর ওঠেনি, বিজ্ঞাপনের মধ্যে মোড়ে মোড়ে একশ খানা পোষ্টার; কখন কোন বিশেষ অভিনয় উপলক্ষ্যে 'ইংলিশম্যানে' ইঞ্চি দুই বিজ্ঞাপন, আর পাঁচশ হ্যাণ্ডবিল।" (মাসিক বসুমতী / জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ / অমৃতলাল বসু)

২২ 'পুরু-বিক্রম নাটক' ও তার অভিনয় প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলার আছে। যেমন, (১) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই নাটক সর্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চ থেকে দর্শকদের মনে জাতীয়তার বীজ বপন করে।

(২) নাটকটির মূলে রয়েছে বিদেশী প্রভাব। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন :— " ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী নাট্যকার জঁ। রাসিন 'আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট' নামে যে নাটক রচনা করেন, তাহাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকের ভিত্তিস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে।" (বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস—প্রথম খণ্ড)

(৩) 'পুরু-বিক্রম নাটকে'র অভিনয়কাল সম্পর্কে নাট্যকারের বিবৃতির সঙ্গে সংবাদপত্রের সাক্ষ্য মেলে না। 'ইংলিশম্যানে'র বিজ্ঞাপন অনুযায়ী বেঙ্গল থিয়েটারে এ-নাটকের অভিনয় তারিখ ২২ আগস্ট, ১৮৭৪ এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১।১০।৭৪) অনুসারে নাটকটি ৩ অক্টোবর, ১৮৭৪ গ্রেট ন্যাশনালে মঞ্চস্থ হয়েছিল। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে এর বিপরীত উল্লেখ দেখি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী 'পুরু-বিক্রম নাটক' প্রথমে গ্রেট ন্যাশনালে এবং পরে, বেঙ্গলে অভিনীত হয়। তিনি বলেছেন :— "পুরু-বিক্রম প্রকাশিত হওয়ার পর, একদিন Great National Theatre-এর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতি কয়েকজন অভিনেতা এই নাটকখানির অভিনয় করিবার জন্য, আমার অনুমতি লইতে আসিয়াছিলেন।…

"সত্যেন্দ্রনাথের "গাও ভারতের জয়" গানটি পুরু-বিক্রমে সন্নিবিষ্ট করা

এই তারিখে বেঙ্গল গ্রেট ন্যাশনালকে ব্যঙ্গ ক'রে Opera Troubles নামায়। 'পুরু-বিক্রম নাটক' ইতিপূর্বে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছে (২২।৮।১৮৭৪)। গ্রেট ন্যাশনালের অভিনয়ে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল বসু আর ক্ষেত্রমণি যথাক্রমে সেকেন্দর শা, পুরু ও রানী ঐলবিলার ভূমিকায় নামলেন। নায়িকার রূপসজ্জায় ক্ষেত্রমণি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন।[২৩] ১০ অক্টোবর 'সতী কি কলঙ্কিনী?' এবং ভারতে যবন' অভিনয়ের পর পূজার ছুটির জন্য থিয়েটার বন্ধ রইলো। পূজাবকাশের পর গ্রেট ন্যাশনাল হরলাল রায় অনূদিত শেক্‌স্‌পিয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের বঙ্গানুবাদ 'রুদ্রপাল' (৩১।১০) মঞ্চস্থ করলে। এই দিন লকের অনুকরণে 'ম্যাকবেথে'র ইংরেজী গান গাওয়া হয়েছিল। 'রুদ্রপাল' নাটকের হ্যাণ্ডবিলে লেখা হয়ঃ— "Macbeth! Macbeth! With an original music in intimation of Lockes. অভিনয় দেখে খুশী হয়ে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' লিখলে ঃ— "Great National Theatre.— On Saturday last the play of "Macbeth" or "Rudrapal" dramatized

হইয়াছিল।…গ্রেট্ ন্যাশনাল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ গানটির বেশ একটা জোরাল' সুর দিয়াছিলেন, সেই সুরেই ইহা এখনও গীত হয়।

"তারপর বেঙ্গল থিয়েটারেও নাটকখানি অভিনীত হয়।…"

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি / বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়)

২৩ "…'পুরু-বিক্রম' নাটকের এক স্থানে আছে,— "পাঞ্জাব প্রদেশস্থ সমস্ত নৃপতিবৃন্দ" ইত্যাদি - এই ছত্রটি একসঙ্গে স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিবার জন্য প্রত্যেক অভিনেত্রীকে বলা হইল। তন্মধ্যে ক্ষেত্রমণিই কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন,— এজন্য তাঁহাকেই নাটকের নায়িকা 'ঐলবিলা'র ভূমিকা প্রদত্ত হইল— যদিচ নায়িকা সাজিবার চেহারা তাঁহার ছিল না।…" (নাচঘর / শারদীয় সংখ্যা / ১৩৩৭— অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

in Bengalee, by one of the managers[২৪] from the well-known English romance, was for the first time performed by the above theatrical company in their pavilion in Beadon Street. The house was tolerably filled. The parts of Macbeth and Lady Macbeth were capitally sustained, especially the latter acquitted herself very satisfactory, and proved that Native woman when well trained can make a good figure on the stage. On the whole, the performance was a complete success, though we must admit there was room for improvement. The scenes and dresses were excellent, and the orchestra in attendence was a first class one, and played some good specimens of native music....." (৪।১১।৭৪) ১৪ এবং ২১ নভেম্বরের নাটক 'আনন্দ কানন অথবা মদনের দিগ্বিজয়' ও 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'। প্রথমটির লেখক লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী। দ্বিতীয়টি রচনা করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম নাটকের দ্বিতীয় রজনীর অভিনয় দেখে ২৪ নভেম্বর, ১৮৭৪ তারিখের 'ইংলিশ-ম্যান' মন্তব্য করলে :—"...The performance was fairly done, the actors and actresses acquitting themselves creditably...." 'আনন্দ কানন' নাটকের ভূমিকালিপি ছিল এইরকম :—রতি ও শান্তি-যাদুমণি, কবিতা এবং কমলা-রাজকুমারী, অহমিকা-ক্ষেতু (ক্ষেত্রমোহন), চপলতা-হরিদাসী, লীলা-কাদু (কাদম্বিনী ?), সঙ্গীত-হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদন-সুরেশ মিত্র,

২৪ সংবাদপত্রের কথায় মনে হয়, নাট্যকার হরলাল রায় এই সময় গ্রেট ন্যাশনালের অন্যতম ম্যানেজার ছিলেন।

বসন্ত-নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিবেক-অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও নারায়ণ-অমৃতলাল বসু। 'আনন্দ কানন' সম্প্রদায়কে অর্থ এবং খ্যাতি দুই-ই দিয়েছিল। কিন্তু সেই সুখ এঁদের ভাগ্যে বেশীদিন সহ্য হল না, দলে আবার ভাঙ্গন দেখা দিল।

ম্যানেজার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কর্মচ্যুত করলে স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগী তাঁকে কুড়ি হাজার টাকা ড্যামেজ বা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন— এই মর্মে এগ্রিমেন্ট লিখে দিতে ভুবনমোহন অস্বীকার করায় নগেন্দ্রনাথ-মদনমোহন বর্মণ, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, যাদুমণি, কাদম্বিনী প্রভৃতিকে নিয়ে 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী' গঠন ক'রে বিভিন্ন স্থানে অভিনয় দেখিয়ে বেড়াতে লাগলেন।[২৫] পরের বছর (১৮৭৫) ফেব্রুয়ারির সময় এঁরা বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে মিলিত হন। ভুবন-নগেনের এই এগ্রিমেন্টঘটিত বিরোধ থানা-পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছিল, শোনা যায়।[২৬] সে যাই হোক্, নগেন্দ্রনাথ চলে গেলে ধর্মদাস সুর আবার

২৫ প্রসঙ্গতঃ, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন :— "... লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর 'আনন্দ কানন' গীতিনাট্যাভিনয়ে দর্শকগণকে প্রীত করিয়া সম্প্রদায়ও বিশেষ লাভবান্ হইয়াছিলেন।

এই সময়ে নগেন্দ্রবাবু একদিন ভুবনবাবুকে বলেন,—'তুমি একখানি এগ্রিমেণ্ট পত্রে আমাকে লিখিয়া দাও, যদ্যপি আমাকে কখনও ম্যানেজারের কার্য্য হইতে ছাড়াইয়া দাও,—আমাকে কুড়ি হাজার টাকা ড্যামেজ দিবে।' ভুবনমোহনবাবু এরূপ এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, নগেন্দ্রবাবু থিয়েটার হইতে মদনমোহন বর্ম্মণ, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, যাদুমণি, কাদম্বিনী প্রভৃতি কতকগুলি অভিনেতা ও অভিনেত্রী সঙ্গে লইয়া চলিয়া যান।..." (গিরিশচন্দ্র)

২৬ "The National Theatre.—A correspondent writes to say that there has been a collapse at the Great National Theatre, and there was no performance on Saturday night. He also mentions some painful facts which may transpire

গ্রেট ন্যাশনালের ম্যানেজার হলেন।[২৭] নতুন ব্যবস্থাপনায় ১৮৭৪-এর শেষ উল্লেখযোগ্য নাটক 'শত্রুসংহার'। নাটকটি হরলাল রায় ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' অবলম্বনে লিখেছিলেন। অভিনয়ের তারিখ ১২ ও ১৯ ডিসেম্বর। 'শত্রুসংহার' নাটকে দ্রৌপদীর সখীর ক্ষুদ্র ভূমিকায় বাংলা থিয়েটারের আদি যুগের অসামান্যা অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন। আবির্ভাবলগ্নের স্মৃতিচারণে তিনি লিখেছেন ঃ— "...তখন স্বর্গীয় ধর্ম্মদাস সুর মহাশয় ম্যানেজার ছিলেন, ৺অবিনাশচন্দ্র কর মহাশয় আসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার ছিলেন। আর বোধ হয় বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু শিক্ষা দিতেন। আমার সব মনে পড়ে না। তবে তখন বেলবাবু, মহেন্দ্রবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু ও গোপালবাবু, ইঁহারাই বুঝি সব শিক্ষা দিতেন। তখন বাবু রাধামাধব করও উক্ত থিয়েটারে অভিনয় কার্য্য করিতেন এবং বর্ত্তমান সময়ে সম্মানিত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ও উক্ত ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অবৈতনিক অভিনেতা ছিলেন। ইঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া আমায় 'বেণী-সংহার' পুস্তকে একটী ছোট পার্ট দিলেন, সেটী দ্রৌপদীর একটী সখীর পার্ট, অতি অল্প কথা।..."

in the police court, if, as he says, a warrant has been issued against one prominent character connected with it, for his apprehension on a charge of embezzlement and criminal appropriation ; the amount of defalcation is stated to be Rs. 10,000, which is probably an exaggeration, as is also the statement that a young native gentleman has been induced to incur debts, in connection with the theatre, to the extent of Rs. 50,000." (ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ-২।১২।১৮৭৪, বুধবার)

২৭ ১৮৭৫, ১৬ জানুয়ারি থেকে ম্যানেজার হিসাবে ধর্মদাস সুরের নাম বিজ্ঞাপিত হ'তে থাকে। নগেন্দ্রনাথের দলত্যাগ ও ধর্মদাসের নিযুক্তির মধ্যবর্তী সময়ে বিজ্ঞাপনে কেবলমাত্র স্বত্বাধিকারীর (ভুবনমোহন নিয়োগী) নাম থাকত।

(আমার কথা) বছরের শেষ নাটক 'বঙ্গের সুখাবসান' (হরলাল রায়) ২৬ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয়।

১৮৭৫ সাল পড়লো। ২ জানুয়ারি খোলা হল উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী'। পরের সপ্তাহেও 'শরৎ-সরোজিনী' অভিনীত হয়েছে, সঙ্গে 'পরীস্থান'। অভিনয়ের দিন (৯।১) 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেন কর্তৃপক্ষ :—

THE GREAT NATIONAL THEATRE

GRAND BEADON STREET PAVILION

THIS EVENING

Saturday, the 9th January, 1875

The most triumphant success

SHURRAT SHOROJEENEE

An acknowledged Master-piece of the day

SHOOTING ON THE STAGE

Fairy Land

Play to commence at 8 P. M.

Books to be had at the Theatre.

ছ'শ টাকার বিনিময়ে কর্তৃপক্ষ নাটকটির অভিনয়স্বত্ব লাভ করেছিলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১৪।১।১৮৭৫) জানালে :—
"গত শনিবার এবং তাহার পূর্ব্বেকার শনিবার রাত্রিতে গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটরে শরুৎ সরোজিনী নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। দুই দিন রঙ্গভূমি লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। শরৎ সরোজিনী নাটকের অভিনয় দেখিবার নিমিত্ত নগরবাসীদিগের এইরূপ কৌতূহল ও ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল, যে শুনিতে পাওয়া যায় না কি স্থানাভাব প্রযুক্ত চারি পাঁচ শত লোককে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল।··· বস্তুতঃ

নাটকখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। অভিনয়ও উত্তম হইয়াছিল।…" ৭ ফেব্রুয়ারি' সাধারণী' লিখলে:—"কলিকাতার প্রথম আজব। শরৎ-সরোজিনী নাটকের অভিনয়। এবং সেই আজবের আজব (Shooting on the stage) অর্থাৎ রঙ্গভূমি মধ্যে বন্দুক ছোড়া। আজব কথা বটে।" যে কারণেই হোক, 'শরৎ-সরোজিনী' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। উদ্বোধনের রাত্রে বেতিয়ার মহারাজা উপস্থিত থেকে থিয়েটার-কর্তৃপক্ষকে সম্মানিত করেছিলেন। গ্রেট ন্যাশনালের পরবর্তী অভিনয়-তালিকা:— ৩০ জানুয়ারি এবং ৬ ফেব্রুয়ারি—'নীলদর্পণ'। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের অভিনয়ে যথাক্রমে তুর্কী রাজদূত এবং গ্রাণ্ট ডাফ এম্. পি উপস্থিত ছিলেন। ১০ ফেব্রুয়ারি ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার উপস্থিতিতে 'শত্রুসংহার' মঞ্চস্থ হয়। 'নবীন তপস্বিনী' নামে ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে। ২০ ফেব্রুয়ারির নাটক 'নগ-নলিনী' (প্রমথনাথ মিত্র)। পরের সপ্তাহে (২৭।২) 'শরৎ-সরোজিনী' দেখেন মহারাজা হোলকার। এই সময় অভিনয় সুরু হ'ত রাত সাড়ে আটটায়। এরপর 'হেমলতা' (৬।৩), 'আনন্দ কানন' (১৩।৩), 'সধবার একাদশী' (২০।৩) প্রভৃতি অভিনয়ান্তে মার্চের শেষে গ্রেট ন্যাশনাল দলবল নিয়ে উত্তর ভারত সফরে বেরুল।[২৮] সঙ্গে ধর্মদাস সুরের নেতৃত্বে গেলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, মতিলাল সুর, অবিনাশ কর (সহকারী ম্যানেজার), নীলমাধব চক্রবর্তী, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, বিনোদিনী প্রমুখ নট-নটীরা। কলকাতার অভিনয় কিন্তু বন্ধ রইলো না। সেখানে মহেন্দ্রলাল বসুর অধিনায়কত্বে গ্রেট ন্যাশনালের প্রদর্শনী নিয়মিত চলতে থাকলো। এই সময় 'জামাই বারিক' (৩।৪), 'নয়শো রুপেয়া' (১০।৪), 'তিলোত্তমাসম্ভব' (১৭।৪), 'সাক্ষাৎ-দর্পণ' (২৪।৪), 'বিষবৃক্ষ'

২৮ বিনোদিনী দাসী রচিত 'আমার কথা'য় এই সফরের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

(১৷৫), 'নন্দনকানন' (৮৷৫), 'শরৎসরোজিনী' (১৫৷৫) প্রভৃতি মঞ্চস্থ হয়। 'নয়শো রুপেয়া'তে অর্দ্ধেন্দুশেখর ছাতুলাল সাজেন। পশ্চিম থেকে তিনি তখন কিছুদিনের জন্য কলকাতায় ফিরেছিলেন। পরে, আবার অর্দ্ধেন্দুশেখর উত্তর ভারতে প্রত্যাবর্তন ক'রে গ্রেট ন্যাশনালের ভ্রাম্যমাণ দলের সঙ্গে মিলিত হন।[২৯]

মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে সফর শেষে সম্প্রদায় কলকাতায় ফিরলে মদনমোহন বর্মণ বেঙ্গল থেকে পুনরায় গ্রেট ন্যাশনালে চলে এলেন।[৩০] জুলাই মাসের তিন তারিখে মহেন্দ্রলাল বসুর লেখা নাটক 'পদ্মিনী' ওঁরই সাহায্যরজনীতে অভিনীত হল। ভীমসিংহের চরিত্রে রূপ দিলেন মহেন্দ্রলাল স্বয়ং। গোপালচন্দ্র মজুমদার[৩১] আলাউদ্দীনের ভূমিকায় নামলেন। অভিনয়ের শেষে 'ভারত-সঙ্গীত' গাইলেন যাদুমণি।

আগস্ট মাস থেকে ভুবনমোহন নিয়োগী গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার শ্যামপুকুর-নিবাসী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিজ দিলেন। ধর্মদাস সুরকে ম্যানেজারের পদ থেকে সরানো হল। তাঁর জায়গায় এলেন মহেন্দ্রলাল বসু। ৭ আগস্ট, ১৮৭৫ তারিখে ঐদিনকার 'পদ্মিনী'

২৯ দ্র. অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্মৃতিচারণ—পঞ্চপুষ্প / আষাঢ়, ১৩৩৭।

৩০ "The portion of the Company, lately giving so many successful performances in Delhi, Lahore, etc., so favourably noticed in the papers, having just returned to Calcutta, the performances henceforth will be on a grand scale. The orchestra under the direction of Madan Mohon Barman is a charming one." (ইংলিশম্যান— ১৫৷৫৷৭৫)

সংবাদপত্রের উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকেই মনে হয় মদনমোহন বর্মণ এই সময় পুনরায় গ্রেট ন্যাশনালে যোগ দেন।

৩১ ইনি ছিলেন টডের রাজস্থানের সম্পাদক ও অমৃতবাজার পত্রিকার সহকারী সম্পাদক।

অভিনয়ের খবর দিয়ে নতুন ব্যবস্থার কথা জানালে 'ইংলিশম্যান'। পত্রিকাখানি লিখলে :—"Great National Theatre.—The Grand Beadon Street Pavilion, owned by Babu Bhuban Mohan Neogi, has been leased out to Babu Krishna Dhan Banarji, and this evening the brilliant and successful drama, Padmini, or the Jewel of Rajasthan, will be performed under the management of Babu Mahendro Nath Bose." রদ-বদলের কারণ সম্পর্কে অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন :—"মে মাসের মাঝামাঝি ধর্ম্মদাসবাবু সদলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। সম্প্রদায় যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছিলেন, বিশেষতঃ লাহোরে কাশ্মীরের মহারাজার সম্মুখে অভিনয় করিয়া গ্রেট ন্যাসান্যাল সম্প্রদায় যেরূপ অধিক অর্থ পাইয়াছিলেন, সেইরূপ শাল, জামিয়ার, স্বচ্ছ পাথর প্রভৃতি বহুমূল্য পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া ইঁহারা থিয়েটারের মালিক ভুবনমোহনবাবুকে যৎসামান্য অর্থ এবং কাশ্মীরাধিপতির উপহারস্বরূপ একখানি অল্পমূল্যের রুমাল ও একখানি ছোট পাথরের রেকাবি প্রদান করেন। কিছুদিন পরে সমস্ত রহস্য প্রকাশ হওয়ায় এবং থিয়েটারে লোকসান ও হিসাবপত্রের গোলমাল ইত্যাদি নানা কারণে বিরক্ত হইয়া ভুবনমোহনবাবু আগষ্ট মাস (১৮৭৫ খৃঃ) হইতে শ্যামপুকুর-নিবাসী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে থিয়েটার লিজ প্রদান করেন। কৃষ্ণধনবাবু থিয়েটারের 'ইণ্ডিয়ান ন্যাসান্যাল থিয়েটার' নামকরণপূর্ব্বক মহেন্দ্রলাল বসুকে ম্যানেজার করিয়া থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করেন,…।" নতুন ব্যবস্থাপনায় 'গ্রেট ন্যাশনালে'র নাম পরিবর্তিত হয়ে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার' হল এবং ধর্মদাস সুরের নেতৃত্বে কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী 'গ্রেট ন্যাশনাল' থেকে বেরিয়ে 'দি নিউ এরিয়ান (লেট ন্যাশনাল) থিয়েটার'. নাম নিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারে যোগ দিলেন। কৃষ্ণধন

বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু বেশী দিন থিয়েটার চালাতে পারেন নি। কিছুদিনের মধ্যেই উনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন, এমনকি বাড়ীভাড়া পর্যন্ত বাকী পড়ে যায়। ফলে, নভেম্বরে আবার ভুবনমোহন গ্রেট ন্যাশনালের কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন। The Indian (late Great) National Theatre নাম মুছে গিয়ে পুনরায় Great National Theatre বহাল রইলো। কৃষ্ণধনের আমলে 'শরৎ-সরোজিনী'[৩২] (১৪।৮), 'নীলদর্পণ'[৩৩] (২১।৮), 'অপূর্ব সতী'[৩৪] (২৩।৮), 'সতী কি কলঙ্কিনী ?' ও 'ভারত-সঙ্গীত' (২৮।৮), 'ডাক্তার-বাবু' (৪।৯), 'পুরু-বিক্রম' (১৮।৯), 'কনক পদ্ম'[৩৫] ও 'এই কলিকাল' (২৫।৯), 'বৃত্রসংহার'[৩৬] (৬।১১) প্রভৃতি অভিনীত হয়েছিল। 'অপূর্ব সতী' নাটক অভিনেত্রী সুকুমারী দত্তের লেখা। ওঁর সাহায্য-রজনীতে নাটকখানি মঞ্চস্থ হয়। অভিনেত্রী রচিত নাটকের অভিনয় বাংলাদেশের পাবলিক থিয়েটারে এই প্রথম। ডিসেম্বর থেকে যথারীতি ভুবনমোহন সরাসরি নিজেই গ্রেট ন্যাশনাল চালাতে

৩২ এই তারিখেই বেঙ্গল থিয়েটারে উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' খোলা হয়।

৩৩ "এই সময়েই অমৃতলাল বসু বেঙ্গল থিয়েটার হইতে আসিয়া 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটারে' যোগদান করেন বলিয়া মনে হয়।" (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

৩৪ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'অভিনেতৃ কাহিনী'তে আছে, জনৈক আশুতোষ দাস সুকুমারী দত্তকে এই নাটক লেখায় সহায়তা করেন।

৩৫ 'কনক পদ্ম' নাটকে অমৃতলাল বসু দুষ্মন্ত সাজেন।

৩৬ অমৃতলালের জীবনীকারের মতে ঐদিন পূর্বঘোষণাসত্বেও 'বৃত্রসংহার' মঞ্চস্থ হয় নি। তিনি জানিয়েছেন :— "৬ই নভেম্বর 'ইংলিশম্যানে' 'Grand Opening Night' ঘোষণা করিয়া তাঁহারা প্রায় দেড় মাস পরে হেমচন্দ্রের 'বৃত্র-সংহার' অভিনয় করিলেন।" (অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য— ডঃ অরুণকুমার মিত্র)

লাগলেন। ডিরেক্টর হয়ে এলেন উপেন্দ্রনাথ দাস আর ম্যানেজার-রূপে অমৃতলাল বসুকে নিযুক্ত করা হল। নতুন ব্যবস্থায় ২৫ ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার অমৃতলালের 'By An Actor' ছদ্মনামে লেখা প্রথম নাটক 'হীরকচূর্ণ'[৩৭] মঞ্চস্থ করলে। গাইকোয়াড়ের সিংহাসন-চ্যুতির ঘটনা নাটকের বিষয়বস্তু। "ভারতের বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের শাসনকালে বরোদার গাইকোয়াড় মলহার রাও হোলকার, তাঁহার রাজত্বের তদানীন্তন বৃটিশ রেসিডেন্ট সাহেবকে পানীয়ের মধ্যে হীরকচূর্ণ-মিশ্রিত বিষদ্বারা হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র-ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন এবং এইরূপ অভিযোগেই বিচারাধীন থাকিয়া সিংহাসন-চ্যুত হইয়াছিলেন।" (দৃশ্যকাব্য পরিচয়— সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়) সেকালে ঘটনাটি আমাদের দেশে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এ-নাটকে নাট্যকার স্বয়ং অ্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ স্কোবলের চরিত্রে রূপ দেন। মলহার রাও সাজেন অর্দ্ধেন্দুশেখর।[৩৮] লক্ষ্মী ও জগত্তারিণী হন যথাক্রমে লক্ষ্মীবাই ও কুমাবাই। 'হীরকচূর্ণ'

৩৭ প্রথম রচনা হিসাবে নাটকখানি দোষ ত্রুটির উর্দ্ধে ছিল না। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বান্ধব' (শ্রাবণ, ১২৮২) লিখেছিল :— "হীরকচূর্ণ নাটক। — লেখকের নাম নাই; গ্রন্থের মুখপত্রে এইমাত্র লিখিত আছে যে, তিনি একজন অভিনেতা। এবার রাজনীতির ঝঞ্ঝাবাতে বরদায় যে ভীষণতরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, এই নাটকখানি তাহারই একটুকু ফেনাস্বরূপ। ইহাতে কুমাবাইর চরিত্র ভিন্ন আর কোন অংশ তেমন প্রীতিপ্রদ বোধ হইল না। গ্রন্থকার মাননীয় পেট্রিয়ট সম্পাদককে যেরূপ তিরস্কার করিয়াছেন, তাহা কি ভাল হইয়াছে?"

একই বিষয়বস্তু অবলম্বনে এই সময় (১৮৭৫) আরো দুজন নাট্যকার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র নাটক রচনা করেন। নগেন্দ্রনাথের 'গুইকোয়ার নাটক' ২২ মে, ১৮৭৫ বেঙ্গল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়।

৩৮ অর্দ্ধেন্দুশেখরের এই অভিনয়ের স্মৃতিতে অমৃতলাল পরবর্তীকালে লিখেছেন :—

নাটকে মঞ্চের উপর রেলগাড়ি দেখানো হত। ইঞ্জিনিয়ার-নট যোগেন্দ্রনাথ মিত্র[৩৯] এই গাড়ি বানিয়েছিলেন। ওঁর সৃষ্ট আরো অনেক মঞ্চকৌশল সেকালের দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। ১৮৭৫ সাল শেষ হল উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' (৩১।১২) নাটক দিয়ে। বিনোদিনী হলেন সুকুমারী দত্ত। ইতিপূর্বে বেঙ্গলে মঞ্চস্থ হ'লেও গ্রেট ন্যাশনালে এ-নাটকের অভিনয় এই প্রথম।

১৮৭৬ সালের সুরুতে এখানে ব্রজেন্দ্রকুমার রায়ের 'প্রকৃত বন্ধু' (৮।১) অভিনীত হল। রাধামাধব কর এবং বিনোদিনী নায়ক-নায়িকা সাজলেন।[৪০] জানুয়ারি মাসের তিন রাত্রি (১৫, ২২ ও ২৯)

"নাট্যকার পরিচয় প্রথমে আমার হয়,
লিখিয়া 'হীরকচূর্ণ' গণি করুণায়।
সাজিয়া বরোদা রায়, নির্ব্বাসনে যবে যায়,
চাহনিতে অশ্রুবিন্দু অর্দ্ধেন্দু ঝরায়।"

"হীরকচূর্ণ নাটকে অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় হইয়াছিল অপূর্ব্ব। অঘোর পাঠক মহাশয় অর্দ্ধেন্দুর উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু তিনিও তাঁহার গাইকোয়াড়ের ভূমিকাভিনয়ের প্রশংসা করিতেন। তিনি বলিতেন নির্ব্বাসনে যাইবার সময় গাইকোয়াড়-অর্দ্ধেন্দু একবার আপন দেশের পানে তাকাইতেন। সে করুণ চাহনি ছিল অপূর্ব্ব।" (ভারতীয় নাট্যমঞ্চ— হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত)

৩৯ এঁর সম্পর্কে অমৃতলালের স্মৃতিচারণে লেখা হয়েছে :— "সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, সেই সেকালের প্রথম 'লীলাবতী' অভিনয়ে (১১।৫।১৮৭২) ইনি নদেরচাঁদ,— এমন নদেরচাঁদ আজ পর্য্যন্ত হয় নি, তবে অভিনেতারূপে তাঁর বিশেষ নাম নাই ; মঞ্চসম্বন্ধীয় নেপথ্যাচার কার্য্যে তিনি ধর্ম্মদাস সুরের সুদক্ষ সহায় ছিলেন ; আর ষ্টার থিয়েটারের কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটস্থ বর্ত্তমান বাটীই তাঁর স্থপতি বিদ্যার সাক্ষ্য দিতেছে ; মন্দিরোপম সুচিত্র কারুকার্য্যভূষিত উক্ত নাট্যশালার গোপুরটি যোগীবাবুর কল্পিত আদর্শে গঠিত।..." (মাসিক বসুমতী— জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪)

৪০ "...নতুন নাটকের অভিনয় হ'ল, তার নাম "প্রকৃত বন্ধু"। এ নাটকে নায়ক সাজলেন স্বর্গীয় মাধুবাবু। এঁর পুরা নাম বাবু রাধামাধব কর।...মাধুবাবু

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী'[৪১] মঞ্চস্থ করার পর ফেব্রুয়ারির ৫, ১২ এবং ১৬ তারিখে গ্রেট ন্যাশনাল যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বিরচিত 'বিদ্যাসুন্দর' নামালে। 'সরোজিনী' নাটকের নামভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন বিনোদিনী। অমৃতলাল-বিজয়সিংহ।[৪২]

নায়ক, আমি বয়সে ছোট হ'লেও নায়িকা।…" (আমার কথা— বিনোদিনী দাসী)

৪১ 'পুরু-বিক্রম নাটকে'র মত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী'র মূলেও আছে বিদেশী প্রভাব। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন :— "গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিদিস খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে 'ইফিজেনিয়া এ্যাট অলিস' নামক নাটক রচনা করেন। গ্রীক পুরাণের একটি কাহিনী অবলম্বন করিয়া নাটকটি রচিত হইয়াছিল। তারপর সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ফরাসী নাট্যকার জঁা রাসিন এই কাহিনী অবলম্বন করিয়া তাঁহার 'ইফিজেনিয়া' নাটক রচনা করেন। ইহাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের ভিত্তিস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে, পুরাপুরি গ্রীক নাটকটি নহে।" (বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস—প্রথম খণ্ড)

'সরোজিনী'র অভিনয় সাফল্য সম্পর্কে 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'তে আছে :— "সরোজিনী' প্রকাশিত (৩০।১১।১৮৭৫) হইবামাত্র কলিকাতার সাধারণ থিয়েটারে বইখানি অভিনীত হইয়া গেল।…সমাজে খুব প্রশংসা লাভ করিল। জ্যোতিবাবুর নাট্যকার বলিয়া একটা খ্যাতিও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। বিশেষতঃ সরোজিনী অভিনয়ের পর, বাঙ্গলা দেশে জ্যোতিবাবুর যশের বিজয় দুন্দভি বাজিয়া উঠিল। সকলেই একটা অভূতপূর্ব্ব অমৃত আস্বাদনের তৃপ্তি সুখে বিভোর হইয়া গেল।"

৪২ "…আমি যখন "সরোজিনী"তে "সরোজিনী"র অংশ অভিনয় করিতাম, তখন এখনকার "ষ্টারে"র সুযোগ্য ম্যানেজারমহাশয় (অমৃতলাল বসু) ঐ নাটকে বিজয়সিংহের অংশ অভিনয় করিতেন।…" (আমার কথা)

'সরোজিনী'র সাফল্যমণ্ডিত অভিনয় এবং অন্যতম প্রধান অভিনেতা অমৃতলালের কৃতিত্বের উল্লেখ রয়েছে মন্মথনাথ ঘোষ রচিত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন :— " 'সরোজিনী'ও মহাসমারোহে ন্যাসানাল থিয়েটারে

১৯ ফেব্রুয়ারি 'সরোজিনী' নাটকের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নামে এক প্রহসন জুড়ে দিলেন। আর এই অভিনয়ের ফলে গ্রেট ন্যাশনাল তথা বাংলা থিয়েটারের শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন জীবনে ঘটলো প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, যার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তী কালের রঙ্গালয় গভীরভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিল। যে ঘটনাকে ভিত্তি ক'রে এই প্রহসন এবং তার প্রতিক্রিয়া সেই ঘটনাটি এই রকম।

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন

১৮৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রিন্স অব ওয়েলস্ (পরে সপ্তম এডওয়ার্ড) ভারত ভ্রমণে কলকাতায় এসে বাঙালী পরিবারের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের ইচ্ছা জানালে রাজভক্ত প্রজা ও হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়[৪৩] তাঁকে ভবানীপুরের স্বগৃহে সাদর অভ্যর্থনা জানান। এই উপলক্ষে গৃহস্বামিনী এবং পরিবারের অন্যান্য মহিলারা যুবরাজকে ভারতীয় প্রথা মতে শংখধ্বনি ও হুলুধ্বনি দ্বারা বরণ করেন। বিদেশী ও বিধর্মী পুরুষের অন্তঃপুর প্রবেশের সংশ্লিষ্ট ঘটনায় সমকালীন হিন্দু সমাজে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং পত্র-পত্রিকায় সমালোচনার ঝড় ওঠে। তীব্র ক্ষোভে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লেখে :— "...that the national feeling had been outraged at the price the Babu paid for his honour...."[৪৪] 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সরোষে জানায় :— "The

উপর্যুপরি অভিনীত হইল এবং দর্শকগণের নিকট প্রভূত প্রশংসা লাভ করিল। অমৃতলাল বিজয়সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয়চাতুর্যে সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন।"

৪৩ পরবর্তীকালের বিশিষ্ট অভিনেতা রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় এঁরই বংশধর।

৪৪ The Indian Stage (vol. II)— Hemendra Nath Das Gupta.

Hindu society can bear all oppression, but no shock to its womanhood. Any person, who allows the family to be defiled from outside, is a disgrace, nay a great enemy, to the Hindu."[৪৫] এই উপলক্ষে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাজীমাৎ' নামে এক বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করেন।[৪৬] তাতে, সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণে সস্ত্রীক জগদানন্দকে জর্জরিত করা হয়। কবি লেখেন ঃ—

৪৫ The Indian Stage (vol. II)—Hemendra Nath Das Gupta.

৪৬ 'বাজীমাৎ' ১২৮২, ৭ মাঘ 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। কবির জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ কবিতাটির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে জানিয়েছেন :— "১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর দিবসে যুবরাজ (পরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি রাত্রিকালে তিনি কলিকাতা হইতে প্রস্থান করেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর 'জেনানা' দেখিতে বোধহয় যুবরাজের ইচ্ছা হয়। হাইকোর্টের জুনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর তখন বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি যুবরাজের অভিপ্রায় অবগত হইয়া ৩রা জানুয়ারি সন্ধ্যাকালে যুবরাজকে ভবানীপুরে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করেন এবং যুবরাজও এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। যুবরাজকে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারস্থ মহিলাগণ অভ্যর্থনা ও বরণ করেন। এই ব্যাপার লইয়া সে সময়ে হিন্দু সমাজে মহা আন্দোলন হয়।…

হাইকোর্টে উকীল লাইব্রেরীতে এই ব্যাপার লইয়া মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল। সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট-প্লীডার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন অতি আচারনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন, তেমনই পরিহাস-রসিক ছিলেন। তিনি এই ব্যাপারে যেমন ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, তেমনই এই ব্যাপার লইয়া ব্যঙ্গকৌতুকও করিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্রের রহস্য-কবিতা রচনার ক্ষমতা তিনি জানিতেন, তিনি কেবলই হেমচন্দ্রকে উত্তেজিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হেম, তুই এই নিয়ে একটা কিছু লেখ্ না।" এই অনুরোধ ও উত্তেজনার ফলে হেমচন্দ্রের 'বাজিমাৎ' রচিত হয়।" (হেমচন্দ্র—২য় খণ্ড)

"বেঁচে থাকো মুখুয্যের পো, খেল্লে ভাল চোটে।
তোমার খেলায় রাং রূপো হয়, গোবোরে শালুক ফোটে॥
"ফিক্র" দানে, এক তড়াতে, কল্লে বাজি মাৎ।
মাছ, কাতুরে ভেকো হলো—কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ॥

সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায়!
দেখালে অদ্ভুত কীর্ত্তি বকুল তলায়!
পুণ্য দিন বিশে পৌষ বাঙ্গালার মাঝে।
পর্দ্দা খুলে কুলবালা সম্ভাষে ইংরাজে॥
... ...
ধন্য হে মুখুয্যেভায়া বলিহারি যাই।
বড় সাপ্টাদরে সাৎ করিলে খেতাব "সি, এস্, আই"॥

হেদে ও-সহরবাসি আর্ কি হাসি হাসবি রেড়ো বলে?
দেখনা চেয়ে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে রানীর ছেলে॥
চৌঘুড়িতে-সঙ্গে করে সাদা মোসাহেব—
নাড়ীটেপা ফেরার সাহেব, বার্টেল নায়েব॥
আর্ কেন লো ঘোমটা খোল, কবির কথা রাখো।
"লাইট" পেয়ে "রাইট" হয়ে, পার্ হও লো সাঁকো॥
ভয় কি তাতে, লজ্জা কি তায়, কাল বদনখানি।
দেখ্‌বে খালি চক্ষে চেয়ে যুবা নৃপমণি॥
কজ্জা তুলে দেখ্‌বে বাজু, দেখবে কাণের দুল,
দেখবে কণ্ঠি, কণ্ঠহার, পিঠের ঝাঁপাফুল॥
আয় এয়োগণ কর্‌বি বরণ পরে চরণ চাপ—
শিবের বিয়ে নয়লো ইহা ধরবে নাকো সাপ॥
এগিয়ে এসো বড় ঠাক্‌রুণ, সাত পোয়াতির মা।
তক্ত পাবেন তোমার তিনি তাও কি জান না?

সোণার থালে হীরের মালা তাতে ঢাকাই ধুতি,
নজর দিয়ে, দেখাও খুলে বউ বিননো পুতি ॥
বাহবা বুক, বুড় বয়সে গলায় কাপড় দিয়ে,
রাজ্ পূজাটী কল্লে ভাল, ফুলের মালা নিয়ে !
কোন্ শাস্ত্রে লেখে বল বাম্‌নের মেয়ে হয়ে !
রাজার ছেলের পা পূজিবে ফুলের সাজি লয়ে ॥"

... ...

উত্তেজনা যখন তুঙ্গে, সেই সময় এই ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের পক্ষ থেকে লেখা হল এক প্রহসন-'গজদানন্দ ও যুবরাজ'। রচয়িতার নাম জানা যায় নি।[৪৭] তবে, প্রহসনের গানগুলি গিরিশচন্দ্রের রচনা ব'লে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের অনুমান।

একটি কোরাস গান ছিল এইরকম :—

"ওলো ঘুবতে পারিনে আর, ধ'রে গিয়েছে পা
কেন গায়ে পড়িস্ ঢ'লে ওলো স'রে যা
হাতে নিয়ে ঝারি, চল্‌তে কি পারি,
একটু থেমে চল্
ওলো ঘেমে গিয়েছে গা।"

ক্ষেত্রমণির গাওয়া একটি গান :—

"আমি পিসী থাক্‌তে
ভাবনা কিরে বোকা ছেলে
অনেক সুকৃতির ফলে
আমার মতন পিসী মেলে।"

৪৭ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর The Indian Stage—vol. II-তে লিখেছেন, প্রহসনখানি উপেন্দ্রনাথ দাসের লেখা (পৃঃ ২৬৮)। আবার ওঁরই 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চে' বলা হয়েছে :— "প্রহসনখানির রচনা যে কাহার, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। ..." (পৃঃ ৭৯)

হাইকোর্টের সম্মুখস্থ দৃশ্যে অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) গাইতেন :—

"(ওরে) জ'জ হ'তে চাও
গজ গিরিধন।"[৪৮] ইত্যাদি

প্রহসনটির প্রধান দুই ভূমিকায় অভিনয় করতেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (যুবরাজ) এবং মহেন্দ্রলাল বসু (গজদানন্দ)। এই 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' কর্তৃপক্ষ মঞ্চস্থ করলেন ১৮৭৬, ১৯ ফেব্রুয়ারি 'সরোজিনী' নাটকের শেষে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল :—

GREAT NATIONAL THEATRE

THIS EVENING

SATURDAY, 19th FEBRUARY, 1876

for the last time

SAROJINI

TO CONCLUDE WITH THE FARCE

GOJANANDA AND THE PRINCE ! !

Come, ye men of the long robe

(ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ—১৯।২।১৮৭৬)

প্রথম অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় কয়েকদিন পর (২৩।২) অমৃতলালের সাহায্যরজনীতে 'সতী কি কলঙ্কিনী ?'র সঙ্গে প্রহসনটি আবার অভিনীত হল। তবে, ঐ রাত্রে শেষ পর্যন্ত 'গজদানন্দ

৪৮ জগদানন্দ ও অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন সংক্রান্ত তথ্যাদি অংশতঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বই থেকে নেওয়া।

ও যুবরাজ' ভিন্ন নামে ও আকারে পরিবেশিত হয়।[৪৯] দ্বিতীয় অভিনয়ের পরেই পুলিশ থেকে এই ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক প্রহসনের অভিনয় বন্ধ ক'রে দিলে। কিন্তু থিয়েটার কর্তৃপক্ষ তাতে ক্ষান্ত না হয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'গজদানন্দ ও যুবরাজ'কে 'হনুমান চরিত্র' নামে রূপান্তরিত ক'রে 'কর্ণাটকুমার' নাটকের সঙ্গে নামালেন। এই অভিনয়ের শেষে ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন।[৫০] অভিনয়ের দিন 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' পত্রিকায় নীচের সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল :—"GREAT NATIONAL THEATRE :—To-night (Saturday) the "Prince of Carnata", a new drama, will be performed for the first time by the above Theatrical Company at Beadon Street, after which the Director of the Company, Baboo Upendro Nath Doss, will deliver an address, and in conclusion the re-named farce, *Hanoomana Charitra* will be presented for the second time, by request of many persons who had not the opportunity of seeing it last Wednesday." (২৬।২।১৮৭৬) প্রসঙ্গতঃ, 'ভারত-সংস্কারক' (৩।৩।১৮৭৬) ৲ নালে :—"ন্যাসন্যাল থিয়েটারের জন্য গজদানন্দ এবং যুবরাজ নামক যে ইতব রুচির নাটক প্রস্তুত হয়, পুলিসের রক্ত-চক্ষু দেখিয়া নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ তাহা অভিনয় করিতে ক্ষান্ত হন। যুবরাজকে দিল্লীশ্বর হোরাঙ্গজিবের পুত্র এবং গজদানন্দকে হনুমান বলিয়া প্রকারান্তরে

৪৯ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের নির্দেশানুসারে ১৮৭৬,২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরার' দ্রষ্টব্য।

৫০ "অভিনয়-রজনীতে উপেন্দ্রনাথ রঙ্গালয়ে পুলিশি হস্তক্ষেপের নিন্দা করিয়া বঙ্গীয় নাট্যশালার স্বাধীনতা রক্ষা বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন।" (ভারতকোষ— প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৪৪)

সেই নাটক অভিনীত হইয়াছে। যাহা হউক এরূপ নাটকের জন্য গবর্ণমেণ্টও মুদ্গর প্রস্তুত করিয়াছেন।" পুলিশের হুকুমে যখন 'হনুমান চরিত্র' এবং 'কর্ণাটকুমার' অভিনয় বন্ধ হয়ে গেল, গ্রেট ন্যাশনাল তখন ১ মার্চ ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাসের সাহায্যরজনীতে পুলিশকে ব্যঙ্গ ক'রে "The Police of Pig and Sheep" নামে এক প্রহসন মঞ্চস্থ করলে।[৫১] সেই সঙ্গে অভিনীত হল 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'। অভিনয়ের শেষে উপেন্দ্রনাথ 'অভিনেত্রী' সম্পর্কে একটি ইংরেজী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে সংবাদপত্রে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল তা এইরকম ঃ—

GREAT NATIONAL THEATRE

WEDNESDAY, 1st. MARCH, 1876

For the Benefit of Baboo Upendra N. Das

Director, G. N. Theatre

SURENDRA BINODINI

To conclude with a new Farce

"THE POLICE OF PIG & SHEEP!"

A Long Railway Train on the Stage !!

An English speech by the Director, on "Actresses."

(ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ—১।৩।১৮৭৬)

৫১ "The troupe next arranged to hold on the 1st March, a performance of Surendra-Vinodini along with the above farce under a queer name Police of Pig and Sheep, criticising the spirit of Sir Stuart Hogg, Commissioner of Police, and Mr. Lamb, Superintendent of Police, for having taken up a hostile attitude." (The Indian Stage—vol. II—Hemendra Nath Das Gupta).

ইতিমধ্যে ২৯ ফেব্রুয়ারি বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক এই শ্রেণীর নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ ক'রে এক অর্ডিন্যান্স জারি করেছেন এবং স্থায়ী প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে গভর্নমেণ্টের উদ্যোগে আইন প্রণয়নের তোড়জোড় সুরু হয়ে গেছে। ১ মার্চের অভিনয়রাত্রে রঙ্গালয়ে পদার্পণ ক'রে পুলিশ সেই নিষেধাজ্ঞা গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ম্যানেজার অমৃতলাল বসুর হাতে তুলে দিলেন।[৫২] এই অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় লেখা হল :—"A Gazette of India Extraordinary was issued last evening containing an Ordinance to empower the Government of Bengal to prohibit certain dramatic performances, which are scandalous, defamatory, seditious, obscene or otherwise prejudicial to the public interest....

We need hardly say that the Ordinance is issued consequent on the performance of that scandalous

৫২ "...On the representation of the Government of Bengal, His Excellency Lord Northbrooke, the Viceroy, issued an Ordinance from Simla as an emergency measure under the Government of India Act, with a view to give the Government of Bengal power to control the dramatic performances....Armed with this authority Mr. Lambert, Deputy Commissioner and Mr. Lamb, Superintendent of Police with Babu Amritalal Dutt, Inspector, Shampukur Thana, came to the Great National Theatre on the 1st March, 1876, when the performance was going on and in absence of the honorary director Mr. Upendra Nath Das, handed over the order to Babu Amritalal Bose, the manager, asking the authorities not to play the farce Gajadananda, Hanuman-Charitra or Police of H[illegible] and Sheep, in the night and similar other farces that were libellous and obscene, any more on their stage, on pain of penalty under the Ordinance." (The Indian Stage—vol. II—H. N. Das Gupta)

farce, entitled "Gajanund" on the stage of a disreputable Native Theatre in Calcutta. All honour to Lord Northbrook for the prompt action taken by him to uphold the cause of public morality and decency. The Ordinance shall remain in force till May next by which time a law will be passed by the Viceregal Council on the subject." (১।৩।১৮৭৬)।

সরকারের এসব উদ্যোগ-আয়োজনের কথা জেনেই বোধহয়, গ্রেট ন্যাশনাল আর ঐ সমস্ত প্রহসনের দিকে না ঝুঁকে সাধারণ অভিনয়ে মন দিলে। কিন্তু শাসক শ্রেণী তখন বদ্ধপরিকর থিয়েটার কর্তৃপক্ষকে যে কোনো উপায়ে শায়েস্তা করবেনই। তাই, ৪ মার্চ যখন গ্রেট ন্যাশনাল মঞ্চে 'সতী কি কলঙ্কিনী ?'র অভিনয় চলছে, তখন পুলিশের ডেপুটি কমিশ্যনর রঙ্গালয়ে হানা দিয়ে সম্প্রদায়ের ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু এবং মতিলাল সুর প্রমুখ আটজন অভিনেতাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেলেন।[৫৩] তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল, তাঁরা ইতিপূর্বে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নামে যে নাটক অভিনয় করেছেন তা অশ্লীল।[৫৪] ৬ মার্চ

৫৩ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, নীচের দশজনের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল :— ভুবনমোহন নিয়োগী (স্বত্বাধিকারী), উপেন্দ্রনাথ দাস (ডিরেক্টর), অমৃতলাল বসু (ম্যানেজার), মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র দাস (এঁরা সবাই অভিনেতা), রামতারণ সান্যাল (অপেরা মাষ্টার) এবং বঙ্কুবিহারী দাস (বিজনেস্ ম্যানেজার)। ভুবনমোহন নিয়োগী ছাড়া এঁদের সকলকেই ঐ রাত্রে গ্রেপ্তার করা হয়। ভুবনমোহন পরের দিন আদালতে আত্মসমর্পণ করেন।

৫৪ গ্রেট ন্যাশনাল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযোগগুলি হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের The Indian Stage—vol. II-তে সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে।

উত্তর-বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেট পি. ডি. ডিকেন্সের এজলাশে আসামীদের বিচার সুরু হল। ৮ মার্চ বিচারক রায় দিলেন, অভিযোগ প্রমাণিত। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর ও ম্যানেজার যথাক্রমে উপেন্দ্রনাথ দাস এবং অমৃতলাল বসুর একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড আর অন্য সকলের মুক্তি। "এই বিচার সম্পর্কে 'ভারত-সংস্কারক' পত্রিকা ১০ই মার্চ মন্তব্য করেন—'যেরূপ বিচার হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, দোষ প্রমাণ হউক না হউক, দণ্ড দেওয়াই উদ্দেশ্য।" (অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য—ডঃ অরুণকুমার মিত্র) পরদিন (৯।৩) কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টে আপীল করলেন এবং বিচারপতি ফিয়ার ও মার্কবীব এজলাসে আপীলের শুনানী সুরু হল। এটর্নী গণেশচন্দ্র চন্দ্রের নির্দেশে মিঃ ব্রানসন্, মনোমোহন ঘোষ এবং টি.

'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের অভিনয়ে নাকি, "1. Both Babus Upendra Nath Das and Amritalal Bose Director and Manager on March 1, 1876, at Great National Theatre wilfully exhibited to public view an obscene representation of a woman having her saree stained with blood in front, carried in the arms of a man having his shirt stained with blood in front, intending thereby to represent the immediat results of such woman having been defloured by such man.

2. Babu Amritalal Bose as District Magistrate recited and uttered the following obscene words to the annoyance of others : (i) Have you got a handsome sister ? Send her to my bed one day. I consent to give you some money.

(ii) Beauty (Sundari), I can't wait any longer. I am still addressing you in soft words. Consent to bestow your love ; if you don't consent. I will take it against your will.

(iii) Sundari, come to my embrace. I am not a tiger or a bear or a hog. I want to taste your love.

পালিত আসামীপক্ষে দাঁড়ালেন। সারা শহর উদগ্রীব ফলাফল জানার প্রত্যাশায়। শুনানীর দিন আদালতে লোক ধরে না। 'সাধারণী' (৭ চৈত্র, ১২৮২) লিখলে:— "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকের অশ্লীলতা অভিনয় করার মোকদ্দামার মোশন বিগত বৃহস্পতিবার জজ ফিয়র ও মার্কবির কাছে শুনানী হইয়াছিল। হাইকোর্ট লোকে লোকারণ্য। যুবক ও মধ্যবিত্তের ভাগই অধিক,.... কিন্তু হলহলা হয় নাই। সকলে নিঃস্তব্ধে কান পাতিয়া কথাগুলি শুনিতেছিল। বলিদানের পূর্বে তান্ত্রিক ভবনেও সেরূপ তুষ্ণীন্‌ভাব কখনও বিরাজ করেনা।"[৫৫] সকল দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে ২০ মার্চ আদালত রায় দিলে, 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকে অশ্লীলতা নেই। সুতরাং নিম্ন আদালতের পূর্বাদেশ নাকচ ক'রে আসামীদের মুক্তি দেওয়া হল।[৫৬] মামলা চলার সময় এবং অব্যবহিত পরে গ্রেট ন্যাশনালের অভিনয় কিন্তু বন্ধ ছিল না। ১১ ও ১৮ মার্চ এবং ১ এপ্রিল তাঁরা যথাক্রমে 'সরোজিনী' ও 'আনন্দ কানন' এবং 'পদ্মিনী' মঞ্চস্থ করেন। প্রথম নাটকটি এই মামলার সাহায্যকল্পে অভিনীত হয়। এই উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপনে আবেদন জানিয়েছিলেন:—

---

৫৫ দ্র. অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য— ডঃ অরুণকুমার মিত্র।

৫৬ "Mr. Justice Phear in delivering judgment on 20th March, 1876 on Revision, expressed that the words and passages whatever animadversion the use and utterance of them on the occasion may be open to, are not obscene within the meaning of sections 292, 294. I. P. C. and there was no ground whatever on which the conviction could be legally supported.

Mr. Justice Markby concurred in the Judgment.

The two prisoners were thus set at liberty."

(The Indian Stage-vol. II—Hemendra Nath Das Gupta)

"Patriots and countrymen, come and support us now, or never."

গ্রেট ন্যাশনালের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ টিঁকলো না। উপেন্দ্রনাথ দাস ও অমৃতলাল বসু বেকসুর খালাস পেলেন। গভর্নমেণ্টও নীরবে বসে নেই। ইতিমধ্যে, অর্ডিন্যান্সের মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। তাই, ইংরেজ সরকার এবার অগ্রসর হলেন Dramatic Performances Control Bill নামক মোক্ষম অস্ত্র নিয়ে। ১৮৭৬ সালের মার্চ মাসে তাঁরা কাউন্সিলে বিলের খসড়াটি পেশ করলেন আর এই বছরেরই শেষের দিকে তা আইনরূপে বিধিবদ্ধ হয়ে গেল।[৫৭] বিলটিতে বলা হল :— "That whenever the Government was of opinion that any dramatic performance was scandalous or defamatory or likely to excite feelings

৫৭ "After the Bill was presented in the house and members of the Council considered the Bill, it was placed before a select committee consisting of the members :— Mr. Cockrel, Raja Narendra Krishna Deb Bahadur, Sir Alexender Arbuthnot and Mr. Hobbhouse. They agreed unanimously that the Bill should be passed.

It was next placed before the Legislative Council for final debates and then passed into the Dramatic Performances Act of 1876". (The Indian Stage—vol II)

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, "এই কুখ্যাত আইনটি সিন্দবাদের বুড়োর মতো বহুদিন পর্যন্ত আমাদের ওপর চেপে ছিলো। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে আদালতের রায়ে আইনটি অকেজো ব'লে ঘোষণা করা হয়। তারপর West Bengal Dramatic Performances Bill নামে পরিবর্তিত আকারে বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা হয়। তখন থেকেই নাট্যামোদীরা এই বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে থাকেন, অবশেষে পরিকল্পনাটি রাজ্য সরকার প্রত্যাহার করেন।" (বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

of dissatisfaction towards the Government or likely to cause pain to any private party in its performance, or was otherwise prejudicial to the interest of the public, Government might prohibit such a performance". বিলে'র সাত নম্বর ধারায় রাজকর্মচারীদের ক্ষমতাদানের সুপারিশ করা হল এইরকম ঃ— "If any Magistrate has reason to believe that any house, room or place is used or is about to be used for any performance prohibited under the Act, he may by warrant authorise any officer of Police to enter with such assistance as may be requisite by night or by day and by force if necessary to enter any such house, room or place and to take into custody all persons whom he finds there for the said purpose."

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে সেকালে কম প্রতিবাদ হয় নি। কয়েকটি পত্র-পত্রিকা এবং কিছু রক্ষণশীল মানুষ এ ব্যাপারে সরকারকে সমর্থন করলেও, সামগ্রিকভাবে দেশের শিক্ষিত নাগরিকবৃন্দ এবং অধিকাংশ সংবাদপত্র এই আইনের বিরুদ্ধে অভিমত দিয়েছিলেন। ৪ এপ্রিল, ১৮৭৬ তারিখে কলকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভায় প্রস্তাবিত বিলে'র বিরুদ্ধে এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল ঃ— "I. That this meeting is of opinion that the Ordinance of February 29th., 1876, was an exercise of the extraordinary powers of the Viceroy not called for by the exigencie of the case ; and that the production of single a farce condemned by the general sense of the community, on the boards of a single theatre in

one of the Presidency Towns, does not justify the introduction of a stringent measure regulating the stage throughout British India.

II. That the Dramatic Performances' Bill, now before the Imperial Legislature, is objectionable in as much as—(a) It makes no distinction between public and private theatres. (b) There is no critical organisation capable of doing justice to the difficult task conscientious censorship. (c) The reasons for the prohibition of plays are too general. (d) The penalties are too severe and all embracing. (e) Summary adjudication by Magistrates, unassisted by a jury, may lead often to miscarriage of justice. (f) There is no necessity in this country to grant the power of licensing theatres.

III. That in order to give effect to the here-in-before resolutions, the undermentioned gentlemen be requested to serve as a committee to draw up and submit a memorial to the Legislature and to forward generally the objects of this meeting...." (ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ—৮।৪।১৮৭৬) কমিটিতে ছিলেন রাসবিহারী ঘোষ, পণ্ডিত নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য, রাজেন্দ্র মল্লিক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। পরবর্তীকালে 'সাধারণী'র সংবাদে প্রকাশ :—"গত ৬ই ডিসেম্বর গবর্নর জেনারাল বাহাদুরের সভায় নাটকাভিনয় সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই আইনটি যাহাতে বিধিবদ্ধ না হয় তজ্জন্য ভারতসভা প্রভৃতি অনেকগুলি সভা হইতে যুক্তিযুক্ত আবেদন প্রেরিত হয়। গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটার হইতে একজন

বারিষ্টরও প্রেরণ করা হইয়াছিল।[৫৮] কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে।" (৩ পৌষ, ১২৮৩) ১৪ ডিসেম্বর, ১৮৭৬ 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লিখলে:—"নাটক সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এ আইন বিধিবদ্ধ না হয়, এই জন্য অনেকগুলি আবেদন প্রদত্ত হয়, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভাতে তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। যুবরাজ যদি এখানে না আগমন করিতেন, তাহা হইলে হয়ত এ আইনটি বিধিবদ্ধ হইত না। এ আইনের উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা গবর্ণমেণ্ট আমাদের উপর আর একটী শাসন স্থাপন করিলেন। আমরা শাসনের প্রভাবে নির্জীব হইয়াছি। গবর্ণমেণ্ট যদি আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক সমুদয় কার্য্যের উপর পর পর এইরূপ শাসন স্থাপন করিতে থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আর দীর্ঘকাল আমাদের এ আইনের অধীন থাকিয়া ইংরাজ রাজার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে না। ভারতবর্ষবাসীরা এরূপ স্থানে গমন করিবে, যেখানে আর ইংরাজ শাসনের ভ্রুকুটীতে তাহাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না।" (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

অস্বীকার ক'রে লাভ নেই, বাংলা থিয়েটারের আদি যুগে ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক ও শালীনতাবর্জিত এক শ্রেণীর প্রহসনের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল এবং দীর্ঘকাল যাবৎ এ জাতীয় নাটক আমাদের দেশের পেশাদার মঞ্চের উপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে এসেছে। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তনের প্রায় পঁচিশ বৎসর পরেও তাই 'রঙ্গভূমি' (১২।১।১৯০১) সক্ষোভে লিখেছিল:— "কি কুক্ষণে "গজদানন্দ" অভিনয় করা হইয়াছিল! সেই দুষ্ট মুহূর্তে

---

৫৮ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন:— "Mr. W. C. Bonerjee made a strong case on behalf of the Theatrical Companies." The Indian Stage--vol. II)

যে ব্যক্তিগত শ্লেষের বীজ উপ্ত হইয়াছিল,[৫৯] তাহার পরিণামে আজ থিয়েটারে দেশের মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত সকল লোকেরই লাঞ্ছনা করা হইয়া থাকে, সেই বিষবৃক্ষের ফলে আজ অন্ধ হেমবাবুকে লইয়াও থিয়েটারে শ্লেষ বিদ্রূপ করা হইতেছে ; তিনি অন্ধ হইয়া একটা রহস্যের পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন ! থিয়েটারে সামাজিক ব্যাধির ঔষধ দিবার সুবিধা আছে বলিয়া কি ব্যক্তিগত বিদ্বেষবশে ব্যক্তিগত নির্ব্বুদ্ধিতা, দোষ, পাপ এবং কুকার্য্য লইয়া থিয়েটারে সঙ দিতে হইবে ? নাট্যালয়াধ্যক্ষেরা যদি এই ভুলে না পড়িতেন, তবে আজ বাবু, একাকার, রাজা বাহাদুর, কালাপানি, বেজায় আওয়াজ, আজব কারখানা, স্বাধীন জেনানা, অবলা ব্যারাক, রুক্মিণীরঙ্গ, রক্তগঙ্গা, থিয়েটার, লজ্জা, তেরস্পর্শ প্রভৃতি কুৎসিত পুস্তকের সৃষ্টি হইত না।…”

৫৯ ‘গজদানন্দ ও যুবরাজ’ হ’তে বাংলাদেশে ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক প্রহসন রচনার সুরু, ‘রঙ্গভূমি’র এই ইঙ্গিত ঠিক নয়। এই ঘটনার বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে সৌখিন নাট্যচর্চার যুগে ১৮৬৬, ১৫ ডিসেম্বর পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ-নাট্যালয়ে অভিনীত ‘বুঝলে কি না’ প্রহসনের উত্তরে কয়লাহাটা বঙ্গনাট্যালয়ে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় রচিত ‘কিছু কিছু বুঝি’ মঞ্চস্থ হয় (২।১১।১৮৬৭)। “…প্রহসনখানির সর্ব্বত্র পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীর প্রতি প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ ও আক্রমণ ছিল।……বিশেষ করিয়া দন্তবক্রের চরিত্র— যাহাতে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে বিদ্রূপ করা হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।…” (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, “…‘কিছু কিছু বুঝি’তে অর্দ্ধেন্দু অভিনয় করেন, সেই তাঁহার প্রথম রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ। উক্ত শ্লেষ প্রহসনে তাঁহার তিনটী অংশ ছিল। তাহার একটী অংশ রাজবাটীর কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিদ্রূপ। ইহাতে তিনি তাঁহার পিতৃষসা-গৃহে বিরক্তিভাজন হন ; তাঁহার পিতা তাঁহাকে অভিনয় করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু নাট্যোন্মাদী অর্দ্ধেন্দু ক্ষান্ত হইলেন না, তাহাতে তাঁহাকে পিতৃষসার গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয়।…” (গিরিশচন্দ্র)

বলাবাহুল্য, ‘দন্তবক্র’ চরিত্রে রূপদানের ফলেই অর্দ্ধেন্দুশেখরের ব্যক্তিগত জীবনে এই পারিবারিক দুর্যোগ ঘটে।

তালিকার এইখানেই শেষ নয়। অন্ততঃ বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত এ জাতীয় রচনার জের চলে এসেছে। এই সময় অমরেন্দ্রনাথ দত্তের বহু প্রহসনে শালীনতাবর্জিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচারের প্রবণতা দেখা যায়।[৬০] এমনকি, সাহিত্যে দুর্নীতির কট্টর সমালোচক দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনও আলোচ্য দোষে দুষ্ট।[৬১] রসরাজ অমৃতলাল বসুও ব্যতিক্রম নন।[৬২]

পূর্বোক্ত পরিস্থিতিতে স্বভাবতই একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা ও সুরুচিসম্পন্ন মানুষ পাবলিক থিয়েটারের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। সাধারণ রঙ্গালয়ে বারনারী নিয়োগে এঁদের উষ্মা আরো বর্দ্ধিত হয়েছিল। 'ভারত-সংস্কারক', 'মধ্যস্থ', 'ইণ্ডিয়ান মিরার' প্রভৃতি পত্রিকার তাই বঙ্গীয় নাট্যশালার বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত ছিল না। আর, এঁদের সক্রিয় সমর্থন অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নের পথ সহজ ও সুগম করেছে।

কিন্তু নিছক অশ্লীল নাটক নিবারণের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত

---

৬০ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬) রচিত চাবুক, গুপ্তকথা, লাট-গৌরাঙ্গ বা ভক্ত বিটেল, আহা মরি, কিসমিস প্রভৃতি প্রহসনে সমকালীন কোনো না কোনো ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ ও কটুক্তি করা হয়েছে। তালিকার অন্তর্ভূক্ত কৌতুকনাট্য 'আহা মরি' এই কারণেই গভর্নমেণ্টের আদেশে নিষিদ্ধ হয়।

৬১ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আনন্দ-বিদায়' প্রহসনে নাট্যকারের বিদ্রূপের লক্ষ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। "...প্যারডি-খানিতে রবীন্দ্রনাথকে অনুচিত ও অশোভনভাবে আক্রমণ করা হয়েছে।..." (দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী— রথীন্দ্রনাথ রায় কৃত ভূমিকা)

৬২ অমৃতলাল বসু রচিত ও ১৯০১ সনের ২৫ ডিসেম্বর খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত "...'অবতার' প্রহসনের সহিত শিশিরকুমার ঘোষের প্রসঙ্গ স্পষ্টত জড়িত ছিল।..." (অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য— ডঃ অরুণকুমার মিত্র) বলাবাহুল্য, এই প্রসঙ্গ মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়।

হয়ে ইংরেজ সরকার আইন বিধিবন্ধের কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন—এমন মন্তব্যে সত্যের অপলাপ হবে। শাসকসম্প্রদায়ের আপত্তি এবং ক্রোধের প্রকৃত কারণ ছিল অন্যত্র। আসলে, তাঁরা বিরোধী ছিলেন সেই সব নাটকের অভিনয়ের, যাদের মাধ্যমে শ্বেতাঙ্গশ্রেণীর দুর্নীতি, শোষণ আর অত্যাচারের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই জাতীয় নাটকের প্রথম এবং সার্থক দৃষ্টান্ত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'। নাটকখানি গ্রন্থাকারে প্রকাশমাত্র (১৮৬০) যেমন দেশ-ব্যাপী আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, বাংলা থিয়েটারে তার অভিনয়ও (১৮৭২) তেমন কম উত্তেজনার সঞ্চার করে নি। আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে 'নীলদর্পণ' নাটকের নির্বাচনে উদ্যোক্তা ন্যাশনাল থিয়েটার সমাজ সচেতন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। এই নাট্য-প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তাঁরা ন্যাশনাল থিয়েটার নামকরণের সার্থকতা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। নিপীড়িত জনগণের দুঃখ-সুখের রূপায়ণে এবং বিদেশী শোষণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তাঁদের বাস্তবানুগ ও আন্তরিক প্রয়াস মঞ্চকে সাধারণ মানুষের হৃদয়ের খুব কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। সাধারণ রঙ্গালয়ে সেদিন 'নীলদর্পণ' অভিনয় জনচিত্তকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত ক'রে দেশবাসীর নির্জীব দেহ-মনে নবীন চেতনার উন্মেষ ঘটায়। প্রসঙ্গতঃ, অমৃতলাল বসু লিখেছেন ঃ— "··· নীলদর্পণ কি করিয়াছে ?··· বাঙ্গালীর মূর্চ্ছাগত মনকে প্রথমে একটু মনুষ্যত্বের তেজে উদ্দীপ্ত জাগরিত করিয়া তুলিয়াছিল। আজ যে বাঙ্গালী দেশের দুঃখে কাঁদিতেছে, ভারত ভারত বলিয়া একটু হাতপা নাড়িতেছে, নীলদর্পণ অভিনয়ের পূর্বে এই অবস্থার কতটুকু অস্তিত্ব ছিল ? কই-১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বরের পূর্ব্বের খাতাপত্র দেখিলে এ হিসাবে তো তত বেশী জমা দেখা যায় না,··· ।"[৬৩] স্বভাব-সন্দিগ্ধ বিদেশী শাসকের চক্ষে তাই

৬৩ রূপ ও রঙ্গ— ৪ অক্টোবর, ১৯২৪

ন্যাশনাল থিয়েটার তথা সাধারণ রঙ্গালয়ের আবির্ভাব মোটেই 'কল্যাণকর' অথবা 'সুখকর' ঠেকে নি। সেই কারণে ন্যাশনাল থিয়েটারে নাটকখানির দ্বিতীয় অভিনয়ের পূর্বে 'মানহানিকর'— এই অজুহাতে অভিনয় বন্ধ ক'রে দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছিল। 'ইংলিশম্যান' (২০।১২।৭২) লিখেছিল:— "A Native paper tells us that the play of Nil Darpan is shortly to be acted at the National Theatre in Jorasanko. Considering that the Revd. Mr. Long was sentenced to one month's imprisonment for translating the play, which was pronounced by the High Court a libel on Europeans, it seems strange that Government should allow its representation in Calcutta, unless it has gone through the hands of some competent censor, and the libellous parts been excised." সে যাত্রায় তথাকথিত মানহানিকর অংশ বাদ দিয়ে নিস্তার মিললেও, সরকারী কর্তৃপক্ষের সতর্কতায় ভাটা পড়ে নি।[৬৪] তাঁরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছিলেন। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়[৬৫] রচিত

৬৪ "...সে দিবস ইংলিশম্যান এই নাটক অভিনয়ে আপত্তি তুলিয়াছেন। নাট্যসমাজের সম্পাদক তাঁহাকে এবং সাধারণকে জানাইয়াছেন, যে, আইন অনুসারে যে যে অংশ দোষাবহ, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক অভিনয় হইতেছে। গত শনিবার পুলিসের ডেপুটী কমিস্‌নর মহাশয় দর্শক শ্রেণীতে উপস্থিত ছিলেন।..." (মধ্যস্থ— ১৫ পৌষ, ১২৭৯)

অমৃতলালের স্মৃতিচারণেও রঙ্গালয়ে রাজপ্রতিনিধির পদার্পণের উল্লেখ আছে এবং বিবরণে জানা যায়, তিনি যে 'নিছক' দর্শকরূপে উপস্থিত হয়েছিলেন সেকথা জানাতে পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের ভুল হয় নি।

৬৫ অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে সেদিন যাঁরা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিলেন নাট্যকার দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। ১৮৭৭, ২১

'চা-কর দর্পণ' (১৮৭৫) নাটকের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত না হ'লেও শ্বেতাঙ্গ চা-করদের অত্যাচার-নিপীড়নের কাহিনী পরিবেশনে নাটকটি সেকালে সংশ্লিষ্ট মহলে যথেষ্ট সাড়া জাগায়। 'নীলদর্পণে'র অনুকৃতি হওয়া সত্ত্বেও বিদেশী শোষণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে 'চা-কর দর্পণে'র ভূমিকাটুকু উপেক্ষার নয়। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের সমর্থনে হব হাউস সাহেব সিলেক্ট কমিটির সভায় নাটকটির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন :— "In the course of the last year a work was printed and published in the form of a drama entitled Cha-Kardarpan Natak which he might state, meant the mirror of tea-planters. He did not know, who the author was and what his motives were, but the work itself was as outrageous a calumny as could possibly be conceived. Its object was to hold up as monsters of iniquity the class of tea—planters and all persons

এপ্রিল গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে পুরস্কার বিতরণী সভায় রঙ্গমঞ্চের স্বাধীনতা হরণে গভর্নমেণ্টের নিন্দনীয় ভূমিকার উল্লেখ ক'রে ইনি যে ভাষণ দেন তার মধ্য দিয়ে এঁর নির্ভিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিনকার সভায় তিনি বলেছিলেন :— "··· ইতিপূর্ব্বে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটরে সামাজিক ও রাজ-নৈতিকবিষয়ক নাটক ও প্রহসনের অভিনয় হইত ; আমাদের সেই স্বাধীনতা লোপ করিবার জন্য আমাদের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা লর্ড নর্থব্রুক বাহাদুর নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে এক অর্ডিনান্স প্রচার করিয়া যান। তৎপরে আমাদের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা লর্ড লিটন বাহাদুর নাট্যাভিনয়বিষয়ক কণ্টকস্বরূপ আইন কার্য্যে পরিণত করিয়া নাট্যাভিনয়ের বক্ষে পদাঘাত করিয়াছেন। ইনি মহাত্মা মৃত বুলওয়ার লিটনের পুত্র হইয়া নাট্যাভিনয় আইন বিধিবদ্ধ করিলেন, ইহা বড় অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে। মহাত্মা বুলওয়ার লিটন নাটকের স্বাধীনতার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন।···" (সমাচারচন্দ্রিকা-২৩ এপ্রিল, ১৮৭৭)

engaged in promoting emigration to the tea-planting districts that was to say, men as respectable as anyother body of men in the empire. These gentlemen, who carried on their business with great advantage to all concerned and possibly with a greater portion of advantage to the labourers, they employed than to anyone else, had held up to them what was called a mirror in which they were represented as indulging, by way of their ordinary occupation, the basest of passions-cruelty, avarice and lust. The play was, however, not acted but there it was. Written for the stage and adapted for it in every respect and without any preventive power the Government had, it might be acted at any moment."[৬৬]

কেবলমাত্র 'নীলদর্পণ' অথবা 'চা-কর দর্পণ' নয়, তৎকালে বাংলা থিয়েটারে অভিনীত 'ভারতমাতা' (ন্যাশনাল—১৫।২।৭৩), 'পুরু-বিক্রম নাটক' (বেঙ্গল—২২।৮।৭৪), 'ভারতে যবন' (গ্রেট ন্যাশনাল —১০।১০।৭৪), 'বঙ্গের সুখাবসান' (বেঙ্গল—১৪।১১।৭৪), 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' (বেঙ্গল—১৪।৮।৭৫), 'বীরনারী' (বেঙ্গল—৪।৯।৭৫), 'বঙ্গবিজেতা' (বেঙ্গল—১১।৯।৭৫), 'হীরকচূর্ণ নাটক' (গ্রেট ন্যাশনাল —২৫।১২।৭৫), 'সরোজিনী' (গ্রেট ন্যাশনাল—১৫।১।৭৬) প্রভৃতি অসংখ্য নক্সা-নাটকের মূল বক্তব্য ছিল স্বদেশপ্রেম এবং পরশাসনের প্রতি ঘৃণা। মঞ্চের মাধ্যমে জাতীয় চেতনার ঈপ্সিত রূপটি এই সময়ই অবয়ব লাভের প্রয়াস পেয়েছে। নানান অসম্পূর্ণতায় আচ্ছন্ন

৬৬ The Indian Stage (vol. II)-- Hemendra Nath Das Gupta.

সমকালীন বাংলা নাটক রচনা সৌকুমার্যে না হোক, আন্তরিকতার গভীর আবেগে মর্ম্মস্পর্শী ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল হয়েছিল। নাট্যশালার এই ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবে বিব্রত এবং শঙ্কিত শাসক সম্প্রদায়ও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। তাঁরা মনে মনে সাধারণ রঙ্গালয়কে দমনের উপায় খুঁজছিলেন। সুযোগ মিলতে দেরী হয় নি। 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' প্রহসনে স্বজাত্যাভিমান ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কড়াপাকে মাত্রাতিরিক্ত ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে আর প্রহসনটির "…মাঝে সরকারের পরিচালকরা এবং স্তাবকরা রাজদ্রোহের গন্ধ পান, এবং জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত ব্যঙ্গ-বাণ আসলে ভবিষ্য রাজ-দম্পতির বিরুদ্ধেই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল বলে মনে করেন।…"[৬৭] কিন্তু আদালতে তা প্রমাণ করা সহজসাধ্য নয় ব'লে, তাঁরা সে পথে না গিয়ে অশ্লীলতার অজুহাতে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'কে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন।[৬৮] তাতেও যখন 'বেয়াড়া' মঞ্চ শায়েস্তা হল না, তখন নিক্ষেপ করলেন চরম অস্ত্র—অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন, যা বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে আদালতে আশ্রয় নেওয়ার সুযোগটুকুও রঙ্গালয়ের হাতছাড়া হয়ে গেল।

---

৬৭ বাংলার নাটক ও নাট্যশালা— শচীন সেনগুপ্ত।

৬৮ 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের প্রকৃত অপরাধ ছিল তার দেশাত্মবোধ। যদিও নাটকখানির "বিষয়বস্তু রোমান্টিক কিন্তু কাহিনীর নায়ক সুরেন্দ্র আত্ম-সচেতন বলিষ্ঠ যুবক, বিদেশীর পদলেহন সে ঘৃণা করে। নাটকটিতে সুরেন্দ্র ও ইংরেজ কর্মচারী ম্যাক্রেণ্ডেলের শত্রুতার মধ্যে তীব্রতা আছে এবং উভয়ের বিরোধের মধ্যে স্বাদেশিকতার উদ্দীপনা প্রকাশিত হয়েছে। ম্যাক্রেণ্ডেল চরিত্রটি 'নীলদর্পণ'-এর 'রোগ' চরিত্রের অনুরূপ এবং আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যেও মিল আছে।… নাটকটির প্রারম্ভেই এই গানটি আছে— 'হায় কি তামসী নিশি ভারতমুখ ঢাকিল, / সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল। / শোকসাগরেতে ভাসি, ভারত মা দিবানিশি / স্মরি পূর্ব যশোরাশি, কান্দিতেছে অবিরল, / কে এখন নিবারিবে জননীর অশ্রুজল!" (স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা— মন্মথ রায়)

এই আইনের প্রবর্তনায় প্রমাণিত হল, সাধারণ রঙ্গালয় জন্ম থেকেই সমাজের প্রতি তার নৈতিক দায়িত্বটুকু নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে। সরকারী নিষেধাজ্ঞার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, অশ্লীলতা নয় —দেশাত্মবোধের জাগরণ রোধ করা।[৬৯] ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একদল এদেশীয় মানুষও নাট্যশালার স্বাধীনতা খর্ব করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের জেহাদ ছিল অশ্লীল নাটকের বিরুদ্ধে। আর এই সমর্থনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করতে শাসক সম্প্রদায়ের দ্বিধা হয় নি। অশ্লীলতার অজুহাতে ইংরেজ সরকার সেদিন রঙ্গমঞ্চের উপর যে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল, তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এর ফলে স্বাধীন ও সুস্থ নাট্যসৃষ্টির গতি ব্যাহত এবং খণ্ডিত হয়েছে বারংবার।

পরবর্তী অভিনয় প্রবাহ

এদিকে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের মকদ্দমার পর থেকে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ভাঙ্গন সুরু হল। উপেন্দ্রনাথ দাস বিলাতে

৬৯ ১৯১১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ইংরেজ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ নাটকের তালিকা থেকে এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে। তালিকাটি এই রকম :—

(১) বঙ্কিমচন্দ্রের— মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর ও আনন্দমঠ।

(২) গিরিশচন্দ্রের— ছত্রপতি শিবাজী, সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসিম।

(৩) ক্ষীরোদপ্রসাদের— প্রতাপাদিত্য, বাঙলার মসনদ, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, নন্দকুমার এবং দাদা ও দিদি।

(৪) অমরেন্দ্রনাথ দত্তের— আশা কুহকিনী ও আহা মরি।

(৫) মনোমোহন গোস্বামীর— শিবজী, কর্মফল ও সংসার।

উপরোক্ত নাটকগুলির মধ্যে মাত্র দু'টি কি তিনটির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ অথবা শালীনতাবর্জিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অভিযোগ ছিল। বাকী এবং অধিকাংশ নাটকই নিষিদ্ধ হয়েছে দেশাত্মবোধ প্রচারের অপরাধে।

পাড়ি দিলেন।[৭০] অমৃতলালও অভিনয় ছেড়ে বাড়ী বসে রইলেন এবং কিছুদিন বাদে আন্দামান চলে গেলেন পুলিশে চাকুরী নিয়ে। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যার বিবাহের নামে থিয়েটার ছাড়লেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর দল-বল নিয়ে বাইরে বেরুলেন। বিনোদিনী যোগ দিলেন বেঙ্গল থিয়েটারে। সুকুমারী দত্তের স্বামী উপেন্দ্রনাথের অনুগামী হওয়ায় তাঁর পক্ষে মঞ্চ ত্যাগ করা ছাড়া উপায় রইলো না। চারিদিকে ছত্রভঙ্গ অবস্থা, থিয়েটার উঠে যাওয়ার দাখিল। মামলা-মকদ্দমা সংক্রান্ত খরচে ও দুর্ভোগ-দুশ্চিন্তায় জর্জরিত স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগীর তখনকার মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

অনিয়মিতভাবে এই দুর্দিনেও অভিনয় চলেছে।[৭১] তৎকালীন মঞ্চস্থ নাটকের তালিকায় আছেঃ—'পদ্মিনী' (১।৪।৭৬), 'ভীমসিংহ' (৮।৪।৭৬), 'সতী কি কলঙ্কিনী ?' (৪।১১।৭৬), 'সরোজিনী' (১৮। ১১।৭৬), 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' (২৫।১১।৭৬) এবং 'পারিজাত হরণ' (২।১২।৭৬)। শেষেরটি নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা নাট্য-

৭০ উপেন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করেন ১৮৭৬ সালের এপ্রিলে। এর ঠিক এক বছর পরে অমৃতলাল আন্দামান রওনা হন। উপেন্দ্রনাথ দাসের বিলাত গমন উপলক্ষে ১৮৭৬, ২৮ মার্চ 'সুলভ সমাচার' লিখেছিল :— "ন্যাশেনল থিয়েটরের ডাইরেক্টর বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস বারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত গমন করিবেন। এ ব্যক্তিকে যেন ভূতে ঘুরিয়া নিয়া বেড়াইতেছে। আমরা আশা করি ইনি শান্তশিষ্ট হইযা যাহাতে সংসারের কুশল হয় এরূপে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।"

৭১ 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত অভিনয়-তালিকা দৃষ্টে মনে হয় ১৮৭৬ সালের মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত গ্রেট ন্যাশনালের অভিনয় বন্ধ ছিল। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তও মকদ্দমার পর থিয়েটার বন্ধ থাকার কথা বলেছেন।

রাসক।[১২] অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ হওয়ার পর বিশেষতঃ, ১৮৭৬ সালের শেষের দিকে গ্রেট ন্যাশনালের অনিয়মিত অভিনয়ের উল্লেখ আছে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' পত্রিকায় ১২ জানুয়ারি, ১৮৭৭ তারিখে প্রকাশিত নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনে :—

GREAT NATIONAL THEATRE

Saturday, the 13th January, 1877

WITH A THOUSAND APOLOGIES

For last few weeks' irregularities over which he with his company had no control. The Proprietor respectfully invites the indulgent nobility and gentry of

CALCUTTA AND ITS SUBURBS TO THE LONG EXPECTED GLORIOUS

opera

PARIJAT HARANA

১৮৭৭ সালের প্রথমার্দ্ধে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছে এই সব নাটক :—'পারিজাত হরণ বা দেব দুর্গতি' (২৭।১), 'সতী কি কলঙ্কিনী ?' ও 'চোরের উপর বাটপাড়ি' (১৭।৩), 'প্রণয়-কানন বা প্রভাস' (২৪।৩), 'আদর্শ সতী' (২৯।৩), 'একেই কি বলে সভ্যতা' (৭।৪), 'বিদ্যাসুন্দর' এবং 'ধীবর ও দৈত্য' (১৪।৪), 'নবীন তপস্বিনী নাটক' (২৮।৪), 'ঠাকুরদাদা' এবং 'কুব্জ' (২ ৫), 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক' (৫।৫) এবং 'কৃষ্ণকুমারী'

১২ ভ্রমবশতঃ, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত নাটকটি অতুলকৃষ্ণ মিত্রের রচনা ব'লে উল্লেখ করেছেন। (দ্র. The Indian Stage— vol. III)

(২৩।৫) প্রভৃতি। এই সময় গীতিনাট্য রূপায়ণে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এর মূলে ছিল কুশলী সুর-সংযোজক ও গায়ক-অভিনেতা রামতারণ সান্যালের কৃতিত্ব। বিশেষভাবে এঁরই নৈপুণ্যে 'আদর্শ সতী' প্রমুখ গীতিনাট্য সমাদৃত হয়।[৭৩]

উপরোক্ত নাটকগুলির অভিনয় সম্পর্কে সমকালীন পত্র-পত্রিকার অভিমত উদ্ধৃত হচ্ছে। 'পারিজাত হরণ বা দেব দুর্গতি' সম্পর্কে ২৮ জানুয়ারি, ১৮৭৭ তারিখের 'সাধারণী'র মন্তব্য ঃ— "...নাট্যাভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা নন্দন কাননের দৃশ্যটি বড় চমৎকার হইয়াছিল।..." 'প্রণয়কানন বা প্রভাস' প্রসঙ্গে 'সমাচার-চন্দ্রিকা' ঃ — "...আমরা এই গীতাভিনয় সন্দর্শনে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। অভিনেতৃগণের মধ্যে নন্দ, কৃষ্ণ, ভক্ত, রাধিকা, বৃন্দা এবং রুক্মিণীর অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল। নিকুঞ্জকানন, কেলি পর্ব্বত এবং প্রণয় কাননের দৃশ্য অতি পরিপাটী, বলা বাহুল্য। ইহাও বলা আবশ্যক হইতেছে, গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটর কোম্পানি যেরূপ গীতাভিনয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, নাটকাভিনয়ে তদ্রূপ হয়েন নাই। বঙ্গ রঙ্গ-ভূমি যেরূপ নাটকাভিনয় করিতে পারেন তদ্রূপ গীতাভিনয় করিতে পারেন না।..." (২৬।৩।৭৭) 'আদর্শ সতী' সম্পর্কে ২ এপ্রিল, ১৮৭৭ তারিখের 'সমাচারচন্দ্রিকা'র অভিমত ঃ— "...অভিনেতৃগণের মধ্যে সত্যবান, সুরবালা, বনলভ, মহাশ্বেতা, মিশ্রকেশী এবং সাবিত্রীর অভিনয় মনোহারী হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা

৭৩ 'আদর্শ সতী' এবং 'প্রণয়-কানন বা প্রভাস' প্রণেতা অতুলকৃষ্ণ মিত্রের নাটক রচনার মূলেও ছিলেন রামতারণ সান্যাল। প্রধানতঃ, তাঁরই প্রেরণায় অতুলকৃষ্ণ গীতিনাট্য প্রণয়নে ব্রতী হন। "তিনি অতুলকৃষ্ণের গানে সুর-সংযোজনা করিয়া দিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় অতুলকৃষ্ণের একাধিক গীতি-নাট্য সাধারণ-রঙ্গালয়ে অভিনীত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল ..." (অতুলকৃষ্ণ মিত্র / সাহিত্য-সাধক চরিতমালা— ষষ্ঠ খণ্ড

সাবিত্রীর অভিনয় দর্শনে যে আমরা কি পর্য্যন্ত পুলকিত হইয়াছি, লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। চতুর্থ অঙ্ক কাননে সত্যবানের মৃত্যু, এবং মহাকালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সাবিত্রীর যমপুরে গমন এবং তথা হইতে সত্যবানের প্রাণবায়ু লইয়া সাবিত্রীর প্রত্যাগমন এবং সত্যবানের প্রাণদান দর্শনে যে আমাদিগের কি অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে আমরা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছি না। আমরা অনুরোধ করি, যদি কখন গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটরে আদর্শ সতী অর্থাৎ সাবিত্রী সত্যবান গীতাভিনয় হয়, তাহা হইলে যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহারা একবার এই অভিনয় দর্শনে চক্ষের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন। এই অভিনয়ের পরিসমাপ্তিতে তিনটী আতাফলের প্যাণ্টোমাইম এবং পরীস্থানের দৃশ্য দেখান হইয়াছিল। চিত্রপটের সুবন্দোবস্তের জন্য ষ্টেজ ম্যানেজার বাবু ধর্ম্মদাস সুরকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।" 'বিদ্যা-সুন্দর' এবং 'ধীবর ও দৈত্য'র অভিনয় দেখে 'সমাচারচন্দ্রিকা' জানালে :— "....বিদ্যাসুন্দরের অভিনেতৃগণের মধ্যে রাজা, বিদ্যা, মালিনী এবং সখিগণের অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল। সুন্দরের কিছুই সুন্দরত্ব ছিল না। ইহা অপেক্ষা যিনি রাজার অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহাকে যদি সুন্দরের অংশ অভিনয় করিতে দেওয়া হইত তাহা হইলে বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয়কে আমরা প্রশংসা করিতে পারিতাম। ধীবর ও দৈত্যের অভিনয় মন্দ হয় নাই। মহারাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস বাহাদুর যৎকালে ভারতে শুভাগমন করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্মানার্থ নগর যেরূপ আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল, গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটর সেই আলোকের নকল দেখাইযাছিলেন। একখানি চিত্র গবর্নমেণ্ট হাউসের, আর একখানি বোধহয় কলেজ স্কোয়ারের অপরখানি যমুনা সেতুর। ফলে আমরা আলোকমালা ও পরীস্থান দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। গ্রেট ন্যাশন্যালের অধ্যক্ষ যদি পুরুষ অভিনেতৃর উন্নতি করিতে পারেন,

তাহা হইলে তাঁহারা সাধারণের বিশেষরূপ মনোরঞ্জন করিতে পারিবেন।...” (১৬।৪।১৮৭৭)

২১ এপ্রিল, ১৮৭৭ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ‘আদর্শ সতী’ অভিনয়ের শেষে নট-নটী ও কলাকুশলীদের মধ্যে পারিতোষিক বিতরণ কবা হল। ভুবনমোহন নিয়োগী (অধ্যক্ষ), ধর্মদাস সুর (স্টেজ ম্যানেজার), রামতারণ সান্যাল (অপেরা নির্দেশক) প্রত্যেকে একটি ক’রে রৌপ্যপদক এবং অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু একটি রূপার ঘড়ি পুরস্কার পেলেন। অন্যান্য নট-নটীদের সোনাব আংটি, চুড়ি, আতরের শিশি এবং প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়। এসব উপহারের অনেকগুলি দিয়েছিলেন রায় বাহাদুর গিরিশচন্দ্র দাস। ‘নবীন তপস্বিনী নাটক’ দেখে ৩০ এপ্রিল ‘সমাচারচন্দ্রিকা’ লিখলে ঃ—“... এই অভিনয় দর্শনে আমবা প্রীতিলাভ কবিতে পাবি নাই। অভিনেতৃগণের মধ্যে জলধরেব অভিনয় সুন্দব হইয়াছিল। বিজয়েব অভিনয় মন্দের ভাল। রাজা বড় মন্দ অভিনয় করেন নাই। কামিনীর অভিনয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মালতী ও মল্লিকার মধ্যম শ্রেণীর হইয়াছিল। — এক কথায় বলিতে গেলে নবীন তপস্বিনী যেমন হওয়া উচিত, তাহার কিছুই হয় নাই।” ‘সবোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটকে’র অভিনয় সম্পর্কে উপবোক্ত পত্রিকাব সমালোচনা ঃ—“... অভিনেতৃগণের মধ্যে লক্ষ্মণ সিংহ, বিজয়, সবোজিনী, বোশেনারা এবং রাণীব অভিনয় সুন্দব হইয়াছিল। শূন্যে কালীর আবির্ভাব বড় আশ্চর্য্য হইয়াছিল। সবোজিনীর অভিনয়ে দর্শকবৃন্দ ব্যথিত হন। চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিব প্রাঙ্গণে সবোজিনীর খেদোক্তি, রোশেনারাব বলিদান এবং রাজপুত মহিলাগণের চিতায় প্রাণত্যাগ অতীব মনোহাবী হইয়াছিল।...” (৮।৫।১৮৭৭) ‘কৃষ্ণকুমারী’ব অভিনয় প্রসঙ্গে ‘সমাচার-চন্দ্রিকা’ ২৪ মে, ১৮৭৭ তাবিখে মত প্রকাশ করলে ঃ— “...অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে বলিতে হইবে, তবে কৃষ্ণকুমারীর অংশ যাহাকে অভিনয় করিতে দেওয়া হইয়াছিল, সে দেখিতে ততোধিক সুন্দরী

নহে। কৃষ্ণকুমারী রাজকন্যা; তাহার ঐরূপ কুৎসিত গঠন হইলে চলিবে কেন? যদি আর কখন কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় হয়, তাহা হইলে এই অংশটুকু যেন পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হয়।” ১৪ জুলাই ভুবনমোহন নিয়োগীর বেনিফিট নাইটে ‘আদর্শ সতী’ অভিনীত হয়েছে।

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হওয়ার ফলে সরকারী হামলার আশঙ্কায় ভীত গ্রেট ন্যাশনাল এ-পর্যন্ত নতুন কোনো সামাজিক বা ঐতিহাসিক নাটক রূপায়ণে সাহসী হয় নি। পুরানো নাটকের ফাঁকে ফাঁকে ‘পারিজাত হরণ’, ‘আদর্শ সতী’, ‘প্রণয়কানন বা প্রভাস’ প্রমুখ কয়েকখানি গীতিনাট্য মঞ্চস্থ হয়েছে বটে এবং তাদের সাফল্যে থিয়েটারের সুনামও বেড়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু কেবলমাত্র গীতি-নাট্য সম্বল ক’রে মঞ্চ আর কতদিন নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে? তাই, বৈচিত্র্যের অভাবে যখন গ্রেট ন্যাশনালের দর্শক-স্রোতে ভাঁটা পড়তে সুরু করেছে, বিপর্যয় এড়াবার উদ্দেশ্যে স্বত্বাধিকারী ভুবন-মোহন উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে থিয়েটার তুলে দেওয়ার সংকল্প নিলেন।

যোগ্য ব্যক্তির সন্ধান মিলতে দেরী হল না। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র এগিয়ে এলেন থিয়েটারের দায়িত্বভার নিজের কাঁধে তুলে নিতে। ১৮৭৭ সালের জুলাই মাসে উনি নিজে লেসী হয়ে গ্রেট ন্যাশনালের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করলেন। এই কাজে গিরিশচন্দ্রকে প্রেরণা দেন ওঁর শ্যালক দ্বারকানাথ দেব এবং অন্তরঙ্গ সুহৃদ কেদার চৌধুরী। পরিচালন-ব্যবস্থায় এই রদ-বদলের সংবাদ জানিয়ে 'সমাচারচন্দ্রিকা' (৭।৮।১৮৭৭) লিখলে :— "গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অধ্যক্ষ বাবু ভুবনমোহন নেউগী তিন বৎসরের জন্য বাগবাজার নিবাসী বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষকে থিয়েটার বাটী ভাড়া দিয়াছেন।— গিরিশবাবু একজন উপযুক্ত লোক, বোধহয় ইঁহার হস্তে থিয়েটারটী ভালরূপ চলিবে।···" কেদার চৌধুরীর সহায়তায় গিরিশচন্দ্রের লিজ নেওয়ার সঙ্গে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' নামের বিলুপ্তি ঘটলো, রঙ্গালয়ের নতুন নামকরণ হল— 'ন্যাশনাল থিয়েটার'।

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা ক'রে গিরিশচন্দ্র প্রথম কিছুদিন পুরানো নাটকের অভিনয় করেছেন। ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৭ মঞ্চস্থ হল 'কমলে কামিনী'। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সমাচারচন্দ্রিকা' লিখলে :— "···অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। অভিনেতৃগণের মধ্যে বক্কেশ্বর, মকরকেতন, শিখণ্ডিবাহন, গান্ধারী, সুশীলা এবং রণকল্যাণীর অভিনয় প্রশংসনীয় হইয়াছিল। বক্কেশ্বর প্রতি পদে পদে দর্শকগণকে হাসাইয়াছিলেন। আমরা বক্কেশ্বর এবং রণকল্যাণীর অভিনয় দর্শনে অধিকতর প্রীতিলাভ করিয়াছি। রাস-মণ্ডপের অভিনয়টী আমোদজনক হইয়াছিল বটে। — আমরা ভরসা করি নূতন কোম্পানি দিন দিন উন্নতিলাভ করিবেন।····" (১৮।৯।১৮৭৭) ২৯ সেপ্টেম্বরের নাটক 'মুকুটাচরণ মিত্র' ছদ্মনামে রচিত গিরিশচন্দ্রের 'আগমনী'। এতে রামতারণ সান্যাল, কেদার চৌধুরী, কাদম্বিনী

এবং বিনোদিনী যথাক্রমে গিরিরাজ, মহাদেব, মেনকা এবং উমা সাজলেন। *এই সময় বিনোদিনী ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দেন।* ৩ অক্টোবর অভিনীত হল— 'অকাল বোধন'। এটিও গিরিশচন্দ্রের পূর্বোক্ত ছদ্মনামে লেখা। 'অকাল বোধনে' গিরিশচন্দ্র রামচন্দ্রের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইন্দ্র সাজেন মহেন্দ্রলাল বসু। এই অভিনয়ের পর ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ ঘোষের আপত্তিতে নিজ মালিকানা ছেড়ে গিরিশচন্দ্র শ্যালক দ্বারকানাথ দেবকে ন্যাশনাল থিয়েটার ভাড়া দিলেন। দ্বারকানাথের সময়ে ন্যাশনালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' (১৫।১২।১৮৭৭) ও গিবিশচন্দ্র নাটকায়িত 'মেঘনাদবধ' (২২।১২।১৮৭৭) মঞ্চস্থ হয়। 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় সম্পর্কে ১৯ ডিসেম্বর, ১৮৭৭ 'সমাচাবচন্দ্রিকা' লিখলেঃ— "গ্রেট ন্যাসনেল থিয়েটর ভবনে ইতিপূর্ব্বের ন্যাসনেল থিয়েটর কোম্পানি অভিনয় করিতেছেন। গত শনিবার ইহারা মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্তেব সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণকুমাবী নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনেতৃবর্গের মধ্যে ভীমসিংহ, জগৎসিংহ, ধনদাস, অহল্যাদেবী এবং কৃষ্ণকুমাবী স্ব স্ব অংশ সুন্দবরূপে অভিনয় করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ভীমসিংহ, ধনদাস ও কৃষ্ণকুমাবীর অভিনয় অতীব প্রশংসনীয় হইয়াছিল। আমবা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গ রঙ্গভূমি ও গ্রেট ন্যাসনেল থিয়েটরে কৃষ্ণকুমারীব অভিনয় দেখিয়াছিলাম কিন্তু ইঁহাদিগের অভিনয় তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয। কিন্তু এই কোম্পানির অধ্যক্ষ ও ম্যানেজাবের নিকট আমবা দুঃখিত হইয়া জানাইতেছি যে যিনি প্রম্‌ট (অর্থাৎ বলিয়া দেন) করেন তাঁহার চিৎকারে দর্শকগণের কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছে। একবার প্রমটারের কথা শুনিয়া পুনরায় অভিনেতৃগণের মুখ হইতে সেই কথা শুনা কতদূর কষ্টকর, যাঁহারা একবাব ভুগিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। নূতন কোম্পানির নূতন পরিচ্ছদ ও কতকগুলি নূতন চিত্রপট দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম।—" 'মেঘনাদবধ'

নাটকের প্রথম অভিনয়রাত্রের (১।১২।১৮৭৭) ভূমিকালিপি *ছিল এইরকম ঃ— রাম ও মেঘনাদ-গিরিশচন্দ্র ঘোষ, লক্ষ্মণ-* কেদারনাথ চৌধুরী, রাবণ-অমৃতলাল মিত্র,[৭৪] বিভীষণ ও মহাদেব-মতিলাল সুর, সুগ্রীব, মারীচ ও সারণ-অতুলচন্দ্র মিত্র (বেডৌল), হনুমান-যদুনাথ ভট্টাচার্য, ইন্দ্র-আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিক ও দূত-অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), মদন-রামতারণ সান্যাল, মন্দোদরী-কাদম্বিনী, প্রমীলা-বিনোদিনী, চিত্রাঙ্গদা ও মায়া-লক্ষ্মীমণি, শচী-বসন্তকুমারী, রতি ও বাসন্তী-কুসুমকুমারী, নৃমুণ্ডমালিনী ও প্রভাসা-ক্ষেত্রমণি। নট-নটীরা সকলে বিশেষতঃ, মেঘনাদ ও রামের দ্বৈতভূমিকায় গিরিশচন্দ্র অসাধারণ নৈপুণ্য দেখালেন। 'মেঘনাদবধে'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে 'সমাচারচন্দ্রিকা' (২৫।১২।১৮৭৭) বললে ঃ— "......আমরা ন্যাশন্যাল থিয়েটরের অভিনয় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি,—আশাতীত আনন্দ অনুভব করিয়াছি। অভিনেতৃগণের মধ্যে রাবণ, মেঘনাদ, রাম, লক্ষ্মণ, শিব, বিভীষণ এবং প্রমীলার অভিনয় প্রশংসনীয় হইয়াছিল। বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মেঘনাদ ও রামের অংশ অভিনয় করেন। স্পষ্ট কথা বলিতে কি গিরিশবাবুর মত অভিনেতা বোধ করি বঙ্গ নাট্যশালায় নাই। বাবু কেদারনাথ চৌধুরী লক্ষ্মণের অংশ অভিনয় করেন, এই অংশটীও সুন্দররূপে অভিনয় হইয়াছিল। যিনি রাবণের অংশ অভিনয় করেন, তাঁহাকে আমবা চিনি না, কিন্তু তাঁহার অভিনয় দর্শনে আমরা বড়ই প্রীত হইয়াছি। লক্ষ্মণের শক্তিশেল ও প্রমীলার চিতারোহণ দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। প্রমোদোদ্যান, যোগাসন পর্ব্বত ও শিবিরের দৃশ্যপট অতি চমৎকার হইয়াছে। শেষ দৃশ্যটী যৎকালে

৭৪ এই নাটকের মাধ্যমে প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন। পূর্বে, ইনি যাত্রাদলের অভিনেতা ছিলেন। গিরিশচন্দ্র এঁর স্বরমাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে এঁকে মঞ্চে আনেন। অমৃতলাল মিত্র ছিলেন তাঁর বন্ধুপুত্র।

প্রমীলাসুন্দরী চিতায় প্রাণত্যাগ করিতে যান, তখন রাবণ, সারণ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পদাতিক সৈন্য, দণ্ডধারী, পতাকীদল, বাদ্যকরগণ, প্রমীলা, বাসন্তী, নৃমুণ্ডমালিনী ও সখীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমন করিয়াছিলেন— এ দৃশ্যটী নূতন প্রকারের হইয়াছে, ইংরাজী ধরণের। বঙ্গ নাট্যশালায় আমরা এরূপ দৃশ্য কখন দেখি নাই। ন্যাশন্যাল থিয়েটর কোম্পানি যেরূপ অভিনয় করিতেছেন, শীঘ্রই যে ইঁহারা কলিকাতা নগরে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। প্রতিবারেই ইঁহাদিগের দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।" গিরিশচন্দ্রের দ্বৈত ভূমিকার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে 'সাধারণী' লিখেছিলঃ— " .. 'রামচন্দ্র' ও 'মেঘনাদ' এই দুই রূপে নাট্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ অভিনয় করেন। পাত্রদ্বয়ের চরিত্র, কার্য্য এবং ভাব সমস্তই বিভিন্ন, সুতরাং একই ব্যক্তির দ্বিবিধ রূপ পরিগ্রহ কিছু বিসদৃশ হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে! কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দক্ষতায়, তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতায়, এ দোষ দেখিয়াও আমরা মনে কিছু করিতে পারি নাই, দোষ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম এবং তাঁহার 'রাম'রূপের অভিনয়ে বারংবার আমাদের কঠোর চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। লক্ষ্মণ যখন পূজাগারে প্রবেশ করেন, তখন গিরিশচন্দ্রের মেঘনাদসম্ভব সৌম্যভাব দর্শনে আমরা মুগ্ধ হই; আবার তৎপরক্ষণেই যখন মেঘনাদ সহসা রোষকষায়িত নেত্রে বীরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বক্ষ প্রসারণপূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিলেন, তখন গিরিশচন্দ্র অভিনয় পটুতার চরম সীমা দেখাইলেন। তাঁহার সে ভাব অদ্ভুত, বিস্ময়কর; তাহাতে আমরা মুগ্ধেরও অধিক হইয়াছিলাম। ইংলণ্ডের প্রথিতনামা গ্যারিকের ক্ষমতার পরিচয় পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু বঙ্গের গিরিশ অপেক্ষা কোনও গ্যারিক যে অধিকতর ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন ইহা আমাদের ধারণা হয় না।..." (১০।২।১৮৭৮)

এ-নাটকে আর একজন প্রচুর সুখ্যাতি পেয়েছিলেন, তিনি বিনোদিনী

দাসী। বিনোদিনী 'মেঘনাদবধ' নাটকে প্রমীলাসহ সাতটি ভূমিকায় অভিনয় করতেন। এই সময় ন্যাশনাল থিয়েটারের খুব নাম-ডাক। ১৬ ডিসেম্বর, ১৮৭৭ তারিখের 'সাধারণী'তে ন্যাশনালের তৎকালীন জনপ্রিয়তার উল্লেখ আছে। প্রশংসার সঙ্গে অবশ্য আশঙ্কার কথাটিও পত্রিকা গোপন করে নি। 'সাধারণী' লিখেছিল ঃ— "নব কলেবরে কলিকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটারের বেশ সুখ্যাতি হইয়াছে। বাবু গিরিশ চন্দ্র ঘোষ ও কেদারনাথ চৌধুরী উভয়েই এ বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তি; ইহাদের উপর এই রঙ্গভূমির তত্ত্বাবধানের ভার আছে, সুতরাং অভিনয়-কার্য্য ভাল হইবারই কথা। তবে ভদ্রলোকে যে কতকগুলো বাজারের বেশ্যা লইয়া অধিকদিন কোন কার্য্য চালাইতে পারেন, সে বিশ্বাস আমাদের নাই; তাহাতেই বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে। বিলাতের মত আমাদের দেশেব অভিনেত্রীগণ যতদিন না আপনাদের ইজ্জৎ বুঝিবে ততদিন আমাদের এ আশঙ্কা কিছুতেই অপগত হইবে না।"

১৮৭৮ সালের সুরুতেই পবিবর্তন। এই সময় ন্যাশনাল থিয়েটারের সাব লিজ কেদারনাথ চৌধুরীর নামে হস্তান্তরিত করা হয়।[৭৫] ৫ জানুয়ারি এখানে নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' মঞ্চস্থ হল। অভিনয় প্রসঙ্গে 'সমাচারচন্দ্রিকা' (৯।১।১৮৭৮) জানালে ঃ— "....অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। অভিনেতৃগণের মধ্যে জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, ক্লাইভ, সেরাজউদ্দৌলা, মোহনলাল, রাণী ভবানী, ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী এবং সেরাজমহিষী সকলেই আপনাপন অংশ সুন্দররূপে অভিনয় করিয়াছিলেন। "পলাশীর যুদ্ধ" অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত; ন্যাশন্যাল থিয়েটবের অভিনেতৃগণ যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে এরূপ অভিনয় করিবেন আমাদিগের আশা ছিল না।.... ফলকথা বলিতে কি,

৭৫ লিজ-স্বত্ব পরিত্যাগ করলেও, 'দুর্গেশনন্দিনী' (২২ ৬।৭৮) অভিনয়-কালে আকস্মিক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মঞ্চ থেকে সাময়িক অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রধান অভিনেতা, নাট্যকার এবং অভিনয় শিক্ষকের পদে গিরিশচন্দ্র অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ন্যাশন্যাল থিয়েটর কোম্পানি পলাশীর যুদ্ধ অভিনয়ে যে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।....” এই সমালোচনা প্রকাশের অল্পদিনের ব্যবধানে নাটকটির অভিনয় সম্পর্কে ‘সাধারণী’তে যে মন্তব্য করা হয়েছিল তাতে কিন্তু নিন্দার অংশ অল্প নয়। পত্রিকাখানি লিখেছিল ঃ— “.... “পলাশীর যুদ্ধ” নাটক না হইয়াও কেন যে অভিনীত হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।.... আমরা যাহা দেখিলাম, তাহাতে ন্যাশনাল দলের প্রায় সকলেই সুপাঠক বলিয়া বোধ হইল। ক্লাইবের আবৃত্তি প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এবং তিনি যথাযোগ্য ভঙ্গীও করিতে জানেন। কিন্তু যিনি রাজবল্লভ সাজিয়াছিলেন, তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্র হইলে, আমরা তাঁহাকে এক শ্রেণী নামাইয়া দিতাম; তিনি যাহা আবৃত্তি করেন, তাহাতে ভাবস্ফূর্ত্তি কিছুমাত্র হয় না, কোথায় কিরূপ শ্বাসবল আবশ্যক তাহা তিনি জানেন না, এবং আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি টক্কর খান। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক, রণস্থলের অপর পার্শ্বে মোহনলাল অভিনয় কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; তিনি আহত কি মৃত, কি ভাণ করিয়া পড়িয়াছিলেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি নাই; আবার উদাসীন চলিয়া গেলে তিনি অকাতরে যে বক্তৃতা করিলেন, তাহাও অসদৃশ হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন তাঁহার অভিনয় মন্দ হয় নাই। যিনি সিরাজুদ্দৌলা সাজিয়াছিলেন, তিনি কেবল সঙ্ সাজিতে পারেন, হৃদয়ভাব-ব্যঞ্জক অভিনয় প্রদর্শনে তিনি নিতান্ত অপটু। সুরামত্তের ন্যায় পটমঞ্চে যে ঢলিয়া ঢলিয়া, টলিয়া টলিয়া, আধ আধ লাফাইয়া, বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া পাগলের মত ঘুরিতে লাগিলেন, বঙ্গের নবাব উচ্ছৃঙ্খল হইলেও তাহার সহস্রাংশের একাংশও তথাবিধ ভাবভঙ্গী করিত না। ...ফলতঃ পটমঞ্চের সেরাজ আমাদিগকে নিতান্ত উত্যক্ত করিয়াছিলেন।...”[১৬] (২০।১।১৮৭৮) ‘পলাশীর যুদ্ধ’ নাটকে

১৬ সে যুগের কঠোর অভিনয় সমালোচনার এই দৃষ্টান্তটি গিরিশচন্দ্রের

ক্লাইভ, সিরাজ, জগৎশেঠ ও ঘাতক, মোহনলাল, রানী ভবানী এবং বৃটেনেশ্বরীর ভূমিকায় যথাক্রমে গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, কেদার চৌধুরী, কাদম্বিনী ও বিনোদিনী অবতীর্ণ হতেন। এ-নাটকের ১২ জানুয়ারি, ১৮৭৮ তারিখের অভিনয়ে পুণা সার্ব্বজনীন সভার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। নবগোপাল মিত্র এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। ২৬ জানুয়ারি অভিনীত হল কুঞ্জবিহারী বসু রচিত 'আনন্দমিলন।' অবিনাশচন্দ্র কর তখন ন্যাশনালের ম্যানেজার। ওঁর সাহায্যরজনীতে নাটকখানির উদ্বোধন হয়। অভিনয়ের দিন 'সমাচারচন্দ্রিকা' জানালে ঃ— "অদ্য শনিবার ন্যাশন্যাল থিয়েটরে আনন্দ-মিলন নামক একখানি নূতন নাট্য-গীতকার অভিনয় হইবে। ম্যানেজার বাবু অবিনাশচন্দ্র করের লভ্যের রজনী। ইনি এই থিয়েটরের জন্মদিন হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বহু যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি, অদ্য রজনীতে নাট্যামোদী লোকেরা নূতন নাট্যগীতিকা দর্শন করিয়া ম্যানেজারের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।" (২৬।১।১৮৭৮) এই গীতিনাট্যে রামতারণ সান্যাল 'নল' এবং কাদম্বিনী 'দময়ন্তী' সেজেছিলেন। ৪ মার্চ (?) 'দোললীলা' নামলো। ৯ মার্চের (?) নাটক বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' (নাট্যরূপ-গিরিশচন্দ্র)। এতে গিরিশচন্দ্র, রামতারণ সান্যাল, মহেন্দ্র-লাল বসু, কাদম্বিনী এবং বিনোদিনী যথাক্রমে নগেন্দ্র, দেবেন্দ্র, শ্রীশ, সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী সাজলেন। ১৬ মার্চ কর্তৃপক্ষ মঞ্চস্থ

পরবর্তী কালের রচনায় উল্লেখিত হয়েছে। বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা' গ্রন্থের ভূমিকায় প্রসঙ্গক্রমে তিনি লিখেছেন ঃ— "… সে সময়ে অভিনয় সম্বন্ধে অতি তীব্র সমালোচনা হইত। যথা— পলাশীর যুদ্ধ দেখিয়া সাধারণীতে সমালোচন,… সিরাজদ্দৌলার উপর এরূপ কঠোর লেখনী সঞ্চালন যে, প্রকৃত সিরাজদ্দৌলা যেরূপ পলাশী ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অভিনেতা সিরাজদ্দৌলা সমালোচনার তাড়নায় নিজ ভূমিকা ত্যাগ করিতে ব্যগ্র হইয়া-ছিলেন। ব্যথিতচিত্তে বলিয়াছিলেন, 'আর আমার নবাব সাজায় কাজ নাই।"

করলেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'। 'সাধারণী' (২৪।৩।১৮৭৮) জানালে :— "…রঙ্গভূমি জনাকীর্ণ হইয়াছিল। অভিনেতাদিগের মধ্যে পশুপতির অভিনয় অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ইনি সকল বিষয়েই সমধিক দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঁহার মুখভঙ্গী পরিবর্ত্তন ও নিপুণ অভিনয়কার্য্যে সকলেই সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। সাধারণীতে যথার্থই লেখা হইয়াছে, যে বঙ্গ নাট্যশালার মধ্যে ইনি একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন। হেমচন্দ্রের অভিনয়ও মন্দ হয় নাই, তবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলা যায় না। তাহার একমাত্র কারণ অনভ্যাস। মাধবাচার্য্যের অভিনয় মন্দ হয় নাই।

অভিনেত্রীগণের মধ্যে, গিরিজায়া ও মনোরমাব অভিনয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আমবা মনোরমার চরম দেখিয়া বাস্তবিকই দুঃখিত হইয়াছিলাম। কখন মনোরমার হৃদয়ে বালিকা উন্মাদিনীর ছায়া, কখন বা প্রৌঢ়ার ভাবব্যঞ্জক গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণের কৃতকার্য্যতা দর্শনে আনন্দিত হইয়াছিলাম। গিরিজায়া আপনার অংশ অতি উত্তমরূপে সম্পাদিত করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় রঙ্গভূমে অভিনেত্রীগণের মধ্যে যে এরূপ প্রত্যাশা করা যাইবে, তাহা আমাদের পূর্ব্বে কখনই বিশ্বাস হয় নাই।…" অবিমিশ্র প্রশংসা নয়, পত্রিকাখানিতে তদানীন্তন ন্যাশনাল থিয়েটাবের পরিচালন-ব্যবস্থার ত্রুটিও উল্লেখিত হয়েছে। সমালোচনার পরবর্তী অংশেব মন্তব্য এইরকম :— "… অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল, অতএব দর্শকমণ্ডলী যে সম্যক প্রকারে আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ কি? কিন্তু আমরা অনেক সময় সে চিহ্ন দেখিতে পাই নাই বরং বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ অধ্যক্ষের অপারগতা। অভিনয়ে অনেক বিশৃঙ্খলতা হইয়াছিল।

আমরা দেখিলাম অভিনয় কার্য্য আরম্ভ হইবার সময় নয় ঘটিকা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। … বাঙ্গালির নিয়ম নাই—এ অপবাদ কবে যাইবে? যাহা অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সাধ্য তাহা যত্যপি অর্দ্ধ ঘটিকা

পূর্ব্বে সম্পাদিত হইলে আনন্দকর হয়, তাহা করা কি কর্ত্তব্য নহে? বিশেষত ঐকতান বাদন আমাদের শ্রুতি সুখকর হয় নাই, অতএব বলা বাহুল্য যে তাহার পুনঃ পুনঃ বাদনে দর্শকমণ্ডলী বিরক্ত হইয়াছিলেন। ··· রঙ্গালয়ে অত্যন্ত জনরব হইয়াছিল, এরূপ হট্টগোল থিয়েটরে সাজে না। ··· কতকগুলি দর্শক অভিনেত্রীগণের প্রতি কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এটি তাঁহাদিগের অভদ্রতার পরাকাষ্ঠা। ম্যানেজার মহাশয়েব প্রতি আমাদিগের আর একটি বক্তব্য যে, মত্ত ব্যক্তিদিগের রঙ্গভূমে প্রবেশ নিষেধের জন্য যেন বিশেষ যত্ন করা হয়।···" ২২ জুন ন্যাশনাল গিরিশচন্দ্র নাটকায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' নামালে। প্রথম রজনীব ভূমিকালিপি ছিল এইরকম ঃ— জগৎসিংহ-কেদার চৌধুরী, ওসমান-কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তিলোত্তমা ও আয়েষা-বিনোদিনী, কতলু খাঁ-মতিলাল সুর, বিদ্যাদিগ্‌গজ-অতুলচন্দ্র মিত্র (বেডৌল), রহিম শেখ-অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), বিমলা-কাদম্বিনী এবং আশমানি-লক্ষ্মীমণি। "দুর্গেশনন্দিনীতে প্রথমতঃ গিরিশচন্দ্র কোন ভূমিকা লন নাই। কেদারবাবু হইতেন জগৎ। কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওসমান। বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয়ের সহিত এই প্রতিযোগিতা টিঁকিল না। সেখানকার শরৎ ঘোষ মহাশয় ও হরিদাস বাবু উক্ত ভূমিকাদ্বয়ে অপূর্ব্ব অভিনয় করিতেন। দ্বিতীয় রাত্রি হইতে গিরিশচন্দ্রই হইলেন জগৎসিংহ আর ওসমানের ভূমিকা দেওয়া হইল মহেন্দ্র বসুকে। বিনোদিনী হইলেন আয়েষা, কাদম্বিনী বিমলা। অভিনয় হইল অপূর্ব্ব। কিন্তু তথাপি জিৎ রহিল বেঙ্গল থিয়েটারেরই কারণ শরৎবাবু ঘোড়ায় চড়িয়া রঙ্গমঞ্চে আসিতেন।" (ভারতীয় নাট্যমঞ্চ— হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত) কিছুদিন পরে এই নাটকের অভিনয়কালে এক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে গিরিশচন্দ্র সাময়িকভাবে অভিনয় থেকে বিরত হন। গিরিশচন্দ্র মঞ্চ হ'তে অবসর নিলে কেদার চৌধুরী ন্যাশনালের লিজ ছেড়ে দেন।

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ হওয়ার পর গ্রেট ন্যাশনালের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—স্বত্বাধিকারীরূপে গিরিশচন্দ্রের রঙ্গালয়ে যোগদান এবং ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনা। মঞ্চমালিকের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র জীবনে এই একবারই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি এ জাতীয় বাসনা সযত্নে পরিহার ক'রে এসেছেন। ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণের কাছে অঙ্গীকারই এর কারণ।

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় গিরিশচন্দ্র ভূম্যাধিকারী ও নাট্য-রসিক কেদার চৌধুরীর অকুণ্ঠ সহায়তা পেয়েছিলেন। এই পর্যায়ে কার্যতঃ, কেদার চৌধুরী ও গিরিশচন্দ্রের যুগ্ম উদ্যোগে ন্যাশনাল থিয়েটার পরিচালিত হয়েছিল।[৭৭] পরবর্তীকালে এঁরা দু'জনে অবশ্য দুই বিরোধী শিবিরে নেতৃত্ব করেছেন।

ন্যাশনাল থিয়েটারের এই পর্বে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের সম্যক আত্মপ্রকাশ ঘটে নি। উল্লেখযোগ্য নতুন কোনো নাটকও মঞ্চস্থ করতে পারে নি সম্প্রদায়। মূলতঃ, মধুসূদন—দীনবন্ধু—বঙ্কিমচন্দ্র এই ত্রয়ীর পুরানো রচনাকে অবলম্বন ক'রে এসময় ন্যাশনালের অভিনয়ধারা প্রবাহিত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র—বিনোদিনীর অভিনয় প্রতিভার বিকাশ এবং অমৃতলাল মিত্রের প্রতিশ্রুতিময় আবির্ভাব এই অধ্যায়ের স্মরণীয় ঘটনা।

১৮৭৯ সালের প্রথম থেকে থিয়েটার সাব-লিজ নিলেন গোপীচাঁদ কেঁইয়া (শেঠি) নামে জনৈক মাড়ওয়ারী। ম্যানেজার হলেন অবিনাশচন্দ্র কর। ১১ জানুয়ারি 'প্রমোদ কানন' (অপেরা) ও 'গ্রন্থকার' (প্রহসন) অভিনীত হওয়ার পর ১৮ জানুয়ারি গোপাল-

৭৭ ন্যাশনাল থিয়েটারের সুরুতে থিয়েটারের পরিচালন-দায়িত্ব যে দু'জনে মিলে বহন করেছেন, গিরিশচন্দ্রের পরবর্তীকালের রচনায় তার উল্লেখ আছে। বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা' গ্রন্থের ভূমিকায় প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছেন :— "··· যখন ৺কেদারনাথ চৌধুরীর সহিত একত্র হইয়া থিয়েটার আরম্ভ করি···"

চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত ও ইটালীয় অপেরা অনুসারে গ্রথিত গীতিনাট্য 'কামিনীকুঞ্জ'[১৮] মঞ্চস্থ হল। 'কামিনীকুঞ্জ' সংলাপবিহীন গীতিনাট্য, উত্তর-প্রত্যুত্তর সব কিছুই সঙ্গীতের মাধ্যমে উচ্চারিত। এতে রামতারণ সান্যাল নায়ক সাজতেন এবং দু'টি বিশিষ্ট স্ত্রীচরিত্রে অবতীর্ণ হতেন বনবিহারিণী এবং কাদম্বিনী। 'কামিনীকুঞ্জ' জনপ্রিয় হয়েছিল।

এই সময় থেকে বাংলা থিয়েটারে রবিবারে অভিনয়ের ব্যবস্থা চালু হয়। ন্যাশনালের ম্যানেজার অবিনাশ কর আকস্মিকভাবে এই প্রথার প্রবর্তন করেন। "তাঁহার সময়ে, যে কোন কারণে, গ্যাস কোম্পানীর বিলের টাকা বাকী পড়ায়, অফিস হইতে লোক আসিয়া গ্যাসের কনেক্‌সন কাটিয়া দিয়া যায়। অবিনাশবাবু বড় একরোখা ছিলেন। তিনি গ্যাস না জ্বালাইয়া অভিনয় করিবার অভিপ্রায়ে রবিবার বেলা ২ টার সময় অভিনয় ঘোষণা করেন,— তাহাতে খুব বিক্রয় হয়। সেই হইতে রবিবারেও অভিনয় চলিতে থাকে।" (নাচঘর—শারদীয় সংখ্যা, ১৩৩৮—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়) ৮ ফেব্রুয়ারি 'শরৎ-সরোজিনী', ১৫ ফেব্রুয়ারি 'বঙ্গবিজেতা' প্রভৃতি পুরানো নাটকের অভিনয়ের পর ন্যাশনাল থিয়েটার ২৬ জুলাই মনোরঞ্জন দাশ বিরচিত 'নন্দনকুসুম' নামে এক গীতিনাট্য নামালে। প্রথম অভিনয়রজনীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ অনাথ বালকদের শিক্ষাভাণ্ডারে দেওয়া হয়েছিল। এই রাত্রে হাইকোর্টের প্রধান

১৮ প্রসঙ্গতঃ, শান্তিদেব ঘোষ জানিয়েছেন:— "... ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত এই নাটকটি বাংলার নাট্য ইতিহাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তার একটি কারণ হল, এই প্রকারের গীত-নাটক বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম। আর দ্বিতীয় কারণ হল যে, এই নাটকই পূজনীয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গীতিনাটক 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচনার পথ সহজ করেছিল।..."

বিচারপতি গার্থ সাহেব বিশিষ্ট দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। নতুন নাটকের অভাবে 'বৃত্রসংহার' প্রভৃতি অভিনয়ের পর সম্প্রদায় মফস্বল ভ্রমণে বেরুল। প্রথমে ঢাকা। সেখান থেকে বাঁকিপুর, বেথিয়ার রাজবাটি, কাশী, এলাহবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি জায়গায় তাঁরা অভিনয় করলেন। সম্প্রদায় যখন কাশীতে স্বত্বাধিকারী গোপীচাঁদের সঙ্গে ম্যানেজার অবিনাশ করের মনোমালিন্য ঘটায় তিনি অবিনাশ চন্দ্রকে দল ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। বাইরে থেকে ফেরার পর ১৮৮০-র গোড়ার দিকে ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায় এবং কিছুদিন বাদে কেদার চৌধুরীর মাতুল কালিদাস মিত্র আসরে নামেন। ইনি বেশীদিন ছিলেন না। তারপর অনেকে, কেউ একমাস, কেউ বা এক সপ্তাহের জন্য মঞ্চ ভাড়া নিতে থাকেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের তখন দারুণ দুরবস্থা! সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ মিত্র (লঙ্কা মিত্র) লিজ নিয়ে উপহার বিতরণের মাধ্যমে থিয়েটার চালাবার চেষ্টা করেন। তাঁর সময়ে "ন্যাশানাল থিয়েটারে লটারীর হিসাবে উপহার দেওয়া হইত। দ্রব্যগুলি ফুট-লাইটের সামনে সাজানো থাকিত; টিকিটে নম্বর দেওয়া থাকিত, দ্রব্যগুলিতেও নম্বর দেওয়া হইত। যে দর্শকের ভাগ্যে যে নম্বরের টিকিট আসিত, সেই নম্বরের জিনিষ তিনি পাইতেন। কেহ হয়তো এক বস্তা কয়লা পাইলেন, কেহ হয়তো একটী ছাতা, কেহ হয়তো বড় দুইটী বিলাতী কুমড়া, কেহ বা এক কাঁদি কলা!···দর্শকগণের মধ্যে এই উপহার লইয়া খুব হাসিতামাসা চলিত।···" (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর— অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

কিন্তু এত ক'রেও থিয়েটার চললো না। জমির ভাড়া এবং মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স প্রভৃতি বাকী পড়ায় ভুবনমোহন নিয়োগীর দেনার দায়ে ন্যাশনাল থিয়েটার শেষ পর্যন্ত নীলামে উঠলো আর পঁচিশ হাজার টাকায় তা কিনে নিলেন প্রতাপচাঁদ জহুরী নামে এক মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ী। প্রথম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটলো এইভাবে।

বাংলা থিয়েটারের অন্যতম পথিকৃৎ ভুবন নিয়োগীর কাল শেষ হল। সাত বছর থিয়েটার চালিয়ে পরিশেষে উনি অবাঙ্গালী ব্যবসাদারের হাতে সাধের মঞ্চ তুলে দিলেন। 'স্থরেন্দ্র-বিনোদিনী' মামলার পর থেকে ওঁর দুর্দিন স্থরু হয়েছিল। আর্থিক সঙ্কটে ভুবনমোহন বেশ কয়েকবার থিয়েটার বাড়ী ভাড়া দিতে বাধ্য হয়েছেন। সেই সব ভাড়াটিয়াদের অনেকেই ওঁর উপর স্থবিচার করেন নি। কেউ কেউ চক্রান্ত করেছেন মালিকানা স্বত্ব থেকে তাঁকে বঞ্চিত করার।[৭৯] অভিজাতবংশীয় হৃদয়বান এই মানুষটির মধ্যে শিল্প ও শিল্পী প্রীতির অভাব ছিল না। ঘাটতি ছিল ব্যবসায় বুদ্ধি আর বিচক্ষণতার। অংশতঃ সেইকারণে এবং কিছুটা দৈব-দুর্বিপাকে ভুবন নিয়োগীকে বারংবার বিপদগ্রস্ত ও পর্যুদস্ত হ'তে হয়েছে। সর্বপ্রকার ত্রুটি আর অক্ষমতা সত্ত্বেও বাংলা মঞ্চের ইতিহাসে তিনি একজন অকৃত্রিম নাট্যানুরাগী এবং ত্যাগব্রতী রূপে চিহ্নিত হয়ে আছেন।

ন্যাশনাল থিয়েটারেব এই পর্যায়ে যে সমস্ত লেসীরা রঙ্গালয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁদের অনেকেই মঞ্চকে প্রমোদক্ষেত্র মনে করতেন। থিয়েটারের আয়ের প্রায় সবটুকু চলে যেত তাঁদের বিলাস উপকরণের মাশুল যোগাতে। নারী ও স্থরার স্রো.ত নিমজ্জমান এইসব মালিকদের আমলে থিয়েটারে নিয়ম-শৃংখলার অস্তিত্ব ছিল না। বেহিসাবী খরচ আর কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণের ফলে অচিরেই

৭৯ ভুবনমোহনের সেই দুর্ভোগের ইঙ্গিত আছে অমৃতলাল বস্থর রচনায়। তিনি লিখেছেন :— "কিন্তু আর এক মজাও দেখলাম, ভুবনমোহন নিয়োগী গ্রেট্ ন্যাশানাল থিয়েটারের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হয়েও নিজের থিয়েটারে নিজে ঢুকতে পায় না। যে সকল কৌশলে ভুবনের কাছ থেকে থিয়েটার লিজ্ নিয়ে তা হস্তান্তরের পর হস্তান্তর ক'রে ভুবনকে ভূঁইকম্পে দুলিয়ে উল্টে ফেলে দেওয়া হয় শোনা গেল, তার বর্ণনায় আমি অনেক বিবেচনা ক'রে ধামা চাপা দিলাম।" (মাসিক বস্থমতী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪)

ঋণগ্রস্ত হয়ে এঁরা একে একে বিদায় নিয়েছেন। এঁদের অপকর্মের সাথে সাথে মঞ্চও শনৈঃ শনৈঃ কলঙ্কসাগরে ডুবেছে। এই সময় ভদ্র দর্শক আর কুলনারী যুগপৎ থিয়েটারকে পরিহার ক'রে এসেছেন আত্মসম্মান রক্ষার তাগিদে। এই সব কাপ্তেন মালিকের অনাচারের বিরুদ্ধে সমকালীন পত্র-পত্রিকাগুলি কিন্তু ধিক্কারে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ১৯ এপ্রিল, ১৮৭৯ তারিখের 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় কেশবচন্দ্র সেন লিখেছিলেন :—"ন্যাশনাল থিয়েটারের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আসিতেছে··· থিয়েটারের লোকেরা মন্দ স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয় করে, মদ খায়, অভিনয়স্থলে মারামারি হুড়োহুড়ি করিয়া দক্ষযজ্ঞেব ব্যাপার করিতেছে দেখিয়াও শিক্ষিত ভদ্রলোক তাহাতে উৎসাহ দিয়া থাকেন, আমোদ করেন, তখন আর এ দুবাচার কে নিবারণ করিবে? এখন আবার বাবুরা নিজের পরিবার লইয়া এই থিয়েটার কবিয়া না বসেন, আমাদের আশঙ্কা হইতেছে।"

প্রতাপচাঁদ জহুরীব আবির্ভাবে ন্যাশনালে তথা বাংলা থিয়েটারে নতুন অধ্যায়েব সূচনা হল। এই প্রথম একজন প্রকৃত ব্যবসায়ী রঙ্গালযেব কর্ণধার হলেন। বর্তমান সময় থেকে আয়-ব্যয়ের হিসাব-রক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। মঞ্চের ভিতর-বাহিরেও নিয়ম-শৃংখলা প্রত্যাবর্তন করে।[৮০]

দায়িত্বভার হাতে নিয়ে প্রতাপচাঁদ সর্বপ্রথম সন্ধান কবতে লাগলেন এক সুযোগ্য ম্যানেজারের। গিরিশচন্দ্রকে উপযুক্ত

৮০ "প্রতাপচাঁদ ছিলেন ব্যবসায়ী। তিনি বুঝেছিলেন এই থিয়েটারই একদিন একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হবে, যদি উপযুক্ত পরিচালন-ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় এবং যদি হিসাবপত্র ইত্যাদি যথাযথভাবে রক্ষার বন্দোবস্ত করা যায়। কেবলমাত্র সুঅভিনয়ই অর্থাগমের পক্ষে যথেষ্ট নয়, একটি প্রতিষ্ঠানকে সম্যকরূপে চালিয়ে যেতে হলে তার জন্য অবশ্য প্রয়োজন হয় শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মকানুন বিধিব্যবস্থা-পালনের।···" (বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র— অহীন্দ্র চৌধুরী)

বিবেচনায় জহুরী তাঁকে ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালক হওয়ার অনুরোধ জানালেন। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর সেই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন গিরিশচন্দ্র। তিনি তখন পার্কার কোম্পানীর কেরানী-বৃত্তিতে নিযুক্ত আছেন। সেখানকার দেড়শ টাকা মাইনের চাকুরী ছেড়ে গিরিশচন্দ্র একশ টাকা বেতনে ন্যাশনাল থিয়েটারের অধ্যক্ষ হলেন। এতদিন অপেশাদার তালিকায় তাঁর নাম ছিল। এখন থেকে রঙ্গালয় হল গিরিশচন্দ্রের একমাত্র উপজীবিকা। ন্যাশনাল থিয়েটারের এই পর্বেই নাট্যকাররূপে গিরিশচন্দ্রের সার্থক আত্ম-প্রকাশ ঘটে। প্রতাপ জহুরী ও গিরিশচন্দ্র মিলিতভাবে মঞ্চ-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সেদিন যে বিধিনিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন, পরবর্তীকালের সাধারণ রঙ্গালয়ে তা দীর্ঘদিন অনুসৃত হয়ে এসেছে।[৮১]

নতুন ব্যবস্থাপনায় ন্যাশনাল থিয়েটারে কবি সুরেন্দ্র মজুমদারের 'হামির' নাটক দিয়ে ১ জানুয়ারি, ১৮৮১ অভিনয় সুরু হল। গিরিশচন্দ্র এতে চারখানি গান রচনা ক'রে দেন। টডের রাজস্থান থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে সুরেন্দ্র মজুমদার তাঁর প্রথম নাটক 'হামির' লিখেছিলেন। নাটকখানি পূর্বেই ন্যাশনালে মঞ্চস্থ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু নাট্যকারের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে তা এতকাল সম্ভব হয় নি। 'হামিরে'র ভূমিকালিপি ছিল এইরকম ঃ— হামির

৮১ "প্রতাপ জহুরী এবং গিরিশচন্দ্রের এই মিলন বাংলা নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই অভিনব যোগসূত্রের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল গিরিশচন্দ্রের প্রকৃত নাট্যকার জীবনের অঙ্কুরোদ্গমের উপযুক্ত ক্ষেত্র। এক বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করলো নাট্যকার গিরিশচন্দ্র। থিয়েটার পরিচালনার জন্য প্রতাপ জহুরী ও গিরিশচন্দ্র যে সকল নিয়মকানুন প্রবর্তন করেছিলেন গতযুগ পর্যন্ত বাংলাদেশের রঙ্গালয় পরিচালনায় সেইগুলিই অনুসৃত হয়ে এসেছে। রঙ্গালয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এইটাই প্রতাপ জহুরীর অবদান।" (বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র—অহীন্দ্র চৌধুরী)

-গিরিশচন্দ্র, উদয় ভট্ট-মহেন্দ্রলাল বসু, জাল মাহ্‌তো-অমৃতলাল বসু, বীলনদেব-অমৃতলাল মিত্র, কমলা-কাদম্বিনী, লীলা-বিনোদিনী এবং পান্না-বনবিহারিণী। ৮ জানুয়ারি, ১৮৮১ 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' লিখলে :— "The National Theatre.— We hear that the entertainments given at this Theatre are very popular with the native community, and that the management have been very liberal, both in fitting up the Theatre, and placing the pieces on the stage. An historical drama is to be produced this evening, entitled "Hamir" ; or "Chitore Regained." কিন্তু 'হামির' চললো না। প্রসঙ্গতঃ, বিনোদিনী লিখেছেন :— "এই থিয়েটারের প্রথম অভিনয়, স্বর্গীয় কবিবর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বিরচিত "হামীব"। ইহার নায়িকার ভূমিকা আমার ছিল, কিন্তু তখন ন্যাশন্যালের দুর্নাম রটিয়াছে; অতি ধূমধামের সহিত সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত হইয়া অভিনয় হইলেও অধিক দর্শক আকর্ষিত হইল না।" (আমার কথা) প্রথম প্রচেষ্টার এই ব্যর্থতা পরিচালক গিরিশচন্দ্রকে চিন্তিত ক'রে তুলেছিল। নাটকের অভাবে তিনি বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। অভিনয়যোগ্য নাটক চেয়ে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞাপন দিতে হল তাঁকে কিন্তু সাড়া মিললো না।[৮২] অগত্যা, ১২ জানুয়ারি 'রাসলীলা' এবং ১৫ জানুয়ারি 'শিবের বিবাহ' ও 'মেঘনাদবধ' অভিনীত হওয়ার পর ২২ জানুয়ারি 'পলাশীর যুদ্ধ' নাটকের সঙ্গে ইত্যবসরে লেখা গিরিশচন্দ্রের গীতিনাট্য 'মায়াতরু' মঞ্চস্থ হল।

৮২. "গিরিশচন্দ্র 'হামির' অভিনয়ের পর নূতন নাটকের জন্য অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাই তিনি থিয়েটারের হাণ্ডবিলে ভাল নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দিতে লাগলেন। কিন্তু পুরস্কারের প্রত্যাশায় রামনারায়ণ তর্করত্নের মত কোন প্রতিভাবান নাট্যকারকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল না।" (বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র— অহীন্দ্র চৌধুরী)

'মায়াতরু'তে চিত্রভানু, সুরত, দমনক, মার্কণ্ড, উদাসিনী, ফুল-হাসি এবং ফুল-ধূলা সাজলেন যথাক্রমে মহেন্দ্রলাল বসু, রামতারণ সান্যাল, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, বিহারীলাল বসু, ক্ষেত্রমণি, বিনোদিনী ও বনবিহারিণী। গীতিনাট্যখানি দর্শক সমাদর পেয়েছিল। বনবিহারিণী, রামতারণ এবং বিনোদিনী মনোজ্ঞ অভিনয় করলেন। সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিতা দেখালেন বিনোদিনী। 'আমার কথা'য় তিনি লিখেছেন ঃ—"ভাল ভাল নাটক যাহা ছিল, সব পুরাতন হইয়া গিয়াছে, নূতন ভাল নাটকও পাওয়া যায় না। "মায়াতরু" নামে একখানি ক্ষুদ্র গীতিনাট্য গিরিশবাবু রচনা করিলেন। "পলাশীর যুদ্ধের" সহিত একত্রিত হইয়া এই গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হয়। দুই তিন রাত্রি অভিনয়ের পরেই এই ক্ষুদ্র নাটিকার যশে দর্শক আকর্ষিত হইয়া বাড়ী ভরিয়া যাইতে লাগিল। এই গীতিনাট্যে আমার "ফুলহাসির" ভূমিকা দেখিয়া "রিজ এণ্ড রায়তের" সম্পাদক স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় লেখেন, "বিনোদিনী was simply charming…" 'মায়াতরু'র সুখ্যাতি শুনে অভিনয় দেখতে এসে বঙ্কিমচন্দ্র 'ফুল-হাসি'র (বিনোদিনী) গানের প্রশংসা ক'রে গেলেন। ২৬ মার্চ নামলো গিরিশচন্দ্রের নাট্যরূপ প্রদত্ত রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবী কঙ্কণ'। ৩০ মার্চ ন্যাশনালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'তে গিরিশচন্দ্র, বিনোদিনী ও সুকুমারী দত্ত যথাক্রমে পশুপতি, মনোরমা এবং গিরিজায়ারূপে দেখা দিলেন। গিরিশচন্দ্র রচিত আর একখানি গীতিনাট্য 'মোহিনী প্রতিমা' মঞ্চস্থ হল ৯ এপ্রিল। এখানি W. S. Gilbert-এর 'Pygmalion & Galatta' অনুসরণে লেখা। এতে অংশগ্রহণ করেছেন রামতারণ সান্যাল (হেমন্ত), বিহারীলাল বসু (জম্বুভয়), মহেন্দ্রলাল বসু (মহীন্দ্র), বনবিহারিণী (নীহার), বিনোদিনী (সাহানা) এবং কাদম্বিনী (কুসুম)।

'মোহিনী প্রতিমা'র নাচ-গান সাধারণ দর্শককে খুশী করলেও নাটকখানি সমালোচকদের মনঃপুত হয় নি। 'সাধারণী' শ্লেষের সুরে

প্রশ্ন করেছিল :— “গিরিশবাবুর অসাধারণ অভিনয় ক্ষমতা, সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যজ্ঞান, প্রচুর ইংরেজী কাব্য আলোচনা, স্ফুটনোন্মুখী কবিতা শক্তি— কি শেষে বুদ্বুদসদৃশ এইসকল নাট্যবিম্ব প্রসব করিতে নিযুক্ত রহিল ?…” (২৪।৪।১৮৮১) ‘আলাদিন’ নামে গিরিশচন্দ্র রচিত একটি পঞ্চরংও ‘মোহিনী প্রতিমা’র সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। এতে কুহকী, আলাদিন, বাদ্‌সাহ, উজীর, উজীর-পুত্র, কলু, জিনি, আলাদিনের মাতা, বাদ্‌সাহ-কন্যা ও পরী এবং দাসী সেজেছিলেন যথাক্রমে গিরিশচন্দ্র, রামতারণ সান্যাল, মহেন্দ্রলাল বসু, নীলমাধব চক্রবর্তী, অপূর্বকৃষ্ণ দত্ত, গিরীন্দ্রনাথ ভদ্র, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), ক্ষেত্রমণি, বিনোদিনী ও নারায়ণী। “ন্যাশনালে এই-খানি বড় জমিত। গিরিশবাবু যখন… রামতারণের সম্মুখে যাদুদণ্ড ঘুরাইতেন সকলে বিস্মিত হইতেন। আর আলাদিন যখন চীনে-ম্যানের বেণী দুলাইয়া এই গানটি গাহিতে গাহিতে বাহির হইত— দর্শক আনন্দে মাতিয়া উঠিত।” (ভারতীয় নাট্যমঞ্চ— হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত) পরের নাটক, ‘আনন্দ রহো’। প্রথম অভিনয়ের তারিখ —২১ মে, ১৮৮১। ‘আনন্দ রহো’ গিরিশচন্দ্রের লেখা প্রথম ঐতি-হাসিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। এর বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিলেন গিরিশচন্দ্র (বেতাল), অমৃতলাল মিত্র (আকবর ও রাণা প্রতাপ), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (সেলিম), অমৃতলাল বসু (মানসিংহ), মতিলাল সুর (ভামসা), ক্ষেত্রমণি (মহিষী), বিনোদিনী (লহনা) এবং কাদম্বিনী (যমুনা)। নাটক হিসাবে দুর্বল হওয়ায় ‘আনন্দ রহো’ চলে নি।[৮৩]

৮৩ “রাণা প্রতাপের মৃত্যু, মানসিংহকে হত্যা করিতে আকবরের ষড়যন্ত্র, মানসিংহের কন্যা লহনার প্রেম ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া ইহা রচিত; কিন্তু এই সকল বিচ্ছিন্ন কাহিনীর মধ্য দিয়া মূল নাট্যকাহিনীর কেন্দ্রীয় ঐক্যটি সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। রাণা প্রতাপের চরিত্রগত দৃঢ়তা ইহাতে রক্ষা পায় নাই, আকবর ও মানসিংহের চরিত্রের ঐতিহাসিক

১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গালয়ের সূত্রপাত থেকে বেশ কিছুকাল বাংলা থিয়েটার প্রধানতঃ দীনবন্ধু, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনার উপর নির্ভর ক'রে এসেছে। এঁদের লেখা সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকগুলি সেকালে অপরিসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত অল্প। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন (১৮৭৬) চালু হওয়ার পর রাজরোষের ভয়ে এঁদের রচিত নাটকও আর মঞ্চমালিকরা মঞ্চস্থ করতে সাহস পেতেন না। ফলে ব্যাপক ভাবে গীতিনাটকের রচনা ও অভিনয় সুরু হল। নতুন নাটক নেই, খ্যাতনামা নাট্যকারদের প্রচলিত ও মঞ্চসফল নাটকও বহু অভিনীত এবং রাজরোষের আশঙ্কায় পরিত্যক্ত। ভরসা কেবল গীতিনাট্য কিন্তু বৈচিত্র্য প্রয়াসী দর্শকদের কেবলমাত্র তাই দিয়ে সন্তুষ্ট কবা সম্ভব নয়। সুতরাং এই পর্যায়ে নতুন নাটকের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছিল।

সৌখিন সম্প্রদায়ের কৃতী নট গিরিশচন্দ্র বাংলাদেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন অভিনেতা ও পরিচালক হিসাবে। ন্যাশনাল (জোড়াসাঁকো) বা গ্রেট ন্যাশনাল পর্বে তাঁর অনবদ্য অভিনয়নৈপুণ্যে দর্শককুল মুগ্ধ হয়েছে। নাট্যকা· হওয়ার বাসনা তাঁর ছিল না, যদিও অনুবোধে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক কাহিনী তিনি নাটকায়িত করেছেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পর্বে তিনি যখন ওখানকার লেসী (১৮৭৭) এবং মুখ্য অভিনেতা, সেই সময় মঞ্চের দাবী মেটাতে বাধ্য হয়ে তাঁকে কয়েকখানি গীতিনাট্য রচনা করতে হয়। ব্যাপারটা নিছক প্রয়োজনের তাগিদে ঘটেছিল। প্রতাপ জহুরীর আমলে ন্যাশনালের অধ্যক্ষ হয়ে উনি একই

মর্যাদা ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তদুপরি অন্যান্য ঐতিহাসিক ও অর্ধ-ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিও সুপরিকল্পিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে না।...” (বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস— প্রথম খণ্ড / ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য)

অভাব বোধ করলেন— নাটক নেই, নাটক চাই। এই পর্যায়েও গিরিশচন্দ্র কয়েকখানি গীতিনাট্য রচনা করেন। তাদের কোনো কোনোটির অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, কোনোটির বা হয় নি। পূর্বের মত এগুলিও ছিল ফরমাশী রচনা। মূলতঃ, তখনও তিনি অধ্যক্ষ ও অভিনয়শিল্পী। সুরেন্দ্র মজুমদারের ঐতিহাসিক নাটক 'হামির' দিয়ে গিরিশচন্দ্র নব পর্যায়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন করেছিলেন কিন্তু 'হামিব' চলে নি। তখন বাধ্য হয়ে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্রকে নতুন নাটক চেয়ে বিজ্ঞাপন দিতে হল কিন্তু তাতেও যখন আশানুরূপ সাড়া মিললো না, কয়েকখানি গীতিনাট্য রচনার পর তিনি স্বয়ং লেখনী ধারণ করলেন পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার সংকল্প নিয়ে। রচিত হল— 'আনন্দ রহো'। ন্যাশনালে গিরিশের প্রথম ঐতিহাসিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের অভিনয় ব্যর্থ হয়েছে। তার কারণ, নাটকখানি ছিল দুর্বল। চিন্তা ও কল্পনার দৈন্য 'আনন্দ বহো'র সর্বত্র। চরিত্রগুলিও জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে নি। নানা অসঙ্গতি এবং কল্পনার অবাজকতা নাটকখানিকে ক্লিষ্ট কবেছিল। পূর্ববর্তী নাট্যকাবদের ঐতিহাসিক নাটকের সাফল্য দেখে 'কৃষ্ণকুমারী' (মধুসূদন) এবং বিশেষভাবে 'অশ্রুমতী' (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গিরিশচন্দ্র 'আনন্দ রহো' রচনা করেন। কিন্তু এই পদানুসরণ হয়েছিল অক্ষম অনুকরণ মাত্র।

"…'আনন্দ রহো'র ব্যর্থতার পর গিরিশচন্দ্র অনুধাবন করলেন তাঁর ত্রুটি কোথায়। তিনি বুঝতে পারলেন এখনও পূর্ণাঙ্গ একটা নাটক লেখার উপযুক্ত তিনি হন নি, ইতিপূর্বে বঙ্কিমেব উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ দান করে তিনি প্রশংসা অর্জন করেছিলেন, কারণ সেখানে ছিল একটা সুগঠিত কাঠামো। সেই কাঠামোর মধ্যেই বিচবণ ক'রে তিনি কিছু কিছু চরিত্রসৃষ্টি ও দৃশ্য-সংস্থাপনের ক্ষেত্রে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছিলেন। তাই এবার গিরিশচন্দ্র চাইলেন এমন একটা বিষয়বস্তুকে তাঁর নাটকের উপজীব্য করতে, যার মধ্যে আছে

বাঙ্গালী নরনারীর মর্মস্পর্শী রসময় আবেদন এবং একটা সুনির্দিষ্ট কাঠামো, যে নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবাধে বিচরণ ক'রে তিনি জনপ্রিয় নাটক সৃষ্টি করতে পারবেন।

গিরিশচন্দ্র উপলব্ধি করলেন যে, বাঙ্গালী ধর্মপ্রাণ, ভক্তিমান, দৈববিশ্বাসী। তিনি এই নাটকের বিষয় সংগ্রহ কবার দিক দিয়ে উপযুক্ত বলে মনে করলেন পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বাঙ্গালীর অতি প্রিয় ধর্মগ্রন্থগুলিকে। গিরিশচন্দ্র সেই ঐতিহাসিক নাট্যপ্রিয়তার যুগে পৌরাণিক নাটক লিখতে অগ্রসর হয়ে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন বলে অনেকের কাছে মনে হবে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র জানতেন এই পরীক্ষায় সাফল্য তাঁর অবধাবিত। কারণ বাঙ্গালী দর্শক যে ঐতিহাসিক নাটক বা উপন্যাস ভালবাসে তার কারণ তা'রা যে ইতিহাসেব যথাযথ রূপায়ণের জন্য ভালবাসে তা নয়, তারা এই ধরণের নাটকের মধ্যে পায় উত্তেজনা, পায় খানিকটা ইতিহাস, খানিকটা রোমান্স। তবে উত্তেজনার খোরাক পাওয়াই হচ্ছে এই সকল নাটক ভাল লাগার কারণ। তিনি তখন ভাবলেন, পৌরাণিকের মধ্যেও এমন বিষয় নিতে হবে যার মধ্যে থাক্‌বে যথেষ্ট উত্তেজনা। তিনি দেখলেন, রাবণ-বধের কাহিনীর মধ্যে বীররস পরিবেশন করা যাবে, বীররসের স্থায়ীভাব উৎসাহ, এই উৎসাহই নিয়ে আসবে অপরিসীম উত্তেজনা। আব এই বীবরসের সঙ্গে যদি ভক্তিরস, করুণরস প্রভৃতি ভক্তিরস, করুণরস প্রভৃতি মিশ্রিত করা যায় তখন তার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। রামায়ণের থেকে কাহিনী নিয়ে তিনি লিখলেন 'রাবণ-বধ' নাটক। নাটকটি অভিনীত হল ১৮৮১-র ৩০শে জুলাই।" (বাংলা-নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র—অহীন্দ্র চৌধুরী)

স্বর্ণযুগের সূচনা

এবার পরীক্ষায় সফল হলেন গিরিশচন্দ্র। চিরন্তন ভক্তিরস-পিপাসু বাঙ্গালীর কাছে কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদর্শে গড়া 'রাবণবধে'র আবেদন ব্যর্থ হল না।[৮৪] নাটকখানি মঞ্চস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে রচয়িতার জয়ধ্বনি উঠলো। এতদিন সুনিপুণ অভিনেতা ও পরিচালক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল, এবার সেই সাথে যুক্ত হল নাট্যকারের সম্মান। 'রাবণবধ' গিরিশচন্দ্রকে নাট্যকারের প্রতিষ্ঠা দিলে। ন্যাশনাল থিয়েটারের অতীত-কালিমা বিস্মৃত হয়ে দর্শকরা আবার বিপুল সংখ্যায় ভীড় করতে লাগলো রঙ্গালয়ের দরজায়।[৮৫] গৈরিশ ছন্দে রচিত এ-নাটক রচনা সৌকুমার্যে এবং মর্ম-

৮৪ প্রসঙ্গতঃ, অমৃতলাল বসু লিখেছেন:—"রাবণবধ নাটক যেদিন প্রথম অভিনীত হয়, আমাদের বড়ই ভাবনা হইয়াছিল—পৌরাণিক নাটক চলিবে কিনা? কিন্তু অভিনয়কালীন যে সময়ে জগজ্জননীর অভয় পাইয়া রাবণ অবধ্য হইয়া উঠিয়াছে, রামচন্দ্র হতাশ হইয়া লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে বলিতেছেন—

দেহ সবে বিদায় আমায়,
সাগর-সলিলে—ত্যজিব তাপিত প্রাণ! ··

রামচন্দ্র-বেশী গিরিশচন্দ্রের জলদগম্ভীর কণ্ঠ হইতে যখন শেষ দুই ছত্র—

তারার চরণে ভক্তি-অস্ত্র বিনে
কি পারে বিন্ধিতে আর!

উচ্চারিত হইল, তখন দর্শকমণ্ডলী ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠে যেরূপ সমবেত উল্লাস-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, তখনই আমাদের মনে হইল, এ নাটক চলিবে, ভক্তি-প্রধান বাঙ্গালী তাহার জন্মগত সংস্কার ভুলে নাই— ধর্ম্মপ্রাণ জাতির মর্ম্মস্থান এ নাটক ঠিক স্পর্শ করিয়াছে।" (গিরিশচন্দ্র— অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

৮৫ বিনোদিনী তাঁর 'আমার কথা'য় জানিয়েছেন:— "······'রাবণবধে'র পর হইতে থিয়েটারে লোকের স্থান সঙ্কুলান হইত না। উপরের আসন সকল প্রতিবারই পূর্ণ হইয়া যাইত, যে সকল ধনবান ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা ঘৃণা করিয়া

স্পর্শী অভিনয়ে সেদিন যুগপৎ সাধারণ দর্শক ও বিদগ্ধ সমালোচককে মুগ্ধ করেছিল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লিখলে:— "There was a grand performance of National Theatre last Saturday and we congratulate the management on the signal success achieved on the occasion. A new drama Rāvonbadh destruction of Rāvana— written in verse by the "Garrick of the Hindu Stage" and the new and splendid sceneries and dresses, to say nothing of the histrionic talents of the actors and actresses, called for the repeated and enthusiastic applause. We hope all lovers of Hindu Drama, will muster strong on the next occasion". (৪।৮।১৮৮১) 'রাবণবধ' নাটকের ভূমিকালিপি ছিল এইরকম:—রাম-গিরিশচন্দ্র, লক্ষ্মণ-মহেন্দ্রলাল বসু, ব্রহ্মা-নীলমাধব চক্রবর্তী, ইন্দ্র-অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), হনুমান-অঘোরনাথ পাঠক, সুগ্রীব-উপেন্দ্রনাথ মিত্র, রাবণ-অমৃতলাল মিত্র, বিভীষণ-অমৃতলাল বসু, নিকষা, কালী, দুর্গা ও ত্রিজটা-ক্ষেত্রমণি, সীতা-বিনোদিনী, মন্দোদরী-কাদম্বিনী। এ-নাটকে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছিলেন লক্ষ্মণবেশী মহেন্দ্রলাল বসু। তাঁর অভিনয়নৈপুণ্য সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন:— "রাবণবধে'র লক্ষ্মণ, সীতার কথার উত্তরে 'জ্যেষ্ঠ অনুগামী মাতঃ' এবং স্বগত, 'কেন মাগো সুমিত্রা জননি, ধরেছিলে গর্ভে মোরে'! গভীর শোকাচ্ছন্ন ধীরকণ্ঠে প্রস্তরবৎ অচলভাবে যেরূপে উচ্চারিত হইয়াছিল তাহা শ্রবণে দর্শকবৃন্দ প্রস্তরবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। আমি 'রাম' সাজিয়াছিলাম,

---

থিয়েটারে আসিতেন না তাঁহাদের দ্বারাই দুই একদিন পূর্ব্বে টিকিট ক্রীত হইয়া অধিকৃত হইত।"

আমার চক্ষে জল আসিল, রঙ্গমঞ্চের সকলে এমনকি হীন পট-পরিবর্ত্তনকারীরাও নিজকার্য্য ভুলিয়া মুগ্ধপ্রায় হইল।......" (স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসু— রঙ্গালয়, ২ চৈত্র ১৩০৭) অপর একজন শিল্পী এ-নাটকে কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তিনি বিনোদিনী (সীতা)। 'রাবণবধ' নাটকের আর একটি বিশিষ্ট সম্পদ তার ছন্দ। গিরিশচন্দ্র তাঁর নব আবিষ্কৃত ভঙ্গ-অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটকটি রচনা করেছিলেন। এও ছিল তাঁর এক রকমের পরীক্ষা। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছিল। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা'র কয়েকটি ছত্রের দ্বারাও গিরিশচন্দ্র প্রভাবান্বিত হয়েছেন। বাংলা দেশের দুই খ্যাতনামা নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ও রাজকৃষ্ণ রায় প্রায় একই সময়ে ভঙ্গ-অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটক লেখা সুরু করেন। রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুর্ভঙ্গ' এবং গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' একই বৎসরে (১৮৮১) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তবে, 'হরধনুর্ভঙ্গ' কিছুদিন পূর্বে রচিত ও বেঙ্গলে অভিনীত হ'লেও, এই নতুন ছন্দের প্রথম সার্থক প্রয়োগ-কর্তার সম্মান গিরিশচন্দ্র দাবী করতে পারেন।[৮৬] এই কাজে তিনি যে রাজকৃষ্ণের চেয়ে অধিক সফল হয়েছিলেন, 'রাবণবধ' প্রমুখ এই ছন্দে লেখা নাটকসমূহেব অভাবনীয় অভিনয়সাফল্যই তার প্রমাণ বহন কবছে। প্রসঙ্গতঃ, 'বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে অহীন্দ্র চৌধুবী লিখেছেন :— "... ..গিরিশচন্দ্র 'রাবণ-বধে'ই

৮৬ "রাজকৃষ্ণ রায় বাংলা কাব্যে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দেব প্রথম প্রবর্ত্তক হইলেও বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এই সম্মান গিরিশচন্দ্রেরই প্রাপ্য বলিয়া মনে হয়। গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' ও রাজকৃষ্ণের 'হরধনুর্ভঙ্গ' আভিনয়িক ছন্দে রচিত হইয়া একই বৎসরে— ১২৮৮ সালে প্রকাশিত ও কয়েকদিনের ব্যবধানে অভিনীত হয়। প্রকৃতপক্ষে উভয় নাট্যকারই পরস্পরের অজ্ঞাতসারে নিজ নিজ রচনায় স্বাধীনভাবে এই ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, মনে করাই সঙ্গত হইবে। তবে এই ছন্দ গিরিশচন্দ্রের হস্তে যেরূপ সার্থক ও সুন্দর হইতে পারিয়াছে, রাজকৃষ্ণ সম্বন্ধে সে-কথা বলা চলে না।" (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা)

প্রথম প্রবর্তন করলেন ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ। চতুর্দশ অক্ষরের বন্ধন থেকে অমিত্রাক্ষরকে মুক্ত করে গিরিশচন্দ্র তাকে দিলেন স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিবেগ— সৃষ্টি হল নাটকের উপযুক্ত ভাষা। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ চতুর্দশ অক্ষরের বন্ধনে আবদ্ধ এবং উহা আয়ত্ত করাও সাধারণ অভিনেতৃবর্গের পক্ষে কষ্টসাধ্য।

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পেঁচার নক্সা'র প্রচ্ছদপটে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত একটি ক্ষুদ্র কবিতা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন গিরিশচন্দ্র এই নবতম গৈরিশী ছন্দ প্রবর্তনের। মুক্ত হরিণীর ন্যায় স্বচ্ছন্দ গতিতে চলমান, শ্রুতিমধুর, সহজ সরল গৈরিশী ছন্দ পরে গিরিশচন্দ্রের এবং অন্যান্য নাট্যকাবের বিভিন্ন নাটকে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং নাটক-রচনার উপযুক্ত বাহনরূপে স্বীকৃত হয়েছিল। মাইকেল থেকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সূত্রপাত এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দ রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি অনেক নাট্যকারই ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছেন।.....গিরিশচন্দ্রই সর্বপ্রথম এই ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দকে এমন একটা সার্থক রূপ দিলেন যে, নাটকের অভিনয়কালে সেকালের সুকণ্ঠ নট নটীগণের কণ্ঠে এই ছন্দের নাট্যাংশ আবৃত্তিতে যে শব্দঝঙ্কাব সৃষ্টি হত, তাতে দর্শক''ণ স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। অনেকেরই এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। এইরূপে অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ঘসে মেজে যে গৈরিশী ছন্দ সৃষ্টি হয়েছিল, সেই ছন্দই হল নাটকের সম্পূর্ণ উপযোগী।"

'রাবণবধে'র সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে গিরিশচন্দ্র রচনা করলেন দ্বিতীয় পৌরাণিক নাটক 'সীতার বনবাস' এবং ১৭ সেপ্টেম্বব, ১৮৮১ ন্যাশনাল থিয়েটারে তা মঞ্চস্থ হল। এ-নাটকে গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) নীলমাধব চক্রবর্তী, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, অতুলচন্দ্র মিত্র (বেড়ৌল), অঘোরনাথ পাঠক, বিনোদিনী, কুসুমকুমারী, কাদম্বিনী, বনবিহারিণী এবং ক্ষেত্রমণি যথাক্রমে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, দুর্মুখ, সুমন্ত্র, অশ্বরক্ষক,

লব, কুশ, সীতা, অলিক্ষরা ও নিকষার ভূমিকায় দেখা দিলেন। বলাবাহুল্য, 'সীতার বনবাস'ও জনসমাদর থেকে বঞ্চিত হল না। অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন :— "……এর অভিনয় সর্বশ্রেণীর দর্শকের বিশেষ করে মহিলাদের হৃদয়কে অনায়াসে জয় করে নিতে পেরেছিল। রামায়ণের করুণতম অংশকে অবলম্বন করে যে নাটক গিরিশচন্দ্র লিখেছিলেন. তার সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় যে করুণ রসের প্লাবন বহিয়ে দিয়েছিল তার তুলনা বিরল। এই সময় থেকে বাংলার মা লক্ষ্মীদের আগমনের সাথে সাথে লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টিও বর্ষিত হয় বঙ্গীয় নাট্যশালার উপর, সেই সময় রঙ্গালয়কে ভদ্র, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজ বেশ প্রীতির চক্ষে দেখতেন না, কারণ অভিনেতাদের মধ্যে পান-দোষের প্রাবল্য দেখা যেত। সেইজন্য ভদ্রলোকেরা মহিলাদের প্রায় নিয়ে আসতেন না রঙ্গালয়ে। কিন্তু 'সীতার বনবাসে'র অপূর্ব অভিনয়ের কথা শুনে ক্রমশঃ প্রচুর সংখ্যক মহিলা দর্শকের সমাগম হতে লাগল। 'সীতার বনবাস'ই প্রথম বাংলার মা জননীদের নাট্যশালায় অভিনয়-দর্শনে আগমনের জন্য সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। মায়েদের আগমনে বঙ্গীয় রঙ্গালয় ধন্য হল এবং সকল শ্রেণীর নরনারীরই নির্মল আনন্দলাভের পীঠস্থানে পরিণত হল। মহিলাদের জন্য আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হল, এমন কি সারা ত্রিতলটিকে চিক দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল তাঁদের বসবার জন্য। 'সীতার বনবাস' যে শুধু একটি অভিনয়-সফল জনপ্রিয় নাটক মাত্র— তাই নয়, মহাকবি গিরিশচন্দ্রের কবিত্ব শক্তির মহনীয়তা বহু ক্ষেত্রেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এই নাটকের মধ্যে।" (বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র) 'সীতার বনবাস', 'রাবণবধ' নাটকের মতই জনপ্রিয় হল। এ-নাটকেও মহেন্দ্রলাল বসু লক্ষ্মণরূপে দর্শকদের চিত্ত জয় করেছেন। তাঁর সেই হৃদয়গ্রাহী অভিনয় সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :— "সীতার বনবাসের" লক্ষ্মণ— সীতাকে বনে রাখিয়া উন্মাদবৎ সন্তপ্ত হৃদয়-ভাবে মহেন্দ্রলাল সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া-

ছিলেন ; এ অভিনয়ে আমি রাম সাজিয়াছিলাম, অদ্ভুত অভিনয় দর্শনে আমি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশকাল বিস্মৃত হই।" (স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসু— রঙ্গালয, ২ চৈত্র, ১৩০৭) আব উপভোগ্য হ'ত লব ও কুশের বেশে বিনোদিনী এবং কুসুমকুমারীব (খোঁড়া) অভিনয়।[৮৬ক] এবপর ২১ সেপ্টেম্বব, ১৮৮১ (?) ন্যাশনালে অমৃতলাল বসুব 'তিলতর্পণ' প্রহসন মঞ্চস্থ হয। এতে নাট্যকার স্বযং বাপ্পাবাও সেজেছিলেন। অভিনয় দেখে 'সাধারণী' লিখেছিল :— "মহাতীর্থ ন্যাশনাল বঙ্গভূমিতে এই তিলতর্পণ ক্রিযা দর্শন এক নিশীথে আমাদেব অদৃষ্টে ঘটিযাছিল ; খানিক খানিক বিবক্তিজনক হইলেও, আমবা মাঝে মাঝে বালকেব মত উচ্চহাস্য কবিতে বাধ্য হইযাছিলাম।" (১০।৪।১৮৮১) বামায়ণ অবলম্বনে দু খানি নাটক লেখাব পব গিবিশচন্দ্র মহাভাবতেব কাহিনী নিয়ে 'অভিমন্যুবধ' বচনা কবলেন এবং ২৬ নভেম্বব, ১৮৮১ তাবিখে ন্যাশনাল থিয়েটাবে প্রথম অভিনীত হল সেই নাটক। নাটকখানিব ভূমিকালিপি ছিল এইবকম :— যুধিষ্ঠিব ও দুর্যোধন-গিবিশচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রোণাচার্য-কেদাবনাথ চৌধুবী, ভীম ও গর্গ-অমৃতলাল মিত্র, অর্জুন ও জযদ্রথ-মহেন্দ্রলাল বসু, অভিমন্যু-অমৃতলাল মুখোপাধ্যায (বেলবাবু), দুঃশাসন-নীলমাধব চক্রবর্তী, কর্ণ ও গণক-অঘোবনাথ পাঠক, সুভদ্রা-গঙ্গামণি, উত্তবা-বিনোদিনী, বোহিণী-কাদম্বিনী। উন্নতমানেব নাটক হওযা সত্ত্বেও 'অভিমন্যুবধ' চললো না। বিযোগান্ত নাটকেব প্রতি সমকালীন দর্শকেব

৮৬ক "সীতাব বনবাস' খুব জনপ্রিয হযেছিল। 'সীতার বনবাসে' লবকুশের অভিনয হত অতি চমৎকার। প্রতাপচাঁদ একদিন গিরিশচন্দ্রকে বললেন – বাবু যব দোসরা কিতাব লিখেগা তব্ ফিন ওহি দুঃ লেড়কা ছোড় দেও।" (সাজঘর— ইন্দ্র মিত্র)

প্রতাপ জহুরীর এই অনুরোধের কারণে গিরিশচন্দ্র 'লক্ষ্মণ-বর্জন' লিখেছিলেন।

অনীহা এর কারণ মনে হয়।[৮৭] বছরের শেষ নাটক 'লক্ষ্মণ-বর্জন'। এটিও গিরিশচন্দ্রের রচনা। ন্যাশনালে প্রথম অভিনয়ের তারিখ—৩১ ডিসেম্বর, ১৮৮১।

১৮৮২ সাল পড়লো। নতুন বছরে গিরিশচন্দ্র নাট্যামোদীদের উপহার দিলেন আরো তিনখানি পৌরাণিক নাটক—'সীতার বিবাহ', 'রামের বনবাস' এবং 'সীতাহরণ'। ন্যাশনালে এদের অভিনয় তারিখ যথাক্রমে ১১ মার্চ, ১৫ এপ্রিল ও ২২ জুলাই, ১৮৮২। 'সীতার বিবাহ' নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন:—"গিরিশচন্দ্রের বিশ্বামিত্রের ভূমিকাভিনয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক ভূমিকাই সুন্দররূপে অভিনীত হইয়াছিল। ধর্ম্মদাসবাবু (সুর) জনকের রাজসভায় অভিনয় উপলক্ষ্যে রঙ্গমঞ্চের উপর রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া দর্শকমণ্ডলীর প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। রঙ্গমঞ্চের উপর রঙ্গমঞ্চ বঙ্গ নাট্যশালায় এই প্রথম প্রদর্শিত হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও 'সীতার বিবাহ' দর্শকমণ্ডলীর নিকট সেরূপ সমাদৃত হয় নাই। বোধহয় 'রাবণবধ', 'সীতার বনবাস' ও 'লক্ষ্মণ বর্জ্জনে'র অভিনয়ে রাম চরিত্রের

---

৮৭ "...উচ্চশ্রেণীর নাটক হওয়া সত্ত্বেও 'অভিমন্যুবধ' 'সীতার বনবাসে'র ন্যায় সর্বশ্রেণীর দর্শকগণের চিত্তজয়ে সমর্থ হ'ল না। 'অভিমন্যুবধ' নাটকটি বিয়োগান্ত নাটক বলেই দর্শক সমাজে পূর্ববর্তী নাটক 'সীতার বনবাসে'র মত আদৃত হয় নি। পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র এই সর্বপ্রথম বিয়োগান্ত নাটকের অবতারণা করলেন। যে সময় মিলনান্ত যাত্রাভিনয় ও নাটক দেখতেই সকলে অভ্যস্ত এবং এই শ্রেণীর নাটকের প্রতি তাদের আন্তরিক সহানুভূতি বিরাজমান,—সেই যুগে প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে বিয়োগান্ত নাটক রচনা করে গিরিশচন্দ্র একটা দুঃসাহসিকতার কাজ করেছেন বলা যায়। দর্শক সমাজও এই দুঃসাহসের প্রতিদান দিতে ভোলেনি, তাই নাটকটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি।" (বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র—অহীন্দ্র চৌধুরী)

চরমোৎকর্ষ দেখিয়া রামের বাল্যলীলা দর্শনে দর্শকের ততটা আগ্রহ জন্মে নাই।" কেবলমাত্র 'সীতার বিবাহ' নয়, 'রামের বনবাস' এবং 'সীতাহরণ'ও জমে নি। এর কারণ মনে হয়, গিরিশচন্দ্রের বর্তমান পর্যায়ের নাটকগুলির মধ্যে উন্নত রচনাশক্তির নিদর্শন মিললেও, একই মূল কাহিনীর পুনরাবৃত্তি এবং পরিচিত অভিনয়শৈলী দর্শকদের মনে নিরুৎসাহের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। বিচক্ষণ মঞ্চাধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র অবিলম্বে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বলেই, 'সীতার বিবাহে'র অসাফল্যের অব্যবহিত পরে তিনি বৈচিত্র্যপ্রয়াসী দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য 'ব্রজবিহার' (১।৪।.৮৮২) নামে স্বরচিত গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করেন।[৮৮] গদ্য বা পদ্য সংলাপবিহীন, সর্বাংশ গীতাশ্রিত 'ব্রজবিহারে'র সঙ্গীত দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। বৈচিত্র্যের ধারাটিকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য তিনি 'সীতাহরণে'র পর মঞ্চস্থ করলেন একটি প্রহসন—'ভোট মঙ্গল। সজীব পুত্‌লো নাচ'। ন্যাশনালে এর প্রথম অভিনয়ের তারিখ—৭ অক্টোবর, ১৮৮২। এতে নাচওয়ালা সাজতেন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। 'ব্রজবিহারে'র সাফল্য নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে পুনরায় গীতিনাট্য রচনায় উৎসাহিত করেছিল। ফলে, 'মলিন মালা' রচিত হয়ে ২৮ অক্টোবর, ১৮৮২ মঞ্চস্থ হল। রামতারণ সান্যাল 'মলিন মালা'য় লহর কুমারের ভূমিকা নিলেন। এরপর বৎসরের শেষে ন্যাশনাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র নাটকায়িত রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবীকঙ্কণে'র পুনরভিনয় হয়। নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিতেন মহেন্দ্রলাল বসু (নরেন্দ্র), মতিলাল সুর (শৈলেশ্বর), বনবিহারিণী (জেলেখা), বিনোদিনী

৮৮ ইটালীয় অপেরার আদর্শে রচিত এ জাতীয় প্রথম যে নাটকটি সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছিল, তার নাম 'কামিনীকুঞ্জ'। লিখেছিলেন গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 'কামিনীকুঞ্জ' এই ন্যাশনাল থিয়েটারেই ১৮৭৯, ১৮ জানুয়ারি প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

(হেমলতা) প্রমুখ সম্প্রদায়ের কৃতী শিল্পীরা। সন ১৮৮২-র সমাপ্তি এইভাবে।

১৮৮০ থেকে ১৮৮২—ন্যাশনাল থিয়েটারের এই তিন বৎসরের নাটক, অভিনয় এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অগ্রগতি সামগ্রিক ভাবে বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়কে প্রভাবান্বিত করেছে। প্রথমতঃ, নাটকের কথাই ধরা যাক। বঙ্কিম— দীনবন্ধু— মাইকেল— জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক যখন পৌনঃপুনিক অভিনয়ের ফলে আবেদনবিহীন, গীতিনাট্যে আর দর্শক আকর্ষিত হয় না এবং অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের ভয়ে যে সময় নাট্যকাররা ঐতিহাসিক নাটক রচনায় নিরুৎসাহ, বাংলা নাটকের সেই বন্ধ্যাদশায় ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র। ন্যাশনালের অধ্যক্ষরূপে মঞ্চ পরিচালনার তাগিদে তাঁকে নাটক রচনায় উদ্যোগী হ'তে হয়েছিল। এই প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়ে তিনি কেবল সহর নয়, গ্রামের দিকেও দৃষ্টি দেন। দূরদর্শিতার গুণে গিরিশচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন, নাট্যশালাকে সর্বস্তরের মানুষের মিলিত তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করতে না পারলে প্রতিষ্ঠান স্থায়ী হবে না। তাই, তিনি নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ব্যাপারে ঝোঁক দিলেন কাহিনীর সর্বজনীনতার উপর, যাতে আবালবৃদ্ধবনিতা শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভেদে এর রসাস্বাদন করতে পারে। এক্ষেত্রে রামায়ণ ও মহাভারতকে তাঁর আদর্শ মনে হল। বাঙ্গালীর প্রিয় কৃত্তিবাসকেই তিনি বেছে নিলেন। রচনাকালে তিনি দেখেন, প্রচলিত গদ্যের দুরূহতা সাধারণ দর্শকের রসোপভোগের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ এবং তা কাব্যরসসৃষ্টির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অনুকূল ভূমিকা নেয় না। তাই, গিরিশচন্দ্রকে ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবিষ্কার করতে হল যা, পরে গৈরিশ ছন্দ আখ্যা পেয়েছে। এই নতুন ছন্দের প্রয়োগ মঞ্চে দ্বিবিধ সুফল প্রসব করলে। নাটকের ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হওয়ায় এর আবেদন এবং কাব্য সুষমা সাধারণ দর্শকের চিত্তস্পর্শী হল। আর, স্বচ্ছন্দগতি ছন্দের

সহায়তায় নট-নটীরা নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শনের প্রচুর সুযোগ পেলেন। মঞ্চের জনপ্রিয়তা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ঘটলো অভিনয় প্রতিভারও শ্রীবৃদ্ধি। সাধারণ রঙ্গালয়ের স্থায়িত্ব সম্পর্কে আর চরম নৈরাশ্যবাদীরও সংশয় রইলো না।[৮৯]

দ্বিতীয়তঃ, অভিনয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, রামায়ণ-মহাভারতের জনপ্রিয় কাহিনী এবং স্বচ্ছন্দগতি গৈরিশ ছন্দ ন্যাশনাল থিয়েটারের এই পর্বের একাধিক অভিনেতা-অভিনেত্রীকে সাধারণ রঙ্গালয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমান অধ্যায়ে সুকণ্ঠ আবৃত্তিকাররূপে মহেন্দ্রলাল বসু ও অমৃতলাল মিত্র চিহ্নিত হন। অভিনেত্রীদের মধ্যে বিনোদিনী দাসীর নাট্যপ্রতিভা একালে সমালোচকের অজস্র প্রশংসায় অভিসিঞ্চিত হয়। শিল্পীদের খ্যাতির মূলে ছিল গৈরিশ ছন্দের পরিপোষক গিরিশ-প্রবর্তিত সুরেলা অভিনয়রীতি, যার সার্থক প্রয়োগে তাঁর অন্যতম শিষ্য অমৃতলাল মিত্র পরবর্তীকালে দিকৃপাল অভিনেতার সম্মান পেয়েছেন।

ন্যাশনাল থিয়েটারের আলোচ্য অধ্যায়ে তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়েছে রঙ্গালয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায়। আদি পর্বের বিশৃঙ্খলতা সংবাদ-পত্রের সমালোচনার এবং দর্শকের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৮৯ প্রসঙ্গতঃ, 'সাধারণী' (১২।২।১৮৮২) লিখেছে :—"……এতদিনে ন্যাশনাল থিয়েটর স্থাপনা সার্থক হইল। বাঙ্গালায় পৌরাণিক প্রকৃত নাটক হইল, হিন্দুর পড়িবার পুস্তক আবার হইল, নাটকের ভাষা হইল, ভাষা বল পাইল, কৃত্তিবাস, কাশীদাস পুলকিতচিত্ত হইলেন, গিরিশচন্দ্র লিলিপট, ব্রবডিঙ্গনাগ অতিক্রম করিয়া আপনার স্বদেশ চিনিতে পারিলেন, আপনার আসন গ্রহণ করিলেন এবং রাম লক্ষ্মণের গৌরব ক্ষয়প্রয়াসী বিধর্ম্মী মধুসূদনের কাব্য পুনর্জীবিত করিবার জন্য রঙ্গাঙ্গনে ব্রত করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিতে-ছিলেন এতদিনে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল আর আমরাও কঠোর সমালোচনার পাপ হইতে অব্যাহতি মুক্ত লেখনীতে গিরিশচন্দ্রে উপযুক্ত ধন্যবাদ করিয়া আমাদের কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিলাম।"

পূর্বযুগের মঞ্চাধিকারীদের বিলাসী প্রকৃতি ও স্বেচ্ছাচারপ্রবণতা রঙ্গালয়কে প্রমোদাগারে পরিণত করে। সেই অন্ধকার যুগে নাট্যশালা হ'তে নিয়ম ও শৃঙ্খলা অন্তর্হিত হয়। বিচক্ষণ ব্যবসায়ী প্রতাপ জহুরীর সহায়তায় গিরিশচন্দ্র একালে ন্যাশনাল থিয়েটারে যে সব বিধি-নিয়ম প্রবর্তিত করেছেন তা, পরবর্তীকালে সাধারণ রঙ্গালয়ে সঠিক বিবেচনায় অনুসৃত হয়েছিল। আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা, শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়মিত বেতন প্রদান, মঞ্চের অন্তরালে ও বাহিরে সংযত পরিবেশ সৃষ্টি প্রভৃতি সম্পর্কে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে থিয়েটার এই সময় একটি ভদ্র ও লাভজনক ব্যবসার রূপ নেয়। কলুষিত পরিবেশের কারণে নিরীহ ভদ্রসন্তান, বিদ্বজ্জন আর পুররমণীরা, যাঁরা এতকাল নাট্যশালা থেকে শতহস্ত দূরে ছিলেন তাঁরাও এসময় দর্শকের সামিল হয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব এবং বাঞ্ছনীয় পরিবর্তনের গুণে প্রতিষ্ঠা যখন সম্পূর্ণ, সেই সময় অকস্মাৎ ন্যাশনাল থিয়েটারে ভাঙ্গন দেখা দিল এবং গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে শিল্পী ও কলাকুশলীদের একাংশ বে'রয়ে এসে বিডন স্ট্রীটে 'ষ্টার' নামে নতুন থিয়েটারের উদ্বোধন করলেন।

ভাঙ্গনের কারণরূপে ন্যাশনাল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী প্রতাপ জহুরীকে দায়ী করা চলে। একাধিক গুণের পাশাপাশি প্রতাপচাঁদের একটি মারাত্মক দোষ ছিল তা, কৃপণতা। 'অল্প ব্যয়ে অধিক লাভ' নীতিতে বিশ্বাসী প্রতাপচাঁদ অভিনেতা-অভিনেত্রী ও অন্যান্য কর্মীদের বেতনের ব্যাপারে অযথা অনুদার ছিলেন। যাঁদের কর্মদক্ষতার গুণে তিনি থিয়েটার ব্যবসায় প্রচুর লাভবান হয়েছেন, তাঁদের যোগ্য পারিশ্রমিকের প্রতি তাঁর অনুচিত ঔদাসীন্য রঙ্গালয়ের মূল ভিত্তিকে নাড়া দিলে। এর সাথে যুক্ত হল মালিকের ছোট বড় একাধিক দুর্ব্যবহার। ফলে, যখন নটী বিনোদিনীর জনৈক রূপমুগ্ধ মাড়ওয়ারী ভক্ত নতুন থিয়েটার গড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে, গিরিশচন্দ্র ও তাঁর মতাবলম্বীরা আর দ্বিধা না ক'রে ন্যাশনাল ত্যাগ করলেন।

ন্যাশনাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের শেষ অবদান ওঁরই লেখা 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'। নাটকটি এখানে ১৩ জানুয়ারি, ১৮৮৩ প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল। 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে'র ভূমিকালিপি ছিল এইরকম ঃ— কীচক ও দুর্যোধন-গিরিশচন্দ্র, অর্জুন (বৃহন্নলা)-মহেন্দ্রলাল বসু, ভীম, ভীষ্ম ও জনৈক ব্রাহ্মণ-অমৃতলাল মিত্র, শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রোণাচার্য-কেদারনাথ চৌধুরী, বিরাট-অতুলচন্দ্র মিত্র (বেডৌল), যুধিষ্ঠির-উপেন্দ্রনাথ মিত্র, নকুল-বিহারীলাল বসু (জ্যাঠা), সহদেব -কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, উত্তর-অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), কৃপাচার্য-নীলমাধব চক্রবর্তী, গোপ-জীবনকৃষ্ণ সেন, অভিমন্যু-বনবিহারিণী, দ্রৌপদী-বিনোদিনী, সুদেষ্ণা-কাদম্বিনী, উত্তরা-ভূষণকুমারী, হাড়িনী-ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি। নাটক হিসাবে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' গিরিশচন্দ্রের রচনাবৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ন্যাশনালে এর অভিনয়ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে, অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর 'বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ— "গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির ভীড়ে হারিয়ে যাওয়ার মত নাটক এটি নয়। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যে অনায়াসে দৃষ্টি-আকর্ষণকারী নাটক এই 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'— আপন শক্তিতে মহিমান্বিত, অবিস্মরণীয়।...'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকে অর্জুন, ভীম, দ্রৌপদী, কীচক প্রভৃতি চরিত্র আপন বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান। সে সময় ন্যাশনাল থিয়েটারও এক হিসাবে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ছিল যে, 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকটির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত করে তোলার মত প্রতিভাশালী অভিনেতৃগোষ্ঠী লাভ করেছিল।

গিরিশচন্দ্রের জীবনীকার অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় ম'শায় বলেছেন যে, তখন যেন অভিনয় হত না— অভিনয়ের প্রতিযোগিতা হত। একথা সত্য। প্রত্যেক অভিনেতাই আপন আপন ভূমিকাটিতে কৃতিত্ব দেখাবার মত যথেষ্ট সুযোগ পেতেন।

একের পর এক অভিনেতা অভিনেত্রীরা রঙ্গমঞ্চে আসছেন এবং

তাঁদের অপূর্ব অভিনয়-নৈপুণ্যে দর্শকচিত্তে উত্তেজনা ধাপে ধাপে উঠতে থাকে। ভীমরূপী অমৃতলাল মিত্র, দ্রৌপদীর চরিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী এবং কীচকবেশী গিরিশচন্দ্র কীচক বধ অধ্যায়ে তাঁদের অনবদ্য অভিনয়-নৈপুণ্যে দর্শকচিত্ত জয় করে নিলেন এবং দর্শকগণের বিস্ময়, কৌতূহল ও উত্তেজনাকে এমন চরম পর্যায়ে নিয়ে এলেন যে, মনে হ'ল এর পর আর কারও অভিনয় দর্শকচিত্তে রেখাপাত করতে পারবে না। কিন্তু উত্তরের সঙ্গে গোধন রক্ষাকল্পে যাত্রাকালে অর্জুনবেশী মহেন্দ্রলাল বসু এমন অপূর্ব অভিনয় প্রদর্শন করলেন যে, তাঁর যাদুস্পর্শে দর্শকমণ্ডলী অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। ক্ষুদ্র চরিত্রগুলিও শক্তিশালী নটের প্রাণবন্ত অভিনয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করেছিল।...”

সাফল্যের বিজয়মুকুট মাথায় নিয়েই গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর অনুগমন করলেন অমৃতলাল মিত্র, অঘোরনাথ পাঠক, নীলমাধব চক্রবর্তী, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, বিনোদিনী প্রমুখ নট-নটীরা। সেই বছরেই ওঁরা বিডন স্ট্রীটে ‘ষ্টার’ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৩, ২১ জুলাই গিরিশচন্দ্রের ‘দক্ষযজ্ঞ’ নাটক দিয়ে নতুন রঙ্গালয়ের উদ্বোধন হয়।

পতন সুরু

গিরিশচন্দ্র দলবলসহ বিদায় নিলে ন্যাশনাল থিয়েটারের ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হলেন কেদারনাথ চৌধুরী (মতান্তরে ধর্মদাস সুর)। সশিষ্য গিরিশচন্দ্রের প্রস্থানের পর অবশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে এখানে রাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত ‘তরণীসেন-বধ’ অভিনয় হয়েছে।[৯০] অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) সাজলেন

৯০ নাট্যকারের ঘনিষ্ঠ সহচর শরচ্চন্দ্র দেবের মতে, এই অভিনয় সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন :— “তিনি (রাজকৃষ্ণ) গ্রেট ন্যাসন্যালে

তরণীসেন। মহেন্দ্রলাল বসু ও মতিলাল সুর যথাক্রমে রাম এবং রাবণের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। এই সময় 'শ্রীবৎসচিন্তা' নাটকে সমুদ্রের অরণ্যে রূপান্তরের Diarama প্রদর্শিত হয়। ৭ মে ন্যাশনালে মঞ্চস্থ হল কেদারনাথ চৌধুরী নাটকায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ।' নাটকখানির মহলার সময় অর্দ্ধেন্দুশেখর এসে সম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছেন। উনি 'আনন্দমঠে' মহাপুরুষের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। অন্যান্য চরিত্রে রূপ দিলেন কেদারনাথ চৌধুরী (জীবানন্দ), মহেন্দ্রলাল বসু (মহেন্দ্র), বনবিহারিণী (শান্তি), মতিলাল সুর (সত্যানন্দ)প্রভৃতি। গিরিশচন্দ্র চলে যাওয়ায় তখন ন্যাশনালের সে জৌলুষ আর নেই। 'আনন্দমঠ' দর্শকদের খুশী করতে পারলে না। নাট্যরূপ অত্যন্ত সাধারণ স্তরের হয়েছিল। শিল্পীরাও উল্লেখযোগ্য দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি এ-নাটকের মাধ্যমে। 'সাধারণী' লিখলে ঃ—"ন্যাশনাল থিয়েটারের "আনন্দমঠ" অভিনয়ে কেহই তৃপ্ত হন নাই। একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, "আনন্দমঠ" অভিনীত হইল, কিন্তু দেশানুরাগের স্ফুলিঙ্গমাত্র আমাদের অন্তরে জ্বলিল না, কিছুমাত্র অশ্রু আমাদের চক্ষে ঝরিল না।" (২০।৫।১৮৮৩)

১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ ন্যাশনাল থিয়েটার 'স্বপ্নময়ী' অভিনয় করলে। "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার প্রণেতা; ·· ·আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে শোভাসিংহের বিদ্রোহ-ব্যাপার লইয়া এই ঐতিহাসিক নাটকখানি রচিত।···" (দৃশ্যকাব্য পরিচয়—সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়) এ-নাটকও বিশেষ সুবিধা করতে পারলে না, উপরন্তু ব্যবস্থাপনার নিন্দা রটলো। 'সাধারণী' জানালে ঃ— "···ন্যাশানাল থিয়েটারে গত শনি ও বুধবারে 'স্বপ্নময়ী' অভিনীত হইয়াছিল।

'তরণী সেন' দিলে উহার অভিনয় এরূপ সুন্দর হইয়াছিল যে শুনিয়াছি, দুদিন বঙ্গ রঙ্গভূমিকে দর্শকাভাবে অভিনয় বন্ধ করিতে হইয়াছিল।" (রাজকৃষ্ণ রায় অনূদিত রামায়ণের শরচ্চন্দ্র দেব রচিত ভূমিকা)

সুরজ, শুভসিংহ, রোহিম খাঁ, জেহানা ও স্বপ্নময়ীর অভিনয় উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। অন্যান্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয় বড় ভাল হয় নাই। ন্যাশানালের প্রহরীদের নিমিত্ত ভদ্রলোকের মানসম্ভ্রম থাকে না। তাহারা সময়ে সময়ে এরূপ অপমান করে যে তাহা অলেখনীয়। তাহারাই এই পদ পাইয়া চতুষ্পদ হইয়া উঠিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়েরা কি এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন না?" (২৩।৯।১৮৮৩) গিরিশচন্দ্রের আমলে যে নিয়ম-শৃঙ্খলা একদা ন্যাশনালের গৌরবের সামগ্রী ছিল, এ সময় তার চরম অবনতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। থিয়েটারের শোচনীয় দুরবস্থা দেখেই বোধহয় প্রতাপ জহুরী আর বেশীদিন রইলেন না। কেদার চৌধুরী রচিত 'ছত্রভঙ্গ' অভিনয়ের পর উনি ন্যাশনাল থিয়েটার পরিত্যাগ করেন। 'ছত্রভঙ্গ' নাটকের ভূমিকালিপি ছিল এইরকম:—দুর্যোধন-কেদারনাথ চৌধুরী, ধৃষ্টদ্যুম্ন-মহেন্দ্রলাল বসু, দ্রৌপদী-বনবিহারিণী এবং শকুনি-রাধামাধব কর।

১৮৮৫ সালে গ্রেট ন্যাশনালের ভূতপূর্ব স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগী ন্যাশনাল থিয়েটার লিজ নিলেন। ম্যানেজার হিসাবে রইলেন কেদারনাথ চৌধুরী। ২৭ আগস্ট ১৮৮৫ (?) এঁরা মঞ্চস্থ করলেন হরিভূষণ ভট্টাচার্য বিরচিত 'কুমারসম্ভব'। এ-নাটকের দৃশ্যসজ্জায় ধর্মদাস সুর নতুনত্ব দেখিয়েছিলেন। মদনভস্ম ও বসন্তের আবির্ভাবকালীন দৃশ্যে Mechanical Diarama প্রদর্শিত হয়। 'কুমারসম্ভবে' মদন, রতি, দুর্গা এবং মহাদেবরূপে যথাক্রমে পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, সুকুমারী দত্ত, ছোট রানী ও ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় দেখা দিতেন। ১৮৮৬, ৩ জুলাই এখানে কেদারনাথ চৌধুরী কৃত রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরানীর হাটে'র নাট্যরূপ 'রাজা বসন্ত রায়' অভিনীত হল। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিলেন রাধামাধব কর (বসন্ত রায়), মতিলাল সুর (প্রতাপ), মহেন্দ্রলাল বসু (উদয়), হরিমতি (বিভা), ছোট রানী (সুরমা), নীলমাধব চক্রবর্তী (রামচন্দ্র),

ভবতারিণী (রানী), পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (অনঙ্গমোহন) লক্ষ্মী (মঙ্গলা) এবং অর্দ্ধেন্দুশেখর (রমাই ভাঁড়)। এরপর প্রতাপচাঁদ জহুরীর সঙ্গে ভুবনমোহনের মামলা হয় এবং শেষ পর্যন্ত থিয়েটার নিলামে ওঠে। ষ্টার ২৫০০ টাকায় কিনে বাড়ী ভেঙ্গে ফেলে। ন্যাশনাল থিয়েটার নিশ্চিহ্ন হয়। পরবর্তীকালে এই জমির উপরই মিনার্ভা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, যার অস্তিত্ব আজও অব্যাহত আছে।[৯১]

৯১ ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিণতি সম্পর্কে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন :— "......Theatre was closed in October, 1886. In a suit by Jahuri on the allegation that Bhuban Mohan though insolvent, himself purchased the property in the name of his wife, a decree granting permission to sell the pavilion was passed. On the auction-sale that followed, the Star Company purchased it and had it demolished, probably with a view to keep no two rivals on both sides of it." (The Indian Stage—vol. III)

পরিশিষ্ট

ক. অভিনয়-তালিকা

কাম্যকানন	অমৃতলাল বসু প্রভৃতি	৩১।১২।১৮৭৩
বিধবা-বিবাহ নাটক	উমেশচন্দ্র মিত্র	১০।১।১৮৭৪
প্রণয়পরীক্ষা	মনোমোহন বসু	১৭।১।১৮৭৪
কৃষ্ণকুমারী	মধুসূদন দত্ত	২৪।১।১৮৭৪
নন্দবংশোচ্ছেদ	লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	৩১।১।১৮৭৪
উচিৎ ফল	—	”
কপালকুণ্ডলা	নাট্যরূপ-গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৭।২।১৮৭৪
মৃণালিনী	”	২১।২।১৮৭৪
নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	২৫।২।১৮৭৪
মৃণালিনী		২৮।২।১৮৭৪
নন্দবংশোচ্ছেদ		৪।৩।১৮৭৪
নগরের নবরত্নসভা	—	৭।৩।১৮৭৪
কমলে কামিনী	দীনবন্ধু মিত্র	১৪।৩।১৮৭৪
নবীন তপস্বিনী	”	১৮।৩।১৮৭৪
সধবার একাদশী	”	২৮।৩।১৮৭৪
রাসলীলা, ভারতমাতা এবং কমলে কামিনীর একটি দৃশ্য		”
কপালকুণ্ডলা		৪।৪।১৮৭৪
নীলদর্পণ		১১।৪।১৮৭৪
হেমলতা	হরলাল রায়	১৮।৪।১৮৭৪
কুসুমকুমারী	চন্দ্রকালী ঘোষ	২৫।৪।১৮৭৪
কুলীনকন্যা অথবা কমলিনী	লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	৩০।৫।১৮৭৪
সতী কি কলঙ্কিনী ?	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (?)	১৯।৯।১৮৭৪
সতী কি কলঙ্কিনী ?		২৬।৯।১৮৭৪
পুরু-বিক্রম নাটক	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩।১০।১৮৭৪
সতী কি কলঙ্কিনী ?		১০।১০।১৮৭৪

ভারতে যবন		১০।১০।১৮৭৪
রুদ্রপাল	হরলাল রায়	২১।১০।১৮৭৪
আনন্দ কানন অথবা মদনের দিগ্বিজয়	লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী	১৪।১১।১৮৭৪
কিঞ্চিৎ জলযোগ	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	„
আনন্দ কানন		২১।১১।১৮৭৪
কিঞ্চিৎ জলযোগ		„
শত্রুসংহার	হরলাল রায়	১২।১২।১৮৭৪
শত্রুসংহার		১৯।১২।১৮৭৪
শরৎ-সরোজিনী	উপেন্দ্রনাথ দাস	২।১।১৮৭৫
শরৎ-সরোজিনী ও পরীস্থান		৯।১।১৮৭৫
নীলদর্পণ		৩০।১।১৮৭৫
নীলদর্পণ		৬।২।১৮৭৫
শত্রুসংহার		১০।২।১৮৭৫
নবীন তপস্বিনী		১৩।২।১৮৭৫
নগ-নলিনী	প্রমথনাথ মিত্র	২০।২।১৮৭৫
শরৎ-সরোজিনী		২৭।২।১৮৭৫
হেমলতা		৬।৩।১৮৭৫
আনন্দ কানন		১৩।৩।১৮৭৫
সধবার একাদশী		২০।৩।১৮৭৫
জামাই বারিক	দীনবন্ধু মিত্র	৩।৪।১৮৭৫
নয়শো রূপেয়া	শিশিরকুমার ঘোষ	১০।৪।১৮৭৫
তিলোত্তমাসম্ভব	মধুসূদন দত্ত	১৭।৪।১৮৭৫
সাক্ষাৎ দর্পণ	প্রবোধচন্দ্র মজুমদার	২৪।৪।১৮৭৫
বিষবৃক্ষ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১।৫।১৮৭৫
নন্দনকানন		৮।৫।১৮৭৫
শরৎ-সরোজিনী		১৫।৫।১৮৭৫
পদ্মিনী	মহেন্দ্রলাল বসু	৩।৭।১৮৭৫
ভারত-সঙ্গীত	—	„

পদ্মিনী		৭।৮।১৮৭৫
শরৎ-সরোজিনী		১৪।৮।১৮৭৫
নীলদর্পণ		২১।৮।১৮৭৫
অপূর্ব সতী	সুকুমারী দত্ত	২৩।৮।১৮৭৫
সতী কি কলঙ্কিনী ?		২৮।৮।১৮৭৫
ভারত-সঙ্গীত		”
ডাক্তারবাবু	ভুবনমোহন সরকার	৪।৯।১৮৭৫
পুরু-বিক্রম নাটক		১৮।৯।১৮৭৫
কনক পদ্ম	হরলাল রায়	২৫।৯।১৮৭৫
এই কলিকাল	—	”
বৃত্রসংহার	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৬।১১।১৮৭৫
হীরকচূর্ণ নাটক	অমৃতলাল বসু	২৫।১২।১৮৭৫
সুরেন্দ্র-বিনোদিনী	উপেন্দ্রনাথ দাস	৩১।১২।১৮৭৫
প্রকৃত বন্ধু	ব্রজেন্দ্রকুমার রায়	৮।১।১৮৭৬
সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫।১।১৮৭৬
সরোজিনী		২২।১।১৮৭৬
সরোজিনী		২৯।১।১৮৭৬
বিদ্যাসুন্দর	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	৫।২।১৮৭৬
বিদ্যাসুন্দর		১২।২।১৮৭৬
সরোজিনী		১৯।২।১৮৭৬
গজদানন্দ ও যুবরাজ		”
সতী কি কলঙ্কিনী ?		২৩।২।১৮৭৬
গজদানন্দ ও যুবরাজ (ভিন্ন নামে)		”
কর্ণাটকুমার	সত্যকৃষ্ণ বসু সর্বাধিকারী	২৬।২।১৮৭৬
হনুমান চরিত্র	—	”
সুরেন্দ্র-বিনোদিনী		১।৩।১৮৭৬
দ্য পুলিশ অব্ পীগ্ অ্যাণ্ড শীপ্		”

সতী কি কলঙ্কিনী ?		৪।৩।১৮৭৬
সরোজিনী		১১।৩।১৮৭৬
আনন্দ কানন		১৮।৩।১৮৭৬
পদ্মিনী		১।৪।১৮৭৬
ভীমসিংহ	তারিণীচরণ পাল	৮।৪।১৮৭৬
সতী কি কলঙ্কিনী ?		৪।১১।১৮৭৬
সরোজিনী		১৮।১১।১৮৭৬
সুরেন্দ্র-বিনোদিনী		২৫।১১।১৮৭৬
পারিজাতহরণ বা দেব-দুর্গতি	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২।১২।১৮৭৬
পারিজাতহরণ		১৩।১।১৮৭৭
পারিজাতহরণ		২৭।১।১৮৭৭
সতী কি কলঙ্কিনী ?		১৭।৩।১৮৭৭
চোরের উপর বাটপাড়ি	অমৃতলাল বসু	”
প্রণয়কানন বা প্রভাস	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	২৪।৩।১৮৭৭
আদর্শ সতী		২৯।৩।১৮৭৭
একেই কি বলে সভ্যতা	মধুসূদন দত্ত	৭।৪।১৮৭৭
বিদ্যাসুন্দর		১৪।৪।১৮৭৭
ধীবর ও দৈত্য		”
আদর্শ সতী		২১।৪।১৮৭৭
নবীন তপস্বিনী		২৮।৪।১৮৭৭
ঠাকুরদাদা		২।৫।১৮৭৭
কুব্জ		”
সরোজিনী		৫।৫।১৮৭৭
কৃষ্ণকুমারী		২৩।৫।১৮৭৭
কমলে কামিনী		১৫।৯।১৮৭৭
আগমনী	মুকুটাচরণ মিত্র (গিরিশচন্দ্র ঘোষ)	২৯।৯।১৮৭৭
অকাল বোধন		৩।১০।১৮৭৭
কৃষ্ণকুমারী		১৫।১২।১৮৭৭

মেঘনাদবধ		২২।১২।১৮৭৭
পলাশীর যুদ্ধ	নবীনচন্দ্র সেন	৫।১।১৮৭৮
পলাশীর যুদ্ধ		১২।১।১৮৭৮
আনন্দ-মিলন	কুঞ্জবিহারী বসু	২৬।১।১৮৭৮
দোললীলা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৪।৩।১৮৭৮(?)
বিষবৃক্ষ		৯।৩।১৮৭৮(?)
মৃণালিনী		১৬।৩।১৮৭৮
দুর্গেশনন্দিনী	নাট্যরূপ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২২।৬।১৮৭৮
প্রমোদকানন	—	১১।১।১৮৭৯
গ্রন্থকার	—	„
কামিনীকুঞ্জ	গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৮।১।১৮৭৯
শরৎ-সরোজিনী		৮।২।১৮৭৯
বঙ্গবিজেতা	রমেশচন্দ্র দত্ত	১৫।২।১৮৭৯
নন্দনকুসুম	মনোরঞ্জন দাশ	২৬।৭।১৮৭৯
হামির	সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	১।১।১৮৮১
রাসলীলা	—	১২।১।১৮৮১
শিবের বিবাহ		১৫।১।১৮৮১
মেঘনাদবধ		„
পলাশীর যুদ্ধ		২২।১।১৮৮১
মায়াতরু	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	„
মাধবীকঙ্কণ	রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র ঘোষ কৃত নাটক	২৬।৩।১৮৮১
মৃণালিনী		৩০।৩।১৮৮১
মোহিনী প্রতিমা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৯।৪।১৮৮১
আলাদিন	„	„
আনন্দ রহো	„	২১।৫।১৮৮১
রাবণবধ	„	৩০।৭।১৮৮১
সীতার বনবাস	„	১৭।৯।১৮৮১

তিলতর্পণ	অমৃতলাল বসু	২১।৯।১৮৮১(?)
অভিমন্যুবধ	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২৬।১১।১৮৮১
লক্ষ্মণ-বর্জন	"	৩১।১২।১৮৮১
সীতার বিবাহ	"	১১।৩।১৮৮২
ব্রজবিহার	"	১।৪।১৮৮২
রামের বনবাস	"	১৫।৪।১৮৮২
সীতাহরণ	"	২২।৭।১৮৮২
ভোট মঙ্গল।	"	৭।১০।১৮৮২
সজীব পুত্‌লো নাচ		
মলিন মালা	"	২৮।১০।১৮৮২
পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস	"	১৩।১।১৮৮৩
তরণীসেনবধ	রাজকৃষ্ণ রায়	?
আনন্দমঠ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে কেদারনাথ চৌধুরী কৃত নাটক	৭।৫ ১৮৮৩
স্বপ্নময়ী	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭ ৯।১৮৮৩
ছত্রভঙ্গ	কেদারনাথ চৌধুরী	?
কুমারসম্ভব	হরিভূষণ ভট্টাচার্য	২৭।৮।১৮৮৫(?)
রাজা বসন্ত রায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের কেদারনাথ চৌধুরী কৃত নাট্যরূপ	৩।৭।১৮৮৬

খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায়

অমৃতলাল বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, রাধাপ্রসাদ বসাক, বসন্তকুমার ঘোষ, অ.ওতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ সিংহ, মদনমোহন বর্মণ (সঙ্গীতশিক্ষক), কান্তাপ্রসাদ (নৃত্যশিক্ষক), হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ মিত্র, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

অবিনাশচন্দ্র কর, রাধামাধব কর, রাধাগোবিন্দ কর, নীলমাধব চক্রবর্তী, গোপালচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র দাস, রামতারণ সান্যাল (অপেরামাস্টার), কেদারনাথ চৌধুরী, অমৃতলাল মিত্র, অতুলচন্দ্র মিত্র (বেড়ৌল), যদুনাথ ভট্টাচার্য, বিহারীলাল বসু, অপূর্বকৃষ্ণ দত্ত, গিরীন্দ্রনাথ ভদ্র, অঘোরনাথ পাঠক, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, জীবনকৃষ্ণ সেন, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, হরি-দাসী, রাজকুমারী, বিনোদিনী, লক্ষ্মী, জগত্তারিণী, সুকুমারী দত্ত (গোলাপ), বসন্তকুমারী, বনবিহারিণী, নারায়ণী, গঙ্গামণি, ভূষণকুমারী, ছোটরানী, হরিমতি বা বিভা-হরি, ভবতারিণী প্রভৃতি।

গ. অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন

Act No. XIX of 1876 (16th December, 1876)

AN ACT FOR THE BETTER CONTROL OF PUBLIC DRAMATIC PERFORMANCES

Preamble.

Whereas it is expedient to empower the Government to prohibit public dramatic performances which are scandalous, defamatory, seditious or obscene; It is hereby enacted as follows:—

Short title Local extent.

1. This Act may be called the Dramatic Performances Act, 1876. It extend to the whole of British India;

Magistrate defined.

2. In this Act "Magistrate" means, in the presidency-towns, a Magistrate of police, and elsewhere the Magistrate of the District.

Power to prohibit certain dramatic performances.

3. Whenever the Local Government is of opinion that any play, pantomime or other drama performed or about to be performed in a public place is—

(*a*) of a scandalous or defamatory or

(*b*) likely to excite feelings of disaffection to the Government established by law in British India, or

(*c*) likely to deprave and currupt persons present at the performance.

The Local Government, or outside the presidency-towns and Rangoon the Local Government or such

Magistrate as it may empower in his behalf, may by order prohibit the performance.

Explanation—Any building or enclosure to which the public are admitted to witness a performance on payment of money shall be deemed a "public place" within the meaning of this section.

Power to serve order of prohibition. Penalty for disobeying order.

4. A copy of any such order may be served on any person about to take part in the performance so prohibited, or on the owner or occupier of any house, room or place in which such performance is intended to take place; and any person on whom such copy is served, and who does, or willingly permits, any act in disobedience to such order, shall be punished on conviction before a Magistrate with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

Power to notify order.

5. Any such order may be notified by proclamation, and a written or printed notice thereof may be struck up at any place or places adapted for giving information of the order to the persons intending to take part in or to witness the performance so prohibited.

Penalty for disobeying prohibition.

6. Whoever after notification of any such order:—

(a) takes part in the performance prohibited thereby or in performance substantially the same as the performance so prohibited, or

(b) in any manner assists in conducting any such performance, or

(c) is in wilful disobedience to such order present as a spectator during the whole or any part of any such performance, or

(d) being the owner or occupier, or having the use of any house, room or place, opens, keeps or uses the same for any such performance, or permits the same to be opened, kept or used for any such performance,

shall be punishable on conviction before a Magistrate with imprisonment for a term which may extend three months, or with fine, or with both.

Power to call for information.

7. For the purpose of ascertaining the character of any intended public dramatic performance, the Local Government, or such officer as it may specially empower in this behalf, may apply to the author, proprietor or printer of the drama about to be performed, or to the owner or occupier of the place in which it is intended to be performed, for such information as the Local Government or such officer thinks necessary.

XLV of 1860.

Every person so applied to shall be bound to furnish the same to the best of his ability, and whoever contravenes this section shall be deemed to have committed an offence under section 176 of the Indian Penal Code.

Power to grant warrant to police to enter and arrest and seize.

8. If any Magistrate has reason to believe that any house, room or place is used, or is about to be used, for any performance prohibited under this Act, he may, by his warrant, authorise any officer of police to enter with such assistance as may be requisite, by night or by day, and by force, if necessary, any such house, room or place, and to take into custody all persons whom he finds therein, and to seize all scenery, dresses and other articles found therein, and reasonably suspected to have been used, or to be intended to be used, for purpose of such performance.

Saving of prosecutions under Penal Code, Sections, 124A and 294 xlv of 1860.

9. No conviction under this Act shall bar a prosecution under section 124A or section 294 of the Indian Penal Code.

Power to prohibit dramatic performance in any local area, except under license.

10. Whenever it appears to the Local Government that the provisions of this section are require in any local area, it may declare, by notification in the local official Gazette, that such provisions are applied to such area from a day to be fixed in the notification.

On and after that day, the Local Government may order that no dramatic performance shall take place in any place of public entertainment within such area, except under or license to be granted by such Local Government, or such officer as it may specially empower in this behalf.

The Local Government may also order that no dramatic performance shall take place in any place of public entertainment within such area, unless a copy of the piece, if and so far it is written, or some sufficient account of its purport, if and so far as it is in pantomime, has been furnished, not less than three days, before the performance, to the Local Government, or to such officer as it may appoint in this behalf.

A copy of any order under this section may be served on any keeper of a place of public entertainment; and if thereafter he does or willingly permits any act in disobedience to such order, he shall be punishable on conviction before a Magistrate with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fines or with both.

Power exercisable by Governor General.

11. The powers conferred by this Act on the Local Government may be exercised also by the Governor General in Council.

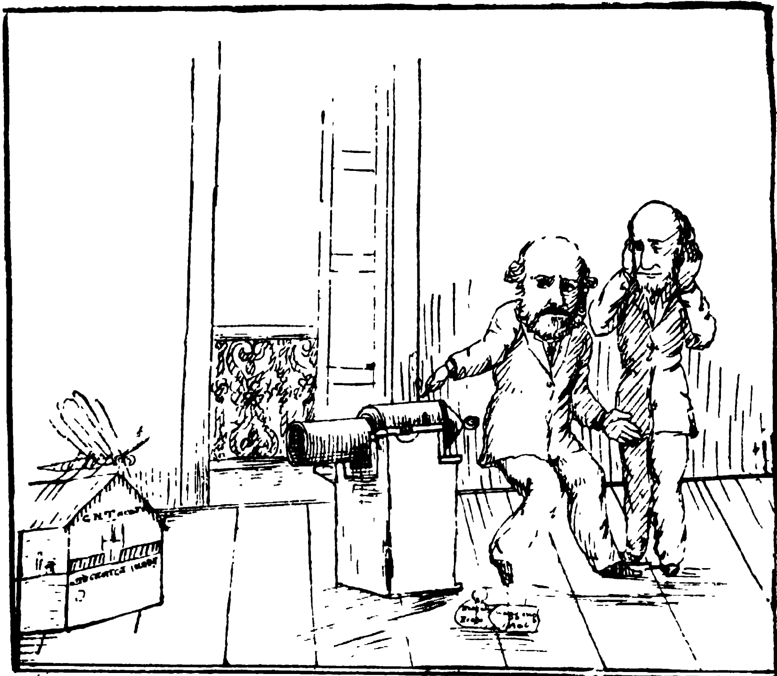
Exclusion of performances at religious festivals.

12. Nothing in this Act applies to any Jatras or performances of a like kind at religious festivals.

মন্মথ রায় রচিত 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা' গ্রন্থ হ'তে সঙ্কলিত।

ঘ. অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন

(সমকালীন ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীর দৃষ্টিতে)



Government Ord(i)nance,

মশা মারিতে কামান

বসন্তক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত (৯ম সংখ্যা|১২৮১-৮২) এই ব্যঙ্গচিত্রটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে সংগৃহীত।

ষ্টার থিয়েটার

(১৮৮৩-১৮৮৭)

ইংরেজীর ১৮৮১-৮৩ সাল। ৬ নম্বর বিডন স্ট্রীটের (বর্তমান মিনার্ভার জায়গায়) ন্যাশনাল থিয়েটারে তখন প্রতাপচাঁদ জহুরীর আমল। গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), নীলমাধব চক্রবর্তী, অমৃতলাল বসু, বিনোদিনী, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি প্রমুখ শিল্পীরা 'সীতার বনবাস', 'অভিমন্যুবধ', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' প্রভৃতি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় ক'রে চলেছেন। চারিদিকে গিরিশ-প্রতাপের জয়জয়কার। কিন্তু ন্যাশনালের এই সুসময় বেশী দিন রইলো না। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বেতন নিয়ে ও নানা কারণে স্বত্বাধিকারী প্রতাপচাঁদের সঙ্গে মতদ্বৈধতা হওয়ায় অনুরক্ত নট-নটীসহ গিরিশচন্দ্র দলত্যাগ করলেন।[১] উদ্দেশ্য, নতুন নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা।

সুযোগ মিলতে দেরী হয় নি। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে মাড়ওয়ারী ধনী গুর্মুখ রায়[২] এগিয়ে এলেন। তাঁর টাকায় ৬৮ নম্বর বিডন স্ট্রীটে বাগবাজারের কীর্তিচন্দ্র মিত্রের জমি লিজ নিয়ে থিয়েটার

১ গিরিশচন্দ্র চলে গেলে রামতারণ সান্যাল, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), মহেন্দ্রলাল বসু, বনবিহারিণী (ভুনী) প্রভৃতি কেদারনাথ চৌধুরীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয় করতে থাকেন। ১৮৮৩-র শেষে প্রতাপচাঁদের মালিকানা শেষ হয়।

২ নাম সাদৃশ্যে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ অনেকে এঁকে শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত ব'লে উল্লেখ করলেও, আসলে ইনি মাড়ওয়ারী। এঁর পিতা হোরমিলার কোম্পানীর প্রধান দালাল ছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর উনিও সেই পদে অধিষ্ঠিত হন। (দ্র. গিরিশচন্দ্র— অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

বাড়ী তৈরীর কাজ সুরু হল। রমণী-রসিক গুর্মুখ বিনোদিনীকে লাভ করার অভিলাষে অভিনয়-ব্যবসায় নেমেছিলেন। শিল্পীদের নিজস্ব রঙ্গমঞ্চের আশায় বিনোদিনী তাঁর পূর্বরক্ষককে পরিত্যাগ ক'রে ও একাধিকবার বিপুল অর্থপ্রাপ্তির লোভ বিসর্জন দিয়ে গুর্মুখ রায়ের আশ্রিতা হ'লেন। রঙ্গালয় নির্মাণ শেষ হল। কথা ছিল, বিনোদিনীর নামানুসারে নতুন নাট্যশালার নাম হবে—বি. থিয়েটার। কিন্তু সহ-কর্মীদের ঈর্ষা আর চক্রান্তে শেষ পর্যন্ত তা না হয়ে, হল— 'ষ্টার'। এই মঞ্চের সঙ্গে বিনোদিনী নাম্নী অভিনেত্রীর অনেক ত্যাগ, লাঞ্ছনা আর আশাভঙ্গের ইতিহাস জড়িত আছে।[৩]

স্বত্বাধিকারী-গুর্মুখ রায়, অধ্যক্ষ ও শিক্ষক-গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সঙ্গীতপরিচালক-বেণীমাধব অধিকারী, স্টেজম্যানেজার-জহরলাল ধর, সহকারী স্টেজম্যানেজার-দাসুচরণ নিয়োগী এবং কোষাধ্যক্ষ-হরিপ্রসাদ বসু— এঁদের নিয়ে নব-রঙ্গালয় তার যাত্রা সুরু করলে। ইতিমধ্যে কালীঘাট মন্দিরের নাটমঞ্চে একদিন উদ্বোধনী নাটকের ড্রেস-রিহার্সাল হয়ে গিয়েছে।

১৮৮৩, ২১ জুলাই বাংলাদেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। এই তারিখে গিরিশচন্দ্র রচিত 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক দিয়ে বিডন স্ট্রীটের ষ্টার থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হ'ল।[৪] উদ্বোধনের

৩ বিশদ বিবরণের জন্য বিনোদিনী দাসী রচিত আত্মচরিত 'আমার কথা' দ্রষ্টব্য। সম্প্রতি বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। নানা কারণে নাট্য-রসিকরা বইখানিকে মূল্য দিয়ে থাকেন। একালের প্রখ্যাত অভিনেতা-পরিচালক শম্ভু মিত্র বলেছেন :— "আমার মতে বইটি বাঙলা রঙ্গমঞ্চের কর্মীদের অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত।"

৪ এই তারিখের পূর্বেও যে ষ্টার থিয়েটারে অভিনয় হয়েছে, তার প্রমাণ 'সাধারণী' পত্রিকার নীচের উদ্ধৃতি :— "কলিকাতার প্রসিদ্ধ নটনেতা বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ষ্টার কোম্পানি নাম দিয়া একটি নূতন থিয়েটর খুলিয়াছেন। ২৪শে মার্চ সীতার বনবাস অভিনয় হয় ; ..." (১।৪।১৮৮৩) এই অভিনয়

দিন 'রেইজ অ্যাণ্ড রায়ৎ' পত্রিকা লিখলে :— "The new Star Theatre in Beadon Street, the largest of the Native Theatres, erected at no small outlay, opens this evening under the management of the well-known dramatic writer and actor, Babu Girish Chunder Ghose, with Babu Ghose's rendering of the Pauranic legend of the yagnya of Daksha or the Death of Sati. The lovers of the drama are expected to muster in force to lend *eclat* to the inauguration of the best place of public amusement of the kind we have yet had in this metropolis." দক্ষ সাজলেন গিরিশচন্দ্র স্বয়ং।[৫] মহাদেব-অমৃতলাল মিত্র এবং সতী-বিনোদিনী। অন্যান্য চরিত্রে রূপ দিলেন— অমৃতলাল বসু[৬] (দধীচি), নীলমাধব চক্রবর্তী (ব্রহ্মা), উপেন্দ্রনাথ মিত্র (বিষ্ণু), মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় (নারদ), অঘোরনাথ পাঠক (নন্দী), প্রবোধচন্দ্র ঘোষ (ভৃঙ্গী), গিরীন্দ্রনাথ ভদ্র (মন্ত্রী), কাদম্বিনী (প্রসূতি), গঙ্গামণি (ভৃগুপত্নী), যাদুকালী (চেড়ী), ক্ষেত্রমণি (তপস্বিনী) প্রভৃতি। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ষ্টার ও 'দক্ষযজ্ঞ' লাভ করলো বিপুল জন-অভিনন্দন। বিনোদিনী তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় উদ্বোধন-রজনীর স্মৃতি বিবৃত করেছেন। তিনি লিখেছেন :— "প্রথম দিনের সে লোকারণ্য, সেই খড়খড়ি দেওয়ালে লোক সব ঝুলিয়া ঝুলিয়া বসে থাকা দেখিয়া আমাদের

অসমাপ্ত রঙ্গালয়ে অথবা অস্থায়ী মঞ্চে অন্য কোথাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল কিনা, তা অবশ্য জানা যায় নি।

৫ গিরিশচন্দ্রের পরিণত বয়সে, তাঁর পরিবর্তে অঘোরনাথ পাঠক এই ভূমিকায় নামতেন।

৬ অমৃতলাল বসু 'সীতাহরণ' নাটকাভিনয়ের পর ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে বেঙ্গলে গিয়েছিলেন। ষ্টারের পত্তন হ'লে তিনি এখানে চলে আসেন।

বুকের ভিতর দুর্ দুর্ করিয়া কম্পন বর্ণনাতীত! আমাদেরই সব 'দক্ষযজ্ঞ' ব্যাপার! কিন্তু যখন অভিনয় আরম্ভ হইল, তখন দেবতার বরে যেন সত্যই দক্ষালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইল। বঙ্গের গ্যারিক গিরিশবাবুর সেই গুরুগম্ভীর তেজপূর্ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মূর্ত্তি যখন ষ্টেজে উপস্থিত হইল তখন সকলেই চুপ। তাহার পর অভিনয় উৎসাহ, সে কথা লিখিয়া বলা যায় না। গিরিশবাবু "দক্ষ", অমৃত মিত্রের "মহাদেব" যে একবার দেখিয়াছে, সে বোধহয় কখনই তাহা ভুলিতে পারিবে না। "কে-রে, দে-রে, সতী দে আমার" বলিয়া যখন অমৃত মিত্র ষ্টেজে বাহির হইতেন তখন বোধহয় সকলেরই বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিত। দক্ষের মুখে পতি-নিন্দা শুনিয়া যখন সতী প্রাণত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া অভিনয় করিত তখন সে বোধহয় নিজেকেই ভুলিয়া যাইত। অভিনয়কালীন ষ্টেজের উপর যেন অগ্নি উত্তাপ বাহির হইত।" (আমার কথা) অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে ১৮৮৩, ৫ আগস্ট 'সাধারণী' লিখলেঃ— "২৭শে জুলাই শনিবার রাত্রে ষ্টার থিয়েটরের নবীন ভবনে দক্ষযজ্ঞ নাটকের তৃতীয়বার অভিনয় সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে।··· নবীন রঙ্গালয়ে নব নাটকের অভিনয় এতই সুন্দর হই··ছিল, যে সহস্র সহস্র প্রশংসাবাদেও আমরা হৃদয়ে তৃপ্তি প্রদান করিতে পারি নাই।······" ঐ পত্রিকারই আর একদিনের অভিমতঃ— "···এই অভিনয় দর্শনে আমাদের চক্ষু প্রীতি লাভ করিয়াছে, শ্রুতি সুধাসিক্ত হইয়াছে, হৃদয় করুণ রসে আর্দ্র হইয়াছে এবং মনীষা বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ করিয়াছে।" (২।৩।১৮৮৪) এই নাটকের সঙ্গীত এবং আলোকসম্পাতও বিশেষ প্রশংসিত হয়।'

৭ "দক্ষযজ্ঞ' নাটকের গানগুলির সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষকরূপে গিরিশচন্দ্র-পরিচালিত নাট্যশালায় বেণীমাধব প্রথম গুণপনার পরিচয় দিলেন। এই নাটকের পাঁচখানি গানই রাগে তালে গঠিত, তার একটি ধ্রুপদাঙ্গের। বেণী ওস্তাদ-রচিত সুমধুর সুরে গানগুলি মঞ্চে গেয়েছিলেন স্বনামধন্যা নটী

'দক্ষযজ্ঞে'র পর 'ধ্রুবচরিত্র'। প্রথম অভিনয় ১৮৮৩-র ১১ আগস্ট। ভূমিকালিপি :—উত্তানপাদ-অমৃতলাল মিত্র, বিদূষক-অমৃতলাল বসু, মহাদেব-উপেন্দ্রনাথ মিত্র, ব্রহ্মা-নীলমাধব চক্রবর্তী, নারদ-অঘোরনাথ পাঠক, ধ্রুব-ভূষণকুমারী, সুনীতি-কাদম্বিনী, সুরুচি-বিনোদিনী। এ-নাটকের সবচেয়ে বড় সম্পদ, সঙ্গীত। ধ্রুবের ভূমিকাভিনেত্রী ভূষণকুমারী গানে ও অভিনয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন। দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সঙ্গীত ও বাংলার নাট্যশালা' প্রবন্ধে জানিয়েছেন :—"ধ্রুবচরিত্রে'র জন্যে ২৫টি গান রচনা করেন গিরিশচন্দ্র এবং সেই গীতাবলী রাগে তালে সম্পূর্ণ করেন বেণী ওস্তাদ। শুধু পরিমাণে নয়, গুণেও গানগুলি নাটকটির প্রধান আকর্ষণ হল। বেশীর ভাগ গাইলেন ধ্রুবরূপিণী ভূষণকুমারী এবং সুনীতির ভূমিকায় কাদম্বিনী। দুজনেই তাঁরা সুকণ্ঠ গায়িকা। ধ্রুবের চরিত্রে ভূষণকুমারীর সুন্দর অভিনয় ও প্রাণস্পর্শী গান দর্শকদের চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। বিশেষ তাঁর 'ফুটিলে ফুল ধ্রুব তোলেনা, ফুলে পূজা হবে তা তো ভোলেনা' গানখানি। বিখ্যাত 'সাধারণী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যগোষ্ঠীর অন্যতম লেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকার গানটির অত্যন্ত প্রশংসা করেন।" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা / প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা / ১৩৭৪) এই নাটকেই গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট বিদূষক চরিত্রের প্রথম

বিনোদিনী, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি যথাক্রমে সতী, প্রসূতি, তপস্বিনী ও নারদের ভূমিকায়। ···অভিনয়ের সঙ্গে নাটকের গানগুলিও শ্রোতৃবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করেছিল।" (সঙ্গীত ও বাংলার নাট্যশালা—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়/সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-চতুঃসপ্ততিতম বর্ষ। প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৭৪)

"দক্ষযজ্ঞ নাটকে কাচের উপর আলো ফেলিয়া দশমহাবিদ্যার চমকপ্রদ আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখাইয়া সুপ্রসিদ্ধ নাট্যশিল্পী জহরলাল ধর বিশেষরূপ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।" (গিরিশচন্দ্র— অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

সূচনা।[৮] 'ধ্রুবচরিত্র' অভিনয়ের সময় মামলা-মকদ্দমার জন্য নাট্যশালা কিছুদিন বন্ধ থাকে। ১৮৮৩, ২৩ সেপ্টেম্বর 'সাধারণী' জানায়ঃ—"ষ্টার থিয়েটার আগামী শনিবার হইতে পুনরায় খুলিবে। ইহাদের মোকদ্দামা আপোষে মিটিয়া গিয়াছে। সুখের বিষয়।" এই বৎসরের শেষ নাটক গিরিশচন্দ্রের 'নল-দময়ন্তী' (২২।১২।১৮৮৩) বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। নল, দময়ন্তী, কলি ও পুষ্করের ভূমিকায় যথাক্রমে অমৃতলাল মিত্র, বিনোদিনী, অঘোরনাথ পাঠক এবং নীলমাধব চক্রবর্তী অবতীর্ণ হলেন। 'সাধারণী' লিখলেঃ— "অভিনয় দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণ যদি অভিনয় দর্শনে আনন্দলাভের সহিত, জ্ঞান ও উপদেশ একাধারে সংগ্রহ বাসনা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যেন এক একবার ষ্টার থিয়েটরের নবীন ভবনে অভূত (?) সুন্দর অভিনয় দর্শনে অগ্রবর্ত্তী হন। গত ৫ই ডিসেম্বর (৫ই জানুয়ারি ?) শনিবার ষ্টার থিয়েটরে শ্রীযুক্ত গিরীশবাবু প্রণীত "নল-দময়ন্তী" নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম।…নাটকগত শ্রেষ্ঠ নায়ক, নায়িকা হইতে সামান্য প্রতিহারী, স্ত্রীলোকটি পর্য্যন্ত অভিনয়ে অসামান্য পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছে। নল-দময়ন্তীর অভিনয় অভিনয়োৎকর্ষের চরম দৃষ্টান্ত। কলি ও ·ষ্করের অভিনয় প্রশংসাপ্রদ; অন্যান্য অংশের অভিনয় হৃদয়গ্রাহী। দৃশ্য,— দৃশ্যপট-গুলি অতীব নয়নানন্দদায়ক।"…[৯] (২০।১।১৮৮৪) ১৮৮৩-র শেষে

৮ "নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের হস্ত-প্রয়োগের পূর্বে কি সংস্কৃত নাটকে, কি বাঙ্গালা নাটকে বিদূষক চরিত্রের অভাব ছিল না। রাজবয়স্য হিসাবে ভাঁড়ামি ও ঔদরিকতার পরিচয়-দেওয়া ছাড়া আর কোন নূতনত্বের আস্বাদন তাহাতে পাওয়া যায় না। গিরিশচন্দ্রই বিদূষকের নূতন রূপ দিয়াছেন।… 'ধ্রুবচরিত্র' নাট্যক্ষেত্রের মধ্যে বিদূষকের পদ-চিহ্ন সর্বপ্রথম স্থাপিত হইল। রহস্য ও ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া সত্যকথন-শীলতা এই রাজবয়স্যের বৈশিষ্ট্য।" (দৃশ্যকাব্য পরিচয়— সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়)

৯ "বৈজ্ঞানিক শিল্প প্রবর্ত্তনে রঙ্গমঞ্চের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে

স্বজাতির তাড়নায় ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে গুর্মুখ রায় থিয়েটারের স্বত্ব ত্যাগ করলে অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু,[১০] হরিপ্রসাদ বসু ও দাসুচরণ নিয়োগী মাত্র এগারো হাজার টাকার বিনিময়ে ষ্টারের মালিকানা লাভ করেন। ডিসেম্বর মাসে কলকাতার গড়ের মাঠে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মেলায়[১১] 'নল-দময়ন্তী'র অভিনয়ে সম্প্রদায় প্রভূত অর্থোপার্জন করায় থিয়েটার ক্রয়ের সময় জোড়াসাঁকোর হরিধন দত্তের ভ্রাতা কৃষ্ণধন দত্তের নিকট হ'তে কৃত ঋণ বহুলাংশে শোধ হল।

১৮৮৪ সালে গিরিশচন্দ্র বিরচিত 'কমলে কামিনী'[১২] (২৯ মার্চ), 'বৃষকেতু',[১৩] 'হীরার ফুল' ও অমৃতলাল বসুর 'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে' (১৬ এপ্রিল) এবং গিরিশচন্দ্রের 'শ্রীবৎসচিন্তা' (৭ জুন) অভিনীত হওয়ার পর ২ আগস্ট ষ্টার গিরিশচন্দ্রের লেখা ভক্তিরসাশ্রিত যুগান্তকারী নাটক 'চৈতন্যলীলা' মঞ্চস্থ করলে। 'চৈতন্যলীলা'র

গিরিশচন্দ্র নল-দময়ন্তী নাটকে কমল-কোরক প্রস্ফুটিত হইয়া অপ্সরাগণের আবির্ভাব, বস্ত্র লইয়া সহসা পক্ষীর আকাশে উত্থান ইত্যাদি কয়েকটি দৃশ্য সংযোজন করিয়াছিলেন। নাট্যশিল্পী জহরলাল বাবু তাহা সুসম্পন্ন করিয়া দক্ষযজ্ঞে দশমহাবিদ্যা প্রদর্শনের ন্যায় সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।" (গিরিশচন্দ্র— অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

১০ অমৃতলাল বসু Working Partner রূপে যোগ দেন। মালিকানা লাভের জন্য তাঁকে কোনো মূলধন বিনিয়োগ করতে হয় নি।

১১ জুলস্ জুর্বাটের কর্তৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে ৪ ডিসেম্বর, ১৮৮৩ এই মেলার উদ্বোধন হয়।

১২ "জহরলালবাবুর গুণপনায় কালীদহে কমলে কামিনী প্রভৃতি দৃশ্যগুলিও অতি সুন্দর দেখান হইত। তাহার উপর শ্রীমন্তের ভূমিকায় শ্রীমতী বনবিহারিণী সুমধুর ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতে দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন।" (গিরিশচন্দ্র— অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

১৩ "জহরলালবাবু রঙ্গমঞ্চের উপর বৃষকেতুর শিরচ্ছেদ দেখাইয়া দর্শকগণকে বিস্মিত ও চমকিত করিতেন।" (ঐ)

অভিনয় বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঊনিশ শতকের ধর্মীয় নবজাগরণে নাটকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছিল।[১৪] এর রচনা সৌকুমার্য এবং 'জীবন্ত' অভিনয় পাশ্চাত্যানুরাগী দেশীয় নব্য সম্প্রদায়ের হিন্দুধর্মের প্রতি বহুকালপোষিত অশ্রদ্ধা দূরীকরণে সহায়তা করে। কেবল কলকাতা সহর নয়, সুদূর পল্লী অঞ্চলেও 'চৈতন্যলীলা'র সুখ্যাতি এবং প্রভাব বিস্তৃত হয়। এই প্রসঙ্গে অমৃতলাল বসু পরবর্তীকালে তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় লিখেছেন :— "'বখাটে' নট ও 'অখাঁটি' নটীবৃন্দ দ্বারা দেশে ধর্ম্মপ্রচার হইল! ছি ছি একথা মনে আসিলেও, স্বীকার করিতে নাই, তাতে মহাপাপ আছে! কিন্তু কে জানে কেমন, তারিখে একটু গোলমাল করে, মনে হয় যেন এই নগণ্য সম্প্রদায়কে 'জঘন্য' বেদীতে শ্রীকৃষ্ণ মহিমা কীর্ত্তন করিতে শুনিয়াই ধর্ম্ম-বিপ্লবকারী বীরগণ অন্তরে ঈষৎ কম্পিত হইলেন, আর ধর্ম্মপ্রাণ নিদ্রিত হিন্দু জাগরিত হইয়া ব্রজরাজ ও নবদ্বীপচন্দ্রের বিশ্ব বিমোহন প্রেম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন; নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল, গীতা ও চৈতন্যচরিতের বিবিধ সংস্করণে দেশ ছাইয়া পড়িল, বিলাত প্রত্যাগত বাঙ্গালী সন্তানও লজ্জিত ন হইয়া সগর্ব্বে আপনাকে হিন্দু হিন্দু হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল !!!" (রূপ ও রঙ্গ— ৪।১০।১৯২৪) অমৃতলাল অন্যত্র লিখেছেন :— "লিখিলা চৈতন্যলীলা,/হীরক হইল শিলা.,/নাট্যশালা হল তীর্থ ভক্তমেলা থিয়েটার।/বাজে শিঙা বাজে খোল/রঙ্গমঞ্চে হরিবোল/ বিলাসীর নতশির আঁখিজলে ভেসে যায়।/ ছুটিল নামের বন্যা/ধরণী

১৪ "...'চৈতন্যলীলা' এত জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রধান কারণ 'হিন্দু পুনরভ্যুত্থান আন্দোলন' (Hindu Revivalism), থিওসফিস্ট (Theosophist) আন্দোলন, নব্য-বৈষ্ণব (Neo-Vaisnava) আন্দোলন প্রভৃতি এবং পরমহংসদেবের ভূমিকা।..." (গিরিশ রচনাবলী / দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা—ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত)

হলেন ধন্যা/গণিকা গুণীর গণ্যা কেঁদে লুঠে কৃষ্ণ-পায়॥" সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমন কি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মথুরানাথ পদরত্ন, শিশিরকুমার ঘোষ, ফাদার লাফোঁ, এডুইন আর্নল্ড, কর্ণেল অলকট প্রমুখ দেশী-বিদেশী মনীষীবৃন্দ পর্যন্ত 'চৈতন্যলীলা'র প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বস্তুতঃ, চৈতন্য চরিত্রের রূপায়ণ বিনোদিনীর শিল্পীজীবনের শ্রেষ্ঠকীর্তি। অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন তিনি এই ভূমিকায়।[১৫] বিনোদিনীর নাট্যনৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে প্রখ্যাত সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত 'রেইজ অ্যাণ্ড রায়ৎ' পত্রিকায় মন্তব্য করলেন :— "...Her Chaitannya showed a wonderful mastery of the subtle forces dominating one of the greatest of religious characters who was taken to be the Lord himself and is to this day worshipped as such by millions. For a young Miss to enter into such a being so as to give it perfect expression, is a miracle. ...." (১০।১০।১৮৮৫) ঐ পত্রিকারই ৭ নভেম্বর, ১৮৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হল কর্ণেল এইচ্. এস্. অলকটের[১৬] প্রশস্তিমূলক পত্র। তাতে তিনি রায় দিলেন :— "...As for the Chaitanya Lila, I unhesitatingly affirm that it is impossible for anyone but a "Civilized", peg-drinking Babu, like the one you saw misbehaving himself on the front bench of the

১৫ পরবর্তীকালে অমৃতলাল বসু বলেছেন :— "শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের কত দারুমূর্তি, কত চিত্রপট দেখিয়াছি কিন্তু মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে গেলেই আমি বিনোদিনীকে ধ্যানচক্ষে দেখি।" (সচিত্র শিশির—বড়দিন, ১৯২৪) এ বড়ো কম প্রশংসা নয়!

১৬ কর্ণেল অলকট (১৮৩২-১৯০৭) ছিলেন ভারতে থিওসফিক্যাল আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, মাদাম ব্লাভাটস্কির (১৮২১-৯১) সহযোগী।

orchestra, to witness the play without a rush of spiritual feeling and religious fervour. The poor girl who played Chaitanya may belong to the class of unfortunates [alas ! how unfortunate these victims of man's brutishness], but while on the scene she throws herself into her role so ardently that one only sees the Vaishnava saint before him. Not a lewd gesture, not a sensual glance of the eye, not the slightest suggestion of animal desire, l ike those which make up the attraction of nautches to their patrons. I am a psychologist and watch faces for signs of hidden emotion. At the Star Theatre in Beadon Street, there was not a symptom of any bad influence working in the audience ; while at every nautch the signs of lustful desire are but too evident, and by the dancer, encouraged by responsive look and gesture. So throughly do.. the Star actress feel the emotions of the saint she personates, so intensely arouse in her own bosom the religious ecstacy of Bhakti Yoga, she fainted dead away between the acts the evening I was there, and a medical man who shared my box had to go behind the scenes each time to administer restoratives."
সমালোচনা প্রসঙ্গে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (..৯।৯।১৮৮৪) জানিয়েছে :—
"We witnessed the performance of 'Chaitanya Lila' at the Star Theatre the other night. There was much to admire. The scenic effect was fair, and the

artistic arrangement of the parts did credit to the critical taste of the manager. The acting was satisfactory, and the singing exquisite. The actor who took the part of Chaitanya seems to be gifted with considerable histrionic ability. We are bound to say that Native Theatres are making fair progress. ...” এই ‘চৈতন্যলীলা’ দর্শন উপলক্ষেই ১৮৮৪, ২১ সেপ্টেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ষ্টার থিয়েটার তথা সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম পদার্পণ ঘটে এবং বিনোদিনী প্রমুখ নটীকুল তাঁর আশীর্বাদ লাভে ধন্য হন। সার্থক ভক্তিরসাশ্রিত নাটক রচনায় ও অভিনয়ে কেবলমাত্র নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের খ্যাতি অথবা ষ্টারের যশঃগৌরব বৃদ্ধি পেল তাই নয়, বিনোদিনী প্রমুখের অসাধারণ নৈষ্ঠিক শিল্পসাধনায় আকৃষ্ট হয়ে দেশের তাবৎ জ্ঞানীগুণীজনের রঙ্গালয়ে আবির্ভাব ঘটায় সামগ্রিকভাবে বাংলা থিয়েটারের মর্য্যাদা বাড়লো এবং অভিনেত্রী সম্প্রদায়ের প্রতি রক্ষণশীলদের ঘৃণা এবং অবজ্ঞারও হল হ্রাস-প্রাপ্তি। ‘চৈতন্যলীলা’র ভূমিকালিপি ছিল এইরকম:—জগন্নাথ মিশ্র-নীলমাধব চক্রবর্তী, নিমাই (চৈতন্য)-বিনোদিনী, নিত্যানন্দ ও পাপ-বনবিহারিণী, গঙ্গাদাস-মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, অদ্বৈত-উপেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রতিবেশী ও লোভ-অমৃতলাল বসু, শচী ও ভক্তি-গঙ্গামণি, লক্ষ্মী-প্রমদাসুন্দরী, বিষ্ণুপ্রিয়া-কিরণবালা প্রভৃতি।

১৮৮৪-র শেষ নাটক ‘প্রহ্লাদচরিত্র’ ও অমৃতলাল বসুর ‘বিবাহ বিভ্রাট’ (২২।১১)। গিরিশচন্দ্রের লেখা ‘প্রহ্লাদচরিত্র’ ষ্টারে সুবিধা করতে পারে নি। রাজকৃষ্ণ রায় রচিত ঐ নামের নাটক কুসুমকুমারী নাম্নী জনৈকা অভিনেত্রীর সঙ্গীতনৈপুণ্যে বেঙ্গল থিয়েটারে অধিকতর জনপ্রিয় হয়েছিল। ষ্টারে প্রহ্লাদ সাজতেন বিনোদিনী আর অমৃতলাল মিত্র হিরণ্যকশিপু। ‘বিবাহ বিভ্রাট’ সেকালে বিশেষ খ্যাতি পেয়েছিল। এ-নাটকে ঝি-এর ভূমিকায়

ক্ষেত্রমণির অভিনয় স্মরণীয় হয়ে আছে। তদানীন্তন লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর স্যার রিভার্স টমসন ক্ষেত্রমণির নাট্যনৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেছেন, তাঁর মত প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী পাশ্চাত্যেও দুর্লভ।[১৭] নাটকখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে ৩১ জানুয়ারি, ১৮৮৫ 'রেইজ অ্যাণ্ড রায়ৎ' লিখেছিলঃ— "...The same place of elevated amusement has scored another triumph in Bibaha Bibhrat, a comedy by Baboo Amritalal Bose, himself a great comedian. It is an incisive attack on the most crying evils of our society at this moment in the shape of a drama full of rollicking fun, and presenting a photographic portraiture of Bengali life. Introduced to the stage under the auspices and advice of the veteran manager, and played by a strong company including the author himself, it has had an extraordinary run. ...."

১৮৮৫-র সুরু 'নিমাই সন্ন্যাস' (২৮।১) দিয়ে। নাটকখানি গিরিশচন্দ্রের রচনা। 'চৈতন্যলীলা'র মত এতেও নিমাই সাজলেন বিনোদিনী। অন্যান্য অংশে রূপ দিলেন প্রবোধচন্দ্র ঘোষ (প্রতাপ রুদ্র), উপেন্দ্রনাথ মিত্র (রায় রামানন্দ), অমৃতলাল মিত্র (কেশব ভারতী), অঘোরনাথ পাঠক (সার্বভৌম), গঙ্গামণি (শচী), ভূষণকুমারী (বিষ্ণুপ্রিয়া) প্রভৃতি। কিন্তু 'চৈতন্যলীলা'র মত জনসমাদর 'নিমাই সন্ন্যাসে'র ভাগ্যে জোটে নি।[১৮] ৩ মে 'প্রভাসযজ্ঞ'

---

১৭ সেকালের বিখ্যাত ধনী ও ব্যবহারজীবী জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে ১৮৮৫, ২৩ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত বিবাহ বিভ্রাট' নাটকের বিশেষ অভিনয়ানুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন।

১৮ "নাট্যাচার্য্য অমৃতলালবাবু বলেন,— "বোধহয় এই গূঢ় আধ্যাত্মিক

(গিরিশচন্দ্র) অভিনয়ের পর ষ্টার ১৯ সেপ্টেম্বর গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব-চরিত' মঞ্চস্থ করলে। প্রথম রজনীর ভূমিকালিপি ছিল এইরকম ঃ— সিদ্ধার্থ (বুদ্ধদেব)-অমৃতলাল মিত্র, শুদ্ধোদন-উপেন্দ্রনাথ মিত্র, বিষ্ণু ও যন্ত্রী-কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিদূষক-শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুজাতা-প্রমদাসুন্দরী এবং গোপা-বিনোদিনী। গিরিশচন্দ্র এডুইন আর্‌নল্‌ডের 'Light of Asia' নামক কাব্য অবলম্বনে নাটকখানি বচনা করেন। 'বুদ্ধদেব-চরিতে'র অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। বিদেশী কবি স্বয়ং তাঁর কাব্যের নাট্যরূপ দেখে মুগ্ধ হন।[১৯] প্রসঙ্গতঃ, 'হিন্দু পেট্‌রিয়ট' জানিয়েছে ঃ— "Mr. Edwin Arnold during his short stay at Calcutta did not miss the opportunity of witnessing the rendering of his own exquisite and incomparable idyl the Light of Asia, by the talented Star Theatre Company and wrote a highly complimentary letter to the manager which, we publish below :—

"I cannot leave Calcutta, where I have experienced such great friendliness from every side, without expressing the singular pleasure, I derived from witnessing the performance at your Theatre of the life of Buddha, founded on my poem the Light of

ভাবেব আধিক্য— অভিনযে তেমন অভিব্যক্ত হয় নাই বা হওয়া সম্ভব নহে, এবং সেই ভাব সাধারণ দর্শকের পক্ষে উপলব্ধি করাও কঠিন হইয়াছিল, এই নিমিত্তই চৈতন্যলীলার ন্যায় 'নিমাই সন্ন্যাস' সর্ব্বজনসমাদৃত হয় নাই।" (গিবিশচন্দ্র— অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, 'নিমাই সন্ন্যাস' রচনার মূলে ছিল অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের প্রেরণা।

১৯ ১৮৮৫-র শেষের দিকে এডুইন আর্‌নল্‌ড ভারত ভ্রমণে আসেন।

Asia. The story, clearly condensed was presented, it seemed to me, with much dramatic ability, and intelligence on the part of the leading actors, particularly those who played Siddartha and his Princess. The management, simple as its appliances were, was good ; and I was especially impressed by the way in which your Hindu audience, listened with such close and intellectual attention to the philosophic portion of the dialogue. I thank you sincerely for such an opportunity of deserving the sensible character of your fellow-citizens and the interest aroused in their minds by these lofty teachings which spring from Indian soil. None of the undeserved honours, done to me and to my work has touched me more than the play at your theatre for which please accept my thanks and convey them to your accomplished Company."

We are glad, the management took up the suggestion we had thrown out, while noticing the performance of the Buddhadeb Charit some time ago and we need hardly add that Mr. Arnold's compliment is a well deserved one." (১।২।১৮৮৬) এই নাটকের একখানি গান :— "জুড়াইতে চাই-কোথায় জুড়াই ?" শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদের বড় প্রিয় ছিল।[২০]

২০ "নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) যখন এই গানটি গভীর রাত্রিতে শয্যাত্যাগ করিয়া সিমলার গৌরমোহন মুখার্জীর ষ্ট্রীটস্থ বাড়ীর দালানে আপনার মনে পায়চারি করিতে করিতে গাহিতেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে গানটি

১৮৮৬ সালের ৩ জুলাই অভিনীত হল গিরিশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্তিমূলক নাটক 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর'। প্রথম অভিনয় রাত্রে অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), অঘোরনাথ পাঠক, বিনোদিনী এবং গঙ্গামণি যথাক্রমে বিল্বমঙ্গল, সাধক, ভিক্ষুক, চিন্তামণি ও পাগলিনীর চরিত্রে রূপ দিলেন। এই নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয় অমৃতলাল মিত্রের নট জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। "……'বিল্বমঙ্গল'-এর প্রথম অভিনয়-রাত্রির দর্শকদের মধ্যে আজ আর কেউ জীবিত নেই। কিন্তু পরে এই নাটক বহুবার অভিনীত হয়েছে, আর অমৃতলাল মিত্র বিল্বমঙ্গল-রূপে দেখা দিয়েছেন। তাঁর সে-অভিনয় দেখেছেন··· তাঁদের একজনের অভিমত এখানে বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করি। ইনি হলেন কলা-দক্ষ শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। তিনি লিখছেন— "তাঁর চেহারা ছিল মঞ্চের উপযোগী। সুগঠিত দেহ, প্রশস্ত ললাট, আয়ত চক্ষু, টিকলো নাক। অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ অভিনেতার মত তিনিও মঞ্চের উপর আবির্ভূত হয়ে একটি-মাত্র বাক্য উচ্চারণ না করেও দর্শকদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন।"

"··· বিল্বমঙ্গল-রূপে তাঁকে আমি দেখেছি বারংবার। কারণ মাত্র দু-একবার দেখলে সে অপূর্ব অভিনয়ের পরিপূর্ণ রস আস্বাদন করা চলত না। প্রাচীন নাটক 'বিল্বমঙ্গল', সেকালে এবং একালে বিভিন্ন রঙ্গালয়ে অসংখ্যবার অভিনীত হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত

এমন শ্রুতিমধুর হইত যে বাড়ীর আশেপাশের ঘরের নিদ্রিত ব্যক্তিরা নিদ্রা-ত্যাগ করিয়া স্থির হইয়া শুনিতেন।···যাঁহারা নরেন্দ্রনাথের মুখে রাত্রিতে সেই গান শুনিতেন, তাঁহাদের তখন আর বাহ্যজ্ঞান কিছু থাকিত না—সংসারের মায়ামমতা ভুলিয়া গিয়া কোথায় এক অসীম জগতে প্রবেশ করিতেন। এই গানটি বরাহনগর মঠে সর্ব্বদাই গীত হইত।" (শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী (৩য় ভাগ)—মহেন্দ্রনাথ দত্ত)

বিল্বমঙ্গল-ভূমিকায় অমৃতলালের তুলনা খুঁজতে স্মৃতিসাগর মন্থন ক'রেও অমৃতলাল ছাড়া আর কারুকেই খুঁজে পাই না।

"অমৃতলালের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নাটক জীবন্ত হয়ে উঠত। তারপর দ্বিতীয় অঙ্কের যেখানে তিনি গলিত শব আলিঙ্গন ক'রে নদী পার হয়ে চিন্তামণির গৃহে গিয়েছেন এবং দিব্যদৃষ্টি লাভ ক'রে দীর্ঘ স্বগতোক্তি করছেন— এই পরিণাম! এই নরদেহ—/জলে ভেসে যায়, ছিঁড়ে খায়/কুক্কুর শৃগাল,/কিম্বা চিতা-ভস্ম পবন উড়ায়—/। তখন অপূর্ব এক ভাবের বন্যায় প্রত্যেক দর্শকের চিত্ত আলোড়িত হয়ে উঠত। আবার বণিকের গৃহে গিয়ে অহল্যাকে দেখে ক্ষণিক মোহে চঞ্চল হয়েও আত্মসংবরণ ক'রে বিল্বমঙ্গল যখন— মন, এখনো কি আঁখির মমতা কর? / শত্রু তোব শীঘ্র কর্ বধ। / দিব আমি উত্তম নয়ন, / সেই আঁখি ব্রজের গোপালে / 'আমার' বলিয়ে তুলে নেবে কোলে। / অন্য সব হেরিবে অসার। / যাও যাও নশ্বর নয়ন— /। ব'লে কাঁটা দিয়ে স্বহস্তে নিজের দুই চক্ষু বিদ্ধ করতেন, দর্শকরা তখন পাথরের মূর্তির মত এমন স্তম্ভিত হয়ে ব'সে থাকত যে, কেউ হাততালি দিয়ে প্রাণের উচ্ছ্বাস পর্যন্ত প্রকাশ করতে পারত না।" (অথ নট ঘটিত— সূত্রধার) সঙ্গীতাংশেও 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল।[২১] 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুরে'র পর 'বেল্লিক বাজার' ষ্টারে অভিনীত আর একখানি সাফল্যমণ্ডিত নাটক। গিরিশচন্দ্র

২১ "…উচ্চশ্রেণীর অভিনয়ধন্য নাটকখানিরও সঙ্গীতাংশ রীতিমত আকর্ষণের বস্তু। ১২ খানি রাগাশ্রয়ী গানের মধ্যে বিশেষ করে 'পাগলিনী'র 'ওমা কেমন মা ত' কে জানে।' (মিশ্র কাফি, একতালা), 'আমার পাগল বাবা' (গৌরী, একতালা), 'সাধে কি গো শ্মশানবাসিনী' (কানাড়া মিশ্র, একতালা), 'আমায় নিয়ে বেড়াস হাত ধ'রে' (ছায়ানট, মধ্যমান), 'যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে' (মাঝ মিশ্র, পোস্তা) ইত্যাদি বাংলার নাট্যমঞ্চে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। পাগলিনীর ভূমিকায় প্রথম অভিনয়ে যেমন গঙ্গামণি, তেমনি পরে পরে এক এক সময়ে অবতীর্ণা হয়েছেন নরীসুন্দরী,

রচিত এই 'পঞ্চরং'টি ২৪ ডিসেম্বর, ১৮৮৬ মঞ্চস্থ হয়। দোকড়ি সেনের চরিত্র রূপায়ণে অমৃতলাল বসু সুখ্যাতি অর্জন করলেন। এই নাটকে রঙ্গিণীর ভূমিকায় অভিনয় ক'রে বিনোদিনী ষ্টার তথা রঙ্গজগৎ থেকে চিরবিদায় নেন। সহকর্মীদের অবিচার ও চক্রান্ত, একমাত্র কন্যার অকালমৃত্যু এবং পরমহংসদেবের আধ্যাত্মিক প্রভাব তাঁর অবসর গ্রহণের মূলে ছিল।[২২] 'বেল্লিক বাজার' প্রহসনে কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু এবং বিনোদিনী যথাক্রমে ললিত, পুঁটিরাম, খুদিরাম, দোকড়ি এবং রঙ্গিণী সাজতেন। সাংবাদিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার এই পঞ্চ রঙের প্রশংসায় লিখেছিলেনঃ—"বেল্লিক-বাজার রুচিবিকারে ফুটিয়াছে। বেল্লিক-বাজার অভিনয়ে বড়ই ফুটন্ত! জীবন্ত! রঙ্গরুচি যে আমাদিগের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়া নীতি-প্রীতির মূল উল্টাইয়া আমাদিগকে পদে পদে পেষণ করিতেছে, পদে পদে স্বার্থের দায় ভদ্রাচারে জলাঞ্জলি দিতেছে, তাহা ইহাতে একরকম চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখান হইয়াছে।" (নববিভাকর—সাধারণী, ১২৯৪)

১৮৮৭, ২১ মে 'রূপ-সনাতন' (গিরিশচন্দ্র) অভিনীত হওয়ার পর এখানে আর কোনো নতুন নাটক মঞ্চস্থ হয় নি। 'রূপ-সনাতন' নাটকে চৈতন্যদেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)। এই চরিত্রে তিনি অনবদ্য অভিনয় করেছেন। বিনোদিনী মঞ্চের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করায় বিশাখার ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল কিরণবালাকে। এ-নাটকে সনাতনের রূপসজ্জায় অমৃতলাল মিত্র গান গাইতেন।

তিনকড়ি, সুশীলাবালা প্রমুখ বাংলার শ্রেষ্ঠা গায়িকা-অভিনেত্রী।" (সঙ্গীত ও বাংলার নাট্যশালা)

২২ 'চৈতন্যলীলা'য় বিনোদিনীর অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মস্তক স্পর্শ ক'রে আশীর্বাদ জানান। এই ঘটনায় বিনোদিনীর মনোরাজ্যে পরিবর্তন ঘটে। দীর্ঘায়ু এই অভিনেত্রী পরবর্তীকালে পবিত্র দিন যাপন করেন।

চার বৎসরের নাট্যসাধনায় বিডন স্ট্রীটের ষ্টার থিয়েটার যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেই সময় তার ভাগ্যাকাশে বিপদের কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। 'বেল্লিক বাজারে'র সুখ্যাতি ষ্টারের বিপর্যয় ডেকে আনলে। নাটকখানির অসম্ভব জনপ্রিয়তা দেখে ধনকুবের গোপাললাল শীল থিয়েটার ব্যবসায় প্রলুব্ধ হলেন। প্রমাদ গুণলে ষ্টার। শীলমশায় কৌশলে জমি কিনে ষ্টার কর্তৃপক্ষকে উঠে যাওয়ার নোটিশ দিলে তাঁরা বিপদগ্রস্ত হন। শেষে গিরিশচন্দ্রের মধ্যস্থতায় স্থির হল, সম্প্রদায় ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে থিয়েটার বাড়ী ছেড়ে দেবেন কিন্তু ষ্টার নামের 'গুড উইল' গোপাললাল পাবেন না। সেটা তাঁদেরই থাকবে। বিডন স্ট্রীটে ষ্টারের শেষ অভিনয় 'বুদ্ধদেব-চরিত' ও 'বেল্লিক বাজার'। ১৮৮৭, ৩১ জুলাই অনুষ্ঠিত এই অভিনয়ের অন্যতম দর্শক সাংবাদিকপ্রবর অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর পত্রিকায় লিখলেন :— "গিরিশবাবু সদলে ষ্টার থিয়েটার হইতে বিদায় লইলেন। ষ্টার থিয়েটার বাড়িটির সহিত আর তাঁহাদের কোন সম্পর্ক রহিল না। বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান রঙ্গালয়ের এই আকস্মিক তিরোভাব বড়ই আক্ষেপের কথা। দর্শকে-সমালোচকে প্রকৃত রঙ্গরসপান গিরিশবাবুর প্রসাদেই করিতেছিলে । ...'বুদ্ধদেব-চরিত' ও 'বেল্লিক বাজার' ষ্টার থিয়েটারের তুটি শেষ অভিনয়। শেষদিনে রঙ্গশালা জনতায় যেন ভাঙিয়া পড়িতেছিল। রঙ্গক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত কোথাও কখন এত জনতা হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। প্রবীণ নবীন দর্শকদল সাধ মিটাইয়া গিরিশবাবুর কল্পনাময়ী সাধনের বিজয়া দেখিলেন। অভিনয়ান্তে 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রণেতা শ্রীযুক্ত অমৃত-লাল বসু এই ক্ষুদ্রকালে তাঁহাদের যে রাশি রাশি ত্রুটি হইয়াছে তাহা স্বীকার করিয়া অতি বিনীত ভাবে সর্ব্বসমক্ষে ক্ষমা চাহিলেন। পর্ণকুটীর বাঁধিয়া কখনও প্রকাশ্যে আবার দেখা দিবেন, তাহার আভাস দিলেন। কলুটোলাস্থ প্রসিদ্ধ শীলবংশীয় শ্রীযুক্ত গোপাললাল শীল যে ইহার সর্ব্বস্বত্বে অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাহাও স্পষ্টাক্ষরে

সাধারণের গোচর করিলেন। সকলেই যেন শোকে ম্রিয়মাণ।”[২৩] (নববিভাকর—সাধারণী, ১২৯৪)

বিডন স্ট্রীটের ষ্টার থিয়েটারের চার বৎসরের জীবনের এইখানেই সমাপ্তি। থিয়েটার উঠে গেল। স্বত্বাধিকারীরা ত্রিশ হাজার টাকা পেয়ে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের উপর জমি কিনে নতুন নাট্যশালা তৈরী করলেন। জন্ম নিল— হাতিবাগানের ‘ষ্টার’। গৌরবময় ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে তার অবদানও বড় কম নয় কিন্তু সে আর এক ইতিহাস।

২৩ বিডন স্ট্রীটের ষ্টারের শেষ অভিনয়রজনীর বিবরণ অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় অনুরূপ ছাপা হয়েছিল। ১৮৮৭, ২ আগস্ট ‘ইণ্ডিয়ান মিরার’ লিখেছে :— "...Babu Amrita Lal gracefully acknowledged the patronage that had been accorded to the company during the last four years that they had catered for the public in that pavilion, craved pardons for their shortcomings, and concluded by expressing a hope that their patrons would continue their kindness towards them, should the company resume their performances elsewhere, as they shortly expected to do......"

"..The sympathetic silence with which the affecting address was received unquestionably proved the popularity of the corps with the play-going public who had mustered strong on the occasion to bid the company a hearty au revoir......" (অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য— ডঃ অরুণকুমার মিত্র)

পরিশিষ্ট

ক. অভিনয়-তালিকা

দক্ষযজ্ঞ	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২১।৭।১৮৮৩
ধ্রুবচরিত্র	"	১১।৮।১৮৮৩
নল-দময়ন্তী	"	২২।১২।১৮৮৩
কমলে কামিনী	"	২৯।৩।১৮৮৪
বৃষকেতু	"	১৬।৪।১৮৮৪
হীরার ফুল	"	"
চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে	অমৃতলাল বসু	"
শ্রীবৎসচিন্তা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৭।৬।১৮৮৪
চৈতন্যলীলা	"	২।৮।১৮৮৪
প্রহ্লাদচরিত্র	"	২২।১১।১৮৮৪
বিবাহ বিভ্রাট	অমৃতলাল বসু	"
নিমাই সন্ন্যাস	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২৮।১।১৮৮৫
প্রভাসযজ্ঞ	"	৩।৫।১৮৮৫
বুদ্ধদেব-চরিত	"	১৯।৯।১৮৮৫
বিল্বমঙ্গল ঠাকুর	"	৩।৭।১৮৮৬
বেল্লিক বাজার	"	২৪।১২।১৮৮৬
রূপ-সনাতন	"	২১।৫।১৮৮৭

খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায়

গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, নীলমাধব চক্রবর্তী, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়, অঘোরনাথ পাঠক, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, গিরীন্দ্রনাথ ভদ্র, মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), বিনোদিনী, কাদম্বিনী, গঙ্গামণি, যাদুকালী, ক্ষেত্রমণি, ভূষণকুমারী, বনবিহারিণী, প্রমদাসুন্দরী, কিরণবালা প্রভৃতি।

গ. সমালোচনা

'দক্ষযজ্ঞ' নাটক দিয়ে বিডন স্ট্রীটের ষ্টার থিয়েটারের উদ্বোধনের দু'দিন পরে ২৩ জুলাই, ১৮৮৩ তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় অভিনয়ের যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে উদ্বোধন রজনী সম্পর্কিত অনেক তথ্যাদি স্থান পেয়েছে। মূল্যবান বিধায় সম্পূর্ণ সমালোচনাটি এখানে উদ্ধৃত হচ্ছে :—

"The Star Theatre in Beadon Street was opened to the public for the first time last Saturday night. As regards fittings and accoutrements, it may fairly take its place among the best Play-houses in this city, though the arrangements on this night were not as perfect as could be desired for the convenience of the audience. To visitors on the lowermost rows of the stall seats the performance was almost invisible, and the same may be said of those who had back seats in the dress circle. The play performed was "Duksha yojya" or the ceremony performed by Durga's father King Duksha for the express purpose of slighting Siva, which ended in confusion to the yojya, and the death of King Duksha, father of Sati or Durga. The performance was capital; the parts of Duksha, Mahadev, Sati and Queen Manoka were exceedingly well performed. In the early scenes the actresses seemed to have not well rehearsed the interlocutions, but they more than made up as the play advanced. The scenic representations were all that could be desired, and the exhibition of ghosts, the ten transformations of Sati and other images by means of reflected electric light behind a glass, deservedly drew loud plaundits. On the whole the performance does great credit to Babu Girishchunder Ghose, the dramatic Genius of Bengal at the present day. To make the new theatre a resort for respectable persons for rational recreation and amusement, the manager should scrupulously attend to two things— he should strictly prevent public women taking seats among the audience in exposed places and keep out drunken men. The uproar caused by the latter was a source of great annoyance to the spectators."

এমারেল্ড থিয়েটার

(১৮৮৭-১৮৯৭)

১৮৮৩-র গোড়ার দিকে গিরিশচন্দ্র দলবল নিয়ে ন্যাশনাল ছেড়ে গেলে প্রতাপ জহুরী কেদার চৌধুরীকে ম্যানেজার ক'রে অবশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে থিয়েটার চালাতে লাগলেন। কিন্তু ন্যাশনালের আগের সুনাম আর ফিরলো না। ১৮৮৬-তে স্বত্বাধিকারী ভুবন নিয়োগীর সঙ্গে প্রতাপচাঁদের মামলায় থিয়েটার নিলামে উঠলে ষ্টার সাড়াই হাজার টাকায় কিনে বাড়ী ভেঙে ফেলে।

ন্যাশনালের সেই সব নট-নটীদের নিয়ে সদ্য কেনা বিডন স্ট্রীটে ষ্টারের বাড়ীতে গোপাল শীল তাঁর এমারেল্ড থিয়েটার খুললেন। ম্যানেজার হলেন সেই কেদার চৌধুরী। তখনও কলকাতায় ইলেক্‌ট্রিক্‌ চালু হয় নি। শীলমশায় আলাদা ডাইনামো বসিয়ে থিয়েটার বাড়ীতে আলো আনলেন। আর সেই আলোতে জহরলাল ধর ও শশিভূষণ দের তৈরী জমকালো দৃশ্যপট এবং দামী সাজ-পোষাক ঝলমল করতে লাগলো।

খুব জাঁকজমকের সঙ্গে ১৮৮৭-র ৮ অক্টোবর কেদার চৌধুরীর 'পাণ্ডব নির্বাসন' দিয়ে হল এমারেল্ডের উদ্বোধন। সে রাতে অর্দ্ধেন্দু-শেখর মুস্তফী ধৃতরাষ্ট্র, মহেন্দ্রলাল বসু দুর্যোধন, রাধামাধব কর শকুনি, মতিলাল সুর যুধিষ্ঠির, কিরণশশী (ছোট রানী) ভানুমতী আর বনবিহারিণী (ভুনী) দ্রৌপদী সাজলেন। ইতিমধ্যে ২২ জানুয়ারি বেঙ্গল থিয়েটারে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ওই নামের নাটক অভিনীত হয়ে গেছে। এমারেল্ডের 'পাণ্ডব নির্বাসন' নতুনত্বের অভাবে চললো না। ১৩ নভেম্বর 'আনন্দ কানন অথবা মদনের দিগ্বিজয়' ও 'বিধবা সঙ্কট' নামিয়ে দেখা গেল, ফল সেই

এক— টিকিটঘর ফাঁকা। থিয়েটার জমছে না দেখে গোপাল শীল কুড়ি হাজার টাকা বোনাস ও মাসিক সাড়ে তিনশ টাকা বেতনে পাঁচ বৎসরের চুক্তিতে গিরিশচন্দ্রকে এমারেল্ডের ম্যানেজার হ'তে ডাকলেন। সেই সঙ্গে এও ব'লে পাঠালেন, রাজী না হ'লে তিনি যথেচ্ছ টাকা পয়সা দিয়ে গিরিশের দলের সবাইকে নিজের থিয়েটারে ভাঙিয়ে আনবেন। সহকর্মীদের সাথে শলা-পরামর্শ ক'রে অনেক ভাবনা চিন্তাব পর গোপাল শীলের থিয়েটারে যোগ দিলেন গিরিশচন্দ্র। ১৮ নভেম্বর (মতান্তরে ৩ ডিসেম্বর), ১৮৮৭ থেকে তাঁর নাম এমাবেল্ডের ম্যানেজাব হিসাবে বিজ্ঞাপিত হ'তে রইল। গিরিশচন্দ্র আসামাত্র কেদার চৌধুবী অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও রাধামাধব করকে নিয়ে এমাবেল্ড ছাড়েন। শোনা যায়, যাওয়ার সময় কেদারনাথ ব'লে যান:—"এক শৃঙ্গে দুই সিংহ না করে বসতি।" বোনাসের কুড়ি হাজার টাকা থেকে মাত্র চার হাজার রেখে বাকী টাকা গিরিশচন্দ্র শিষ্যদেব হাতে তুলে দিলেন হাতি-বাগানে ষ্টারের বাড়ী তৈরীব জন্য। পুবো টাকাটাই দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, মেজ ভাই অতুলকৃষ্ণের জেদা-জেদিতে তা আব হয়ে ওঠে নি। কোনো সর্ত নয়, টাকাটা দেওয়ার সময় গিরিশচন্দ্র শিষ্যদের শুধু একটা অনুরোধই করেছেন, তাঁদেব প্রতিষ্ঠানে যেন কোনো ভদ্র সন্তান লাঞ্ছিত না হয়।

গিরিশচন্দ্র এমারেল্ডে এসেই ১৮৮৭-র ২৭ নভেম্বর 'নীলদর্পণ' দিয়ে সুরু ক'রে পরপর 'সীতার বনবাস', 'মৃণালিনী', 'মেঘনাদবধ', 'নবীন তপস্বিনী' প্রভৃতি পুরানো নাটক নামালেন। ২৮ জানুয়ারি, ১৮৮৮ 'অনুসন্ধান' জানালে:—"মরকত রঙ্গভূমি।—স্বর্গীয় মহাত্মা মতিলাল শীলের বংশধর বাবু গোপাললাল শীল মহোদয় এই রঙ্গ-ভূমির স্বত্বাধিকারী। শীলবংশের ঐশ্বর্য্য অতুল; সুতরাং অর্থব্যয় দ্বারা রঙ্গভূমির যতদূর অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইতে পারে, এখানে সে বিষয়ের ত্রুটি হইতেছে না। অর্থে সুদক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রী ও

কার্য্যের পারিপাট্য অবশ্যই লক্ষিত হইতেছে। এমন কি, ব্যয় বাহুল্য দেখিয়া পূর্ব্বে আমরা মনে করিয়াছিলাম, বুঝি বা গোপালবাবু ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ন। কিন্তু এখন আর আমরা সে শঙ্কার কারণ দেখিতেছি না। একদিকে যেরূপ ব্যয়ভূষণ, অন্যদিকে তেমনি অর্থাগম দেখিয়া আমরা ভরসান্বিত হইতেছি। অধিকন্তু নীলদর্পণ, নবীন তপস্বিনী প্রভৃতি স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের পুস্তকের ও নটবর শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষের পুস্তকাদির অভিনয়-শৃঙ্খলা দেখিয়াও আমরা তুষ্ট হইয়াছি।" ১৮৮৮, ৪ ফেব্রুয়ারি 'সুভদ্রা-হরণে'র পর ১৭ মার্চ ইতিপূর্বে ষ্টারের জন্য লেখা গিরিশচন্দ্রের 'পূর্ণচন্দ্র' মঞ্চস্থ হল। মহেন্দ্রলাল বসু, গোলাপ (সুকুমারী দত্ত), মতিলাল সুর, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমণি, বনবিহারিণী (ভুনী) ও কিরণশশী (ছোট রানী) যথাক্রমে শালিবাহন, পূর্ণচন্দ্র, দামোদর, সেবাদাস, জম্বু (চামার), ইচ্ছা, লুনা এবং সুন্দরার ভূমিকায় দেখা দিলেন। 'পূর্ণচন্দ্রে'র সঙ্গীতপরিচালক ছিলেন শশিভূষণ কর্মকার। ধর্মদাস সুর ও শশিভূষণ দের উপর রঙ্গভূমি সজ্জার দায়িত্ব ছিল। অভিনয়ে মতিলাল সুর, ক্ষেত্রমণি আর সুকুমারী প্রশংসা অর্জন করলেন। নাটক সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় গোপাল শীল টাকা পেলেন প্রচুর। এ সময় আট'শ থেকে হাজার টাকা পর্যন্ত দৈনিক টিকিট বিক্রী হয়েছে। টিকিটের হার ছিল তখন যথাক্রমে আট আনা (গ্যালারী), এক টাকা (পিট) এবং দু' টাকা (স্টল)। প্রসঙ্গতঃ, 'রেইজ অ্যাণ্ড রায়ৎ' পত্রিকার সম্পাদক জানালেন ঃ—"এক 'পূর্ণচন্দ্রে' গোপালবাবুর বিশ হাজার টাকার উপর আদায় হইয়াছে।" 'তুলসীলীলা' (২ জুন) অভিনয়ের পর ২১ জুলাই এখানে নামানো হল অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'নন্দ-বিদায়।' অভিনয় করলেন মতিলাল সুব (নন্দ), ভবতারিণী (যশোদা), হরিভূষণ ভট্টাচার্য (কংস), বিষাদ কুসুম (কৃষ্ণ), বিড়াল হরি (রাধিকা) এবং মোহিতমোহন গোস্বামী (অক্রুর)। সঙ্গীতের

গুণে 'নন্দ-বিদায়' বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। এরপর গিরিশচন্দ্রের 'বিষাদ' মঞ্চস্থ হয়। ৬ অক্টোবর এ-নাটকের প্রথম রজনীতে মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, ক্ষেত্রমণি ও গুলফন হরি যথাক্রমে অলর্ক, মাধব, সোহাগী এবং রাজমাতারূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। নাটকের সঙ্গীতশিক্ষা দিয়েছিলেন মোহিতমোহন গোস্বামী ও পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। 'বিষাদ' সাফল্যমণ্ডিত হয়। বিশেষতঃ, মহেন্দ্রলাল বসু এ-নাটকে অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন ঃ—"বিষাদ নাটকে অলর্কের ভূমিকা যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মহেন্দ্রলালের অভিনয়ের যাঁহাবা পক্ষপাতী, তাঁহারাও স্বীকার করেন যে, তৎপূর্ব্বে তাঁহাব এরূপ অদ্ভুত শক্তি তাঁহাদের অনুভূত হয় নাই। এ অভিনয়ে মহেন্দ্রলাল আপনার সমস্ত অভিনয় পরাজয় করিয়াছিলেন।" (রঙ্গালয়—২ চৈত্র, ১৩০৭) ইতিমধ্যে গোপাল শীলকে লুকিয়ে মেয়েমানুষ সেজে গিবিশচন্দ্র সহকর্মীদের জন্য 'নসীরাম' লিখে দিয়ে এসেছেন। 'সেবক' ছদ্মনামে প্রচারিত সেই নাটক দিয়েই ১৮৮৮-র ২৫ মে হাতিবাগানেব ষ্টাবেব সুরু।

বছর দুয়েকের মধ্যে গোপাললালের থিয়েটারেব শখ মিটে যাওয়ায় তিনি থিয়েটার বাড়ী মতিলাল সুর, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, হরিভূষণ ভট্টাচার্য আর ব্রজলাল মিত্রকে লিজ দিয়ে দিলেন। গিরিশচন্দ্রের চুক্তি ছিল গোপাল শীলের সঙ্গে তাই মালিকানা বদল হওয়ায় তিনি এমারেল্ড ছেড়ে চলে গেলেন ষ্টারে। সেখানকার ম্যানেজারের দায়িত্ব তাঁব উপর বর্তালো। গিরিশচন্দ্র বিদায় নেওয়ার পব কেদার চৌধুরী আবার এমাবেল্ডেব ম্যানেজাব হয়ে এসেছিলেন কিন্তু সে যাত্রায় বেশীদিন থাকেন নি। ১৮৮৮-র ৮ ডিসেম্বর বীণায় অভিনীত উপেন্দ্রনাথ দাসের নিম্নরুচির নাটক 'দাদা ও আমি'র উত্তবে ২৫ ডিসেম্বর এমারেল্ড অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'গাধা ও তুমি' (You and Ass অর্থাৎ U. N. Dass) নামিয়েছে। ফলে, অভিনয়ের নামে নোংরামী সুরু হল। এমারেল্ডের অবস্থা তখন ক্রমশঃ অবনতির দিকে।

১৮৮৯ সালের গোড়ার দিকে খোলা হল অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'আনন্দকুমার'। নাটকখানি দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছিল। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'অনুসন্ধান' জানালে :— "এমারেল্ড থিয়েটার। — "আনন্দকুমার" নামক নূতন নাটক উক্ত রঙ্গালয়ে আজকাল বেশ সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইতেছে।... অভিনয় দেখিয়া অনেক স্থলেই মন অভিনয়-ভাবে আকৃষ্ট হয়। আর, অভিনেতা-অভিনেত্রী সম্বন্ধে আনন্দকুমারের প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারের অভিনয়েই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পটুতা দেখা গেল। আর, বামা বৈষ্ণবীর গানগুলিও বেশ মিষ্ট লাগিল। তবে অভিনয়ে দোষের ভাগও যে ছিল না, এমন নহে।.... মোটের উপর অভিনয় সুন্দর হইতেছে। শেষকথা, আনন্দকুমারের অভিনয় দেখিয়া আমাদের সেই হতভাগ্য "নন্দকুমার"কে স্বতঃই মনে পড়ে।" (২৫।২।১৮৮৯) কিন্তু 'আনন্দকুমার' মঞ্চস্থ ক'রে এমারেল্ডের অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি। থিয়েটার বরং আরো অবনতির দিকেই এগোতে লাগলো। গতিক মন্দ দেখে কিছুদিন পরে গোপাল শীল আবার থিয়েটারের হাল ধরলেন। এবার ডিরেক্টর হয়ে এলেন মনোমোহন বসু। কেদার চৌধুরীকে পুনরায় ম্যানেজার করা হল। ইতিমধ্যে মার্চ মাসে অর্দ্ধেন্দুশেখর এখানে যোগ দিয়েছেন। নতুন ব্যবস্থাপনায় ৮ জুন মনোমোহন বসুর 'রাসলীলা নাটক' নামলো। এর অভিনয় যে কেবলমাত্র ব্যর্থ হয়েছিল তাই নয়, এই সময়কার এমারেল্ডের ব্যবস্থাপনার ত্রুটিতে এবং দর্শক-সমালোচকের প্রতি শিল্পীগোষ্ঠীর অভদ্র ব্যবহারে অনেকেই তখন এঁদের উপর বিরূপ হয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ, 'অনুসন্ধান' (১৩।৬।১৮৮৯) লিখেছে :—

এমারেলড-থিয়েটার 'রাসলীলা'

(অকৃতকার্য্যতা ও অত্যাচার)

গত শনিবার উক্ত রঙ্গালয়ে 'রাসলীলা' নামক নূতন নাটকের অভিনয়

হইয়াছিল। হ্যাণ্ডবিল, প্লাকার্ড ও বিজ্ঞাপনাদি দেখিয়া জানিয়াছিলাম, বঙ্গের প্রধান নাটককার মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু মহাশয়ের রচিত নাটক 'রাসলীলা'— তাঁহারই পরিচালকত্বে, বিশেষতঃ, তাহার উপর আবার বহুদর্শী ও বিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত নূতন ম্যানেজার বাবু কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের দ্বারা অভিনীত হইবে। সুতরাং অভিনয় না জানি কতই মনোহব হইবে, সত্য সত্যই এই আশায়, আমরা অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে, সে আশায় আমরা সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়াছি। অধিক কি, বড়ই আনন্দিত হইবার আশায় উপস্থিত হইয়া, ক্রমেই যত দৃশ্য পড়িয়াছে— যতই অঙ্ক আসিয়াছে, ততই ক্ষোভে ও দুঃখে ম্রিয়মান হইয়াছি ; এবং শেষে অভিনয়-দর্শন অসহ্য হওয়ায়, শেষ না দেখিয়াই উঠিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি। .... এই নিদারুণ গ্রীষ্মের সময় দর্শকদিগের জন্য এক একখানি পাখারও বন্দোবস্ত ছিল না। তাহার উপর আবাব অত্যাচার-অবিচাব। অভিনয় অপেক্ষা তাহা আবও বিরক্তিকর। বোধহয়, সে কথা শুনিলে ভদ্রলোক মাত্রেই সহসা রঙ্গালয়ে যাইতে সঙ্কুচিত হইবেন। 'কর্ণধাব'—পত্রিকার সম্পাদক বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় সেই দিন অভিনয় দেখিতে যান। কয়েক দৃশ্য অভিনয় দেখিয়াছেন, এমন সময় থিয়েটাবের একজন অভিনেতা আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। হাবাণবাবুও তদনুযায়ী বাহিরে গেলেন। কিন্তু বাহিরে যাইলে, উক্ত রঙ্গালয়ের অপর আর একজন অভিনেতা হাবাণবাবুর হাত ধরিয়া, তাঁহাকে যথেচ্ছা গালাগাল্লি দিতে লাগিলেন। শুনিলাম, হাবাণবাবু 'নববিভাকর-সাধারণী'তে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকেব অভিনয়-সম্বন্ধে কি সমালোচনা করিয়াছিলেন, এই তাঁহার অপরাধ। ···এ অপেক্ষা রঙ্গালয়ের অধঃপতন, আর কি হইতে পারে? নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া, একজন সম্পাদকের প্রতি এরূপ অত্যাচার কি অল্প ক্ষোভের

কথা ?...” প্রতিবাদ-নিন্দার মধ্যেই ১৩ জুলাই ‘সরোজা’ (রাধারমণ কর) এবং ‘বক্কেশ্বর’ (অতুলকৃষ্ণ মিত্র) নামে দু’টি নতুন নাটকের উদ্বোধন হল। ‘সরোজা’ নাটকের নামভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন সুকুমারী। পরের নাটকে অর্দ্ধেন্দু বক্কেশ্বর সাজতেন। কোনো ব্রাহ্ম পরিবার সম্পর্কে অশোভন মন্তব্য থাকায় কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পর ইংরেজ সরকার আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর আবেদনক্রমে ‘বক্কেশ্বর’ প্রহসনের অভিনয় বন্ধ ক’রে দিলে। এই সময় থিয়েটারের পরিচালন-ব্যবস্থায় দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। দর্শকদের উপর একশ্রেণীর থিয়েটার-কর্মচারীর অশালীন ব্যবহার এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, পত্র-পত্রিকাগুলি এমারেল্ডের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। ব্যাপার শেষ পর্যন্ত এতদূর গড়ালো যে, স্বত্বাধিকারী গোপাল শীল সাময়িকভাবে রঙ্গালয় বন্ধ রাখতে মনস্থ করলেন। ‘অনুসন্ধান’ লিখলে ঃ—

এমারেল্ড থিয়েটারের পরিণাম

আমরা যাহা বলিয়াছিলাম, কার্য্যেও দেখিতেছি, ক্রমে তাহাই গড়াইল। আমাদের আন্দোলন— সমালোচনায় ঝিবা এমারেল্ড থিয়েটার উঠিয়া যায়! এতদিনে বুঝিলাম গোপালবাবু জ্ঞানবান— ক্রীড়া-পুত্তলির ন্যায় লোকের কুহকে তাঁহাকে হাসাইতে-নাচাইতে পারে না। রঙ্গালয়ের দিন দিন অধোগতি দেখিয়া, সুসময়েই তিনি উহা বন্ধ রাখিবেন সঙ্কল্প করিয়া, বড়ই বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছেন। মাননীয় মনোমোহনবাবুর নিকট কেদারনাথের ‘হাম-বড়াই’ ভাব, সাধারণের প্রতি ‘থিয়েটার পার্টি’র অত্যাচার-অবিচার-পতনের এই যে সকল বাড়াবাড়ি— ইহাতেই ‘এমারেল্ডে’র বুঝি এই ঘটিল! যাই হোক, এখনও আমরা কিন্তু উহার মঙ্গলাকাঙ্খী। গোপালবাবুকে যদিও আমরা আর ঐরূপে, কুপোষ্য পুষিয়া, টাকার শ্রাদ্ধ করিতে পরামর্শ দিই না; কিন্তু যদি তিনি এখনও উহা চালাইতে

চাহেন, তাহা হইলে কার্য্য-প্রণালীর পরিবর্ত্তন ও সুবন্দোবস্ত করিয়া, তবে যেন উহাতে হাত দেন, এই মাত্র তাঁহার প্রতি আমাদের পরামর্শ।" (১৫।৯।১৮৮৯) অভিযোগ বিশেষভাবে ম্যানেজার কেদারনাথ চৌধুরীর বিরুদ্ধে। সেই কারণে ও অসুস্থতাহেতু ১৯ অক্টোবর 'কিরণশশী' নাটকের উদ্বোধনের পর তিনি এমারেল্ড ত্যাগ করেন। 'কির৭শশী' সম্পর্কে ৩০ অক্টোবর, ১৮৮৯ তারিখের 'অনুসন্ধান' পত্রিকার মন্তব্য :— "……অভিনয় বড়ই বিরক্তিকর হইয়াছিল। কেবল এক লালজী ও ভৈরবীর গান— ব্যতীত আর কিছুতেই যেন জমজমা হয় নাই— সকলই যেন ফাঁকা! কি যে দেখিয়াছি, তাহার কিছুই যেন হৃদয়ে অঙ্কিত হয় নাই। শুধু আমাদের কথা নহে; সকলেরই ঐ একই কথা।" ১৮৮৯-এর শেষ দুই নাটক অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'গোপী-গোষ্ঠ' (১৩।১২) এবং 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না' (২৫।১২)। প্রথমটিতে হরিভূষণ ভট্টাচার্য, বিষাদ কুসুম, ক্ষেত্রমণি ও গুলফন হবি যথাক্রমে আয়ান, কৃষ্ণ, জটিলা আর কুটিলার অংশ গ্রহণ করেছেন।

১৮৯০ সালের শ্রেষ্ঠ নাটক রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী'। এমারেল্ড থিয়েটারে এ-নাটকের উদ্বোধনের তারিখ ৭ জুন, ১৮৯০। প্রথম অভিনয়রাত্রের ভূমিকালিপি :— বিক্রমদেব-মতিলাল সুর, কুমার সেন-মহেন্দ্রলাল বসু, দেবদত্ত-হরিভূষণ ভট্টাচার্য, শঙ্কর-চুনিলাল মিত্র, সুমিত্রা-গুলফন হরি এবং ইলা-কুসুম (বিষাদ)। 'রাজা ও রানী' সে সময় প্রচণ্ড জন-সংবর্দ্ধনা পেয়েছে। সুঅভিনয়ের গুণে বহুকাল বাদে দর্শকরা আবার ভীড় করতে লাগলো এমারেল্ডের দরজায়। পূর্বের অখ্যাতি যেন দূর হল কিছুটা। কুমার সেনের ভূমিকায় মহেন্দ্রলাল মর্ম্মস্পর্শী অভিনয় করলেন।[১] বিষাদমূলক প্রেমের

১ প্রসঙ্গতঃ, অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন :— "রাজা ও রাণী' পূর্বে—প্রথম অভিনীত হয়েছিল গোপাললাল শীলের 'এমারেল্ডে'।…কুমার সেন এমারেল্ডে করতেন মহেন্দ্রনাথ বসু- মহেন্দ্র মাষ্টার ছিল যাঁর চল্‌তি নাম। অমৃতলাল মিত্রের

অভিব্যক্তিতে সে যুগে তাঁর তুলনা ছিল না। স্বকীয় ভঙ্গীতে অভিনয়ের সুখ্যাতি ক'রে 'অনুসন্ধান' লিখলে :— "থিয়েটারের বাজারে আজকাল 'এমারেল্ড থিয়েটারে' 'রাজা ও রানী' নামক যে নাটকখানি অভিনীত হইতেছে, সেখানি কিন্তু ভাল। একটু আদটু সম্প্রদায়গত গন্ধ থাকিলেও, মোটের উপর এরূপ অভিনয় সচরাচর দেখা যায় না। অভিনয়ের ক্রমেই জমজমা— যত শেষ, ততই হৃদয়-বিদারক। ফলতঃ ইহা দেখিবার সামগ্রী।" (১৫।৯।১৮৯০) সেই সময়কার এমারেল্ডে অভিনীত একটি অসার নাটক 'ষণ্ড' (১।৮) সম্পর্কে ঐ সংখ্যায় পত্রিকাটির অভিমত এই যে :— "......এমারেল্ডের 'ষণ্ড' 'যাচ্ছে-তাই'। ওরূপ কদর্য্য অভিনয় এখনই বন্ধ করা উচিত। ইহাতেই থিয়েটারের অধঃপতন হয়। বিশেষতঃ ইহার নবাবের বিলাস-কক্ষের কদর্য্য দৃশ্য-সম্বন্ধে পুলিশের দৃষ্টি পড়াই কর্ত্তব্য।" বছরের শেষে, ১৩ ডিসেম্বর এখানে 'অনুপমা' মঞ্চস্থ হয়েছে।

১৮৯১-এ এমাবেল্ডে অভিনীত নাটকের তালিকায় আছে :— দীনবন্ধু মিত্রের 'কমলে কামিনী নাটক' অবলম্বনে রচিত 'মণিপুর যুদ্ধ' (২৮।৬), সুরেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'লালা গোলোকচাঁদ' (৩।৯), অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'নিত্যলীলা বা উদ্ধব-সংবাদ' (২৬।৯) প্রভৃতি। 'লালা গোলোকচাঁদে'র নামভূমিকায় ছিলেন মহেন্দ্রলাল বসু। কুসুম (বিষাদ) এ-নাটকে মাতাজী সেজেছেন।

১৮৯২ সালের জানুয়ারি মাসের তিন তারিখে অতুলকৃষ্ণ মিত্র রচিত

জুড়ি ছিলেন ইনি, কৃতী গিরিশ-শিষ্য। এঁকে বলা হ'ত 'ট্রাজেডিয়ান অব বেঙ্গল'। অতি সুন্দর ছিল গলা। অমৃতবাবুর গলাও ছিল সুন্দর, কিন্তু একটু সুরেলা। মহেন্দ্রবাবুর গলা একটু গম্ভীর, সুর-বর্জিত, মানিয়ে যেত কুমার সেনে অদ্ভুত ভাবে। তাঁর—"ইলা-ইলা-ফিরে গেনু দুয়ারে আসিয়া।" —যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা বলতেন, আজও যেন তা কানে বাজে।" (নিজেরে হারায়ে খুঁজি—প্রথম পর্ব)

'বিধবা কলেজ চাবুক' অভিনীত হওয়ার পর নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ স্বয়ং এমারেল্ডের ম্যানেজারপদে অধিষ্ঠিত হলেন। ১১ এপ্রিল, ১৮৯২ 'অনুসন্ধান' জানালে ঃ—"এমারেল্ড থিয়েটার।— এই রঙ্গালয়ের নূতন ম্যানেজার অতুলবাবু আবার ইহার পূর্ব্ব-প্রতিপত্তি-স্থাপনের জন্য যত্ন পাইতেছেন। ইতিমধ্যে ইঁহার অমায়িক ব্যবহারে আমাদের প্রতিনিধি মহাশয় বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকন্তু, সে দিনের অভিনয়-পারিপাট্য দেখিয়াও তিনি তুষ্ট হইয়াছেন। আনন্দের কথা।" অতুলকৃষ্ণ মিত্র দায়িত্ব নেওয়ার পর এমারেল্ডে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' (২৩।৭), 'মৃণালিনী' (১০।৮), 'কপালকুণ্ডলা' (সেপ্টেম্বর), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৭।১২) প্রভৃতি খুব সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছে। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন অতুলকৃষ্ণ মিত্র নিজে।[২] এসব নাটকের অভিনয়ে এমারেল্ড তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করলে। আবার যেন দর্শকদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠলো এই থিয়েটার। এ সময় 'অনুসন্ধান' লিখেছে ঃ—"...এই নাট্যশালা সম্বন্ধে মধ্যে লোকেব যেরূপ ধারণা হইয়া আসিয়াছিল— বাস্তবিকও কোন কোন বিষয়ে এখানে যেরূপ শৃঙ্খলার অভাব দৃষ্ট হইত, সুখের বিষয়, সেদিনের 'বিষবৃক্ষে'র অভিনয় দেখিয়া আমাদের সে ধারণা অপনীত হইল।... গত ৯ই শ্রাবণ শনিবারে আমরা উহা দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিনয়টি বস্তুতঃ সেদিন প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল।..." (২৯।৭।১৮৯২) "...২৭-এ শ্রাবণ বুধবারে এখানে বঙ্কিমচন্দ্র বাবুব স্বনামখ্যাত 'মৃণালিনী' অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয়ে দর্শকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। ..." (১৫।৮।১৮৯২) "... 'কপালকুণ্ডলা' পুস্তকের অভিনয়ের মত

---

২ "স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্র এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চের জন্য যে তিনখানি উপন্যাস —"কপালকুণ্ডলা," "কৃষ্ণকান্তের উইল" ও "বিষবৃক্ষ" নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেন, ...। অতুলবাবুর "কপালকুণ্ডলা"র মধ্যেও আবার অনেক স্থলেই গিরিশচন্দ্রের লেখা মিশিয়া গিয়াছে।" (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

অভিনয় 'এমারেল্ড থিয়েটারে' অনেক দিন দেখা যায় নাই।...”
(১৪।১।১৮৯২) 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পূর্ণচন্দ্র ঘোষ কৃষ্ণকান্ত, মহেন্দ্রলাল বসু গোবিন্দলাল, মতিলাল সুর হরলাল, সুকুমারী দত্ত রোহিণী, হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী) ভ্রমর ও শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্রহ্মানন্দ সেজেছিলেন।

১৮৯৩-এর প্রথম দিকে অভিনীত হল 'ষোল কড়াই কাণা' এবং 'রাজা বসন্ত রায়'। দু'খানি নাটকই প্রশংসা পেয়েছে। সমালোচনা প্রসঙ্গে ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩ তারিখের 'অনুসন্ধান' জানালে:— “এমারেলড্ থিয়েটার।—আজকাল এই রঙ্গভূমিতে “ষোল কড়াই কাণা” নামক যে প্রহসনের অভিনয় চলিতেছে, তাহা বিলক্ষণ কৌতুকপ্রদ।... অভিনয়টীও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতেছে। এমারেল্ডে যে অনেকগুলি সুদক্ষ অভিনেতা আছেন, এই অভিনয়ে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মধ্যে একবার এই রঙ্গালয়ে “রাজা বসন্ত রায়” অভিনয় দেখিয়াও প্রীত হইয়াছি। বসন্ত রায়ের সঙ্গীত-শক্তি ও অভিনয়-পারিপাট্য নৈপুণ্য অবলোকনে আমরা... হৃষ্টচিত্ত হইয়াছি। তাঁহার মত পরিপক্ক অভিনেতা সুবিরল।” ২৬ জুলাই এখানে মঞ্চস্থ হয়েছে 'সধবার একাদশী'। এ-নাটকে মহেন্দ্রলাল বসুর অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে 'অনুসন্ধান' (৩০।৭।১৮৯৩) বললে:— “... নিমচাঁদ এ প্রহসনের 'জান'। সেই পুরাতন পাকা অভিনেতা মহেন্দ্রবাবু স্বয়ং এই নিমচাঁদের অংশ অতি দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রবাবু নিমচাঁদের জীবন্ত ছবি দর্শকমণ্ডলীর চক্ষের সম্মুখে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন। নিমচাঁদের অভিনয়ে এরূপ দক্ষতা আমরা এ পর্য্যন্ত অতি অল্পই দেখিয়াছি। ...” এই চরিত্রের রূপারোপে গিরিশচন্দ্রের বিশেষ সুনাম ছিল কিন্তু তুলনা-মূলক অভিনয়ে মহেন্দ্রলাল নিজ বৈশিষ্ট্যে গুরুর পাশে স্থান ক'রে নিলেন। এই বছরের সেপ্টেম্বরে মহেন্দ্রলাল বসুকে এমারেল্ডের কর্তৃত্বপদে দেখা গেল। ওঁর নেতৃত্বে ৭ অক্টোবর এমারেল্ড সাড়ম্বরে

রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবীকঙ্কণ' উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেছে। প্রশস্তিমূলক সমালোচনায় লিখলে 'অনুসন্ধান':— "এমারেল্ড থিয়েটার।—মধ্যে মধ্যে ধীরে ধীরে, দুই-একখানি নব নাটকের অভিনয় করিয়া, ইঁহারা আপনাদের যশোরাশি অপ্রতিহত রাখিতেছেন। এমন কি, সময় সময় মনে হয়— প্রকৃত নাটক দুই-একখানি এখনও এমারেল্ডে অভিনীত হয়। এই এক 'মাধবী-কঙ্কণে'র কথা তুলিলেও, তাই-ই বলা যায়। নাটকোচিত বিষয়-নির্ব্বাচন এবং তাহাকে নাট্যাকারে পরিবর্ত্তন—এতদুভয়বিষয়েই ইঁহাদের অধ্যক্ষ-সম্প্রদায় অকৃতকার্য্য নহেন; তদুচিত অভিনয়-শৃঙ্খলায়ও ইঁহারা পশ্চাদপদ্ হন নাই। তবে কেমন যে লোকের সঙ-নাচ দেখার একটা একঘেয়ে প্রবৃত্তি, কেমন যে ইঁহাদের বদ-পড়্তা, তাই ফলোদয় কিছুই হয় না! ইহা বাস্তবিকই ক্ষোভের বিষয়।" (২৯৷১১৷১৮৯৩)

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্রলাল সুবিধা করতে পারলেন না। ১৮৯৪-এর ফেব্রুয়ারিতে উনি এমারেল্ড ছেড়ে রয়েল বেঙ্গলে যোগ দিলেন। সঙ্গে নিলেন কয়েকজন নট-নটীসহ সুকুমারী দত্তকে। ওঁরা যাওয়ার পর ২২ সেপ্টেম্বর এখানে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'মা' অভিনীত হয়।

ইতিমধ্যে ১৮৯৩ সালের ২৮ জানুয়ারি মিনার্ভা থিয়েটারের উদ্বোধন হয়ে গেছে। অর্দ্ধেন্দুশেখর তখন সেখানে। বরুণচাঁদ (মুকুল-মুঞ্জরা),[৩] আবু হোসেন (আবু হোসেন),[৪] বিদূষক (জনা)[৫] প্রভৃতি ভূমিকার অভিনয়ে তাঁর তখন দেশজোড়া খ্যাতি। আত্মভোলা, নির্ব্বিবাদী শিল্পীমানুষটির কি দুর্মতি হল, মতলব করলেন থিয়েটারের মালিক হবেন। গিরিশচন্দ্র এবং আরো অনেকে কত বোঝালেন কিন্তু অর্দ্ধেন্দু অনড়। শুভানুধ্যায়ীদের মানা না শুনে বিদূষকের

৩ ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩ মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত।

৪ ২৫ মার্চ, ১৮৯৩ মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত।

৫ ২৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৩ মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত।

ভূমিকায় বেশ কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পর তিনি মিনার্ভা ছেড়ে এমারেল্ড লিজ নিলেন। ওঁর আমলে বেশ আড়ম্বরসহকারেই সাফল্যের সঙ্গে পুরানো নাটক 'রাজা বসন্ত রায়' মঞ্চস্থ হয়েছে। ২ জানুয়ারি, ১৮৯৫ তারিখে অভিনীত এ-নাটকের অভিনয়ের প্রশংসা-জড়িত এক সমালোচনায় 'অনুসন্ধান' লিখলে ঃ— "বহুল পরিবর্ত্তন-পরিশোধনের পর, 'এমারেল্ড থিয়েটার' এবার কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। স্বনাম প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তৌফি এবার স্বয়ং উক্ত রঙ্গভূমি-পরিচালনার ভার লইয়াছেন। দেখিয়া সুখী হইলাম, এবার যেন এমারেল্ডের সম্পূর্ণ সংস্কার হইয়াছে। গত বুধবার আমরা এই রঙ্গালয়ে 'রাজা বসন্ত রায়' নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। বুধবারের অভিনয়, প্রধানতঃ কোন রঙ্গালয়েই ততদূর সন্তোষপ্রদ হয় না। কিন্তু আমরা দেখিয়া আশাতীত আনন্দিত হইলাম যে, সেই বহুবার দেখা পুরাতন পুস্তকের অভিনয় — এই বুধবারের অভিনয়ের দিনেও— আমাদের নিকট অভিনব বলিয়া বোধ হইয়াছিল। অভিনয়ে আরও একটি অভিনব বিষয় দেখিলাম। মুস্তৌফি মহাশয়কে আমরা এতদিন হাস্যরসের অবতার বলিয়াই জানিতাম; কিন্তু সেদিন, প্রতাপাদিত্যে অংশাভিনয়ে তাঁহার বীর-রৌদ্ররসের চূড়ান্ত অভিনয় দেখিয়া, তাঁহাকে সর্ব্বরসের অবতার বলিয়া ধারণা হইল। তদ্ভিন্ন, রাজা বসন্ত রায়-অতুলনীয়; উদয়াদিত্য, মোহন প্রভৃতিও প্রশংসনীয়।..." (১০।১।১৮৯৫) ৩১ আগস্ট খোলা হল ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রথম নাটক 'ফুল-শয্যা'। অর্দ্ধেন্দুশেখর ছিলেন অসাধারণ অভিনেতা ও পরিচালক কিন্তু থিয়েটার চালানোর মত বাস্তব এবং কূটবুদ্ধি তাঁর ছিল না। ফলে, আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেও উনি এমারেল্ডকে দাঁড় করাতে পারলেন না বরং ঋণগ্রস্তই হয়ে পড়লেন। থিয়েটার ব্যবসায় নেমে দেনার দায়ে তাঁকে অবশেষে বসতবাড়ী পর্যন্ত বিক্রী করতে হল।[৬] এই বছরেই

৬ অর্দ্ধেন্দুশেখরের এমারেল্ড থিয়েটার লিজ নেওয়ার ব্যাপারে

অর্দ্ধেন্দুশেখর এমারেল্ডের কর্তৃত্ব ছেড়ে জনৈক অবাঙ্গালীর মালিকানায় ওখানেই অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। নতুন ব্যবস্থাপনায় 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতি অভিনয়ের পর ১৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৫ রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা' মঞ্চস্থ হল। এমারেল্ডের এই পরিবর্তনের সংবাদ দিয়ে 'অনুসন্ধান' (৩০।১১।১৮৯৫) জানালেঃ— "এমারেল্ড থিয়েটার। — একজন হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী এমারেল্ডের নাকি কর্তৃত্ব লইয়াছেন। নূতন বন্দোবস্তে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী মহাশয় এক্ষণেও উক্ত রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ বটে! রঙ্গক্ষেত্রে তিনি একজন প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি; তাঁহার সহযোগীগণও অনেকেই আছেন। 'কপালকুণ্ডলা' ও 'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতির পর এক্ষণে তাঁহারা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্রের "বঙ্গবিজেতা" নাটকের অভিনয়ের উদ্যোগ করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের সফলতা কামনা করি।"

এমারেল্ডের শেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয় এই 'বঙ্গবিজেতা'। অতঃপর এমারেল্ড থিয়েটার উঠে যায়। ১৮৯৬-এর শেষের দিকে নীলমাধব চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সিটি সম্প্রদায় মঞ্চ ভাড়া নিয়ে কিছুকাল এখানে অভিনয় চালায়। ৭ নভেম্বর এঁরা মঞ্চস্থ করেন 'মাধবী' এবং 'বেহদ্দ বেহায়া'। পরদিন 'তরুবালা' ও 'হীরার ফুল' অভিনীত হয়। ধর্মদাস সুর এই দলের মঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন। এঁরাও বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি, যদিও ওঁদের 'দেবী চৌধুরাণী' (২৭।২।১৮৯৭) সে সময় বিশেষ প্রশংসা পেয়েছিল। ইংরেজী ১৮৯৭ সালের এপ্রিল মাসের প্রথমার্দ্ধে (১৩০৩ সনের চৈত্রের শেষে) সিটি সম্প্রদায়ের অভিনয় বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে এমারেল্ড থিয়েটারের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়— জন্ম নেয় 'ক্লাসিক থিয়েটার'।

গিরিশচন্দ্রের বক্তব্য থেকে উপরোক্ত অংশটুকু সঙ্কলিত হয়েছে। অর্দ্ধেন্দুশেখরের মৃত্যুর পর ৩ আশ্বিন, ১৩১৫ মিনার্ভা থিয়েটারে অনুষ্ঠিত শোকসভায় গিরিশচন্দ্র এই জাতীয় মন্তব্য করেন। বক্তৃতাটি পরে 'বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

পরিশিষ্ট

ক. অভিনয়-তালিকা

পাণ্ডব নির্বাসন	কেদারনাথ চৌধুরী	৮।১০।১৮৮৭
আনন্দ কানন অথবা মদনের দিগ্বিজয়	লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী	১৩।১১।১৮৮৭
বিধবা সঙ্কট	—	„
নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	২৭।১১।১৮৮৭
সুভদ্রাহরণ	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (?)	৪।২।১৮৮৮
পূর্ণচন্দ্র	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৭।৩।১৮৮৮
তুং।নীল। ।।	—	২।৬।১৮৮৮
নন্দ-বিদায়	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	২১।৭।১৮৮৮
বিষাদ	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৬।১০।১৮৮৮
গাধা ও তুমি	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	২৫।১২।১৮৮৮
আনন্দকুমার	„	১৮৮৯-এর গোড়ায়
রাসলীলা নাটক	মনোমোহন বসু	৮।৬।১৮৮৯
সরোজা	রাধারমণ কর	১৩।৭।১৮৮৯
বক্কেশ্বর	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	„
কিরণশশী	—	১৯।১০।১৮৮৯
গোপী-গোষ্ঠ	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	১৩।১২।১৮৮৯
ভাগের মা গঙ্গা পায় না	„	২৫।১২।১৮৮৯
রাজা ও রানী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭।৬।১৮৯০
ষণ্ড	—	১।৮।১৮৯০
অনুপমা	—	১৩।১২।১৮৯০
মণিপুর যুদ্ধ	দীনবন্ধু মিত্রের 'কমলে কামিনী' অবলম্বনে র। ত	২৮।৬।১৮৯১
লালা গোলোকচাঁদ	সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু	৩।৯।১৮৯১
নিত্যলীলা বা উদ্ধব-সংবাদ	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	২৬।৯।১৮৯১
বিধবা কলেজ চাবুক	„	৩।১।১৮৯২

বিষবৃক্ষ	নাট্যরূপ-অতুলকৃষ্ণ মিত্র	২৩।৭।১৮৯২
মৃণালিনী	”	১০।৮।১৮৯২
কপালকুণ্ডলা	”	সেপ্টেম্বর, ১৮৯২
কৃষ্ণকান্তের উইল	”	১৭।১২।১৮৯২
ষোল কড়াই কাণা	—	১৮৯৩-এর গোড়ায়
রাজা বসন্ত রায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বৌ-ঠাকুরাণীর হাট’ উপন্যাস অবলম্বনে কেদারনাথ চৌধুরী কৃত নাটক	”
সধবার একাদশী	দীনবন্ধু মিত্র	২৬।৭।১৮৯৩
মাধবীকঙ্কণ	কাহিনী-রমেশচন্দ্র দত্ত নাট্যরূপ-গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৭।১০।১৮৯৩
মা	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	২২।৯।১৮৯৪
রাজা বসন্ত রায়		২।১।১৮৯৫
ফুল-শয্যা	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	৩১।৮।১৮৯৫
বঙ্গবিজেতা	রমেশচন্দ্র দত্ত	১৪।১২।১৮৯৫

খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায়

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, মহেন্দ্রলাল বসু, রাধামাধব কর, মতিলাল সুর, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মোহিতমোহন গোস্বামী, চুনিলাল মিত্র, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, কিরণশশী (ছোট রানী), বনবিহারিণী (ভুনী), সুকুমারী দত্ত (গোলাপ), ক্ষেত্রমণি, ভবতারিণী, কুসুম (বিষাদ), হরি (বিড়াল), হরি (গুলফন) প্রভৃতি।

ক্লাসিক থিয়েটার
(১৮৯৭-১৯০৬)

এমারেল্ড থিয়েটার উঠে গেল।

অর্দ্ধেন্দুশেখরের পর বেনারসী দাস নামে জনৈক মাড়ওয়ারী থিয়েটার বাড়ী ভাড়া নিয়ে কিছুদিন অভিনয় চালিয়েছিলেন। তারপর নীলমাধব চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সিটি থিয়েটার মঞ্চটি লিজ নেয়। এঁরা এমারেল্ডে প্রায় দশমাস অভিনয় করেছিলেন। সিটি বিদায় নেওয়ার পর এখানে ক্লাসিক থিয়েটারের জন্ম হয়। ক্লাসিকের প্রতিষ্ঠাতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। অমরেন্দ্রনাথ মানেই ক্লাসিক থিয়েটার।

১৮৭৬, ১ এপ্রিল কলকাতার বিখ্যাত দত্ত বংশে অমরেন্দ্রনাথের জন্ম। ইনি রেলি ব্রাদার্সের মুৎসুদ্দি দ্বারকানাথ দত্তের তৃতীয় পুত্র। অমরেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত দার্শনিকরূপে প্রসিদ্ধ। হীরেন্দ্র-তনয় কবি সুধীন্দ্রনাথের নাম বিদগ্ধমহলে অজানা নয়। অমরেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ও সুধীন্দ্র-অনুজ লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্য-গবেষক হরীন্দ্রনাথ দত্ত আজও জীবিত আছেন।

বাল্যকাল হ'তে অভিনয়ে অমরেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় অনুরাগ লক্ষিত হয়। বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম ক'রে অসীম উৎসাহ আর অধ্যবসায়ের দ্বারা তরুণ বয়সেই তিনি ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। নানা কারণে ক্লাসিক ও অমরেন্দ্রনাথ বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা কারণগুলি বিবৃত করার প্রয়াস পাবো।

অবদান

"১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় পঁচিশ বৎসর বাঙ্গলা দেশের থিয়েটার, যাঁহাদের লইয়া প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়—

তাঁহাদের দ্বারাই নানা রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছিল। এক ন্যাশানাল ও গ্রেট ন্যাশানালের দল ভাঙ্গিয়াই—ষ্টার, এমারেল্ড, সিটি, মিনার্ভা—জন্মগ্রহণ করে। বেঙ্গল থিয়েটারের কথা স্বতন্ত্র; তাঁহাদেব পুবাতন চা'ল মৃত্যুব পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত বদলায় নাই। এ সকল দল ভাঙ্গাভাঙ্গির কথা আমি পরে বলিব। আমার উপস্থিত বক্তব্য এই, পঁচিশ বৎসর ধরিয়া থিয়েটারের দর্শকবৃন্দ—সকল নাট্যশালাতেই সেই একই পুরাতন পরিচিত মুখ দেখিয়া আসিতেছিলেন; নাটক বদলাইতেছিল, কিন্তু নায়ক সেই স্বর্গীয় অমৃতলাল, না হয় স্বর্গীয় মহেন্দ্র বসু। গিরিশচন্দ্র মাঝে মাঝে সাজিতেন বটে, কিন্তু এই পঁচিশ বৎসবের শেষাশেষি কয়েক বৎসর তিনি সাজা একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইদানীং প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধের চরিত্র ভিন্ন তাঁহাকে মানাইতও না। এমাবেল্ড কি ষ্টারে কোন নূতন নাটক বিজ্ঞাপিত হইলেই, লোকে পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিত—নায়ক সাজিবেন, হয় মহেন্দ্রলাল, না হয় অমৃতলাল মিত্র। সিটি এবং মিনার্ভায় স্বর্গীয় প্রবোধচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) এবং শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব 'হিবো' সাজিতে সুরু করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও পুবাতন দলের সংসৃষ্ট ও পুবাতন দলের মধ্য হইতেই আত্মপ্রকাশ করেন বলিয়া—দর্শক কর্ত্তৃক ঠিক নূতন বলিয়া গৃহীত হয়েন নাই। এই সকল কাবণে এবং বাহির হইতে নূতন কোন ক্ষমতাপন্ন অভিনেতাকে মাথা তুলিতে না দেখিয়া সাধারণ দর্শক একপ্রকার ঠিক করিয়াই লইয়াছিলেন যে, থিয়েটার জিনিষটা যেন একটা বিশেষ দলেরই একচেটিয়া ব্যবসা; বাহির হইতে ইহার দুর্ভেদ্য ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। এদিকে অমৃতলাল ও মহেন্দ্রলাল— দিন দিন পুবাতন হইয়া আসিতেছিলেন। বয়সতো কাহারও হাতধরা নয়? নবীন নায়কের ভূমিকায় ইঁহারা ঠিক আর খাপ খাইতেছিলেন না। সাধারণ দর্শক অপেক্ষা করিতেছিল 'নূতনের' জন্য। ঠিক এই সময়েই অমরবাবু থিয়েটার

খুলিলেন।" (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) নতুনত্বের প্রত্যাশায় উন্মুখ রসগ্রাহী দর্শক অমরেন্দ্রনাথের মধ্যে প্রার্থিত ফললাভ করেছিল সন্দেহ নেই। আদর্শ নটোচিত অনিন্দ্য-সুন্দর দেহকান্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে তাঁর ছিল দর্শকচিত্ত আচ্ছন্নকারী অভিনয়শক্তি, যা তিনি নিরলস অধ্যবসায়ের দ্বারা অর্জন করেছিলেন।

"অধিকাংশ বাঙালীই স্বভাব-অভিনেতা ; এবং এই জাতিগত উত্তরাধিকার ছাড়াও অমরেন্দ্রনাথ ছিলেন কান্তিমান ; তাঁর মুখশ্রী ছিল সুন্দর, এবং কালো চুল ও গুম্ফরাজির প্রতি তুলনায় তাঁর পাকা ধানের মতো গায়ের রঙ আরো উজ্জ্বল দেখাত। কিন্তু তাঁর আয়ত দৃষ্টি, ব্যঞ্জনাময় ভঙ্গিমা, আর সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বর— তাঁর অঙ্গের সেই সূক্ষ্মতম অর্থ বিকিরণের ক্ষমতা--বহু বর্ষের সাধনার ফলেই তাঁর আয়ত্বে এসেছিল।" (কবিতা/আশ্বিন— পৌষ, ১৩৬৭/সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আত্মজীবনীর বঙ্গানুবাদ) অমরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ, আবির্ভাব মাত্র তিনি দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করতে পারতেন। রসিকচিত্ত আবিষ্টকারী এই দুর্লভ ক্ষমতা ছিল সমকালীন অধিকাংশ অভিনেতারই অনায়ত্ত। গিরিশচন্দ্রকে গুরুর স্বীকৃতি দিলেও প্রকৃতপক্ষে "অমরবাবু শিষ্য হয়ে কোনো গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা-লাভ করেন নি, ওঁর নিজের ধারণা, পড়াশুনা আর ইংরেজী নাটক দেখার ফলস্বরূপ নিজের মনোমত নিজস্ব একটি ধারণা সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন।" (নিজেরে হারায়ে খুঁজি, প্রথম পর্ব— অহীন্দ্র চৌধুরী) অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ ক'রে কলারসিক ধূর্জটী-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় হরীন্দ্রনাথ দত্তকে এক পত্রে লিখেছেন :— "আমি যুবাবয়সে অমরবাবুর এক প্রকার অন্ধ ভক্ত ছিলাম। যেটা আমাকে মোহিত করত সেটা তাঁর Personality— ষ্টেজে নামলেই গম্ গম্ করত। তাছাড়া কণ্ঠস্বর ও আবৃত্তির ভঙ্গী ছিল অনবদ্য। বোধহয়, অমৃত মিত্রের কণ্ঠ বেশী সুমিষ্ট ছিল, কিন্তু অতটা উদাত্ত

ছিল না। সেই কণ্ঠের flow ছিল ভরা গঙ্গার মতন। যাকে জোয়ারী বলে তা ত' ছিলই, আরো ছিল গমক, মীড়। অর্থাৎ ধ্রুপদী recitation। অঙ্গভঙ্গী ছিল ঐ ধরণের, অর্থাৎ dignified—কেবল মুখের মাংসপেশী চালু ছিল না। Serio-Comic part-এ যেমন 'অঘোরে' তিনি ছিলেন অতুলনীয়। যতগুলি নাম করেছ তার প্রায় সবই দেখেছি। এক রাত্রে তাঁর প্রদত্ত ছাতা নিয়ে বাড়ি ফিরি, মনে পড়ে। He was a genius— এই কথাটাই সত্যি। কি জানি কেন, কেবলই Byron-এর সঙ্গে তাঁর চরিত্রের তুলনা করতে ইচ্ছা হয়। এমন vitality খুব কম লোকের মধ্যে আছে।…" ১

সমসাময়িক ও পরবর্তীযুগের কৃতী অভিনয়শিল্পীদের সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়ধারার পার্থক্য ধূর্জটীপ্রসাদের অন্য এক রচনায় অনুপম ভঙ্গীতে বিবৃত হয়েছে। ধূর্জটীপ্রসাদ স্বয়ং একজন নাট্যবোদ্ধা এবং বাংলা থিয়েটারের একাধিক যুগের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। স্বভাবতই তাঁর অভিমত প্রামাণিকতার দাবী রাখে। মূল্যবান বিধায় তাঁর সেই দীর্ঘায়ত বক্তব্যের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল :— "…অমৃত মিত্রের কণ্ঠস্বরে বেগ ছিল বেশী, অমর দত্তের ছিল জোয়ারী। অমৃত মিত্রের আবৃত্তি যেন অবিরাম শ্রাবণ-ধারা, অমর দত্তের যেন শরতের প্লাবন। অর্থাৎ অমরবাবু আবৃত্তির বাহিকতা ভাঙ্গতেন গমক ও বিরামের সাহায্যে। রবীন্দ্রনাথের সুর বাঁশির মতন, তাঁর অভিনয় আবৃত্তি-প্রধান, এবং সে আবৃত্তি নানা কারণে লিরিকধর্মী, অর্থাৎ সুর-ঘেঁষা বেশী। বাঁশীর আওয়াজের

১ অমরেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে ধূর্জটীপ্রসাদ অন্যত্র লিখেছেন :— "অমর দত্তের কণ্ঠ ছিল আরো গম্ভীর, তিনি উচ্চারণে গমক দিতেন। তাঁর বহু অভিনয় দেখেছি, কিন্তু যখনই রঙ্গমঞ্চে নামতেন, তখনই মনে হতো যে তিনি সৌখীন অভিনেতা। অথচ রঙ্গমঞ্চের জন্য তিনি জীবনপাত করলেন। তাঁর প্রতিভা স্থিত হতে পারে নি।…" (মনে এলো)

ডিমেন্‌সন্‌ যেন দুটি, তারের যেন তিনটি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরের রেঞ্জ অত্যন্ত বেশী হওয়ার দরুণ ক্ষতিপূরণ হত সহজে। অন্যদিকে গিরীশবাবু, দানিবাবুর অভিনয় দেহ ও মুখভঙ্গীর ওপর বেশী নির্ভর করত। গিরীশবাবুর স্বর বজ্রগম্ভীর, এর উচ্চারণ পদ্ধতি যেন গৈরিশ ছন্দেই ঢালা (সেটা কতটা হাঁপানির জন্য বলা যায় না)। দানিবাবুর আওয়াজ গম্ভীর, কিন্তু উচ্চারণ নিতান্ত অস্পষ্ট ছিল। সেই জন্য অভিনয়টাই তাঁর মূলধন হয়ে উঠত, এবং সেটা তিনি খুব উঁচু হারেই খাটাতেন। আবৃত্তিতে অমরবাবুর বিশ্বাস ছিল অসীম, তাই স্থির শান্ত ভঙ্গিমা ও ধীর সঞ্চারণই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট হত। অর্দ্ধেন্দুবাবুর অভিনয় যা দেখেছি তাতে আবৃত্তি বেশী ছিল না, তাই বোধহয় আমার মনে গোটা কয়েক মূর্ত্তিই সাজানো আছে। সেটা কি তাঁর প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক ভঙ্গী সূক্ষ্মতম ভাব পরিবর্ত্তনের আদেশবাহী ছিল বলেই? যদি তাই হয় তবে তিনিই ছিলেন আমাদের 'শুদ্ধ' অভিনেতা, এবং তাঁর অভিনয় নৃত্যাঙ্গের। সে যাইহোক, শিশিরবাবুর অভিনয় বিচার করলে মনে হয় যে তাতে পূর্ব্বোক্ত ধারা কয়টি মিশেছে, তাই তাঁর আবেদন সমৃদ্ধতর। মেশবার ফলে ধারাগুলিও বদলেছে। আবৃত্তি তাঁর সংযত, অথচ এমন সংযত নয় যে সেটি গদ্য-ছন্দ হ''' ওঠে। অনেকটা যেন পূরবী ও পুনশ্চ-এর পার্থক্য। তাঁর কাটা-কাটা আবৃত্তিতে দুটি জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে। ঘনতা, অর্থাৎ অবান্তর ও নিরর্থককে পরিত্যাগ, যেমন সুরের সাহায্য তিনি নেন না; এবং স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সুষ্ঠু ব্যবহার, যার ফলে অর্থই যে কেবল স্পষ্টতর ও গভীরতর হয় তা নয়, সুর অন্তর্মুখী ও ব্যাপক হয়, বাক্যের টেক্‌শ্চার খাপী হয়। আমি যা বলছি তার উপমা বীণায় (দক্ষিণী ঢঙে) ও বিদেশী সঙ্গীতে এবং সাহি''ত্য sprung rhythm-এ পাওয়া যাবে। আবৃত্তির অভিনবত্বের সঙ্গে মিশে থাকে শিশিরবাবুর অভিনয় দক্ষতা। শিশিরবাবুর চেহারা ও মুখের মাংসপেশী তাঁকে

গিরীশবাবুর অভিনয়ের দিকে টেনে আনে। কিন্তু নানা কারণে, প্রধানত একপ্রকার বিদগ্ধজনসুলভ পরিচ্ছন্নতার ও শুদ্ধতার জন্য তাঁর মানসিক আত্মীয়তা অর্দ্ধেন্দুবাবুর সঙ্গে। সবার ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। আমি পুনশ্চের ছন্দের উল্লেখ করেছি, তা ছাড়া শিশিরবাবুর হাতের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের দান। হাত নিয়ে আমরা কেন বড় অভিনেতারাও মুস্কিলে পড়েন। এই ধরণের দোটানার নিষ্পত্তি করেন শিশিরবাবু দুটি উপায়ে। প্রথম, চোখ ও ঠোঁটের দ্বারা। তাঁর চোখ ও ঠোঁটের গড়ন এমন যে তাতে একত্রে বিপরীত ভাব এবং সূক্ষ্ম অস্পষ্ট fugitive ভাব সহজে খোলে, যে জন্য শ্লেষ বিদ্রূপ প্রভৃতিতে তাঁর সমকক্ষ আমাদের রঙ্গমঞ্চে কেউ নেই। আমি ছিবলে ঠাট্টা বলছি না, Satire বলছি। দ্বিতীয় উপায়, movement; তাঁর প্রবেশ, সঞ্চারণ ও প্রস্থান নাটুকে নয়, কেবল উপযোগী। আবৃত্তির সময় তাঁর অবয়ব-সঞ্চালন লক্ষ্য করা দর্শকের চরম আনন্দ, বিশেষত হাত ও চিবুক।

এই পরিপ্রেক্ষিতে অমর দত্তের অভিনয় বিচার করতে চাই। ফলে দেখি অমরবাবুর অভিনয় আবৃত্তি-প্রধান ছিল। তাঁর অঘোরের অভিনয় আমি একাধিকবার দেখেছি। অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাতেন সেখানে। তবু, সেখানেও, তাঁর মুখের মাংসপেশীতে আলোছায়ার খেলা থাকত না, কেবল Mood-এর ছায়াপাত হত। অর্থাৎ প্রাণশক্তির হ্রাসবৃদ্ধিই, তার দিক পরিবর্ত্তনই থাকত। অন্যদিকে হরিরাজ, প্রতাপে তাঁর গাম্ভীর্য্যের প্রকাশ পেতাম।" (পরিচয়—বৈশাখ, ১৩৪৯)

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ঠিক পঁচিশ বৎসর পরে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অমরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব। বঙ্গীয় নাট্যশালায় তখন গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র এবং মহেন্দ্রলাল বসুর অবিসংবাদিত প্রাধান্য। এই সব লব্ধপ্রতিষ্ঠ নট ও নাট্যশালার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সেদিনকার নবাগত তরুণ অভিনেতা যে সাহসিকতা আর শক্তিমত্তার

পরিচয় দিয়েছিলেন তা, নিঃসন্দেহে পৌনঃপুনিক উল্লেখের দাবী রাখে। অফুরন্ত মনোবল আর কর্মশক্তির প্রতীক ছিলেন তিনি, যাঁর কাছে সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতার মাথা নত হত। পরাজয়ে তিনি অনভ্যস্ত ছিলেন, আত্মবিশ্বাসে ছিলেন সদা অটল। বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম সংস্কারকের গৌরব অমরেন্দ্রনাথই দাবী করতে পারেন। সমকালীন রঙ্গালয়ের বহু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন তিনি সাধিত করেছিলেন, যার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। গতানুগতিকতায় তাঁর ঐকান্তিক অনীহা ছিল এবং তিনি নিরন্তর দর্শকদের চমকপ্রদ সুখের সন্ধানদানে নিরত থাকতেন। অনন্যতা ছিল অমরেন্দ্রনাথের মর্মগত ও মজ্জাগত অভিলাষ এবং ক্লাসিক থিয়েটারের প্রবর্তনায় দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার ক্ষেত্রে তিনি যে অভিনবত্ব এনেছিলেন, সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বৈপ্লবিক বলতে দ্বিধা নেই। বাংলা থিয়েটারে বাস্তবতার জনকও অমরেন্দ্রনাথ। অভিনয় যে কেবলমাত্র 'অভিনয়' নয়, তা নির্ভর করে অভিনয়, মঞ্চ, আলো, রূপসজ্জা প্রভৃতি বিভিন্ন মঞ্চ-আঙ্গিকের সুষ্ঠু সমন্বয়ের উপর গিরিশ যুগে সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম বুঝেছিলেন। মঞ্চের পরিবেশকে অধিকতর জীবন্ত ও নয়নসুখকর করার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং "ক্লাসিক থিয়েটারের আমল থেকেই 'ঠ্যালা সীন', 'কাটা সীন', 'বক্স সীন', পরিবর্ত্তনীয় 'উইংস' ও 'প্রোসিনিয়ম' এবং 'যবনিকা' হিসাবে প্রথম 'কার্টেন' ব্যবহার হয়। রঙীন্ আলো, 'স্পট লাইট', প্রভৃতিরও প্রচলন হয়।......'ষ্টেজে' তখন কেরোসিনের প্যাকিং বাক্স কেটে তৈরী করা রঙীন্ কাপড় মোড়া নকল আসবাবপত্র ব্যবহার হত। অমরেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম ষ্টেজে আসল সরঞ্জামের ব্যবহার প্রবর্ত্তন করেন। খাট, আলমারি, টেবিল, চেয়ার, সোফা, আয়না, ছবি ইত্যাদি ষ্টেজের উপর সাজিয়ে এই সময় থেকেই রঙ্গমঞ্চকে এক বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা চলতে লাগল। ষ্টার, মিনার্ভা, ন্যাশানাল, প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যশালাগুলির মধ্যে বেশ একটা

প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গেল। বারুণী পুষ্করিণী থেকে সিক্তবসনা রোহিণীকে তুলে নিয়ে এল গোবিন্দলাল তাঁর জামাকাপড় ভিজিয়ে। শৈবলিনী ও প্রতাপ গঙ্গায় সাঁতার কেটে উঠতে লাগলো ভিজে কাপড় পরে। জলপ্রপাত ও ঝরণার দৃশ্যে ঝরঝর করে জল ঝরতে লাগল ষ্টেজের উপর! ভীমা পুষ্করণীতে ঝাঁপ দেবার সময় জল ছিটিযে পড়তে সুরু হল। গোবিন্দলাল ষ্টেজের উপর অশ্বপৃষ্ঠে দেখা দিতে লাগলেন। আকাশে উড়ে যাওয়া, শূন্যমার্গে দেবতার আবির্ভাব, ফোয়ারা থেকে জল ওঠা, সূর্য্যাস্ত, চন্দ্রোদয়, ঝড়বৃষ্টি, বজ্রাঘাত ও বিদ্যুৎচমক, ট্রেনের শব্দ প্রভৃতি ধ্বনি, রিভলভার ও পিস্তলের সশব্দে অগ্নি ও ধূম উদ্গীরণ, রঙ্গমঞ্চে কুকুর, বিড়াল, পাখী, পায়রা প্রভৃতি জীবজন্তু ও পশুপক্ষীর আবির্ভাব এই সময় থেকেই সুরু হয়েছিল।" (আনন্দবাজার পত্রিকা—২১ চৈত্র, ১৩৪৭/নরেন্দ্র দেব)

নট ও নাট্যাধ্যক্ষ ব্যতীত অমরেন্দ্রনাথের আর এক পরিচয় ছিল, সে পরিচিতি নাট্যকারের। বেশ কিছু সংখ্যক পূর্ণাঙ্গ নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসনের তিনি রচয়িতা। সেগুলির সবক'টি কৌলিন্য গুণে সমৃদ্ধ না হ'লেও তাদের প্রায় কোনোটি দর্শকানুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয় নি।[২] কেননা, তাদের মানসিকতা ও চাহিদা তিনি জানতেন এবং সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি নয়, থিয়েটারের প্রয়োজন সিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর মনীষা আপন কর্মে লিপ্ত থাকতো। অমরেন্দ্রনাথের লেখনী গীতিনাট্যকে এক বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত

---

২ এই প্রসঙ্গে, অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' (৮।১।১৯১৬) মন্তব্য করেছিল :— "......Whether or not his productions will find an abiding place in Bengali literature, it is for posterity to judge but they were admirably fitted for the stage and for that purpose they were undoubtedly a success."

করেছিল, যাদের সফল প্রযোজনা ক্লাসিকের জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান সোপান হিসাবে পরিগণিত। তিনি যে সহৃদয়, বিবেচক, গুণগ্রাহী[৩] এবং আন্তরিকভাবেই রঙ্গালয়ের উন্নতিকামী ছিলেন, সহকর্মীদের বেতনহারের পুনর্বিন্যাসের দ্বারাই তিনি তা প্রমাণ করেছেন। তদানীন্তন প্রথম শ্রেণীর নটেরাও মাসিক পঞ্চাশ টাকার অধিক বেতনের অধিকারী ছিলেন না। অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং কলাকুশলীদের বুভুক্ষু রেখে নাট্যোন্নয়নের প্রয়াস ব্যর্থ হ'তে বাধ্য, এ সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তাই প্রচলিত নাট্যশালাগুলির মধ্যে ক্লাসিকেই সর্বপ্রথম শিল্পী ও কলাকুশলীদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি ঘটে। অমরেন্দ্রনাথ কর্তৃক 'বেনিফিট নাইটে'র প্রবর্তনাতেও সর্বশ্রেণীর থিয়েটার কর্মীদের অতিরিক্ত অর্থোপার্জনের পথ খুলে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন রঙ্গালয়-সমর্পিতপ্রাণ, সেই কারণে সহকর্মীদের সুখ-দুঃখ থেকে সুরু ক'রে "নাটকসংক্রান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ তিনি উপেক্ষা করেন নি। প্রচারকর্মে তাঁর সূক্ষ্ম মনোযোগ এর নিদর্শন; অভিনয়ের নিশ্চিত সাফল্যের জন্যে যে বিজ্ঞাপন পর্য্যায় তিনি ব্যবহার করতেন, তা দেখলে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা পর্য্যন্ত তারিফ না-ক'রে পারতেন না।" (সুধীন্দ্র-নাথ দত্ত) অমরেন্দ্রনাথের মনীষা বিজ্ঞাপনব্যাপারকে কুমার শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করে, যা সেকালের পক্ষে ছিল অকল্পনীয়। এ যাবৎ-কাল অতি নিকৃষ্ট রঙীন কাগজে, এক রঙা কাগজে হ্যাণ্ডবিল মুদ্রিত হত। সর্বপ্রথম ক্লাসিকই উৎকৃষ্ট আইভরি ফিনিস কাগজে নানা রঙের কালির সাহায্যে তা প্রকাশ করতে লাগলো। যেহেতু

৩ ২৪ নভেম্বর, ১৮৯৭ 'অনুসন্ধান' জানিয়েছে:— "...অধ্যক্ষ অমরেন্দ্রবাবুও— প্রকৃতই গুণগ্রাহী; নৃপেন্দ্রবাবুর নাচশিক্ষায় আটভরি স্বর্ণমেডেল পুরস্কার প্রদান করিয়া আপন গুণগ্রাহিতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।..."

নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু (নেপা বোস) ছিলেন ক্লাসিকের সাফল্যমণ্ডিত গীতিনাট্য 'আলিবাবা'র নৃত্যশিক্ষক।

অভিনবত্ব এবং অনন্যতায় তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ, তাই কেবলমাত্র হ্যাণ্ডবিল নয়, প্রচারের সমস্ত মাধ্যমগুলিকে তিনি শোভন, আকর্ষণীয় ও পরিকল্পিত উপায়ে কাজে লাগালেন। বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত ভাষার ক্ষেত্রেও দেখা দিল উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। গিরিশচন্দ্রের সাধু, মার্জিত আর গাম্ভীর্যমণ্ডিত ভাষার বিকল্পরূপে অমরেন্দ্রনাথ সহজবোধ্য, চটুল এবং চমকপ্রদ শব্দরাজির প্রচলন করলেন।[৪] তাঁর সেইসব রচনা হয়তো সর্বত্র উন্নত মানসিকতা এবং রুচির পরিচয় দিত না কিন্তু তা অনিবার্যভাবে উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক হত। বিজ্ঞাপনের সুষ্ঠু ও কার্যকরী ব্যবহার বাংলা থিয়েটারকে তিনিই প্রথম শিখিয়েছিলেন এবং এর ফলে সাধারণভাবে অভিনয়কলা জনপ্রিয় ও সাধারণ রঙ্গালয়ের অর্থ নৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল সন্দেহ নেই।

আশৈশব যে সাহিত্যপ্রীতি তিনি লালন করেছিলেন অভিনয়প্রিয়তার সঙ্গে তা একত্রিত হয়ে রূপ নিয়েছিল 'সৌরভ', 'রঙ্গালয়', 'নাট্যমন্দির' ও 'থিয়েটার' পত্রিকার প্রকাশনা এবং সম্পাদনা কর্মে। এদের সবক'টির তিনি প্রকাশক ছিলেন, কোনো কোনোটির বা সম্পাদক। অভিনয়কলা সম্পর্কিত সাময়িকপত্রের আবির্ভাব এই প্রথম এবং এ ব্যাপারে পথিকৃতের গৌরব অমরেন্দ্র-নাথেরই প্রাপ্য। উপরোক্ত পত্রিকাগুলির (বিশেষভাবে রঙ্গালয় ও নাট্যমন্দির) মাধ্যমে কেবলমাত্র এদেশের সাধারণ রঙ্গালয়গুলির

৪ একটি হ্যাণ্ডবিলের ভাষার নমুনা :—

হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার!
নাট্যজগৎ স্তম্ভিত!
নাটকের ঘাত-প্রতিঘাতে মানবজীবন দোদুল্যমান!
সারি সারি সখীর সারি!
নাচে গানে ধুলো (ধুল?) পরিমাণ!
ষোড়শী রূপসীর যৌবন-তরঙ্গে সন্তরণ!!

(অথ নট-ঘটিত— সূত্রধার)

অভিনয়ের সংবাদ ও সমালোচনা প্রকাশিত হত তাই নয়, বিদেশের অভিনয়ধারার সচিত্র বিবরণও তাতে থাকতো। বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে তিনি চটুলতার আশ্রয় নিলেও, পত্রিকা বিষয়ে তিনি ছিলেন যথেষ্ট 'সিরিয়াস'— তার প্রমাণ প্রকাশিত রচনাগুলির বিষয় এবং লেখক নির্বাচনের মধ্যে পাওয়া যাবে। যেহেতু রঙ্গালয়-ই ছিল অমরেন্দ্রনাথের জীবন, সেই কারণে তাঁর সর্ববিধ কর্মপ্রচেষ্টা নাট্যশালার পরিবেষ্টনেই আবর্তিত। তাঁর বহুধাবিভক্ত মনীষার প্রকাশমুখ— ক্লাসিক থিয়েটার। সেইহেতু অমরেন্দ্র-প্রতিভার মূল্যায়ন অনিবার্যরূপে ক্লাসিকেই বর্তায়। সবিশেষ পূর্বেই বিবৃত হয়েছে, পরিশেষে সংক্ষেপে বলা চলে — প্রযোজনার দুঃসাহসিক মৌলিকতায়, নিশ্চিত আবেদনক্ষম প্রচাবমাধ্যমের হৃদয়গ্রাহী প্রয়োগে, বর্ণাঢ্য অথচ সরলীকৃত আবেগের নাটক নির্বাচনে এবং সর্বোপরি অনুপম অভিনয়-সৌকুমার্যে ক্লাসিক থিয়েটারেব আকর্ষণ সেকালের নাট্যামোদীদের কাছে অপ্রতিরোধ্য ছিল। বস্তুতঃ, ১৮৯৭ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত বাংলা থিয়েটারের যে যুগ সেখানে ক্লাসিকেরই গৌববময় একছত্র আধিপত্য। অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যবর্তী ব্যবধান হ্রাস পেয়ে হৃদয়-সাযুজ্য সেই সময়ই স্থাপিত হয়েছিল। কেননা, গিরিশ— বিহারী— অমৃত প্রবর্তিত শিক্ষায়তনসুলভ নীরস গম্ভীর পবিবেশ তখন রঙ্গালয় থেকে অন্তর্হিতপ্রায়, বিপরীত ক্ষেত্রে সবস মন্তব্য, চটুল অভিনন্দন ও উল্লাসধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ নিত্য মুখরিত।[৫] অনুরাগে

৫ "...অকুতো-সাহস অমরেন্দ্রনাথ... নিয়ম ও নীতির বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলেন; আলিবাবা প্রভৃতির অভিনয় দেখিতে দেখিতে বিডন ষ্ট্রীটের দর্শকবৃন্দ বোলচাল কাটিয়া, শিস্ দিয়া, দুই একটা অসঙ্গত ইয়ার্কি কপ্‌চাইয়া একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটারকে একটা সর্ব্বজাতীয় আমোদাগারে পরিণত করিলেন। থিয়েটার যেন ব্যুরোক্রেসীর রাজত্ব ছিল, অমরবাবু থিয়েটারকে ডেমোক্রাট করিয়া তুলিলেন।..." (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর —অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

উদ্বেগ তদানীন্তন দর্শক ক্লাসিকের নামে 'পাগল' হতেন— এ মন্তব্যে আতিশয্য নেই। সমকালীন পত্র-পত্রিকার অজস্র প্রশংসাবাদ এই উক্তির স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ক্লাসিক থিয়েটারের আট বৎসরের জীবনেতিহাস অবিস্মরণীয়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে সে এক অনন্তকীর্তি। "সে একদিন গিয়াছে,— যখন বঙ্গীয় নাট্যজগতের প্রায় সকল সার সার রত্নগুলিই 'ক্লাসিকে' সমবেত হইয়াছিলেন!— রঙ্গালয়ের অমন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ— অমন দেশব্যাপী সুখ্যাতি-গৌরব বুঝি বঙ্গীয় নাট জগতে আর কোনও নাট্যশালার অদৃষ্টেই ঘটে নাই!— আবার পক্ষান্তরে অমন অপ্রত্যাশিত, কল্পনাতীত, শোচনীয় পতনও বুঝি কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই! গৌরব ও পতনের এমন অতুলনীয় মর্ম্মন্তুদ আদর্শ— নাট্য-জগতেব ইতিহাসে অতি বিরল!—" (অভিনেতৃ-কাহিনী)

অভিনয় প্রবাহ

লেসী ও ম্যানেজার-অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, সঙ্গীত শিক্ষক-অঘোরনাথ পাঠক, কর্মসচিব-আশুতোষ বড়াল, বিজ্ঞাপনসচিব-প্রমথনাথ দাস, রঙ্গভূমি সজ্জাকর-ধর্মদাস সুর, নট-নটী-মহেন্দ্রলাল বসু, অঘোরনাথ পাঠক, গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, নয়নতারা, শরৎকুমারী, সরোজিনী প্রভৃতিকে নিয়ে ক্লাসিক থিয়েটার তার যাত্রা সুরু করলে। এঁদের প্রথম অভিনয় গিরিশচন্দ্রের 'নল-দময়ন্তী' ও 'বেল্লিক বাজার' ১৮৯৭, ১৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। আবির্ভাবেই ক্লাসিক থিয়েটার দর্শক মহলে সাড়া জাগালো। ২১ জুন মঞ্চস্থ হল শেক্স্পিয়রের 'হ্যামলেট' অনুসরণে রচিত 'হরিরাজ'। এ-নাটকের মাধ্যমে ক্লাসিকের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত। নামভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ প্রশংসনীয় অভিনয়-নৈপুণ্য দেখান। বহু রজনী অভিনীত এ-নাটকের অভিনয় দেখে 'হিন্দু

পেট্রিয়ট' লিখলে :— "Classic Theatre.—That popular and evergreen tragedy "Hariraj", was put on the stage of the Classic Theatre on Sunday last. The piece abounds in situations which never fail to appeal to the finer feelings of the audience. The management of the Theatre is excellent and it has spared no expense in the direction either of dress or scenery to make the play attractive. The different characters are in capable hands who interpret them correctly. The parts played by Hariraj, Dadhimukh, Aruna, Rajbala, Kalhan, Jayakar and Srilekha are undoubtedly praiseworthy." (২০।৬।১৮৯৯) শ্রীলেখা চরিত্রের রূপায়ণে তারাসুন্দরীও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মূল অভিনেত্রী ছোট রানী কয়েকটি অভিনয়ের পর ক্লাসিক ছেড়ে দিলে তারাসুন্দরীকে ঐ ভূমিকায় নামানো হয়। এখানে কবিগুরুর 'রাজা ও রানী'র আত্মপ্রকাশ ঘটলো ২৪ জুলাই। অভিনয়ে বিক্রমদেব, কুমার সেন ও দেবদত্তের চরিত্রাভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রলাল বসু এবং হরিভূষণ ভট্টাচার্য কৃতিত্ব দেখান। সুখ্যাতি শুনে ১১ সেপ্টেম্বর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অভিনয় দেখে গেলেন। 'রাজা ও রানী' ক্লাসিকে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এ-নাটকের 'কুমার সেন' চরিত্রের রূপারোপে মহেন্দ্রলাল যে দক্ষতার পরিচয় দেন, তার তুলনা নেই। ২০ নভেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা গীতিনাট্য মঞ্চস্থ হল। দৃশ্যপট, পোষাক-পরিচ্ছদ, নৃত্যগীত, অভিনয়ভঙ্গী সব দিক থেকেই নাটকখানিতে অভিনবত্ব ছিল। আবদাল্লা ও মর্জিনার বেশে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু (নেপা বোস) এবং কুসুমকুমারী নাচে-গানে-অভিনয়ে দর্শকদের মাতিয়ে তোলেন। 'আলিবাবা'র জনপ্রিয়তা ক্লাসিক থিয়েটারের আর্থিক বনিয়াদকে

সুদৃঢ় করলে। পরবর্তীকালে এই নাটক যে কতবার এখানে অভিনীত হয়েছে, ইয়ত্তা নেই। কেবল ক্লাসিক নয়, 'আলিবাবা' বাংলা থিয়েটারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঞ্চসফল নাটক। সংবাদপত্রে সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হল:— "Classic Theatre.— On Sunday evening this place of entertainment was crowded to witness "Ali Baba" or the "Forty Robbers" from the Arabian Nights. Babu A. N. Dutt, the Manager, capitally rendered the part of "Hosain". The parts of "Margina", rendered by Kusum, and "Abdalla", by Babu Nripendra Chunder Basu, were well filled. The dancing and singing delighted the audience and there were repeated encores. The parts of 'Sakina', 'Fatima', 'Kasim' and 'Ali Baba' were also creditably performed." (ইংলিশম্যান— ১২।৭।১৮৯৯)

১৮৯৮, ২০ ফেব্রুয়ারি ক্লাসিক অমরেন্দ্রনাথের 'বেনিফিট নাইট' উপলক্ষে 'আলিবাবা' ও 'কাজের খতম' মঞ্চস্থ করলে। ইতিমধ্যে মিনার্ভা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চুনিলাল দেব সেখান থেকে এসে ক্লাসিকে যোগ দিয়েছেন। ৮ মার্চ খোলা হল অমরেন্দ্রনাথ রচিত 'দোললীলা' (গীতিনাট্য)। 'আলিবাবা'র মত এ-নাটকেও নেচে-গেয়ে নেপা বোস ও কুসুমকুমারী দর্শকদের মাতিয়ে তুলেছিলেন। জুলাই মাসে গিরিশচন্দ্র পুত্র দানীসহ ক্লাসিকে যোগ দিয়ে নাট্যকার, অভিনয়-শিক্ষক এবং নটরূপে নিযুক্ত হলেন। গিরিশচন্দ্রের অধিনায়কত্বে এই সময় 'মেঘনাদবধ', 'মুকুল-মুঞ্জরা', 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি পুরানো নাটক নামে। মহেন্দ্রলাল আকস্মিকভাবে ক্লাসিক ছেড়ে দেওয়ায় 'মেঘনাদবধ' নাটকে দানীবাবুকে 'লক্ষ্মণ' সাজতে হয়। বর্তমান পর্যায়ে গিরিশচন্দ্র বেশীদিন ক্লাসিকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। বছরের শেষ নাটক 'নির্মলা' মঞ্চস্থ হওয়ার দিন (২৫।১২) উনি

কয়েকজন নটনটীসহ ক্লাসিক ত্যাগ ক'রে মিনার্ভায় যোগ দেন।

১৮৯৯, ৪ মার্চ Municipal Agitation Fund-এর সাহায্যার্থে ক্লাসিক 'হরিরাজ' ও 'দোললীলা' অভিনয়ের আয়োজন করলে। নবপর্যায়ে মিনার্ভায় ১১ মার্চ গিরিশচন্দ্রের পরিচালনায় 'প্রফুল্ল' মঞ্চস্থ হ'লে ১৮ মার্চ ক্লাসিকও ঐ নাটক নামায়। মার্চের শেষে গিরিশচন্দ্র আবার ক্লাসিকে ফিরে এলেন এবং তাঁর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের চুক্তি হল বৎসরে দু'খানি পঞ্চাঙ্কসহ অন্ততঃ চারখানি নাটক তিনি ক্লাসিককে উপহাব দেবেন। সর্তমত, গিবিশচন্দ্র 'দেলদার' রচনায় মন দেন। ক্লাসিকে 'দেলদার' নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ—১০ জুন. ১৮৯৯। সে বাত্রে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, অমবেন্দ্রনাথ, দানীবাবু, অঘোরনাথ পাঠক, কুসুমকুমারী, ভূষণকুমারী,প্রমদাসুন্দরী এবং পান্নাবানী যথাক্রমে দেলদার, নেসা, গহন, সবল, কুহকী, পিয়াসা, ধারা, বেখা ও কুহকিনী সেজেছেন। অভিনয় দেখে ১৮৯৯, ২৭জুলাই তারিখেব 'দৈনিক চন্দ্রিকা' লিখলে :—"ক্ল্যাসিক থিয়েটারে "দেলদার" অপেরার অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। রঙ্গালয় দর্শকমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ হইতে দেখিয়া, আমরা বুঝিলাম যে, এই সুন্দর অপেরাখানির গুণপনা ক্রমশঃই সাধারণে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতেছেন। প্রথমবার অভিনয় দর্শন অপেক্ষা দ্বিতীয়বার অভিনয় দর্শনে আমরা অপেক্ষাকৃত অধিক আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। বাস্তবিক—কি অভিনয়, কি নৃত্যগীত, কি দৃশ্যপট কাহারও নূতনত্ব নষ্ট হয় নাই দেখিয়া, আমরা বুঝিলাম যে, এ অপেরার এখন কিছুদিন অভিনয় চলিতে পাবে। আমরা সকলকেই একবার অভিনয় দেখিতে অনুরোধ করি।" ২৬ আগস্ট অভিনীত হল অমরেন্দ্রনাথের লেখা গীতিনাট্য—'শ্রীকৃষ্ণ'। 'আলিবাবা'র পর এমন মঞ্চসফল গীতিনাটক আর ক্লাসিকে দেখা যায় নি। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ইংলিশম্যান' লিখেছিল :—"Classic

Theatre.— On Saturday night this theatrè was packed to witness the performance of Babu A. N. Dutt's new mythological opera 'Sree Krishna' in two acts. The characters of 'Krishna' and 'Baloram' were admirably rendered by Kusum and Promoda, and Bhusan took the part of 'Radhika'. All of their songs were much appreciated by the audience and repeatedly encored. Other minor parts were suitably filled". (২৯।৮।১৮৯৯) বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অবলম্বনে রচিত 'ভ্রমর' মঞ্চস্থ হল ১৬ সেপ্টেম্বর। নাট্যরূপ অমরেন্দ্রনাথের দেওয়া। প্রথম অভিনয়ের রাত্রে কৃষ্ণকান্ত, হরলাল, গোবিন্দলাল, রোহিণী ও ভ্রমরের ভূমিকায় নামেন যথাক্রমে মহেন্দ্রলাল বসু, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, অমরেন্দ্রনাথ, প্রমদাসুন্দরী এবং কুসুমকুমারী। এঁরা সকলেই সুঅভিনয় করেছেন। ক্লাসিকে 'ভ্রমর' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। গোবিন্দলালের ভূমিকাভিনয় অমরেন্দ্রনাথের শিল্পীজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ১৮৯৯, ২৬ সেপ্টেম্বর 'ইংলিশম্যান' লিখলে :— "Classic Theatre.—Notwithstanding the inclemency of the weather on Saturday night, the above place of amusement was crowded with an appreciative audience to witness the second performance of Bankim Chunder's "Vramar" (a tragedy), dramatised by Mr. A. N. Dutt, the manager who himself appeared in the title role as "Govind Lall" and admirably performed the part. His appearance on the stage on horse back and gallant rescue of "Rohiney" from drowning from the Baruni tank was enthusiastically received. Babu

M. L. Basu, H. B. Bhattacharji, Purna Chundra Ghose and N. C. Basu capitally played their respective parts as "Krishnakanto", "Madhobynath", "Bramhanaddi" (?) and "Haray". The parts of "Vramar", the heroine, and "Rohiney" were creditably rendered by Kusum and Promoda." সেকালের দর্শকদের চমক লাগাবার মত বহু উপকরণ এ-নাটকে ছিল। গোবিন্দলালবেশী অমরেন্দ্রনাথ ঘোড়ায় চেপে মঞ্চে দেখা দিতেন, জলমগ্না রোহিণীকে উদ্ধার করার দৃশ্যে পুকুরের জল ছিটকে স্টেজে উঠতো।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের সুরু অমরেন্দ্রনাথের সামাজিক নক্সা 'মজা' দিয়ে। ওঁর লেখা শ্রেষ্ঠ নক্সাগুলির মধ্যে 'মজা' অন্যতম। এতে তদানীন্তন সামাজিক কদাচার ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক তীব্র কষাঘাত আছে। 'মজা'র নাচ-গান বিশেষ উপভোগ্য হয়। সংবাদপত্রের অভিমত :— "The Classic Theatre.—Last Saturday, we went to witness the performance of this Theatre, when the new pantomime "Maja" was put on board. Most of the performers, including the manager acquitted themselves very well, but the especial feature of the play was the novel and graceful comic dances that were introduced plentifully. Some of the sceneries were decidedly things of beauty, though they might not be destined to be "joy for ever". The play itself which is meant to correct certain follies of the society, contains severe a fine hits ; and although in many places the taste might very well be improved with advantage, it is

sure to find favour with the public." (বেঙ্গলী—১৩।২।১৯০০) ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আবার ক্লাসিকের মনোমালিন্য ঘটেছে। থিয়েটারের জনপ্রিয়তা দেখে উনি মাহিনার বদলে লাভের বখরা দাবী করলে স্বত্বাধিকারী অমরেন্দ্রনাথ নারাজ হন। ফলে, থিয়েটার ছেড়ে গিরিশচন্দ্র বাড়ী বসে থাকেন এবং মিনার্ভার পক্ষ থেকে তাঁকে ভাঙানোর চেষ্টা সুরু হয়। যাই হোক্, সে যাত্রা তিনি ক্লাসিকে থেকে যান এবং 'পাণ্ডব-গৌরব' মহলায় ফেলেন। গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল এই নাটকে পুত্র দানী 'ভীম' এবং অমরেন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণ' সাজেন। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক মহড়ায় অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় উন্নততর হওয়ায় তাঁকেই ভীমের ভূমিকা দিতে হয়। ক্লাসিকে 'পাণ্ডব-গৌরবে'র প্রথম অভিনয় তারিখ—১৯০০, ১৭ ফেব্রুয়ারি। প্রথম রজনীর ভূমিকালিপি :— দণ্ডী-হরিভূষণ ভট্টাচার্য, কঞ্চুকী-গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ভীষ্ম-মহেন্দ্রলাল বসু, ভীম-অমরেন্দ্রনাথ, শ্রীকৃষ্ণ-প্রমদাসুন্দরী, সুভদ্রা-তিনকড়ি দাসী এবং দ্রৌপদী-গোলাপ-সুন্দরী। রূপায়ণে ক্লাসিকের যশঃ অক্ষুণ্ণ রইলো। অভিনয় দেখে 'বঙ্গভূমি' জানালে :— "আমরা গত শনিবারে ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত নূতন পৌবাণিক নাটক 'পাণ্ডব গৌরব'এর অভিনয় দেখিতে গমন করিয়াছিলাম। দণ্ডী ও উর্ব্বশীর উপাখ্যান অবলম্বনে এই নাটক রচিত। সুন্দর অভিনয়, সুন্দর নৃত্যগীত, সুন্দর সাজসজ্জা, সুন্দর চিত্রপট আমাদের চক্ষে সকলই সুন্দর ঠেকিয়াছিল। ...অভিনেতাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বাহাদুরি লইয়াছিলেন ভীম। ভীমের অভিনয় অমরেন্দ্রবাবুব উপযুক্তই হইয়াছে। কঞ্চুকী সাজিয়াছিলেন স্বয়ং গিরিশবাবু। তাঁহার অভিনয় সম্বন্ধে আর কি সমালোচনা করিব? অপরাপর অভিনেতা অভিনেত্রীদিগের মধ্যে সুভদ্রা, উর্ব্বশী, শ্রীকৃষ্ণ, কুন্তী, ঘেসেড়া, ঘেসেড়ানীর অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুভদ্রা ও উর্ব্বশীর সঙ্গীতে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সঙ্গীতগুলিতে যিনি সুর সংযোগ করিয়াছেন তিনি আমাদের বিশেষ

ধন্যবাদপাত্র। নৃত্যগুলি যে চমৎকার সে কথা আর না বলিলেও চলে।" (২০।২।১৯০০) 'পাণ্ডব-গৌরব' সগৌরবে চলতে রইলো বটে কিন্তু গিরিশচন্দ্র ৫ এপ্রিল অভিনয়ের পর ক্লাসিক ছেড়ে তিনকড়ি দাসী, অঘোর পাঠক প্রমুখ কয়েকজন নট-নটী নিয়ে মিনার্ভায় যোগদান করলেন। ক্লাসিকের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের তিন বছরের চুক্তিতে অন্যতম সর্ত ছিল কোনো পক্ষ চুক্তিভঙ্গ করলে অপর পক্ষের তিন হাজার টাকা ক্ষতিপূবণ প্রাপ্য হবে। ক্লাসিক গিরিশচন্দ্রের মার্চ মাসের মাহিনা আটক ক'রে হাইকোর্টে মামলা রুজু ক'রে দিলে। আরজিতে ইন্‌জাংশন অন্যথায় তিন হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করা হয়। বিচারে ইন্‌জাংশন মঞ্জুব না হওয়ায় ক্লাসিকের পক্ষ থেকে মামলায় ঢিলা পড়ে। ইতিমধ্যে ২৬ মে কর্তৃপক্ষ অমরেন্দ্রনাথের নতুন গীতিনাট্য 'দুটী প্রাণ' মঞ্চস্থ করলেন। 'দুটী প্রাণ' জনপ্রিয়তা অর্জন কবেছিল।[৬] এই সময় মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে 'সীতারাম' ধরা হয় এবং প্রতিযোগিতায় ক্লাসিকও ঐ উপন্যাসের অমরেন্দ্রনাথ কৃত নাট্যরূপ নামায়। ৩০ জুন এখানে 'সীতারাম' প্রথম অভিনীত হল। অমরেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রলাল বসু, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, কুসুমকুমারী, হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী) ও ভূষণকুমারী যথাক্রমে সীতারাম, গঙ্গারাম, চন্দ্রচূড় শ্রী, রমা এবং জয়ন্তীর চরিত্রে রূপদান করলেন। মিনার্ভায় 'সীতারাম' নাটকের নামভূমিকায় অবতীর্ণ হন গিরিশচন্দ্র স্বয়ং। একই নাটক নিয়ে দুই থিয়েটার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে ওঠে এবং প্রচারের নামে কাদা ছোড়া-ছুড়ি সুরু হয়।[৭] সে যাই হোক্, গিরিশচন্দ্র এই পর্যায়ে

---

৬ "...The representation is a "triumphant success" from the box-office point of view....." (ইণ্ডিয়ান মিরার—৭।৬।১৯০০)

৭ "...উভয় থিয়েটারে অভিনয়ব্যাপারে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল। উভয় থিয়েটারই হ্যাণ্ডবিলে পরস্পরকে প্রচণ্ড গালিগালাজ করিতে

মিনার্ভায় বেশী দিন থাকেন নি। মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী ২৪ অক্টোবর থেকে তাঁকে বরখাস্ত ক'রে নিজের নাম ম্যানেজাররূপে ঘোষণা করলে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা পরিত্যাগ করেন এবং দানীবাবু, অঘোর পাঠক প্রমুখ তাঁর অনুগত অভিনেতারা ঐ তারিখ থেকে পুনরায় ক্লাসিকে যোগ দেন। গিরিশচন্দ্র ক্লাসিকে আসেন ২৪ নভেম্বর। ততদিনে অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিবাদ মিটে গেছে। তারাসুন্দরী এবং তিনকড়ি দাসীও এ সময় ক্লাসিকের সাথে যুক্ত হয়েছেন। গিরিশচন্দ্রের অধিনায়কত্বে ক্লাসিক থিয়েটারের শিল্পীগোষ্ঠী তখন আশ্চর্যরকমের শক্তিশালী!

১৯০১, ৮ মার্চ ক্লাসিক তথা বাংলা থিয়েটারের বিশিষ্ট নট মহেন্দ্রলাল বসুর মৃত্যু ঘটে। আমাদের দেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি ছিলেন অন্যতম। ক্লাসিকে গিরিশ-নাটকায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' মঞ্চস্থ হল ১ জুন। তার আগে ২০ এপ্রিল এখানে 'মনের মতন' (গিরিশচন্দ্র) অভিনীত হয়েছে। 'কপালকুণ্ডলা'য় গিরিশচন্দ্র অধিকারী ও চটীরক্ষক, অমরেন্দ্রনাথ নবকুমার, অঘোর পাঠক কাপালিক, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ জাহাঙ্গীর, দানীবাবু বালক ভৃত্য, কুসুমকুমারী কপালকুণ্ডলা এবং তারাসুন্দরী মতিবিবির ভূমিকায় দেখা দেন। অভিনয় খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। নবকুমার, মতিবিবি, কপালকুণ্ডলা ও কাপালিক বিশেষ সুখ্যাতি পান। ২৭ জুলাই 'মৃণালিনী' নামলো। কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্রের, নাট্যরূপ গিরিশচন্দ্রের দেওয়া। পশুপতি, হেমচন্দ্র, হৃষিকেশ, দিগ্বিজয়, গিরিজায়া, মনোরমা ও

আরম্ভ করিলেন। অমরেন্দ্রনাথ লিখিলেন,— "নট, নর্ত্তকী ও নাপিত— তিন চল্লিশের পার হইলেই কাজের বার হইয়া যায়।" শুধু তাই নয়, গিরিশচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া, নানাপ্রকার ছড়া কাটিয়া হ্যাণ্ডবিলে ছাপান সুরু হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ ব্যঙ্গচিত্রও বাহির হইতে লাগিল।··· গিরিশচন্দ্রও কোমর বাঁধিয়া রণক্ষেত্রে নামিলেন।···" (রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ— রমাপতি দত্ত)

মৃণালিনীর রূপসজ্জায় যথাক্রমে গিরিশচন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথ, অঘোর পাঠক, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, কুসুমকুমারী, প্রমদাসুন্দরী ও কিরণবালা অবতীর্ণ হন। এঁদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথ, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং কুসুমকুমারী উল্লেখযোগ্য দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। 'মৃণালিনী'র দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতে অভিনয়কালে পশুপতিবেশী গিরিশচন্দ্রের মাথার চামড়া আগুনে পুড়ে গেলে দানীবাবু ঐ ভূমিকায় নামতে থাকেন।

১৯০২, ৯ ফেব্রুয়ারির বিশেষ অভিনয়ে মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর অমরেন্দ্রনাথকে স্বর্ণপদক পুরস্কার দিলেন। ইতিমধ্যে, বেতনবৃদ্ধির দাবী স্বীকৃত না হওয়ায় তারাসুন্দরী ক্লাসিক থেকে অরোরায় চলে গেছেন। ২২ মার্চ 'শিবজী' খোলা হয়। ১৯ জুলাই ক্লাসিক গিরিশচন্দ্রের 'ভ্রান্তি' মঞ্চস্থ করলে। সে রাত্রের ভূমিকালিপি ছিল এইরকম :— রঙ্গলাল-গিরিশচন্দ্র, নিরঞ্জন-অমরেন্দ্রনাথ, পুরঞ্জন-দানীবাবু, গয়ারাম-হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, জমাদার-চণ্ডীচরণ দে, মাধুরী-ভুবনেশ্বরী, ললিতা-রানীসুন্দরী এবং গঙ্গা-কুসুমকুমারী। নাটকের সুখ্যাতিতে দেশ ভরে যায়। 'ভ্রান্তি'র রচনাকৌশল এবং অভিনয়নৈপুণ্য— দুইই প্রশংসিত হয়েছিল। ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯০২ 'বঙ্গবাসী' মন্তব্য করলে :– "আমরা গত শনিবার "ভ্রান্তি"র অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, যেমন সুন্দর নাটক, তেমনই সুন্দব অভিনয়। নাটক-রচনে যেমন কৃতিত্ব, নাট্য-রঙ্গ-পরিচালনেও তেমনই কৃতিত্ব। একদিকে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র; অন্য দিকে নাট্যশালার পরিচালক অমরেন্দ্র।" ২৫ ডিসেম্বরের নাটক গিরিশচন্দ্রের "আয়না" (সামাজিক নক্সা)। প্রথম অভিনয় রজনীতে অমরেন্দ্রনাথ 'সৃষ্টিধরে'র ভূমিকায় নামলেন। কিন্তু দু'রাত্রি অভিনয়ের পর কলের। রাগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর অনুপস্থিতিতে গিরিশচন্দ্র ঐ চরিত্রের রূপ দিতে থাকেন।

১৯০৩ সালের ৭ থেকে ১৪ জানুয়ারি ক্লাসিক থিয়েটারে (স্থায়ী

মঞ্চে) কোনো অভিনয় হয় নি। সম্রাট সপ্তম এড্‌ওআর্ডের মুকুটোৎসব (coronation) উপলক্ষে সম্প্রদায় তখন কলকাতার দরবারে অভিনয় করছিল। ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত ক্লাসিকে সাফল্যের সঙ্গে পুরানো নাটকের অভিনয় হয়। ১৫ আগস্ট ষ্টার ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' মঞ্চস্থ করায় ক্লাসিক হারাণচন্দ্র রক্ষিতের লেখা ঐ নামের উপন্যাসের নাট্যরূপ নামালে। ক্লাসিকে 'প্রতাপাদিত্য' নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ ২৯ আগস্ট, ১৯০৩। ভূমিকা-লিপি ছিল এইরকম :— প্রতাপাদিত্য-অমরেন্দ্রনাথ, শঙ্কর-দানীবাবু, বিক্রমাদিত্য-নীলমাধব চক্রবর্তী, বসন্ত রায়-পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, যশোহর রাজলক্ষ্মী-তিনকড়ি দাসী, ছোট রানী-হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী) ও ফুলজানি-কুসুমকুমারী। অমরেন্দ্রনাথ, দানীবাবু এবং কুসুমকুমারীর অভিনয় দর্শকমনে গভীর রেখাপাত করে। দুই থিয়েটারের 'প্রতাপাদিত্য'ই খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ক্লাসিকের অভিনয় সম্পর্কে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' (১৬।৯।১৯০৩) লিখলে :— "The change of dress on the hero's part is unusually frequent for the Bengali Stage and indicates the manager's wish to make it a study in colour. And the manager who essays the role has made the character a study in human passions as well. In modulation of tone, and variety of facial expression, the impersonation is a characteristic achievement and of the intellectual best yet attempted by him. Sankar, the next character in importance, is undertaken by an expert in the heroic line and played with marked intelligence, barring occasional tendency to strike twelve when it is barely nine.** The characterisation of Phuljani is one in a hundred and it is only to be witnessed,

to be fully appreciated.** Taken as a whole, Protapaditya is one of the most successful historical plays ever produced on the boards of the Classic Theatre. ...” (রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ— রমাপতি দত্ত) পাঁচ রাত্রি শংকরের ভূমিকায় অভিনয় করার পর দানীবাবু ইউনিক থিয়েটারে যোগ দিলেন।[৮] ইতিমধ্যে ১৯০৩, ১০ মে ক্লাসিক থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মাসিক পাঁচশত টাকায় তিন বৎসরের জন্য মিনার্ভা থিয়েটার লিজ নিয়েছেন। একই মালিকানায় যুগপৎ ক্লাসিক ও মিনার্ভার অভিনয় চলতে রইলো। কিন্তু একমাস যেতে না যেতে মিনার্ভার স্বত্ব নিয়ে সুরু হল মামলা। আদালতের রায়ে শেষ পর্যন্ত অমরেন্দ্রনাথ জয়ী হ'লেও নানা কারণে তাঁর পক্ষে এক সঙ্গে দুই থিয়েটার চালানো সম্ভব না হওয়ায় মিনার্ভার লিজ তিনি মনোমোহন পাঁড়ের নামে হস্তান্তর ক'রে দিলেন (২৭।৭।১৯০৪)। মাঝে অবশ্য কিছুদিন চুনিলাল দেবের নেতৃত্বে মিনার্ভা পরিচালিত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে দানীবাবু আবার ক্লাসিকে ফিরে এসেছেন। ওঁর আসার পর ১৯০৪, ৩০ এপ্রিল এখানে গিরিশচন্দ্রের 'সৎনাম' খোলা হল। নাটকের ভূমিকালিপি :— আওরঙ্গজেব-দানীবাবু, হামিদ খাঁ-নটবর চৌধুরী, বিষণসিংহ ও মীর সাহেব-গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী, কারতরফ খাঁ-চণ্ডীচরণ দে, রণেন্দ্র-অমরেন্দ্রনাথ, বৈষ্ণবী-কুসুমকুমারী, সোহিনী-পান্নারানী, গুলসানা-রানীসুন্দরী, পান্না-হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)। অভিনয়ে অমরেন্দ্রনাথ, দানীবাবু, কুসুমকুমারী এবং রানীসুন্দরী নৈপুণ্য দেখালেন। কিন্তু নাটকখানির কোনো কোনো অংশ মুসলমান সমাজে তুমুল বিক্ষোভের সঞ্চার করে এবং তাঁদের আপত্তিতে চতুর্থ অভিনয়রজনী (২১।৫) থেকে 'সৎনাম'র অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়।

---

৮ ১৯০৩ সালের ৬ জুন বেঙ্গল মঞ্চে ইউনিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়

প্রসঙ্গতঃ, 'মিহির ও সুধাকর' (২৭।৫।১৯০৪) জানালে :— "গিরিশবাবুর "সৎনাম" মহানাটক লইয়া গত শনিবারে ভীষণ কাণ্ড সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। মুসলমানের কুৎসাপূর্ণ নাটক অভিনয় করিতে দিব না বলিয়া কলিকাতা সহরের প্রায় ২।৩ সহস্র মুসলমান ক্লাসিক থিয়েটরের সম্মুখে সমবেত হইয়াছিলেন, সহরে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল ; নাটক অভিনয় বন্ধও হইয়াছিল।" মিনার্ভা থিয়েটারের ব্যাপারে অমরেন্দ্রনাথ অনেক টাকা লোকসান দিয়েছিলেন এবং 'সৎনাম' বন্ধ হওয়ায় উনি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। অসাধু ও অযোগ্য কর্মচারীদের উপর বিশ্বাসস্থাপন ও নিজের অমিতব্যয়িতার জন্য এই সময় ক্লাসিকের আর্থিক দুরবস্থা চরমে ওঠে। ফলে, মনোমোহন পাঁড়ের কাছে থিয়েটার বন্ধক দিতে হয়। ১৯০৪, ২৩ আগস্ট মিনার্ভা দর্শকদের উপহার দেওয়া সুরু করলে ক্লাসিকও প্রতিযোগিতায় নামলে। দুই থিয়েটাবে উপহার দেওয়ার ধুম পড়ে গেল। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেষ পর্যন্ত ক্ষতিস্বীকার করতে হল ক্লাসিককে। এসময় মাত্র আড়াই হাজার টাকার দায়ে থিয়েটার হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম হ'লে গিরিশচন্দ্র উপযাচক হয়ে ঐ টাকা ধার দিয়ে ক্লাসিককে বাঁচান। ইতিমধ্যে দানীবাবু ষ্টারে যোগ দিয়েছেন। অর্থাভাব শোচনীয়রূপে দেখা দেওয়ায় নট-নটীদের বেতন বাকী পড়ে এবং স্বয়ং গিরিশচন্দ্র দু'মাসের বেতনের দাবীদার হন। অমরেন্দ্রনাথ কোনো রকমে টাকা যোগাড় ক'রে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বেতন ও গিরিশচন্দ্রের আড়াই হাজার টাকা শোধ দিলেন বটে কিন্তু মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিন মাসের বেতন বাবদ নয়শো টাকা বাকী পড়ায় গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক ছেড়ে মিনার্ভায় চলে গেলেন। টাকার অত্যধিক প্রয়োজনে থিয়েটার বন্ধক দিয়ে এসময় আবার ধার করা হয়। ২৭ নভেম্বর ক্লাসিক অমরেন্দ্রনাথ নাটকায়িত 'চোখের বালি' (রবীন্দ্রনাথ) মঞ্চস্থ করলে।[৯] অমরেন্দ্র-

৯ অভিনয়ের আগের দিন 'বেঙ্গলী'র বিজ্ঞাপনে নাট্যরূপদাতা হিসাবে

নাথ, মনোমোহন গোস্বামী ও কুসুমকুমারী যথাক্রমে মহেন্দ্র, বেহারী এবং বিনোদিনী সাজলেন। নাটক চললো না। ২৫ ডিসেম্বর 'প্রেমের পাথার' (নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন) নামলো। এসময় ক্লাসিক তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে কিন্তু পারে নি। বকেয়া বাড়ী ভাড়ার দায়ে থিয়েটারের নামে উচ্ছেদের নোটিশ জারী করা হয়। অমরেন্দ্রনাথ প্রাপ্য ভাড়া চুকিয়ে দিলেও মামলা চলতে রইলো। অন্য পাওনাদাররাও এই সময় কেস রুজু করেছে। শেষ পর্যন্ত হাইকোর্ট থেকে অমরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ডিক্রী দেওয়া হয় এবং আদালতের আদেশে পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ও অতুলচন্দ্র রায় ক্লাসিকের রিসিভার নিযুক্ত হন। ফলে, মালিকানা হারিয়ে অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক ছেড়ে দিলেন।

নতুন ব্যবস্থাপনায় ১৯০৫ সালের ২২ এপ্রিল থেকে এই থিয়েটারে আবার অভিনয় সুরু হল। অমরেন্দ্রনাথের বদলে প্রবোধচন্দ্র ঘোষ নায়করূপে ক্লাসিকের অভিনেতাগোষ্ঠীতে যোগ দিলেন। বিজনেস ম্যানেজার হলেন দুর্গাদাস দে। কিন্তু থিয়েটার অচল হওয়ায় ছ'মাস পরে মাসিক পাঁচশ টাকা বেতনে অমরেন্দ্রনাথকে ম্যানেজার হিসাবে আনা হয়। অমরেন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে কার্জন মঞ্চে গ্র্যাণ্ড থিয়েটার খুলেছিলেন, সেখান থেকে মনোমোহন গোস্বামী, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, দেবকণ্ঠ বাগচী, কুসুমকুমারী প্রভৃতিকে নিয়ে ২১ অক্টোবর তিনি আবার ক্লাসিকে ফিরে এলেন। ৪ নভেম্বর সুরেন্দ্রনাথ বসুর লেখা নক্সা 'হ'ল কি' অভিনীত হয়েছে। ২৩ ডিসেম্বর ক্লাসিক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রণয় পরিণাম' উপন্যাস অবলম্বনে অমরেন্দ্রনাথ রচিত নাটক 'প্রণয় না বিষ' নামালে।

অমরেন্দ্রনাথের নাম প্রচারিত হ'লেও, 'সাহিত্য' (কার্তিক, ১৩১১) পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে নাট্যরূপদাতারূপে গিরিশচন্দ্রের নাম উল্লিখিত হয়েছে। (দ্র. গিরিশরচনাবলী—প্রথম খণ্ড/সাহিত্য সংসদ সংস্করণ)

রমা পাগলা, হরদয়াল, কুসুম ও সরমার ভূমিকাভিনয়ে অমরেন্দ্রনাথ, মনোমোহন গোস্বামী, কুসুমকুমারী এবং হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী) প্রশংসিত হলেন।

১৯০৬, ২৭ জানুয়ারি খোলা হল গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা'। সে রাত্রের ভূমিকালিপি ছিল এইরকম:— সিরাজ-অমরেন্দ্রনাথ, জগৎশেঠ-গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী, মোহনলাল ও মুসাল্লা-হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, ক্লাইভ-মনোমোহন গোস্বামী, আলিবর্দ্দীবেগম-পান্নারানী, ঘেসেটী-হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী) ও লুৎফউন্নিসা-বিনোদিনী (হাঁদি)। অভিনয় সুখ্যাতি পেলেও, ক্লাসিকের 'সিরাজদ্দৌলা' মিনার্ভার মত পয়সা ঘরে আনতে পারে নি। আশানুরূপ বিক্রী না হওয়ায় এই নিয়ে রিসিভারের সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের মন কষাকষি হয় এবং সেই সময় তিনি অসুস্থও হয়ে পড়েন। নানা বিপর্যয়ের ফলে ওঁর শরীর ও মন ভেঙে পড়েছিল। এই সব কারণে ১৯০৬, মে মাসে অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক থেকে চিরবিদায় নেন।

তাঁর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারের পতন সুরু হয়। কর্তৃপক্ষ অপরেশ মুখোপাধ্যায় ও তারাসুন্দরীকে এনে শেষ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কোনো ফল হয় নি।[১০] ক্লাসিক শেষ পর্যন্ত উঠে যায়।

ক্লাসিকের পতনের জন্য দায়ী অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং। স্বীয় সংগঠন শক্তি, ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিভার দ্বারা উনি যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, ওঁরই চারিত্রিক দুর্বলতায় সেই থিয়েটারের পতন হয়েছিল। আয় বুঝে ব্যয়ের নীতিতে তাঁর আস্থা ছিল না এবং জেদের বশে

১০ অমরেন্দ্রনাথ ১৯০৬, ৬ মে দ্বিতীয় ও শেষবার ক্লাসিক পরিত্যাগ করেন। ২৬ মে থেকে অপরেশচন্দ্র ও তারাসুন্দরী এখানে যোগ দেন। ঐ তারিখে ক্লাসিকে 'কপালকুণ্ডলা' মঞ্চস্থ হয়। পরদিন (২৭।৫।১৯০৬) অভিনীত হয় 'বিল্বমঙ্গল', 'প্রেমের পাথার' এবং 'তাজ্জব ব্যাপার'।

সর্বস্ব ব্যয়েও তিনি অকুণ্ঠ হতেন। মদ্যপান ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারে বেহিসাবী খরচ তো ছিলই, তার উপর ছিল পরোপকারে মুক্তহস্তে দানের অভ্যাস। থিয়েটারের অন্দর ও বাহির মহলের কতলোক যে ওঁর দ্বারা নিয়মিত আর্থিক সাহায্যে উপকৃত হতেন, তার ইয়ত্তা নেই। মিনার্ভার লিজ গ্রহণ, পরে তার সঙ্গে উপহার বিতরণের প্রতিযোগিতা, 'সৎনাম' নাটকের অভিনয় বন্ধ, পরপর কয়েকটি নাটকের আর্থিক অসাফল্য প্রভৃতির ফলে তিনি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। ক্লাসিকের শেষ পর্যায়ে দুর্ভোগ-দুশ্চিন্তায় ওঁর শরীরও ভেঙ্গে পড়েছিল। নিজের অসাধারণ অভিনয়ক্ষমতা এবং অফুরন্ত মনোবলের সাহায্যে এই সব দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠা অমরেন্দ্র-নাথের পক্ষে অসম্ভব হত না, যদি না সহৃদয় ও অনুগত (?) বন্ধু এবং স্তাবকের দল পিছন থেকে তাঁকে ছুরিকাঘাত করতেন। শত্রু-মিত্র ভেদাভেদের অন্তর্দৃষ্টি তাঁর ছিল না। বস্তুতঃ, একপ্রকার ষড়যন্ত্রের ফলেই তিনি ক্লাসিক থেকে বিতাড়িত হন এবং থিয়েটারের মালিকানা তাঁর হস্তচ্যুত হয়। অমরেন্দ্রনাথের স্বত্বাধিকারীত্বে ক্লাসিকের অস্তিত্ব আরো কিছুকাল বজায় থাকলে সামগ্রিকভাবে বাংলা মঞ্চ সমৃদ্ধতর হত, সন্দেহ নেই।

পরিশিষ্ট

ক. অভিনয়-তালিকা

নল-দময়ন্তী	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৬।৪।১৮৯৭
বেল্লিক বাজার	”	”
হরিরাজ	নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী	২১।৬।১৮৯৭
রাজা ও রানী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৪।৭।:৮৯৭
আলিবাবা	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	২০।১১।১৮৯৭
আলিবাবা		২০।২।১৮৯৮
কাজের খতম	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	”
দোললীলা	”	৮।৩।১৭৯৮
নির্মলা	”	২৫।:২।১৮৯৮
হরিরাজ		৪।৩।১৮৯৯
দোললীলা		”
প্রফুল্ল	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৮।৩।১৮৯৯
দেলদার	”	১০।৬ ১৮৯৯
শ্রীকৃষ্ণ	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৬।৮।১৮৯৯
ভ্রমর	বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসের অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত নাট্যরূপ	১৬।৯।১৮৯৯
মজা	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	১।১।১৯০০
পাণ্ডব-গৌরব	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৭।২।১৯০০
দুটী প্রাণ	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৬।৫ ১৯০০
সীতারাম	নাট্যরূপ-অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	৩০।৬।১৯০০
মনের মতন	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২০।৪।১৯০১
কপালকুণ্ডলা	নাট্যরূপ-গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১।৬।১৯০১
মৃণালিনী	”	২৭।৭।১৯০১
শিবজী	মনোমোহন গোস্বামী	২২।৩।১৯০২

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

ভ্রান্তি	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৯।৭।১৯০২
আয়না	”	২৫।১২।১৯০২
প্রতাপাদিত্য	কাহিনী-হারাণচন্দ্র রক্ষিত নাট্যরূপ-অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৯।৮।১৯০৩
সৎনাম	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৩০।৪।১৯০৪
চোখের বালি	নাট্যরূপ-অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (?)	২৭।১১।১৯০৪
প্রেমের পাথার	নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন	২৫।১২।১৯০৪
হ’ল কি	সুরেন্দ্রনাথ বসু	৪।১১।১৯০৫
প্রণয় না বিষ	কাহিনী-যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নাট্যরূপ-অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৩।১২।১৯০৫
সিরাজদ্দৌলা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২৭।১।১৯০৬

খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায়

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহেন্দ্রলাল বসু, অঘোরনাথ পাঠক, গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, চুনিলাল দেব, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দানীবাবু, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ দে, নীলমাধব চক্রবর্তী, নটবর চৌধুরী, গোষ্টবিহারী চক্রবর্তী, মনোমোহন গোস্বামী, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, নয়নতারা, শরৎকুমারী, সরোজিনী, ছোট রানী, ভূষণকুমারী, প্রমদাসুন্দরী, পান্নারানী, তিনকড়ি দাসী, গোলাপসুন্দরী, হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী), কিরণবালা, ভুবনেশ্বরী, রানীসুন্দরী, বিনোদিনী (হাঁদি) প্রভৃতি।

গ. বিজ্ঞাপন

CLASSIC THEATRICAL CO.

ক্লাসিক থিয়েটরিক্যাল কোং ।

RAJA-O-RANI.

রাজা ও রাণী

COME ONE AND COME ALL.

ক্লাসিক মঞ্চে

স্বরচিত 'রাজা ও রানী' নাটকের দর্শকরূপে

রবীন্দ্রনাথ

(১৮৯৭)

কোহিনূর থিয়েটার
(১৯০৭-১৯১২)

ক্লাসিকের পর কোহিনূর।

ক্লাসিক নিলামে উঠলে ১৯০৭-এর এপ্রিলে এক লক্ষ আট হাজার টাকায় শরৎকুমার রায় সেই বাড়ী কেনেন। উনি ছিলেন নদীয়া জেলার কুড়ুলগাছির জমিদার প্রসন্নকুমার রায়ের পুত্র। শরৎবাবু মনোমোহন পাঁড়ের সঙ্গে পার্টনারশীপে ঠিকাদারী ব্যবসা করতেন। সেই সূত্রে পাঁড়ে-মালিকানার মিনার্ভা থিয়েটারে ওঁর যাওয়া-আসা ছিল। মিনার্ভায় 'প্রফুল্ল' নাটকের আর্থিক সফলতা দেখে রায়মশায় থিয়েটার ব্যবসায় প্রলুব্ধ হন এবং এর প্রায় ছ'বছর পরে ক্লাসিক থিয়েটার (এমারেল্ডের বাড়ী) কিনে কোহিনূর থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন।

শরৎকুমার থিয়েটার কেনার পর ষ্টারের তদানীন্তন অবৈতনিক অভিনেতা অপরেশচন্দ্র এখানে চলে আসেন। ক্ষেত্রমোহন মিত্র সে সময় বেকার, (মতান্তরে, ন্যাশনাল হ'তে) তিনিও এসে কোহিনূরে নাম লেখান। বাড়ী মেবামত ও দৃশ্যসজ্জার জন্য ধর্মদাস সুরকে আগেই নেওয়া হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর ছ'জনেই তখন মিনার্ভায়, সেখানে জোর কদমে গিরিশচন্দ্রের নতুন নাটক 'ছত্রপতি শিবাজী' খোলার তোড়-জোড় চলেছে। স্থির হল, অন্য থিয়েটার ভাঙিয়ে নয়— চুনিলাল দেব, তাঁর ভাই নিখিলকৃষ্ণ দেব এবং যেসব নট-নটী বসে আছেন, তাঁদের নিয়ে কোহিনূরের পত্তন হবে। কিন্তু গোড়াতেই, উদ্যোক্তাদের সঙ্গে · তর গরমিলে চুনিবাবু এখানে যোগ দিতে নারাজ হওয়ায় দল ভাঙিয়ে দল গড়া ছাড়া উপায় রইলো না। সেই চেষ্টায় প্রথমে যাওয়া হল অমৃতলাল বসুর কাছে।

রসরাজ বরাবরই এই সব ভাঙা-ভাঙির বিপক্ষে, তাই নতুন লোককে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন তিনি। জবাবে কোহিনূরের পক্ষ থেকে তাঁকেই আচার্যের পদে আবাহন করা হল। দু'চার দিনের পরামর্শের পর রাজী হয়ে অমৃতলাল যোগদানের জন্য ছ'মাস সময় চাইলেন। এক চতুর্থাংশ মালিকানার নিজের থিয়েটার ষ্টারের অবস্থা তখন ভাল নয়, সেই কারণে তাঁর দু'দিক বজায় রাখার এই চেষ্টা। ছ'মাস অপেক্ষার উপায় না থাকায় শরৎবাবুদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হল, একমাসের নোটিশে আসতে রাজী থাকলে তিনি ছ' হাজার টাকা বোনাস ও মর্যাদা অনুযায়ী ভাতা পাবেন। সময়ের সর্ত মঞ্জুর না হওয়ায় অমৃতলাল পিছিয়ে গেলেন। এরপর গিরিশ-চন্দ্রের কাছে যাওয়া হল। তিনি বললেন, নতুন ক'রে দল গড়ার বয়স ও সময় তাঁর নেই, তার চেয়ে উদ্যোক্তারা যেন সব থিয়েটার থেকে বেছে বেছে লোক ভাঙিয়ে আনেন। তাছাড়া, তাঁর একা কোহিনূরে গিয়েই বা লাভ কি? গিরিশচন্দ্রের হাতে তখন নতুন কোনো নাটক মজুত নেই। ওঁর 'ছত্রপতি শিবাজী' সে সময় মিনার্ভায় রিহার্সালে পড়েছে। সেই বই ফিরিয়ে নিয়ে কোহিনূরে দেওয়া অসম্ভব।

নটগুরুর পরামর্শমত দল ভাঙানো সুরু হল। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদকে আনা হল ষ্টার থেকে। মিনার্ভা ছেড়ে এলেন মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু), তিনকড়ি দাসী ও কিরণবালা। ন্যাশনাল থেকে শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু) এবং তারাসুন্দরী। এরপর মিনার্ভা থেকে দানীবাবুকে আনা হয়। সবশেষে যোগ দিলেন গিরিশচন্দ্র স্বয়ং।

ক্ষীরোদপ্রসাদকে আনতে খুবই বেগ পেতে হয়েছিল। অধ্যাপনা ত্যাগের পর সে সময় উনি ষ্টারের স্থায়ী এবং সম্মানিত নাট্যকার। ওখানকার 'প্রতাপাদিত্য' তাঁকে অর্থ ও খ্যাতি দুই-ই দিয়েছে। ষ্টার ছেড়ে তিনি কিছুতেই আসতে চান না, শেষে ওঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু

সুরেশ সমাজপতিকে ধরে ওঁকে আনা হল। ক্ষীরোদপ্রসাদ এসে নতুন নাটক লেখা সুরু করলেন— 'চাঁদবিবি'। দানীবাবুকে আনতে তিন হাজার টাকা বোনাস লেগেছিল। তিনকড়ি আর তারাসুন্দরী প্রত্যেকে হাজার ক'রে নিয়েছিলেন। আর সবাই কেউ পাঁচশ, কেউ আড়াইশ, কেউ দু'শ— যার বাজারদর যেমন।

এই ভাঙ্গনের তোড়ে মিনার্ভা যায় যায়, ষ্টারের অবস্থাও তথৈবচ। মিনার্ভা কতকটা সামলাবার জন্য নিয়েছিল অমরেন্দ্রনাথকে। সেখানে নাট্যকাররূপে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন, অতুলকৃষ্ণ মিত্রও ছিলেন তবু তাঁরা গিরিশচন্দ্রকে ছাড়তে নারাজ। এগ্রিমেণ্ট থাকা সত্ত্বেও ওখানকার মালিক মনোমোহন পাঁড়ে দানীবাবুকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। মিনার্ভার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের এগ্রিমেণ্ট ছিল না। তাঁর সাথে যখন কোহিনূরের কথাবার্তা চলছে, সে সময় ষ্টারও তাঁকে পাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। যাইহোক, কোহিনূরের পক্ষ থেকে অপরেশচন্দ্র ও ক্ষেত্রমোহন সে যাত্রায় অনেক কষ্টে গিরিশচন্দ্রকে তাঁদের তরফে আনতে পেরেছিলেন। গিরিশচন্দ্র দশ হাজার টাকা বোনাস এবং পাঁচশ টাকা (মতান্তরে চারশ টাকা) বেতনে শেষ পর্যন্ত কোহিনূরে যোগ দিলেন।[১] কোহিনূরের প্রথম নাটক ক্ষীরোদপ্রসাদের 'চাঁদবিবি'র পঞ্চম অঙ্ক গিরিশচন্দ্রের লেখা।

১৯০৭, ১১ আগস্ট 'চাঁদবিবি' দিয়ে কোহিনূর থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। 'আত্মদর্শন' নাটকের রচয়িতা ও শিল্পী মহাতাপচন্দ্র ঘোষ 'চাঁদবিবি' নাটকের পোষাক তৈরীর ভার নিয়েছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার থেকে ছবি এনে কর্তৃপক্ষ সাজ-সজ্জার পরিকল্পনা করেন। প্রধান প্রধান ভূমিকাগুলি বাঁটোয়ারার পর যোগ দেওয়ায়, দানীবাবু অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র আদিল

১ কোহিনূরের উদ্যোগপর্ব প্রধানতঃ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' অবলম্বনে রচিত।

শা-রূপে মঞ্চে নামতে বাধ্য হন। এতে উনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কোহিনূরের উদ্বোধন প্রসঙ্গে 'বঙ্গবাসী' (১০।৮।১৯০৭) লিখলে :— "কোহিনূর উদ্‌ঘাটন— আগামী রবিবার সন্ধ্যার সময় নব প্রতিষ্ঠিত কোহিনূর থিয়েটার উদ্‌ঘাটিত হইবে। অভিনয় হইবে— কবি শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নব নাটক "চাঁদবিবি"। দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগরের অধিশ্বরী বীর নারী সুলতানা চাঁদবিবির পরিচয় ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। "চাঁদবিবি"র লেখক যেমন সুযোগ্য— বিষয়ও তেমন মনোজ্ঞ; নব নাট্যশালায় "চাঁদবিবি" খুলিবে ভাল। কোহিনূরে ষ্টেজ ম্যানেজার হইয়াছেন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর। অপেরা মাষ্টার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। কনসার্ট বাজাইবেন দক্ষিণাবাবু। আসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিজনেস ম্যানেজার শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দে আর প্রধান ম্যানেজার স্বয়ং নটবর গিরিশচন্দ্র। সুতরাং কোহিনূরে "চাঁদবিবি" মানাইবার আর বাকী কি?" প্রথম রজনীর ভূমিকালিপি ছিল এইরকম :—আদিল শা-সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), ইব্রাহিম-ক্ষেত্রমোহন মিত্র, এখ্‌লাশ খাঁ-মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল, মিয়ানমঞ্জু-অটলবিহারী দাস, রঘুজী-মন্মথনাথ পাল, মল্লজী-অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চাঁদবিবি-তারাসুন্দরী, যোশীবাই-তিনকড়ি দাসী, মরিয়ম-ভূষণকুমারী (ছোট) ও তাজবিবি-কিরণবালা। 'চাঁদবিবি' সেকালের নাট্যজগতে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। প্রথম অভিনয়ের রাত্রে টিকিট বিক্রয় হয় ২৬০০ টাকার (মতান্তরে ২২৫০ টাকার) যা তদানীন্তন-কালে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। উদ্বোধনরজনীর অন্যতম দর্শক কলারসিক হেমেন্দ্রকুমার রায় পরবর্তীকালে লিখেছেন :— "...প্রথম নাটকের নাম বিজ্ঞাপিত হ'ল ক্ষীরোদপ্রসাদের "চাঁদবিবি"। রং-বেরঙের জমকালো প্রাচীরপত্রে সহর ছেয়ে গেল— নূতন এক উপভোগের আশায় নাট্যরসিকরা উন্মুখ হয়ে উঠলেন। তারপর সে কী ঘটা ক'রে প্রথম অভিনয়ের আয়োজন! অনেক কষ্টে এক

টাকার জায়গায় তিন টাকা খরচ ক'রে একখানি টিকিট সংগ্রহ করলুম (তখনকার দিনে তিন টাকা ছিল খুব উচ্চাসনের মূল্য, অত দাম দিয়ে সেই-ই প্রথম টিকিট কিনলুম, কারণ আর সব আসন বিকিয়ে গিয়েছিল)। ভিতরে গিয়ে দেখি, প্রেক্ষাগারে তিলধারণের ঠাঁই নেই— চারিদিকে যেন বাদুড় ঝুলছে! সেই রাত্রে তখনকার নাট্য-রসিকদের মধ্যে যে আবেগ, উত্তেজনা ও আনন্দের প্রকাশ দেখেছিলুম, এখনকার প্রেক্ষাগারের বিশেষ কোন অভিনয়েরও সময়ে তা আর দেখতে পাই না। তখন অভিনয় দেখে আমরাও যতটা তৃপ্তি লাভ করতুম, সে তৃপ্তিও এখনকার কোন অভিনয় দিতে পাবে না। তখন 'আর্ট', 'আর্ট' ব'লে কেউ চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাতো না, কিন্তু তখনকার ড্রপসিন পর্য্যন্ত আর্টের হরেকরকম বিজ্ঞাপনের হরফে ক্ষতবিক্ষত ও কুৎসিৎ হয়ে উঠত না। তখনকার ঐকতান-বাদনও ছিল কলাবিদের উপভোগ্য, রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তার জন্যেও এখনকার চেয়ে ঢের বেশী টাকা খরচ করতেন। মনে আছে, সখী-সঙ্ঘের নাচগানের সঙ্গে স্বর্গীয় দক্ষিণাচরণ সেনের নেতৃত্বে ঐকতান-বাদন বাংলা রঙ্গালয়ে প্রথম শুনি "কোহিনূরে"র সেই প্রথম রাত্রেই।…" (নাচঘর— ২৫।৫।১৯৩৪)

অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ— "চাঁদবিবিতে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল অভিনয় করেন যোশীবিবির ভূমিকায় তিনকড়ি, চাঁদবিবির ভূমিকায় তারাসুন্দরী, রঘুজীর ভূমিকায় হাঁদুবাবু ও ইব্রাহিমের ভূমিকায় ক্ষেত্রমোহন মিত্র।…অন্য দুই তিনটি ভূমিকাও খুব ভাল হইয়াছিল। তবে এ নাটকে দানিবাবু বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই।…"

১৫ সেপ্টেম্বর গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি শিবাজী' মঞ্চস্থ হল। মিনার্ভাতেও তখন এই নাটক চলেছে।[২] কোহিনূরের অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র,

২ মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি শিবাজী'র প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় ১৭ আগস্ট, ১৯০৭।

দানীবাবু, তিনকড়ি ও তারাসুন্দরী যথাক্রমে আওরঙ্গজেব, শিবাজী, জিজাবাই এবং লক্ষ্মীবাই-এর ভূমিকায় নামলেন। অভিনয় দেখে ১৯০৭, ১৯ সেপ্টেম্বর 'বেঙ্গলী' জানালে :— "'Chhatrapati' at the Kohinoor Theatre :— The Kohinoor Theatre, which has lately come into existence and which comprises some of the best talents of the Indian stage, has begun to arrest the attention of the Theatregoing public of Calcutta. Chand Bibi, with which the playhouse was ushered into being, has established its reputation and that reputation has undoubtedly been enhanced by the performance of Chhatrapati, which was put on its boards for the first time on Sunday evening last. The life story of Sivaji has always a fascinating interest for the Indian and the way in which it was presented at the Kohinoor was simply magnificent. Babu G. C. Ghose as Aurangzebe and Suren Ghose as Sivaji were unexceptionable, while the other parts, male and female, were entrusted to competent hands who rendered a very excellent account of themselves. The scenery and the dresses were gorgeous and quite in keeping with the time when Sivaji lived. Altogether the play has been an unqualified success on which the management deserve the congratulations of the playgoing public." 'বসুমতী' বললে :— "...শিবাজীর অভিনয় খুব সুন্দর হইয়াছিল ; স্বনামখ্যাত অভিনেতা শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ শিবাজীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। আওরঙ্গজেব স্বয়ং গিরিশবাবু। জিজিবাই প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী শ্রীমতী তিনকড়ি দাসী বড় সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন; আর শ্রীমতী তারাসুন্দরী তানাজীর পত্নী লক্ষ্মীবাই-এর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া যেরূপ অভিনয় করিয়াছেন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে তাহার তুলনা নাই।" (২১।৯।১৯০৭) প্রতিদ্বন্দ্বী মিনার্ভার 'ছত্রপতি শিবাজী'ও খুব সুখ্যাতি পেয়েছিল।[৩] দুই থিয়েটারের অভিনয় দেখে জনৈক নাট্যরসিক ১৯০৭, ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখের 'বঙ্গবাসী'তে অভিমত প্রকাশ করলেন:— "...আমি গত সপ্তাহে এই উভয় থিয়েটারেই ছত্রপতির অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছি।...উভয় থিয়েটারের অভিনয়ই তুল্যমূল্য।...মিনার্ভায় শিবাজী অমরেন্দ্রবাবু. কোহিনূরে শিবাজী দানীবাবু।...এ বলে আমায় দেখ; ও বলে আমায় দেখ।... দুই থিয়েটারেই অতি সুন্দর সমান অভিনয়। দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, নাচগান সবই প্রায় তুল্যমূল্য। উভয় থিয়েটারেই কর্তৃপক্ষগণ এতদর্থে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। উভয় থিয়েটারই লোকে লোকারণ্য।..." হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তুলনামূলক আলোচনায় লিখেছেন:— "কোহিনূরে গিরিশচন্দ্র, দানিবাবু, তিনকড়ি,

৩ মিনার্ভার অভিনয়ও যে উপভোগ্য এবং জনপ্রিয় হয়েছি' 'স্টেট্সম্যান' পত্রিকার নীচের সমালোচনা তার প্রমাণ। ১৭ নভেম্বর, ১৯০৭ পত্রিকাখানি লিখেছিল:— "The popularity of...Chhatrapati,.. , is manifest from the large audiences which are attracted to the Minerva Theatre on every occasion that this thrilling play is billed. Though it has been running for about ten weeks now, the large auditorium was crammed in every part and early in the evening the sale of tickets had to be stopped, the large overflow helping to fill the adjacent play-houses. Babu Amarendro Nath Dutt was in excellent form and the entire company played upto his high standard."

তারাসুন্দরী প্রভৃতি থাকায় অভিনয় যে খুব ভাল হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সমবেত অভিনেতৃমণ্ডলীর অভিনয়ই খুব ভাল হইয়াছিল। আগ্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শিবাজীর উত্তেজনাপূর্ণ কথার দানীবাবু যে অভিনয় করেন তাহা অপূর্ব্ব। কিন্তু চেহারায় অমরেন্দ্রনাথকে অধিক মানাইয়াছিল। কোহিনূরের সইবাই ও পুতলাবাইর চেহারা ছিল খুব মানানসই আর অভিনয় চলনসই, কিন্তু মিনার্ভার এই দুই ভূমিকা হইত অনেক ভাল। মিনার্ভার গঙ্গারাম প্রাণস্পর্শী অভিনয় করিয়া ভূমিকার মর্য্যাদা বেশ রক্ষা করিতে সমর্থ হইত, কিন্তু হাঁদুবাবু হইত একেবারে অপূর্ব্ব। মিনার্ভার তানাজী কোহিনূরের অপেক্ষা ভাল হইত। তারাসুন্দরীর লক্ষ্মীবাইতে আগুন ছুটিত, জিজিবাইতে শিবাজীর মাতার মহৎ চরিত্র ফুটিয়া উঠিত, আর মিনার্ভার আওরঙ্গজেবে কোনরূপ ত্রুটি না থাকিলেও, গিরিশচন্দ্রের আওরঙ্গজেব সমালোচনা করিতে গিয়া বঙ্গবাসী ঠিকই বলিয়াছিল "তাঁহারই তুলনা তিনি এ মহীমণ্ডলে।......" (ভারতীয় নাট্যমঞ্চ) পূজার পর বুধবারের নাটক হিসাবে 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাম ঘোষণা করা হল। এবং এই নাটকের অভিনয় নিয়ে মান-অভিমানের ফলে তারাসুন্দরী, পরে অপরেশচন্দ্র কোহিনূর ছাড়লেন। ১৬ নভেম্বর নামলো গিরিশচন্দ্রের দেশপ্রেমমূলক নাটক 'মীরকাসিম'। নামভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন দানীবাবু আর তিনকড়ি দাসী সাজলেন তারা। কোহিনূরে 'মীরকাসিম' নাটকের অভিনয় জনসংবর্দ্ধনা লাভ করেছিল। সংবাদপত্রে সমালোচনা বেরুল :— "The exceedingly lavish manner in which "Mir Kassem" has been staged at the Kohinoor Theatre assist materially in enhancing the enjoyment of this piece, which deals with the incidents of the tumultuous period that followed the accession of Mir Kassem to the throne and the strenuous fight

that ruler had with the East India Company for the protection of indigenous industries. The acting all round reaches a high watermark of excellence, and the huge audience testified their appreciation in a most unmistakable manner.…" (স্টেট্সম্যান— ১৭।১১। ১৯০৭) বছরের শেষ নাটক ক্ষীরোদপ্রসাদের 'দাদা ও দিদি'।[8] প্রথম অভিনয়ের তারিখ— ২৫ ডিসেম্বর, ১৯০৭। 'দাদা ও দিদি'র ভূমিকালিপি :— তক্ষক (দাদা)-মন্মথনাথ পাল, শঙ্খিনী (দিদি)-কিরণবালা এবং চন্দ্রবিন্দু (হট্টমালার বড় ঠাকুর)-কানাইলাল দাশ। নাটকখানি খুব জমেছিল।[৫] গিরিশচন্দ্র এই সময় হাঁপানিতে শয্যা নেওয়ায় দানীবাবুকে বাধ্য হয়ে এ-নাটকের পরিচালনা ভার গ্রহণ করতে হয়। রাজদ্রোহিতার অজুহাতে ১৯১১, ১৮ জানুয়ারি ইংরেজ সরকার 'দাদা ও দিদি'র অভিনয় বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। বছরের শেষ দিনে (১৯০৭, ৩১ ডিসেম্বর) স্বত্বাধিকারী শরৎকুমার রায় মারা যান এবং তাঁর ভ্রাতা শিশিরকুমার রায় এস্টেটের ও কোহিনূর থিয়েটারের রিসিভার নিযুক্ত হন। শরৎবাবুব মৃত্যুর পর কোহিনূরে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সেখান থেকে গিরিশচন্দ্র ও দানীবাবুকে

---

৪ "নাট্যকার এই রঙ্গনাট্যের দশটি দৃশ্যের ভিতর দিয়া এক রূপকের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে যারা কল্পনার কল্পলোকে বিরাজ করিয়া স্বদেশজাত চাষ-আবাদ-শিল্পাদি ছাড়িয়া দিয়া বিজাতীয় সভ্যতার আলস্যে গা ঢালিয়া দেয়, তারা আপন আবাসে পর হইয়া সব খোয়াইয়া ফেলে। কমলা ও কর্মানন্দের প্রসাদে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে বাঁচিবার উপায় হয়।…… এ জাতীয় রূপক প্রণয়নে ক্ষীরোদপ্রসাদই প্রথম হস্তক্ষেপ করিলেন।" (দৃশ্যকাব্য-পরিচয়— সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়)

৫ এই নাটকখানি মঞ্চস্থ হওয়ার ফলে "কোহিনূরের প্রতিষ্ঠা ও অসম্ভব বৃদ্ধি পাইল। প্রতি রাত্রে স্থানাভাবে বহু দর্শক ফিরিয়া যাইতে লাগিল।" (ভারতীয় নাট্যমঞ্চ— হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত)

মিনার্ভায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয় কিন্তু দানীবাবু এলে নায়কের ভূমিকা নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হ'তে পারে ভেবে মিনার্ভার তদানীন্তন ম্যানেজার ও প্রধান অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত আপত্তি জানান।[৬] ফলে, সে যাত্রা গিরিশচন্দ্র ও দানীবাবুর কোহিনূর ত্যাগ ঘটে ওঠে নি।

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রাজা অশোক' অভিনীত হল ১৯০৮, ৭ মার্চ তারিখে। গিরিশচন্দ্রের তখনও থিয়েটারে আসার ক্ষমতা ছিল না, দানীবাবুই অভিনয়শিক্ষা দিতেন। তাঁকে সাহায্য করতেন ক্ষেত্রমোহন মিত্র। নাটক খোলার ঠিক আগে বেতন নিয়ে গোলমাল হওয়ায় মন্মথনাথ পাল, ক্ষেত্রমোহন মিত্র ও মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল কোহিনূর ছেড়ে গেলেন। শিশিরকুমারের পক্ষে তখন অপরেশচন্দ্র এবং তারাসুন্দরীকে ষ্টার থেকে ফিরিয়ে আনা ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। রিহার্সাল শেষ হওয়ার মুখে আসায় 'রাজা অশোকে' ওঁরা দুজনে নামেন নি। তবে, শিশিরবাবুর অনুরোধে ফিরে আসা আর একজন নট মন্মথনাথ পাল এ-নাটকে তাঁর আগের ভূমিকাই গ্রহণ করেছিলেন। অশোক, বিন্দুসার, বীতশোক, রাধাগুপ্ত, বিনায়ক, ধারিণী ও চিত্রা চরিত্রে রূপদান করলেন যথাক্রমে দানীবাবু, কার্তিকচন্দ্র দে, অটলবিহারী দাস, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, মন্মথনাথ পাল, তিনকড়ি দাসী এবং সরোজিনী (মোটা)। 'রাজা অশোক' জমলো না।[৭] ১৫ মার্চ 'ছত্রপতি শিবাজী' দেখতে এলেন বাগ্মীপ্রবর বিপিনচন্দ্র পাল। দেখে খুব সুখ্যাতি করলেন। ৪ এপ্রিল ক্ষীরোদ-

---

৬ গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটকে ভীমের ভূমিকা নির্বাচন নিয়ে একদা এই দুই সমকালীন শক্তিধর নটের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। (দ্র. ক্লাসিক থিয়েটার) 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকের নামভূমিকায় উভয়ের প্রতিযোগিতামূলক অভিনয়ের উল্লেখতো বর্তমান অধ্যায়েই আছে।

৭ "কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হইলেও নাটকখানি বেশী দিন চলে নাই...।" (নাচঘর/পৌষ, ১৩৪১—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

প্রসাদের 'বাসন্তী মেলা' (অপেরা) নামলো। পরলোকগত শরৎ-কুমারের ইচ্ছা ছিল বসন্তকালে কোহিনূর প্রাঙ্গণে বাসন্তী মেলা নামে এক প্রদর্শনী খোলার। সেইমত উনি বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন। ওঁর মৃত্যুর পর শিশিরকুমার ক্ষীরোদপ্রসাদকে দিয়ে ঐ নামে নাটক লিখিয়ে স্বর্গত অগ্রজের অচরিতার্থ বাসনা ভিন্নরূপে পূরণ করেন। 'বাসন্তী মেলা'য় অটলবিহারী দাস, মন্মথনাথ পাল, কিরণ (টালা'র) এবং কুমুদিনী (বেঁটে) যথাক্রমে চাকাদাস, সুরেশ্বর, জয়া ও পুঁইমণি সাজলেন। বলা দরকার, পরবর্তীকালে চাকাদাস চরিত্রের রূপায়ণে অপরেশচন্দ্রের বিশেষ খ্যাতি ছিল। ২ মে পণ্ডিত নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন রচিত নক্সা 'বাজীমাৎ' মঞ্চস্থ হল। নায়ক-নায়িকারূপে দেখা দিলেন দানীবাবু ও ভূষণকুমারী। ১৩ জুন অভিনীত হল গিরিশচন্দ্র নাটকায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'। ভূমিকালিপি :—অভিরাম স্বামী-পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ওসমান-দানীবাবু, বিদ্যাদিগ্‌গজ-মন্মথনাথ পাল (?), আয়েষা-তারাসুন্দরী, বিমলা-তিনকড়ি দাসী ও তিলোত্তমা-ভূষণকুমারী। 'দুর্গেশনন্দিনী' মিনার্ভার বিজয়-বৈজয়ন্তী।[৮] সেখানে যাঁরা অভিনয় ক'রে যশস্বী হয়েছিলেন এবার তাঁরা এখানে। সুতরাং বলা বাহুল্য, কোহিনূরের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রশংসা থেকে বঞ্চিত হল না। ১১ জুলাই কোহিনূর ক্ষীরোদপ্রসাদের লে ' 'বরুণা' মঞ্চস্থ করলে। নাটকখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

শরৎকুমার রায়ের মৃত্যুর পর থেকে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে থিয়েটারের সম্পর্ক ভাল চলছিল না। আগেই বলা হয়েছে, গিরিশচন্দ্র কোহিনূরে আসা অবধি প্রায়ই হাঁপানিতে ভুগছিলেন। নতুন নাটক লেখা বা

৮ মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্র নাটকায়িত 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৯০৬, ২১ ফেব্রুয়ারি প্রথম অভিনীত হয়। সেখানে ওসমান, আয়েষা ও বিমলা সাজতেন যথাক্রমে দানীবাবু, তারাসুন্দরী ও তিনকড়ি দাসী। কোহিনূরেও এই ভূমিকালিপি অনুযায়ী অভিনয় হয়েছে।

পরিচালনার কাজে শরীর ও মন দেওয়া তাঁর পক্ষে দিন দিন অসম্ভব হয়ে উঠছিল। ক্রমাগত অসুস্থতায় বিরক্ত হয়ে নতুন মনিব গিরিশ-চন্দ্রের বেতন বন্ধ ক'রে দিলেন। গিরিশচন্দ্র শিশিরবাবুর মতলব বুঝতে না পেরে বসন্তে শরীর একটু সুস্থ হওয়ায় 'ঝাঁসির রানী' লিখতে সুরু করলেন। দুই অঙ্ক লেখা শেষ হওয়ার পর উপরতলার এক পুলিশ অফিসার ওঁকে ঐতিহাসিক নাটক রচনায় নিষেধ করায় গিরিশচন্দ্র সামাজিক নাটকে হাত দেন।[১] চার অঙ্ক লেখার শেষে দেখা গেল তাঁর তিন মাসের বেতন বাকী পড়েছে। বারংবার তাগাদা সত্ত্বেও টাকা না পাওয়ায় গিরিশচন্দ্র আদালতের আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। শিশিরকুমার রায় এ সময়ে শরৎবাবুর এস্টেটের দেনা ও বিশৃঙ্খল থিয়েটার নিয়ে বিব্রত, তিনি বুঝতে পারলেন না যে গিরিশবাবুর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে লাভজনক। ওঁর এই একটি ভুলে নটগুরুর সাথে কোহিনূরের সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হয়ে যায়। গিরিশচন্দ্রকে আরো কিছুকাল ধরে রাখতে পারলে তাঁর থিয়েটারের পতন এত ত্বরান্বিত হত না। সে যাই হোক, আদালতের বিচারে জয়ী হয়ে বকেয়া টাকা পেয়ে গিরিশচন্দ্র ১৯০৮-এর জুলাই মাসে মিনার্ভায় যোগ দিলেন। সঙ্গে নিলেন পুত্র দানীকে। নটগুরু মিনার্ভায় গেলে সেখান থেকে অর্দ্ধেন্দুশেখর এসে কোহিনূরের শিল্পীগোষ্ঠীভুক্ত হলেন এবং ৫ আগস্ট দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'জেনানাযুদ্ধে'র অভিনয়ে কর্তার ভূমিকায় তাঁকে দেখা গেল। গিরিশচন্দ্র চলে যাওয়ার পর এই সময় সংবাদ-পত্রে কোহিনূরের স্টেজ ম্যানেজার ধর্মদাস সুরের নামে বিজ্ঞাপন দেওয়া হতে থাকে। ৯ আগস্ট 'নবীন তপস্বিনী' এবং 'প্রফুল্ল'

১ গিরিশচন্দ্রের শেষ অসমাপ্ত নাটক 'গৃহলক্ষ্মী'। নাটকটির পঞ্চম অঙ্ক দেবেন্দ্রনাথ বসুর রচনা। প্রথম অভিনয়— মিনার্ভায়, ১৯১২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর।

অভিনীত হল। অর্দ্ধেন্দুশেখর যথাক্রমে জলধর ও যোগেশ সাজলেন। এই ওঁর শেষ অভিনয়। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৯০৮, ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, অসাধারণ অভিনেতা ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনয়শিক্ষক অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর মৃত্যু হয়।

১৯ সেপ্টেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদের 'একতা'(?) এবং ১৭ অক্টোবর দুর্গাদাস দে বিরচিত নক্সা 'মহিলা মজলিশ' অভিনয়ের পর ২১ নভেম্বর কোহিনূর 'দৌলতে দুনিয়া' (ক্ষীরোদপ্রসাদ) খুললে। এ-নাটক আগে 'সপ্তম প্রতিমা' নামে ষ্টারে মঞ্চস্থ হয়েছিল।[১০] রোমান্স ও বাস্তব চরিত্রের সংমিশ্রণে এই নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে। নায়ক মুশাদ সার ভূমিকায় অপরেশচন্দ্র প্রশংসা পেলেন। অন্যান্য চরিত্রের রূপদানে ছিলেন পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (ফকির), মন্মথনাথ পাল (নুরবক্স), অটলবিহারী দাস (বকাউল্লা) ও বিষাদ কুসুম (বেলা)। ১১ ডিসেম্বর থেকে অপরেশচন্দ্রের নাম কোহিনূরের Offg. Manager রূপে দেখা গেল। ২৫ ডিসেম্বর নামলো ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভূতের বেগার' (নক্সা)। পরের দিন হল হরনাথ বসুর 'পাঞ্জাব গৌরবে'র উদ্বোধন। "দর্শকগণের আনন্দধ্বনির সহিত প্রথমাভিনয় রজনী সুশৃঙ্খলায় সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এমন কি কয়েকটি উদারহৃদয় শিখ যুবক আসিয়া আনন্দ ও উৎসাহে অভিনেতাগণকে শিখের পোষাক এবং পাগড়ী-পরিধানে সাহায্য পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় অভিনয়রজনীতে শিখসম্প্রদায় উত্তেজিত হইয়া অভিনয় আরম্ভেই বন্ধ করিয়া দেন। গুরু-জননীর ভূমিকা বারাঙ্গনা দ্বারা অভিনীত হওয়ায় ইঁহারা মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। ইহার পর নাটকখানি মহারাষ্ট্র-বীর রাজারামের আখ্যায়িকায় পরিবর্ত্তিত করিয়া "বীরপূজা" নামে অভিনীত হয়। এই নাটকের নায়ক রাজারামের ভূমিকা অভিনয়ে অপরেশবাবু অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

---

১০ ১৯০২, ১৯ জুলাই ষ্টারে প্রথম অভিনয়।

গোবর্দ্ধনের ভূমিকায় হাঁদুবাবু রঙ্গালয়ে রসের প্রস্রবণ ছুটাইয়াছিলেন। রঙ্গনাথের ভূমিকায় ক্ষেত্রমোহনবাবুও সর্ব্বজনসমাদৃত হইয়াছিলেন। নাটকখানি নাট্যজগতে সাড়া আনিয়াছিল।…" (নাচঘর / ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৩৪—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

১৯০৯, ৩০ জানুয়ারি 'বীরপূজা'র প্রথম অভিনয়ানুষ্ঠানে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। ৮ মে কোহিনূর হরনাথ বসুর 'ময়ূর সিংহাসন'[১১] মঞ্চস্থ করলে। ভূমিকালিপি ঃ— সাজাহান-পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, দারা-অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আওরঙ্গজেব-ক্ষেত্রমোহন মিত্র, মোরাদ-অটলবিহারী দাস, জিহন আলি-মন্মথনাথ পাল, রোশেনারা-প্রমদাসুন্দরী, নাদিরা-কিরণ (টালা'র), সিপার-ভূষণকুমারী এবং আমিনা-চারুবালা। 'ময়ূর সিংহাসনে'র একটি দৃশ্যে মঞ্চকৌশলে জীবন্ত মানুষকে ভস্মীভূত দেখানো হত। ৩ জুলাই যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'নেড়া হরিদাস' উপন্যাস অবলম্বনে দুর্গাদাস দে (মতান্তরে হরিচরণ চক্রবর্তী) কৃত নাটক 'প্রতিফল' নামলো। বিধবার ভূমিকাভিনয়ে তারাসুন্দরী দক্ষতার পরিচয় দিলেন। ২১ আগস্ট অভিনীত হল 'সোনার সংসার' (দুর্গাদাস দে)। প্রথম অভিনয় রাত্রের ভূমিকালিপি ছিল এইরকম ঃ— খেঁদারাম মজুমদার-মন্মথনাথ পাল, দেবদাস-রামকালী বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণনাথ বসু-ক্ষেত্রমোহন মিত্র, কৃষ্ণা-ভূষণকুমারী, বীণা-প্রমদাসুন্দরী। নাটকখানি জমেছিল। 'সোনার সংসারে'র আগেই অপরেশচন্দ্র ও তারাসুন্দরী কোহিনূর ছেড়ে বাণী থিয়েটার নামে এক ভ্রাম্যমাণ সম্প্রদায় গঠন করেন এবং এখানকার কয়েকজন নট-নটী তাতে যোগ দেন। ২৫

---

১১ "কেবলমাত্র অপরেশবাবুর দারার ভূমিকা নহে, প্রত্যেক ভূমিকাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে অভিনীত হইয়া নাটকখানি নাট্যামোদীগণের নিকট আদৃত হইয়াছিল। এস্থলে বলা আবশ্যক, স্বর্গীয় ডি, এল, রায়ের 'সাজাহান' নাটক ইহার প্রায় চারি মাস পরে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। (২৯শে আগষ্ট, ১৯০৯)" (অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

ডিসেম্বর কোহিনূরে হরিপদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'রানী দুর্গাবতী'র[১২] উদ্বোধন হল। প্রমদাসুন্দরী, ভূষণকুমারী, চারুবালা, ক্ষেত্রমোহন মিত্র ও মন্মথনাথ পাল যথাক্রমে দুর্গাবতী, মতিবিবি, রূপমতী, বাজবাহাদুর এবং জগন্নাথের চরিত্রে অবতীর্ণ হলেন। রচনা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও 'রানী দুর্গাবতী' কোহিনূরে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এবং পরবর্তীকালেও এ-নাটক বিভিন্ন রঙ্গালয়ে বহুবার অভিনীত হয়েছে। 'রানী দুর্গাবতী'তে আরাবল্লী পর্বতের জলপ্রপাতের দৃশ্যে দর্শকরা মুগ্ধ হতেন।

১৯১০-এর সুরু রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' দিয়ে। প্রথম অভিনয়— ৯ জানুয়ারি। ৯ মার্চ 'ভূতের বিয়ে' নামে এক নক্সা খোলা হল। ২০ মার্চ নট-নটী এবং কলাকুশলীদের 'বেনিফিট নাইটে' 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মেঘনাদবধ', 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী', 'বঙ্গবিজেতা', 'রাজা ও রানী', 'জনা', 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি ২৪টি নাটকের নির্বাচিত দৃশ্য, সঙ্গীত ও নৃত্যপরিবেশন করলেন কোহিনূরের শিল্পীগোষ্ঠী।

এই উপলক্ষে ১৯১০, ১৮ মার্চ তারিখের 'বেঙ্গলী'তে নীচের আবেদনটি প্রচারিত হয়েছিল:— "It is to be hoped that the appeal of the player who has so conscientiously tried to entertain the patrons of the stage for over

১২ "ইতিহাসের পটভূমিকার উপর কাল্পনিক সৌধ নাটকখানির ভিত্তি-ভূমি।… নাটকটির প্রধান দোষ এই যে দীর্ঘ বক্তৃতার চাপে সংঘাতমুখর সংস্থাগুলি নষ্ট হইয়াছে। নাটকের বেশীর ভাগ পাত্র-পাত্রীরা কাজ অপেক্ষা উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়াছে, ঘটনা (action) অপেক্ষা আস্ফালন বেশি। …নিশ্চেষ্টতা ও আকস্মিক মৃত্যু নাটকীয় সংঘাতসৃষ্টির কৌশল না হইয়া অন্তরায় হইয়াছে। পাঁচ অঙ্কে গদ্য ও স্থানে স্থানে পদ্যের মাধ্যমে নাটকখানি উদ্দেশ্যহীন হইয়া পরিচালিত। গানগুলি ভাষা সত্ত্বেও কেমন প্রাণহীন।" (দৃশ্যকাব্য-পরিচয়— সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়)

two years and a half will meet with suitable response".

আসলে কোহিনূরের নামে কলারসিকরা তখন নিরুৎসাহ হ'তে সুরু করেছেন। তাই নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয়, নিয়মিত অভিনয়ের সঙ্গে যাদু, ব্যায়াম এবং সদ্য আবিষ্কৃত বায়স্কোপ প্রদর্শনী প্রভৃতির চমক দিয়ে দর্শক আকৃষ্ট করার এই শ্রেণীর প্রয়াস কিছুকাল ধরেই চলছিল। এসবের আকর্ষণে কিছু মানুষ থিয়েটারের দরজায় ভীড় করতেন বটে কিন্তু প্রকৃত নাট্যামোদীদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে কোহিনূর তখন বঞ্চিতপ্রায়। এরজন্য থিয়েটারের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাই প্রধানতঃ দায়ী। রঙ্গালয়-পরিচালক হিসাবে শিশিরকুমার রায় খুব একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন না। গিরিশচন্দ্র বিদায় নেওয়ার পর থেকে থিয়েটারের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে সুরু করে। নিকৃষ্ট শ্রেণীর নাটক নির্বাচনেও কোহিনূরের কুখ্যাতি রটেছিল। এমত অবস্থায় এপ্রিলে ন্যাশনাল থেকে চুনিলাল দেবকে এনে মোড় ফেরানোর চেষ্টা হল। ৭ জুন হ'তে উনি নাট্যশিক্ষকরূপে ঘোষিত হলেন। ৩০ জুলাই কোহিনূর নব পর্যায়ে গিরিশচন্দ্রের 'চণ্ড' নামালে। চণ্ড, পূর্ণরাম ও কুশলারূপে দেখা দিলেন যথাক্রমে চুনিলাল দেব, মন্মথনাথ পাল ও পান্নারানী। বই জমলো না। সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয়ার্দ্ধে এখানকার অভিনয় বন্ধ থেকেছে। ১ অক্টোবর 'রাজা অশোক' দিয়ে আবার চালু হল থিয়েটার। ইতিমধ্যে চুনিলাল দেব চলে গেছেন। ওঁকে এনে শিশিরবাবুর কোনো লাভ হয় নি। ২৯ অক্টোবর যখন হরিসাধন মুখোপাধ্যায় রচিত 'আকবরের স্বপ্ন' খোলা হল, তখন দেখা গেল নামী-দামী শিল্পী বলতে কোহিনূরে বিশেষ কেউ আর অবশিষ্ট নেই।

১৯১১-র অভিনীত নাটকের মধ্যে আছেঃ— শৈলেন্দ্রনাথ সরকারের কৌতুক-নক্সা 'শখের জলপান' (৮।৪) এবং 'মধুর মিলন' (৩।৬), হরিশ্চন্দ্র সান্যালের 'বিশ্বামিত্র' (২৬।৮), সৌরীন্দ্রমোহন

মুখোপাধ্যায়ের 'গ্রহের ফের' (২১।১০) এবং অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'জেনোবিয়া' (২৫।১১) ও 'প্রাণের টান' (২৫।১২)।

'শখের জলপান' Sheridan-এর 'Duenna' অনুসরণে লেখা। 'মধুর মিলন' ভারত সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে অভিনীত হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে, ১৯০৯-এর মাঝামাঝি অপরেশচন্দ্র, তারাসুন্দরী এবং জন কয়েক নট-নটীসহ কোহিনূর ছেড়ে ভ্রাম্যমাণ নাট্যসম্প্রদায় খোলেন। কিছুদিন পরে ওঁকে আবার মিনার্ভায় দেখা যায়। সেখান থেকে 'বিশ্বামিত্র' হওয়ার আগে উনি পুনরায় কোহিনূরে ফিরে এলেন। "কোহিনূরে সে সময় শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র সান্যাল নামক জনৈক উদ্যমশীল নবীন লেখক 'বশিষ্ঠ' নামক একখানি নূতন পৌরাণিক নাটক লিখিয়া আনিয়াছিলেন। নাটকখানি নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু এবং স্বর্গীয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় দেখিয়া শুনিয়া আবশ্যকমত সংশোধনাদি করিয়া দিয়াছিলেন।.... হরিশবাবুর নাটকে 'বশিষ্ঠ'ই নায়ক ছিল এবং বিশ্বামিত্র পার্শ্ব চরিত্র-রূপে অঙ্কিত ছিল। অপরেশবাবু 'বিশ্বামিত্র' চরিত্রকে বিশেষরূপে ফুটাইবার নিমিত্ত হরিশবাবুকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ফলতঃ গিরিশচন্দ্রের 'বিশ্বামিত্র'[১৩] নাটকের সহিত প্রতিযোগিতায় অভিনয় করিবার জন্য ইঁহারা নাটকখানির সৌষ্ঠবসাধনে কোনও রূপ ত্রুটি করেন নাই।... অপরেশচন্দ্র বিশেষ যত্নের সহিত এই নাটকখানির শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। নাটকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে অভিনীত হইয়াছিল, ইহার যশঃ সৌরভে শহর পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।" (অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়) ১৯১১-তে 'বিশ্বামিত্র' ছাড়া অন্য নাটক সুবিধা করতে পারে নি। এরপর নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্রকে এনে কোহিনূরের অবস্থা ফেরানোর চেষ্টা হয়। পাছে মিনার্ভা ওঁকে আবার ছিনিয়ে নিয়ে যায় সেই আশঙ্কায় অতুলকৃষ্ণকে শিশির-

১৩ 'তপোবল' নামে ১৮ নভেম্বর, ১৯১১ মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত।

কুমারের দেশের বাড়ীতে লুকিয়ে রাখা হল। সেখানে 'জেনোবিয়া' নামে এক গীতিনাট্য রচনা ক'রে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন। সেই নাটকের প্রথম অভিনয়রজনীর ভূমিকালিপি ছিল এইরকম :— জেনোবিয়া-কুসুমকুমারী, লঙ্গিনেশ-তারক পালিত, জোজিয়ফ-নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, ফরমাজ-অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জবদাস-অতীন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্য, অরিলন-কালীপ্রসন্ন দাস, দাবিদ-প্রবোধচন্দ্র বসু এবং জুহেলিয়া-বিনোদিনী (হাঁদি)। 'জেনোবিয়া'র নৃত্যপরিচালনা করেছিলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু। অতুলকৃষ্ণ মিত্র এবং তাঁর 'জেনোবিয়া' কোহিনূরকে বাঁচাতে পারলে না। অনেক খরচ ক'রে নতুন নাটক নামিয়ে শিশিরকুমার ব্যর্থ হলেন।[১৪] এ বছরের শেষ নাটক 'প্রাণের টান' ফরাসী নাট্যকার মলিয়ারের অনুসরণে লেখা। এতে বিকলার ভূমিকায় কুসুমকুমারী নেমেছিলেন।

১৯১২-র সুরুতে 'পাণ্ডব-গৌরব', 'শঙ্করাচার্য', 'কপালকুণ্ডলা' প্রভৃতি পুরানো নাটকের অভিনয়ের পর ৩০ মার্চ অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'মোহিনী মায়া' মঞ্চস্থ করা হল। নাটকখানি গোল্ড-স্মিথের She Stoops to Conquer-এর অনুকৃতি। কর্তৃপক্ষ Allan Wilkie[১৫] নামে এক বিদেশী প্রয়োগবিদকে দিয়ে নাটকখানি পরিচালনা করিয়ে চমকসৃষ্টির প্রয়াস পেলেন। ১৭৯৫-এ গেরাসিম লেবেডেফের পর বিদেশী নির্দেশকের অধীনে বাংলা

১৪ "উৎকৃষ্ট পোষাকপরিচ্ছদ, নয়নবিমোহন দৃশ্যপট এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় হইলেও গীতিনাট্যখানি বেশীদিন চলে নাই।" (অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

১৫ London Repertory Company-র বিখ্যাত অভিনেতা-প্রযোজক। ১৯১১-র নভেম্বরে কলকাতায় অপেরা হাউসে Macbeth, Othello প্রভৃতি পরিবেশন করেন। তৎকালে এঁর পরিবেশিত নাটকের তালিকায় She Stoops to Conquer-ও ছিল। (দ্র. বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত)

নাটকের অভিনয় সম্ভবতঃ এই প্রথম। কিন্তু তাতেও ভাগ্যের চাকা ঘুরলো না। তার উপর এস্টেট নিয়ে শিশিরকুমারের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃজায়া মৃণালিনী দেবীর (পরলোকগত শরৎকুমার রায়ের বিধবা পত্নী) বিবাদ বাঁধলো। ফলে, থিয়েটার ও সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় দেখা দিল দারুণ বিশৃঙ্খলা। শিশিরবাবু ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। আর্থিক দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় শিশিরকুমার রায় এসময় কোহিনূরকে The Elysium Theatre Limited নামে এক যৌথ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করায় উদ্যোগী হয়েছেন। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গড়া পরিচালনসমিতি এই উদ্দেশ্যে ১৭ এপ্রিল, ১৯১২ তারিখের 'বেঙ্গলী'তে এক বিজ্ঞপ্তি মারফৎ বাজারে তিন লক্ষ টাকা মূল্যের বারো হাজার অর্ডিনারী শেয়ার ছাড়ার প্রস্তাব করলেন। মৃণালিনী দেবীও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন না, লিমিটেড কোম্পানী গড়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁর পক্ষ থেকে ২০ এপ্রিল ঐ কাগজেই নীচের সতর্কবাণী প্রকাশিত হল :—

With reference to the advertisement to converting the Kohinoor Theatre into the Elysium Theatre Ltd., the Public is hereby informed that my client Sreemutty Mrinalini Dabee is entitled to a third part or share of the Estate of her late husband Babu Sarat Kumar Roy under his will and she has filed a suit in the High Court being suit no. 1185 of 1911 against Sisir Kumar Roy, the executor and ......for account for partition of the Estate amongst others the said Kohinoor Theatre. The said suit is still pending.

If anyone purchase the said Kohinoor Theatre or be mixed up into converting the said to "The

Elysium Theatre Ltd.", without my client's consent, he will do so at his own risk and peril.

Dated the 19th day of April, 1912

Attorney-at-law

11, Old Post Office Street

Calcutta.

যাইহোক্, ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত বেশীদূর গড়ায় নি। উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষে স্থির হল— রিসিভার থাকবে না এবং দেনার দায়ে কোহিনূর বিক্রী ক'রে ফেলা হবে। সেইমত, থিয়েটার বাড়ী নিলামের দিনও ধার্য হয়ে গেল। তখনও কিন্তু নতুন নাটকের মহড়া চলছে। এই সম্পর্কে 'নাট্যমন্দির' (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩১৯) লিখলে ঃ— "আগামী ২৭শে জুলাই "কোহিনূর" থিয়েটারের 'ভিটেমাটি' নিলামে উঠিবে বলিয়া সংবাদপত্রে ঘোষিত হইয়াছে। এ সংবাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। সমবায় মূলধনে 'কোহিনূর' 'ইলিসিয়ম' থিয়েটারে পরিণত হইবে বলিয়া ইতিপূর্ব্বে যে প্রস্তাব উঠিয়াছিল, তাহা কি কর্পূরের মত উপিয়া গেল? সংবাদ-পত্রে 'কোহিনূরে'র এই বিপদ ঘোষণা,— আবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নাটকের চিত্তচমকপ্রদ ইস্তাহার! জনরবে প্রকাশ, নবাব খাঁজাহান যেখানে যেখানে পদার্পণ করিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই একটা না একটা ধাক্কা দিয়া আসিয়াছেন,— 'কোহিনূরে' তাঁহার আসন পড়িতে না পড়িতেই একেবারে ভিটেমাটি-চাটির. ব্যবস্থা!— নবাবের অপার মহিমা!" রসিকতাটা ক্ষীরোদপ্রসাদের 'খাঁজাহান'[১৬] নাটক নিয়ে। ৬ জুলাই এ-নাটক কোহিনূরে মঞ্চস্থ হয়েছিল। নাটক

১৬ "ইহার ঘটনাবহুল ঘাত-প্রতিঘাত ফেনাইয়া বড় করা হইয়াছে এবং তাহারই ফাঁকে ফাঁকে সোফিয়া-নারায়ণের অন্তর্মুখী প্রেম সব ঘটনাকে চাপা দিয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এইটুকুই ইহার নাটিকাত্ব, বাকীটুকু নাটকের অস্পষ্টতার আবরণে ধূমায়িত হইয়াছে। অস্পষ্ট নাটকীয় সংঘাতের ভিতর

হিসাবে 'খাঁজাহান' উল্লেখযোগ্য নয়। এরপর কোহিনূরে আর নতুন কোনো নাটক অভিনীত হয় নি। খাঁজাহান, দাদাজী, নারায়ণ রাও, মহব্বৎখান, সোফিয়া ও গুলনার চরিত্রের রূপায়ণে যথাক্রমে অপরেশ-চন্দ্র, তারক পালিত, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, কালীপ্রসন্ন দাস, প্রমদা-সুন্দরী এবং লীলাবতী অবতীর্ণ হন। "অপরেশবাবু নাটকের নায়ক খাঁজাহানের ভূমিকাভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেও নাটকখানি জমে নাই।" (অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়) এই সময় মিনার্ভার কর্তৃত্ব মনোমোহন পাঁড়ের হাতে আসায় অপরেশচন্দ্র আবার সেখানে চলে যান। আর এদিকে অংশীদাররা সবাই একমত হয়ে থিয়েটার তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ২০ এবং ২১ জুলাই, ১৯১২ 'খাঁজাহান', 'বিশ্বামিত্র' এবং 'পলিন' অভিনয়ের পর কোহিনূরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। পত্রিকায় খবর বেরুলো :— "গত ২৭শে জুলাই 'কোহিনূর' থিয়েটার নিলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত মনোমোহন পাণ্ডে এক লক্ষ এগার হাজার টাকায় 'কোহিনূর' থিয়েটার ক্রয় করিয়াছেন।" (নাট্যমন্দির —শ্রাবণ, ১৩১৯)

কোহিনূর বিক্রী হয়ে যাওয়ার ঠিক এক মাস পরে অর্থাৎ ২৭ আগস্ট, ১৯১২ তারিখে ওখানে একটি স্মরণীয় সম্মিলিত অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল— যেটি তার পাঁচ বছরের জীবনেতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নটগুরু গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিভাণ্ডারের সাহায্য-কল্পে ঐদিন বাংলাদেশের সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী (কেবল তিনকড়ি দাসী অসুস্থতার কারণে যোগ দিতে পারেন নি)[১৭] একত্রিত হয়ে কোহিনূর রঙ্গমঞ্চে 'পাণ্ডব-গৌরব', 'বলিদান' এবং

দিয়া প্রচ্ছন্নভাবে নাটিকাখানি সোফিয়ার আত্মত্যাগে পরিণতিলাভ করিল।" (দৃশ্যকাব্য-পরিচয়—সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়)

১৭ তিনকড়ি দাসী যোগদানে অসমর্থা হয়ে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের কাছে নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেছিলেন :—

কয়েকটি গীতাভিনয়ে অংশগ্রহণ ক'রে পরলোকগত মহান নাট্য-স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এ-রকম বিরাট শিল্পী সমাবেশে অভিনয় আগে ও পরে কখনও অনুষ্ঠিত হয় নি। "আসনের মূল্য এই রাত্রের জন্য বৃদ্ধি হইয়াছিল ; তত্রাচ বহু সংখ্যক দর্শককে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া স্থানাভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। এই অভিনয়ে মোট তিন হাজার ছয় শত ছত্রিশ টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল।" (নাট্যমন্দির— শ্রাবণ/ভাদ্র, ১৩১৯) কোহিনূর রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত এই ঐতিহাসিক অভিনয়বাসরের পরিচালক ছিলেন চারজন— অমৃতলাল বসু, মনোমোহন পাঁড়ে, শিশিরকুমার রায় ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৭নং চন্দ্রমোহন স্থরের লেন
কলিকাতা
১১ই ভাদ্র, ১৩১৯।

পরম পূজনীয়
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু,
মহাশয় শ্রীচরণেষু
প্রণাম শতকোটি নিবেদনমিদং

মহাশয়, আমার সবিনয় নিবেদন, আমি কঠিন পীড়ায় শয্যাগত, এ নিমিত্ত অদ্যকার অভিনয়ে যোগদান করিতে অসমর্থা হওয়ায় কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়া আছি, তাহা লেখনীমুখে প্রকাশ করা অসম্ভব। পরম পূজনীয় গিরিশবাবুর আন্তরিক যত্ন ও শিক্ষাতেই আমার ন্যায় মূর্খা স্ত্রীলোক নাট্যামোদীগণের প্রীতিলাভে সমর্থ হইয়াছে। আপনি অদ্য রজনীর দর্শকবৃন্দকে যদ্যপি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই নিদারুণ মর্ম্মব্যথা জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে এই শয্যাশায়ী অবস্থাতেও কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিব। নিবেদন ইতি—

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষিণী
শ্রীমতী তিনকড়ি দাসী

পরিশিষ্ট

ক. অভিনয়-তালিকা

চাঁদবিবি	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	১১।৮।১৯০৭
ছত্রপতি শিবাজী	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৫।৯।১৯০৭
মীরকাসিম	"	১৬।১১।১৯০৭
দাদা ও দিদি	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	২৫।১২।১৯০৭
রাজা অশোক	"	৭।৩।১৯০৮
বাসন্তীমেলা	"	৪।৪।১৯০৮
বাজীমাৎ	নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন	২।৫।১৯০৮
দুর্গেশনন্দিনী	নাট্যরূপ-গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৩।৬।১৯০৮
বরুণা	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	১১।৭।১৯০৮
জেনানা যুদ্ধ	দীনবন্ধু মিত্র	৫।৮।১৯০৮
নবীন তপস্বিনী	"	৯।৮।১৯০৮
প্রফুল্ল	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	"
একতা (?)	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	১৯।৯।১৯০৮
মহিলা মজলিশ	দুর্গাদাস দে	১৭।১০।১৯০৮
দৌলতে দুনিয়া	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	২১।১১।১৯০৮
ভূতের বেগার	"	২৫।১২।১৯০৮
পাঞ্জাব গৌরব	হরনাথ বসু	২৬।১২।১৯০৮
বীরপূজা	"	৩০।১।১৯০৯
ময়ূর সিংহাসন	"	৮।৫।১৯০৯
প্রতিফল	কাহিনী-যোগেন্দ্রনাথ বসু নাট্যরূপ-দুর্গাদাস দে (মতান্তরে হরিচরণ চক্রবর্তী)	৩।৭।১৯০৯
সোনার সংসার	দুর্গাদাস দে	১১।৮।১৯০৯
রানী দুর্গাবতী	হরিপদ মুখোপাধ্যায়	২৫।১২।১৯০৯
গোড়ায় গলদ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯।১।১৯১০
ভূতের বিয়ে	ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯।৩।১৯১০

চণ্ড	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৩০।৭।১৯১০
রাজা অশোক		১।১০।১৯১০
আকবরের স্বপ্ন	হরিসাধন মুখোপাধ্যায়	২৯।১০।১৯১০
শখের জলপান	শৈলেন্দ্রনাথ সরকার	৮।৪।১৯১১
মধুর মিলন	”	৩।৬।১৯১১
বিশ্বামিত্র	হরিশ্চন্দ্র সান্যাল	২৬।৮।১৯১১
গ্রহের ফের	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	২১।১০।১৯১১
জেনোবিয়া	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	২৫।১১।১৯১১
প্রাণের টান	”	২৫।১২।১৯১১
মোহিনী মায়া	”	৩০।৩।১৯১২
খাঁজাহান	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	৬।৭।১৯১২
খাঁজাহান		২০।৭।১৯১২
বিশ্বামিত্র		২১।৭।১৯১২
পলিন	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	”
পাণ্ডব-গৌরব	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২৭।৮।১৯১২
বলিদান	”	”

খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায়

গিরিশচন্দ্র, দানীবাবু, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল, অটলবিহারী দাস, মন্মথনাথ পাল, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কানাইলাল দাস, কার্তিকচন্দ্র দে, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, রামকালী বন্দ্যোপাধ্যায়, চুনিলাল দেব, তারক পালিত, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কালীপ্রসন্ন দাস, প্রবোধচন্দ্র বসু, তিনকড়ি দাসী, তারাসুন্দরী, ভূষণকুমারী (ছোট), কিরণবালা (টালা'র), সরোজিনী (মোটা), কুমুদিনী (বেঁটে), কুসুম (বিষাদ), প্রমদাসুন্দরী, চারুবালা, পান্নারানী, কুসুমকুমারী, বিনোদিনী (হাঁদি), লীলাবতী প্রভৃতি।

মনোমোহন থিয়েটার

(১৯১৫-১৯২৪)

১৯১২-র জুলাই মাসে কোহিনূর থিয়েটার নিলামে উঠলে সেই বাড়ী এক লক্ষ এগারো হাজার টাকায় কেনেন মনোমোহন পাঁড়ে।

মনোমোহন পাঁড়ের নানারকমের ব্যবসা ছিল। থিয়েটার-ওয়ালাদের উনি টাকা ধারও দিতেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন ক্লাসিক আর মিনার্ভা—তুই নৌকায় পা দিয়ে নাজেহাল, সে সময় দেনার দায়ে ওঁকে মিনার্ভার প্রজাস্বত্ব মনোমোহনের নামে লিখে দিতে হয়। সে থিয়েটার পাঁড়ে-মিত্র পার্টনারশীপে ভালই চলছিল। কিন্তু মহেন্দ্র মিত্র মারা যেতে তাঁর ভাই উপেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে মিনার্ভার স্বত্ব নিয়ে মামলা বাঁধলে মনোমোহনবাবু কোহিনূর কিনে নিজস্ব মালিকানায় আলাদা থিয়েটার চালাবেন স্থির করেন। সেই মত মিনার্ভার নট-নটী, সাজ-সরঞ্জাম এবং 'নাম' নিয়েই উনি কোহিনূর মঞ্চে ১৯১৫ সালের ৭ আগস্ট গিরিশচন্দ্রের 'কালাপাহাড়' খুললেন। আড়াইশ টাকা বেতনে ম্যানেজার হলেন দানীবাবু। সংবাদটি জানিয়ে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' লিখলে :— "Minerva Theatre.— This popular place of amusement has shifted to no. 68, Beadon Street, from its old site, the idea of the management being to find better and commodious seating space for the audience. 68, Beadon Street is the old Classic Theatre buildings which used to be the favourite resort of Bengali play-goers several years ago. The first performance in the new buildings opens with the late G. C.

Ghose's drama "Kalapahar" with an after piece which is a delightful opera. Tomorrow there will be a double board." (৭।৮।১৯১৫)

'কালাপাহাড়ে'র পর দানীবাবু, প্রিয়নাথ ঘোষ, তারাসুন্দরী প্রমুখ শিল্পীরা মিলে এখানে 'মনে মনে', 'রূপের ফাঁদ', 'গৃহলক্ষ্মী', 'শিরী-ফরহাদ্', 'পারসিনা', 'বীররাজা', 'পলিন', 'ভীষ্ম', 'বরুণা', 'বাসন্তী' প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে উপেন্দ্র মিত্র 'মিনার্ভা' নাম ব্যবহার করার বিরুদ্ধে আদালত থেকে আদেশ জারী করানোতে শেষ পর্যন্ত মনোমোহন পাঁড়েকে থিয়েটারের নাম পালটাতে হল। নিজের নামেই কোহিনূর মঞ্চের নতুন নামকরণ করলেন উনি— 'মনোমোহন থিয়েটার'। পাঁড়েমশায় সংবাদপত্র মারফৎ জানালেন :— "As the Minerva Theatre Building with its title has been leased out, so my new Theatre at 68, Beadon Street has been named Monomohon Theatre." (বেঙ্গলী— ৪।৯।১৯১৫) অমরেন্দ্রনাথ তখন ষ্টারে, মনোমোহনবাবু তাঁকে নিজের থিয়েটারে অর্দ্ধেক অংশীদার ক'রে আনতে চেয়েছিলেন। "অমরেন্দ্রনাথ সে প্রস্তাবে সম্মত হন ও কথার এতদূর পাকাপাকি হয় যে, তিনি জিনিষপত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হন ; তবে তখনও অবধি কাগজে কলমে কোন লেখাপড়া হয় নাই। অভিনয়বিষয়েও স্থির হয় যে, শরীর যতদিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ না সারে, ততদিন তিনি সপ্তাহে একদিন মাত্র অভিনয় করবেন— বাকী দিনগুলির ভার দানিবাবুর।" (রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ—রমাপতি দত্ত) ষ্টারের সঙ্গে সে সময় ওঁর বনিবনা হচ্ছিল না ব'লে উনি এখানে আসতে চেয়েছিলেন। তবে, শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে মিটমাট হয়ে যাওয়ায়, সে যাত্রা আর অমরেন্দ্রনাথের মনোমোহনে যোগ দেওয়া ঘটে ওঠে নি। আর পরের বছরই তো উনি মারা গেলেন !

১ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ মনোমোহন থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। এই তারিখের অভিনয়সূচী :— ১। জন্মাষ্টমী, ২। নন্দোৎসব, ৩। ভীষ্ম, ৪। নন্দবিদায়, ৫। ধ্রুবচরিত্র এবং ৬। চতুরালী। ২৫ সেপ্টেম্বর খোলা হয়েছে নতুন নাটক দাশরথি মুখোপাধ্যায়ের 'কণ্ঠহার'। দানীবাবু, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, অহীন্দ্রনাথ দে, হেমন্তকুমারী এবং নীরদাসুন্দরী যথাক্রমে রণলাল, নরেন্দ্র, মুরারী, মোহিনী ও রঙ্গিলা সাজলেন। নাটক অকিঞ্চিৎকর কিন্তু দানীবাবুর অভিনয় দর্শকদের খুশী করলো। "বুদ্ধিমান, বলশালী, হিংস্র, অমিতসাহসী, পত্নীপ্রেমিক দস্যু রণলালের ছবি দানীবাবু অপূর্ব্বভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নাটকের কয়েকটি কথা তাঁহার পরামর্শতেই সংযোজিত হয়, তাহাতেই রণলাল চরিত্র ফুটিয়া যায় এবং লোকের সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হয়।" (বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও দানীবাবু—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত) ৬ নভেম্বর 'শ্যামসুন্দরে'র পর ১১ ডিসেম্বর নামলো ক্ষীরোদপ্রসাদ বিরচিত 'বাদ্শাজাদী।' ইতিমধ্যে ষ্টার থেকে চুনিলাল দেব ও বসন্তকুমারী এবং থেসপিয়ান টেম্পেল থেকে তিনকড়ি দাসী এসে যোগ দিয়েছেন। দানীবাবু আজিজ, চুনিলাল দেব মাসুদ, তিনকড়ি হামিদা আর বসন্তকুমারী জুমেলার ভূমিকা নিলেন। নট-নটীরা সবাই নামকরা— অভিনয় খারাপ হল না।

১৯১৬-র সুরু নিশিকান্ত বসুরায়ের 'বাপ্পারাও' (২৬।২) দিয়ে। ভূমিকালিপি :— বাপ্পারাও-দানীবাবু, ইয়াজিদ-চুনিলাল দেব, লছমী-তিনকড়ি দাসী এবং নোশেরা-বসন্তকুমারী। 'বাপ্পারাও' নাট্যকারের প্রথম রচনা, নাটক হিসাবে দুর্বল— সেই কারণে জমে নি। ৮ এপ্রিল উদ্বোধন হ'ল হরনাথ বসুর 'কবির'। ২১ এপ্রিল দানীবাবুর 'বেনিফিট নাইটে' সম্প্রদায় নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানসূচী পরিবেশন করলে :— ১। চণ্ড, ২। হাস্যরসাত্ম অপেরা—'বাহাদুর' (প্রথম অভিনয়), ৩। Pleader's trouble (By the Indian Shakespeare Co.), ৪। Selected scenes, ৫। Selected

songs and dances, ৬। অরোরা বায়স্কোপ ও ৭। কলির অর্জুন। মনোমোহনে অনেকদিন চলেছিল— 'মোগল-পাঠান'। সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এ-নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ৮ জুলাই, ১৯১৬। সে রাতে শের শা, হুমায়ুন, চাঁদ ও সোফিয়া হয়েছিলেন যথাক্রমে দানীবাবু, চুনিলাল দেব, বসন্তকুমারী এবং শশিমুখী। নাচে-গানে-অভিনয়ে 'মোগল-পাঠান' দর্শকদের মাতিয়ে তুললে। দানীবাবু শের শা করলেন, অপূর্ব। আর শশিমুখীর সেই গান :—'ভেঙে গেছে মোর সোনার স্বপন/ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার/ (আজি) হৃদয় ভরিয়া উঠিছে কেবল/মরমভেদী হাহাকার।'— ভোলবার নয়। নাটকখানি মনোমোহনে একটানা ১৫০ রাত্রি অভিনীত হয়েছিল। 'মোগল-পাঠান' আর 'কণ্ঠহার' একসঙ্গে চলেছিল ৬৪ রাত্রি। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' জানালে :—"Moghul-Pathan', the new historical drama, has made a tremendous hit and is having a successful run at the Monomohon. It is nearly two months now that the piece has been holding the boards, but the interest of the Bengali theatre-going public shows no signs of diminution. Every Saturday night the house is full before the appointed hour, and after it, it is a regular scrummage for seats. And no wonder, for both in respect of plot-interest and skilful mounting, 'Moghul-Pathan' holds the palm and the most fastidious critic has pronounced it an all-round success." (২।৯।১৯১৬) এ-নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার আগেই অবশ্য তিনকড়ি দাসী মনোমোহন ছেড়েছেন।

১৯১৭-তে ষ্টার থেকে এলেন আশ্চর্যময়ী। জুন মাসে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় ৭ জুলাই মনোমোহন বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' নামালে।

দানীবাবু, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, চুনিলাল দেব, বসন্তকুমারী এবং আশ্চর্যময়ী যথাক্রমে প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, গেব্রিয়াল, শৈবলিনী ও দলনীর রূপসজ্জায় অবতীর্ণ হলেন। 'চন্দ্রশেখর' ষ্টারের বিখ্যাত নাটক, মনোমোহনেও কম সুখ্যাতি পেল না। দলনীর গানে আশ্চর্যময়ী তাঁর আগের সুনাম বজায় রাখলেন। ৬ অক্টোবর খোলা হল—'পানিপথ' (সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)। বাবর-দানীবাবু, করুণাবতী (কর্ণদেবী ?)-কুসুমকুমারী, সংগ্রামসিংহ-চুনিলাল দেব এবং দেলেরা-আশ্চর্যময়ী। "এতে দানীবাবুর 'বাবর শা' এবং আশ্চর্য্যময়ীর অন্ধ ফুলওয়ালীর বেশে গান—'ওগো দাও সাড়া দাও, কও কথা কও বরষি আসিয়া শ্রবণে—অপূর্ব হয়েছিল।" (নিজেরে হারায়ে খুঁজি / প্রথম পর্ব—অহীন্দ্র চৌধুরী) কুসুমকুমারীর অভিনয়ও মন্দ হয় নি, তবে নাটক চললো না।

যেসব নাটকের নাম করা হয়েছে, তাদের প্রায় কোনোটিই প্রথম শ্রেণীর নয়—অধিকাংশই ফরমায়েশী রচনা। নাট্যকাররা মূল-গায়েন দানীবাবুর মুখ চেয়েই বই লিখতেন। নাটক যাই হোক্ না কেন, ওঁর ভূমিকাটি যাতে দর্শকদের মনোরঞ্জন ক'রে মালিককে পয়সা এনে দেয় লেখকদের সেদিকে সজাগ দৃষ্টি থাকতো। সত্য কথা বলতে কি, দানীবাবুর অভিনয়ের দৌলতে থিয়েটারের বিস্তর রোজগার হলেও ওঁর আয় কিন্তু সে তুলনায় বাড়ে নি। স্বভাবতই, তাঁর মনে অসন্তোষ জমা হচ্ছিল। তাই, এসময় যখন ষ্টার হাজার টাকা মাইনে ও পাঁচ হাজার টাকা বোনাসে ওঁকে নিয়ে যেতে চাইলে, সঙ্গত কারণেই দানীবাবু সেদিকে ঝুঁকলেন। অবশ্য, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (গিরিশচন্দ্রের লিপিকার এবং সে সময় দানীবাবুর অভিভাবক) মাঝে পড়ে দু'পক্ষের মধ্যে এক চুক্তি করিয়ে দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত ওঁর ষ্টারে যাওয়া আর ঘটে উঠলো না। স্থির হল, হাত-খরচ হিসাবে দানীবাবু মাসে দু'শ এবং বাড়ীভাড়া বাবদ মনোমোহনবাবু মাসে ছ'শ টাকা পাবেন। পরে, থিয়েটারের সব খরচ-খরচা

বাদে যে টাকা বাঁচবে দু'জনের মধ্যে তা সমান-সমান হারে ভাগ হবে। চুক্তির ফলে, এখন থেকে দানীবাবু মনোমোহন থিয়েটারের আধা মালিক হলেন।

নতুন ব্যবস্থাপনায় ১৯১৮-র ১৭ আগস্ট নিশিকান্ত বসুরায়ের 'দেবলাদেবী'র উদ্বোধন হল। খিজির খাঁ-দানীবাবু, আলাউদ্দিন-চুনিলাল এবং মতিয়া-আশ্চর্যময়ী। নাটক হিসাবে 'দেবলাদেবী' উচ্চাঙ্গের না হলেও, দানীবাবু দুর্ধর্ষ অভিনয়ে সবাইকে অভিভূত করেছেন।[১] সেই সঙ্গে দর্শকরা মুগ্ধ হল আশ্চর্যময়ীর প্রাণমাতানো গানে।[২] এছাড়া বিভিন্ন ভূমিকায় চুনিলাল দেব, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, সোনামণি ও হরিপ্রিয়া দক্ষতার পরিচয় দিলেন। অভিনয় দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ১৯১৮, ৭ সেপ্টেম্বর 'বেঙ্গলী' লিখলে :—
"...The play deals with the glorious past of the land of the heroes, and as such, it should be witnessed by all patriotic people. "Khijir Khan" is Dani Babu and everything is said. He is the greatest actor in these days. The old adage like father like son, can so nicely be applied to him. He played the part of Khijir Khan exquisitely grand. Miss Ascharyya was greatly cheered when she sang the love songs in her role of Matia. There was nothing particular in the part of Alauddin but as the role was represented by Chuni Babu, the enactment was all that could be desired." এ বছরের বড়দিন থেকে 'পরদেশী' (পাঁচ-

---

১ "খিজির ওঁর এক অপূর্ব সৃষ্টি!" (নিজেরে হারায়ে খুঁজি / প্রথম পর্ব —অহীন্দ্র চৌধুরী)

২ "আশ্চর্য্যময়ী ওতে 'মতিয়া' সেজে যে গান গেয়েছিলেন, তা এখনো কানে লেগে রয়েছে সকলের।" (ঐ)

কড়ি চট্টোপাধ্যায়) নামে এক অপেরা চালু হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

১৯১৯-এর ২০ নভেম্বর মনোমোহনে চুনিলাল দেবের সম্মান-রজনীতে 'প্রফুল্ল' মঞ্চস্থ হয়েছে। যোগেশ সাজলেন দানীবাবু, চুনিলাল রমেশ। সেই সঙ্গে 'রাজা ও রানী', 'জয়দেব', 'কল্যাণী' এবং 'চাঁদবিবি'র নির্বাচিত দৃশ্যও ছিল। 'চাঁদবিবি'তে ক্ষেত্রমোহন মিত্র ইব্রাহিমের ভূমিকায় নামলেন। কোহিনূরে এই চরিত্রের অভিনয়ে উনি খুব নাম করেছিলেন। সবশেষে পরিবেশন করা হল নির্বাচিত নৃত্য-গীত ও 'পরদেশী'। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের আসর জমালো অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'ওলটপালট' নামে এক নক্সা।

১৯২০, ১০ জানুয়ারি মনোমোহন মঞ্চস্থ করলে সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নাটক 'হিন্দুবীর'। প্রথম অভিনয়রজনীর ভূমিকালিপি ঃ—হিমু-দানীবাবু, মুবারিজ-ক্ষেত্রমোহন মিত্র, ইব্রাহিম-হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, আকবর-অহীন্দ্রনাথ দে ও মেহের-আশ্চর্যময়ী। "নাটকখানি বিশেষত্ব-বর্জিত, তথাপি দানীবাবুর হিমুর (বসন্ত রায়ের) অভিনয় দেখিতে প্রথম কয়েক রাত্রিতে তিল-ধারণের স্থান হইত না। ক্ষেত্রবাবুর মুবারিজের ভূমিকাই খুব ভাল হইত।" (বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও দানীবাবু—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত) ৩১ জুলাই খোলা হল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'। নগেন্দ্র-দানীবাবু, দেবেন্দ্র-পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, সুরেশ-চুনিলাল দেব, শ্রীশ-ক্ষেত্রমোহন মিত্র ও হীরা-আশ্চর্যময়ী। এসময় নাটকের কোনো কোনো দৃশ্য ফিল্মের সাহায্যে দেখানো হত। উদ্যোক্তা ছিলেন অরোরা ফিল্মের অনাদি বসু। অবশ্য, মঞ্চে এ রীতি প্রথম চালু করেন অমরেন্দ্রনাথ।

১৯২১ সালে কোনো উল্লেখযোগ্য নতুন নাটকের অভিনয়-সংবাদ নেই। 'গৃহলক্ষ্মী', 'আলিবাবা', 'বলিদান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'প্রফুল্ল', 'শিরী-ফরহাদ' প্রভৃতি জনপ্রিয় নাটকসমূহের পুনরভিনয় হয়েছে এসময়।

১৯২২, ১১ ফেব্রুয়ারি নিশিকান্ত বসুরায়ের 'বঙ্গে বর্গী'র উদ্বোধন হয়েছে। নাটক হিসাবে 'বঙ্গে বর্গী'ও অসার কিন্তু দানীবাবুর অসাধারণ অভিনয় একে বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় ক'রে তুলেছিল। বাংলা থিয়েটারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঞ্চসফল নাটক 'বঙ্গে বর্গী' পরবর্তীকালেও বহু রঙ্গালয়কে প্রভূত অর্থ ও খ্যাতি অর্জনে সহায়তা করেছে। "গম্ভীরবদন, তীক্ষ্মবুদ্ধি ও বলশালী ভাস্কর প্রৌঢ়-বদন, দীর্ঘদেহ, গম্ভীরকণ্ঠ দানীবাবুতে খুব সুন্দর মানাইয়াছিল। অভিনয় খুব ভাল হইয়াছিল এবং পঞ্চাশ রাত্রিতে জুবিলি উৎসব পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ক্ষেত্রবাবুও মোহনলালের ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন এবং ভাস্করের কন্যা গৌরীর ভূমিকায় আশ্চর্য্যময়ীর এবং মাধুরীর ভূমিকায় শশীমুখীর অভিনয়ে কোনও রূপ ত্রুটি লক্ষিত হয় নাই। আলিবর্দ্দির অভিনয় করিয়াছিলেন হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, উপানন্দ জীবনকৃষ্ণ দেব এবং ছিদাম অহীন্দ্র দে। অভিনয়ে কাহারও পূর্ব্বখ্যাতি হ্রাস পায় নাই,…'বঙ্গে বর্গী'র প্রথম অভিনয়ের দিনে ক্ষেত্রবাবুর আবৃত্তিতেই লোকে মুগ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় দিনে দানীবাবু কণ্ঠস্বর একটু চড়াইয়া যেন সকলকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন। উপানন্দ এবং ছিদাম খুব উপভোগ্য হইত। অহীন্দ্রবাবু একজন স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরস-নিপুণ নট ছিলেন।" (বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও দানীবাবু—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত) সমালোচনা প্রসঙ্গে 'মজলিশ' (৮।৯।১৯২২) জানালে :— "… গত শনিবার আমি মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে 'বঙ্গে বর্গী' অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, লোকসংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে "ন স্থানং তিলধারণং" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।……ভাস্কর পণ্ডিত স্বয়ং অভিনেতা-সম্রাট সুরেন্দ্রবাবু সাজিয়াছিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত, বৃদ্ধ আলিবর্দ্দী, মোহনলাল, সিরাজ, মাধুরী কাহারও অভিনয়ত মন্দ দেখিলাম না। তবে, আমার চোখে সামান্য একটু ত্রুটি দেখা গিয়াছে। ভাস্কর পণ্ডিতের সহকারী তানোজী নূতন অভিনেতা, মুখস্ত বুলি, স্বরে গাম্ভীর্য্য নাই, আর

একটু যোগ্যতর ব্যক্তিকে এই অভিনয় করিতে দিলে শোভনীয় হইত। মীরজাফর কূট-বুদ্ধি, ধূর্ত্ত, কিন্তু এমন এক গোবেচারীকে মীরজাফর সাজান হইয়াছিল যে একমাত্র ঐ অভিনেতার দোষে নাটকখানির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বোধ হইল। ভাস্কর পণ্ডিতের কন্যা গৌরীর অভিনয়কৌশল ভাল, কিন্তু পিতার চেয়ে বয়সে তাহাকে অধিক বলিয়া মনে হইল। অপেক্ষাকৃত কম-বয়স্কা রমণীকে গৌরীর পার্ট দেওয়া উচিত ছিল। অন্যান্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। সকলেই যোগ্যতার সহিত আপন আপন অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। দৃশ্যপট সুন্দর ও মনোহর। সাজসজ্জাও মনোমোহনেরই উপযুক্ত হইয়াছিল। .....”

নতুনের ফাঁকে ফাঁকে ‘রিজিয়া’, ‘বরুণা’, ‘শঙ্করাচার্য’, ‘সরলা’, ‘শিরী-ফরহাদ’,‘হিন্দা-হাফেজ’,‘তুফানী’,‘চন্দ্রগুপ্ত’, ‘প্রফুল্ল’, ‘বিষবৃক্ষ’, ‘গৃহলক্ষ্মী’, ‘আলিবাবা’, ‘বলিদান’, ‘সাজাহান’, ‘হারানিধি’ প্রভৃতি পুরানো নাটকেরও বিরাম ছিল না। যে সব অভিনয়ে দানীবাবু থাকতেন সেগুলি দেখার জন্য দর্শক উপচে পড়তো। তাঁর নামের জোরেই সে সময় মনোমোহন থিয়েটারের আকাশছোঁয়া প্রতিপত্তি। বস্তুতঃ, অমরেন্দ্রনাথকে বাদ দিলে গিরিশচন্দ্রের তিরোভাব (১৯১২) ও শিশিরকুমারের আবির্ভাব (১৯২১)— এই দুই-এর মধ্যবর্তী সময়ে তিনিই বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা। তাঁর জনপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত হিসাবে মাত্র এটুকু বললেই আপাততঃ যথেষ্ট হবে, এই থিয়েটার থেকে আট বছরে উনি এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা আয় করেছিলেন। দানীবাবু তথা মনোমোহন থিয়েটারের এই সৌভাগ্যের ধারা হয়তো আরও কিছুকাল অব্যাহত থাকতো কিন্তু ১৯২১ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তন ঘটে গেল যার প্রতিক্রিয়া এড়ানো মনোমোহন থিয়েটারের পক্ষে সম্ভব হল না। আর তার ভাগ্য বিপর্যয়ের সুরু সেই সময় থেকে।

নবযুগের সূত্রপাত

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্য হ'তে নতুন প্রযোজনার অভাবে, বৈচিত্র্যহীনতায় এবং চিন্তাশক্তির দৈন্যে স্বাভাবিক চলৎশক্তি হারিয়ে স্থাণুবৎ গতিহীন ও নিষ্প্রাণ হয়ে দাঁড়ায় বাংলা মঞ্চ। বিহারী-লাল, মহেন্দ্রলাল, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল, গিরিশচন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি দিকপালরা সব গত হয়েছেন— বৃদ্ধ, স্থবির অমৃতলাল বসু ব্যতীত নাট্য-জগতে তখন কর্ণধার বলতে কেউ নেই, অভি-ভাবকহীন মঞ্চলোক সে সময় প্রতি মুহূর্তে অবলুপ্তির আশঙ্কায় ত্রস্ত। বাংলা থিয়েটারে সে বড় দুর্দিন! "বঙ্গীয় নাট্যশালার 'সাজান বাগান' তখন 'শুকিয়ে গেছে'— প্রতিভাবান নটদের কেউই বেঁচে নেই— একা দানিবাবু তখন স্থবির সিংহের মত পুরাতনের রোমন্থন করে চলেছেন, মঞ্চে তখন তাঁর নতুন কিছু দেবার ছিল না। থিয়েটারের ভিতর এবং বাইরের সৌন্দর্য তখন ম্লান হয়ে এসেছে।··· প্রেক্ষাগৃহ মলিন, দর্শকদের বসবার আসনগুলি পীড়াদায়ক, শিল্পীদের বেশভূষায় তিন যুগের ছাপ পড়েছে, নতুন নাটক নেই, নাট্যকারও নেই। অপরেশচন্দ্র, দানিবাবু, মন্মথ পাল, কার্তিকচন্দ্র দে, কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, তারক পালিত, প্রবোধ ঘোষ, কুসুমকুমারী, বসন্তকুমারী প্রভৃতি গিরিশযুগের পুরাতন নট-নটীরা প্রতি শনি, রবি ও বুধবার রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোর সামনে এসে দাঁড়াতেন। নাট্যা-নুরাগী বাঙালী দর্শক, যারা রঙ্গমঞ্চকে চিরদিন ভালোবেসে এসেছে, ধূলিমলিন, হৃতসৌন্দর্য প্রেক্ষাগৃহে এসে তাঁদের অভিনয় দেখতেন আর ভাবতেন, এমনভাবে থিয়েটার আর ক'দিন চলবে?" (শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার—মণি বাগচি) বাংলা থিয়েটারের সেই নৈরাশ্যময় অন্ধকার যুগে নবজীবনের আশ্বাসবাণী বহন ক'রে নিয়ে এলেন যিনি, তাঁর নাম— শিশিরকুমার ভাদুড়ী। সৌখিন অভিনয়ে বিদগ্ধ দর্শকের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন পাথেয় ক'রে,

অধ্যাপনা ছেড়ে এই তরুণপ্রতিভা সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দিলেন। ম্যাডান কোম্পানী পরিচালিত কর্ণওয়ালিশ মঞ্চে (বর্তমানের শ্রী সিনেমা) ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' নাটকের নামভূমিকায় শিশির-কুমারের দীপ্ত আত্মপ্রকাশ সেকালের কলারসিকরা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে প্রত্যক্ষ করলেন। "মনে হতে লাগল যেন এক অতুলনীয় শক্তিশালী যাদুকর তার মায়াজাল বিস্তার করেছে। প্রেক্ষাগৃহের প্রত্যেকটি লোক সে মায়ায় মুগ্ধ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে আছে। আশ্চর্য কণ্ঠস্বর! অদ্ভুত সে কণ্ঠস্বরের ব্যঞ্জনা! অপূর্ব স্বরনিয়ন্ত্রণী-শক্তি।" (প্রেমাঙ্কুর আতর্থী) নতুন যুগের নতুন রূপকারের মহিমান্বিত আবির্ভাবে দেশব্যাপী সাড়া পড়ে গেল। রঙ্গালয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নাট্যামোদীরা আশ্বস্ত হলেন— অভিনন্দন জানালেন অভিনয়ক্ষেত্রে যুগস্রষ্টা শিশিরকুমারকে। সেটা ইংরেজী ১৯২১ সাল। পরের বছর অর্থাৎ ১৯২২-এ মিনার্ভায় যোগদান করলেন দুই তরুণ, শিক্ষিত এবং শক্তিধর অভিনেতা নরেশচন্দ্র মিত্র ও রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে যথাক্রমে চাণক্য ও আন্টিগোনসের ভূমিকায় তাঁদের প্রথম মঞ্চাবতরণ দর্শকরা সানন্দে বরণ ক'রে নিলে। ("নরেশচন্দ্র আর রাধিকানন্দ চরিত্রকে প্রতিষ্ঠা দি' অসাধারণ নিপুণ ছিলেন। মঞ্চে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা নাটকের চরিত্র হয়ে উঠ্‌তেন। নরেশচন্দ্রের খর্ব আকৃতির আর খিন্ন কণ্ঠস্বরের সকল ত্রুটি দূর করে দেয় তাঁর প্রদীপ্ত চোখের অভিনয় এবং ইমোশনকে দুর্বার করে দেখাবার কৌশল। রাধিকানন্দেরও কণ্ঠস্বর কিছুটা ভগ্ন ছিল, কিন্তু বাণী ছিল বিশুদ্ধ, অভিনয়ে ইমোশনের চেয়ে ইনটেলেক্‌ট প্রয়োগ করতেন বেশী।" — শচীন সেনগুপ্ত) বিশেষ-ভাবে প্রশংসিত হলেন রাধিকানন্দ। 'চ গুপ্ত' নাটকে আন্টিগোনসের রূপসজ্জায় "তাঁর সংলাপ, দৈহিক ভঙ্গিমা, মৌখিক ভাবের ব্যঞ্জনা এবং প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ সমস্তই হলো এমন অভিনব যে দর্শকরা উপলব্ধি করলে অভাবিত আনন্দ। নাট্যগগনে যে একটি

নূতন তারকার সন্ধান পাওয়া গেল, সে সম্বন্ধে আর কারুর কোনো সন্দেহ রইলো না।" (হেমেন্দ্রকুমার রায়) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক নাট্যরীতির প্রবর্তন করলেন এই দুই অভিনেতা। তাঁদের অভিনয় ও অভিব্যক্তির মধ্যে অনাস্বাদিত মাধুর্যের সন্ধান মিললো। এই বছরের শেষে ম্যাডান থিয়েটারে আত্মপ্রকাশ ঘটলো আর এক নবাগত সুদর্শন এবং সুকণ্ঠ শিল্পীর— তিনি নির্মলেন্দু লাহিড়ী। ("নির্মলেন্দু লাহিড়ীর আবৃত্তির খ্যাতি ছিল। আবৃত্তি-বহুল ভূমিকাগুলি অভিনয় করে তিনি শ্রোতৃদেরকে মাতিয়ে তুলতে অদ্বিতীয় ছিলেন। কিন্তু তা কেবল সুষ্ঠু আবৃত্তির গুণেই নয়, বাক্-বিভূতির বা oration-এরও গুণে।"— শচীন সেনগুপ্ত) আর ১৯২৩-এ ষ্টারে আর্ট থিয়েটারের পতাকাতলে তিনকড়ি চক্রবর্তী ("বাঙালীর সৌভাগ্য আর্ট থিয়েটার এই ভাবাভিব্যক্তির দ্বারা বাঙলার অভিনয় জগতে নূতন যুগ আনয়ন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্তী সে ভাবধারার অগ্রদূত।"— বসুমতী), অহীন্দ্র চৌধুরী ("একালে নূতন যে কয়জন রঙ্গাজীব (রঙ্গজীবী?) রঙ্গমঞ্চে যোগদান করিয়াছেন, বোধহয় একমাত্র শিশিরবাবু ছাড়া এমন শক্তিমান, এমন জনপ্রিয় অভিনেতা আর একজনও নাই। হয়ত শিশিরবাবুর অভিনয় সর্ব্বথা অনুমোদন করেন না, এমন লোক দুই চারিজন মিলিবে কিন্তু অহীন্দ্রবাবু সর্ব্বজনপ্রিয়"— বাঙলা। "নাটকের প্রতিটি মুহূর্তকে তিনি ইমোশন দিয়ে, আঙ্গিক অভিব্যক্তি দিয়ে, স্বরের ব্যঞ্জনা দিয়ে, দর্শকচিত্তে ঝড় তুলে দিতে পারেন।··· যতক্ষণ তিনি মঞ্চে থাকেন, ততক্ষণ তিনি দুর্নিবার, চিত্ত তিনি জয় করে নেবেনই; হয় কণ্ঠ দিয়ে, নয় দৃষ্টি দিয়ে, নয়ত বা বিশিষ্ট কোন ভঙ্গি দিয়ে; কিন্তু সব সময়েই গভীর আবেগের আবেদন দিয়ে। যুগপৎ সব কৌশল তিনি একসঙ্গে প্রয়োগ করতে পারেন।"— শচীন সেনগুপ্ত), দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ("দুর্গাদাসের গদ্য আবৃত্তি সুমধুর ছিল। কিন্তু তারও আকর্ষণ আবৃত্তির জন্য ততটা

নয়, যতটা তাঁর কণ্ঠের মাধুর্যের জন্য, বিশেষত যখন তিনি খাদে আবৃত্তি করতেন। তাঁর অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল, তাঁর পুরুষোচিত সুঠাম দেহ, তাঁর গাঢ় কালো চোখ, তাঁর অনুপম চলা-ফেরা।··· প্রত্যেকটি মুহূর্ত এক একটি ছবি ফুটিয়ে তুলত।"—শচীন সেনগুপ্ত) প্রমুখ প্রতিভাবান নবীন অভিনেতার দল 'কর্ণার্জুন' অভিনয়ের মাধ্যমে তরুণের জয়যাত্রা সম্পূর্ণ করলেন। এতকাল বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে ছিল নটেরই প্রাধান্য, তাঁর প্রতিষ্ঠালাভে সহায়তা করাই ছিল নাট্যকার এবং কলাকুশলীদের একমাত্র 'মহৎ' কর্তব্য কিন্তু তরুণের এই অভিযান সর্বপ্রথম প্রমাণ করলে অভিনয় কেবলমাত্র 'অভিনয়' নয়, তার সার্থকতা নির্ভর করে অভিনয়, মঞ্চ, আলো, রূপসজ্জা, সঙ্গীত, ধ্বনি প্রভৃতি বিভিন্ন নাট্যআঙ্গিকের সুষ্ঠু সমন্বয়ের উপর। বস্তুতঃ, বাংলা থিয়েটারে 'প্রযোজনা'র আবির্ভাব এই সময়েই, যার প্রবর্তনার কৃতিত্ব আর্ট থিয়েটারের তথা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং প্রবোধচন্দ্র গুহের প্রাপ্য। অল্পকাল পরে শিশিরকুমারের 'সীতা'র উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে এর পরিপূর্ণ বিকাশ প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। আরো অভিনব ছিল তরুণদের এই নাট্যপ্রয়াস এই কারণে যে, এঁরাই সর্বপ্রথম অভিনয়ব্যাপারটিকে অন্ধ হৃদয়াবেগ থেকে মুক্ত ক'রে মননশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। তাঁদের সর্ববিধ নাট্যকর্মে, কি অন্তরঙ্গ, কি বহিরঙ্গের পরিবর্তনসাধনে এমন এক সূক্ষ্ম, মার্জিত, কলানিপুণ মানসিকতা প্রকাশ পেতে লাগলো, যাতে সমকালীন দর্শকমন অভিভূত না হয়ে পারলো না। দর্শকরুচির ঘটলো পরিবর্তন। তারুণ্যের জয়গানে প্রেক্ষাগৃহ হয়ে উঠলো মুখরিত।

মনোমোহনের পতন

যুগ বিবর্তনের এই সন্ধিক্ষণে মনোমোহন কালের দাবীকে অস্বীকার ক'রে নামালে সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা

'আলেকজাণ্ডার' (১৮।৮।১৯২৩) নামে এক কদর্য নাটক। সেই মান্ধাতার আমলের গতানুগতিক অভিনয় আর সনাতন মঞ্চব্যবস্থা দেখে দর্শকরা গভীর বিতৃষ্ণায় মুখ ফেরালে। নবযুগের যৌবনদীপ্ত রূপকারদের তুলনায় তরুণ নায়কের রূপসজ্জায় প্রবীণ অভিনেতার মঞ্চাবতরণ এবং অক্ষম আস্ফালন তাদের অসহ্য লাগলো।... "আলেকজাণ্ডার-রূপী স্থবির দানীবাবুকে দর্শক নেবে কেন? 'আলেকজাণ্ডার' হবেন প্রদীপ্ত তরুণ, সেখানে দানীবাবু বৃদ্ধস্থবির, মানাবে কেন ওঁকে? তারপরে, নাটকখানিও তত সুবিধার ছিল না। আছে কতকগুলি চমকপ্রদ 'সিচুয়েশন' মাত্র কিন্তু তা-ও কে যে কখন কোথায় ঢুকছে, তার কোনো ধারাবাহিকতা নেই, পারম্পর্যও নেই। তবে একটা ভাব অবশ্য ছিল নাটকে, সেটি—স্বাদেশিকতা। সে যুগের তক্ষশীলা ও পুরু—স্বাদেশিকতার আবেগ প্রকাশের সুযোগও ছিল। তাতেও মুশকিল হয়েছিল এই যে, বহু স্থানে 'সেন্সর' কেটে দিয়েছিল। যেগুলি কাটা, বইতে সে-সব স্থানে শূন্য লাইনের ওপর তারকাচিহ্নিত করা আছে। তাতে, পুরো সংলাপগুলি যে কী তা-ও সঠিক নির্ধারণ করা যায় না।" (নিজেরে হারায়ে খুঁজি / প্রথম পর্ব—অহীন্দ্র চৌধুরী) অন্তঃসারশূন্য, দুর্বল নাটক, বৈচিত্র্যহীন, গতানুগতিক অভিনয় আর চিরাচরিত, উপেক্ষিত মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি একত্রিত হয়ে মনোমোহনের পতনের পথই কেবলমাত্র মসৃণ ক'রে দিলে।[৩] নবীনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবীণের

৩ কোনো কোনো পত্রিকায় অবশ্য এই নাটকাভিনয়ের ভালো-মন্দমিশ্রিত সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ 'বাসন্তী' লিখেছে :— "... 'আলেকজাণ্ডার' নাটকের তৃতীয় অভিনয় হইয়া গিয়াছে। ... লেখার দিক দিয়া দেখিতে গেলে মোটের উপর নাটকখানার প্রশংসা করিতে হয়।

একটি জলন্ত দেশাত্মবোধের ধারা এই নাটকে দেদীপ্যমান।... স্থানে স্থানে কয়েকটি অসংবদ্ধ, অস্বাভাবিক এবং অসম্ভব ঘটনার অবতারণ করিয়া লেখক

পশ্চাদপসরণ সুরু হল। কিন্তু 'আলেকজাণ্ডারে'র শোচনীয় পরিণতি তাঁদের চোখ খুলে দিল না, দেয়ালের লিখন পড়তে তাঁরা অক্ষম হলেন, তাই পরবর্তী নাটক নির্বাচনেও সেই একই ভ্রান্তি ঘটলো। যুগের দাবীর প্রতি এবারেও তাঁরা মুখ ফিরিয়ে রইলেন। ফলে, নিশিকান্ত বসুরায়ের 'ললিতাদিত্য' (২।২।১৯২৪) মনোমোহনের দুর্ভাগ্যের পসরা কানায়-কানায় পূর্ণ করলে। থিয়েটারের ভরাডুবি হল। "নাটকখানি নিকৃষ্ট, কিন্তু নাটকও আর কিছু পাওয়া গেল না। পাক্‌সীর জনৈক শিক্ষক নির্ম্মল বসুর একখানি নাটক লিখিবার কথা ছিল, তাহাও তৈরী হইতে দেরী হইল। কাহারও ধৈর্য্য রহিল না, নূতন নাটকের জন্য সকলেই ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। আর কিছু না পাইয়া এই নাটকখানিই অভিনীত হইল। আর ইহাতে মনোমোহনের পরাজয় হয় নিদারুণ।[৪] একে

নাটকখানার গৌরবের অনেকটা হানি করিয়াছেন একথা ন্যায় এবং সত্যের খাতিরে আমরা বলিতে বাধ্য।··· অংশ বিতরণের দোষে আলেকজাণ্ডারের ভূমিকা একটু বেমানান হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এই অংশে নট-চূড়ামণি দানীবাবু তাঁহার সুখ্যাতি সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ··· বীরসিংহের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের সুযোগ্য দৌহিত্র [illegible]বাবুর অভিনয় আমাদিগের বড়ই মধুর লাগিয়াছে।··· অহীন্দ্রবাবু বেসাসের ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। তক্ষশীলার অভিনয় উত্তম হইয়াছে, কিন্তু চেহারা এবং পরিচ্ছদের দোষে অভিনেতার সকল পরিশ্রমই ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

গান অনেক শুনিলাম, কিন্তু তাহার মধ্যে সঙ্গীত বলিয়া পদার্থ খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছিল— আশ্চর্য্যময়ী ও রাণীর মুখে দুই তিনটিতে।··· পুরুর অভিনয়ের ব্যর্থতা দেখিয়া প্রাণ ভরিয়া যায়। এই কি আর্য্য নরপতি প্রাতস্মরণীয় পুরুষপ্রধান পুরুর চিত্র! দরায়ুস, অলিম্পিয়া, চিলো, ক্লিয়োপেট্রা প্রভৃতি কয়টি চরিত্রের অভিনয় ভাল হ[illegible]য়াছে। অবশিষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে একটা "সুর" সর্ব্বদা ভাসিয়া থাকিয়া অন্য সকল সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এই সুরটা কি সত্যই অপরিহার্য্য? ···"

৪ 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'অবতার' প্রমুখ

নূতনের জয়ডঙ্কা, তাহার উপর সমালোচকের বিতৃষ্ণা, নাটকখানিও কদর্য্য, দানীবাবু কোনোরকমেই নিজের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে পারিলেন না।" (বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও দানীবাবু—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত) নব্য সম্প্রদায়ের নাট্য-পরিবেশনা দর্শকচাহিদাকে অনেক, অনেক বাড়িয়ে তুলেছে। তাদের দাবী তখন সাহিত্যরসাশ্রিত নাটক, প্রতিভাদীপ্ত অভিনেতাকুল এবং শিল্পরুচিসম্মত প্রয়োগকৌশল—যার কোনোটিই 'আলেকজাণ্ডার' ও 'ললিতাদিত্যে'র মাধ্যমে পূর্ণ হল না।

পর পর দুটি নাটক ব্যর্থ হওয়ায় দুই মালিক মনোমোহন পাঁড়ে এবং দানীবাবু একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, আগে সব খরচ বাদ দিয়ে দু'জনার প্রত্যেকের ভাগে লাভ থাকতো মাসে হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা। পূজায় এবং বড়দিনে এক একজনের লাভের অঙ্ক আড়াই থেকে তিন হাজারে দাঁড়াতো। এই লাভের টাকায় দানীবাবু কাশী আর টালায় দু'খানা ভালো বাড়ী বানিয়েছিলেন। আজ সেই মুনাফা মাসে ২০০/২৫০ টাকায় এসে ঠেকেছে। নতুন কালের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে ওঠা নিঃশেষিত-প্রতিভা দানীবাবুর পক্ষে আর সম্ভব নয়। তাছাড়া রাস্তা তৈরীর জন্য ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের থিয়েটারবাড়ী ভেঙে ফেলার পরিকল্পনা তখন চূড়ান্ত। সব কিছু খতিয়ে ভেবে দেখে মনোমোহন পাঁড়ে থিয়েটার তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

কয়েকটি পত্র-পত্রিকা কিন্তু 'ললিতাদিত্য' নাটকের অভিনয়ের সুখ্যাতি করেছে। প্রথমোক্ত সংবাদপত্রটি বলেছিল :—"The sonambalastic (somnambulistic ?), scene played by Dani Babu is a marvel of histrionism. He is ably supported by Kusum who as queen shows rare histrionism. The part of Bhupal Sen has well been rendered by Khetra Babu (Mitra)." (হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' থেকে উদ্ধৃত)

ইতিপূর্বে শিশিরকুমার ম্যাডান থিয়েটার ছেড়ে ১৯২৩-এর বড়দিনে ইডেন গার্ডেনের প্রদর্শনীতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা' অভিনয় ক'রে রসজ্ঞ দর্শকদের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তখন নিজস্ব এক রঙ্গমঞ্চের সন্ধান করছিলেন। সাময়িকভাবে উনি আলফ্রেড থিয়েটারে (বর্তমানের 'গ্রেস' সিনেমা) আশ্রয় নিলেও সেখানকার পরিবেশ ওঁর মনঃপুত হচ্ছিল না। ১৯২৪-এর এপ্রিল/মে মাসে মনোমোহনবাবু যখন কার্সিয়াং-এ, শিশিরকুমার ব্যারিস্টার শ্রীশ বসুকে সঙ্গে নিয়ে ওঁর কাছ থেকে মনোমোহন থিয়েটার লিজ নেওয়ার ব্যবস্থা পাকা ক'রে এলেন। এটর্নী গণেশচন্দ্র দে'র মাধ্যমে মাসিক তিন হাজার টাকা ভাড়ায় শিশিরকুমারের সঙ্গে মনোমোহমবাবুর চুক্তি হল। থিয়েটারবাড়ী দখল পাওয়ার জন্য সঙ্গত কারণেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন শিশিরকুমার। বিনা পরামর্শে অকস্মাৎ মনোমোহনবাবু থিয়েটার তুলে দেওয়ায় দানীবাবু দুঃখিত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ, 'শিশির' (১৭।৩।১৯২৪) লিখেছিল ঃ—

"... দানীবাবুর সঙ্গে মনোমোহনবাবুর থিয়েটারে বখরাদারী সম্বন্ধ ছিল। দানীবাবু ছিলেন কর্ম্মী; পাঁড়েজী ছিলেন ধনী। ব্যবসা চলিতেছিল। দানীবাবুর সঙ্গে বখরাদারীর মেয়াদ ছিল ১৩৩১ সালের শ্রাবণের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত; তারপরেও একবছর ছিল দানীবাবুর optional period ইচ্ছা-ভোগ মেয়াদ! পাঁড়েজী ভাগ্যবান্ ব্যবসায়ী পুরুষ, বোধহয় ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির জন্যই ১লা জ্যৈষ্ঠ হইতে থিয়েটারটি হস্তান্তরিত করিয়া দিলেন। দানীবাবুর কথা ভাবিলেন না, শতাধিক অভিনেতা-অভিনেত্রীর কথাও ভাবিলেন না, থিয়েটারটি ভাড়া দিলেন। শুনিতে পাই, তাঁহার অংশীদার, ম্যানেজার, প্রধান অভিনেতা দানীবাবুকে একবার জিজ্ঞাসা করারও দরকারও তিনি দেখেন নাই।" দানীবাবু তখনও আইনতঃ মনোমোহনের আধা মালিক, ইচ্ছা করলে ওঁদের চুক্তি তিনি নাও মানতে পারতেন কিন্তু উনি সেদিকে গেলেন না। তিনি

ছিলেন শিথিল প্রকৃতির, নির্বিরোধী লোক ; তাছাড়া মনোমোহন-বাবুর সঙ্গে তাঁর চুক্তির মেয়াদও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সে কারণে থিয়েটারের দখল দানীবাবু বিনা বাধায় শিশিরকুমারকে ছেড়ে দিলেন। শিশিরকুমার ওঁকে সসম্মানে নিজের সম্প্রদায়ে স্থান দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু দানীবাবু তাতে রাজী হন নি। একদা যেখানে তিনি সম্রাটের গৌরবে বিরাজ করেছেন, সেই রঙ্গালয় থেকে শেষ পর্যন্ত দীনের করুণ বিদায় তাঁকে নিতে হল।

মনোমোহন থিয়েটারের পতন এবং নিজের এই করুণ পরিণতির জন্য দায়ী দানীবাবু স্বয়ং। কেবলমাত্র, নতুন যুগের তরুণ প্রতিভাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার শক্তি ও উদ্যমের স্বাভাবিক অভাবই যে, প্রৌঢ় নটসম্রাট দানীবাবুর পরাজয় ঘটিয়েছিল তাই নয়, এঁদের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন অভিনয়কর্মে নিজের অবহেলাই দানীবাবুর তথা মনোমোহন থিয়েটারের ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রধান কারণ। শেষ ক'বছর অভিনয়ে ওঁর মন ছিল না। "দানীবাবু তখন প্রায়ই যান হাওয়া খেতে বিদেশে, ওঁর বদলে ওঁর ভূমিকায় নামেন হীরালালবাবু, কিন্তু বিক্রি আশানুরূপ হয় না।··· মাঝে মাঝে ক্ষেত্রবাবু আর চুণীবাবু এসে অভিনয় করেন, আর দানীবাবু বছরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই যান কাশী। অভিনয়ে তখন তাঁর তেমন মন নেই, প্রতিপক্ষ নেই— চেষ্টাও নেই, তবে তিনি জানতেন, তাঁর নামেই বিক্রি হতো টিকিট। উনি না থাকলে, এমনও দেখা যেতো যে, ঠিকাদার 'নাইট' কিনে নিয়ে 'পুনঃ সেল' করছে, আট আনার টিকিট চার-ছ'আনাতেও বিক্রি হচ্ছে কখনো-সখনো। দানী-বাবুর ব্যাপার দেখে মনোমোহন পাঁড়েমশাইও হাল ছেড়ে দিয়েছেন। থিয়েটারের প্রতি তাঁর তখন আর তেমন মমতা নেই, তিনি প্রকৃত-পক্ষে থিয়েটার তখন তুলেই দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বহুলোক বেকার হয়ে পড়বে, সেইজন্য মনোমোহনের বিজনেস্ ম্যানেজার চারুচন্দ্র বসু মনোমোহনবাবুকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মিনতি করে

থিয়েটারটি নিজের দায়িত্বেই চালাচ্ছিলেন। মনোমোহনবাবু কিন্তু ভাড়ার টাকাটা মাস হতে-না-হতেই আদায় করে ছাড়তেন। চারু-বাবুর প্রথম দেয়-ই ছিল মনোমোহনবাবুকে। দ্বিতীয় দানীবাবুকে। তৃতীয় ছিল— বিজ্ঞাপন ইত্যাদি বাবদ খরচ-খরচার জন্য। চতুর্থ ছিল, শিল্পীদের। মনোমোহনবাবু এদিকে খুব কড়া লোক। তিনি জানতেন যে, পাঁচটি টাকা বাকী পড়লেও তার জন্য তিনি নিজেই আইনত দায়ী, কারণ, মালিক তিনি, তাঁর নামেই থিয়েটার চলছে। তাই তিনি করতেন কী, ভিতরে-ভিতরে উস্কে দিতেন শিল্পীদের— মাইনে পেয়েছ ? আদায় করে নাও— আদায় করে নাও। চারুবাবুর হতো উভয় সঙ্কট।" (নিজেরে হারায়ে খুঁজি/প্রথম পর্ব — অহীন্দ্র চৌধুরী) কিন্তু এরকম পরিস্থিতিতে থিয়েটার কতদিন চলতে পারে ? তাই, শিশিরকুমারের প্রস্তাব যখন তাঁর কাছে এল, মনোমোহনবাবু আর দ্বিধা করলেন না— ওঁর হাতেই মঞ্চ তুলে দিলেন।

"মনোমোহন রঙ্গালয়ে প্রাচীন দলের শেষ-অভিনয় হয়ে গেল। আপাততঃ কলকাতায় যে দুটি রঙ্গালয় রইল, তা প্রধানতঃ নব্যসম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, জন-সাধারণ এখন পুরাতনের চেয়ে নূতনেরই বেশী পক্ষপাতী।" (নাচ-ঘর— ১৬।৫।১৯২৪) আর এই 'নূতনে'র বন্দনাগীতি কণ্ঠে নিয়ে মনোমোহনের শূন্য মঞ্চে আবির্ভূত হলেন শিশিরকুমার ও তাঁর সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠিত হল— 'মনোমোহন নাট্যমন্দির'।

পরিশিষ্ট

ক. অভিনয়-তালিকা

কালাপাহাড়	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৭।৮।১৯১৫
জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, ভীষ্ম, নন্দবিদায়, ধ্রুবচরিত্র ও চতুরালি		১।৯।১৯১৫
কণ্ঠহার	দাশরথি মুখোপাধ্যায়	২৫।৯।১৯১৫
শ্যামসুন্দর	—	৬।১১।১৯১৫
বাদশাহজাদী	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	১১।১২।১৯১৫
বাপ্পারাও	নিশিকান্ত বসুরায়	২৬।২।১৯১৬
কবির	হরনাথ বসু	৮।৪।১৯১৬
চণ্ড, বাহাদুর, Pleader's trouble, নির্বাচিত দৃশ্য, সঙ্গীত এবং নৃত্য, অরোরা বায়স্কোপ ও কলির অর্জুন		২১।৪।১৯১৬
মোগল-পাঠান	সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮।৭।১৯১৬
চন্দ্রশেখর	নাট্যরূপ—অমৃতলাল বসু	৭।৭।১৯১৭
পানিপথ	সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৬।১০।১৯১৭
দেবলাদেবী	নিশিকান্ত বসুরায়	১৭।৮।১৯১৮
পরদেশী	পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়	বড়দিন, ১৯১৮
প্রফুল্ল তৎসহ রাজা ও রানী, জয়দেব, কল্যাণী এবং চাঁদবিবি নাটকের নির্বাচিত দৃশ্য ও নৃত্যগীত এবং পরদেশী		২০।১১।১৯১৯
ওলটপালট	অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	২৫।১২।১৯১৯
হিন্দুবীর	সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০।১।১৯২০
বিষবৃক্ষ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩১।৭।১৯২০

বঙ্গে বর্গী	নিশিকান্ত বসুরায়	১১।২।১৯২২
আলেকজাণ্ডার	সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮।৮।১৯২৩
ললিতাদিত্য	নিশিকান্ত বসুরায়	২।২।১৯২৪

খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায়

দানীবাবু, প্রিয়নাথ ঘোষ, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, অহীন্দ্রনাথ দে, চুনিলাল দেব, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, জীবনকৃষ্ণ দেব, তারাসুন্দরী, হেমন্তকুমারী, নীরদাসুন্দরী, বসন্তকুমারী, তিনকড়ি দাসী, শশিমুখী, আশ্চর্যময়ী, কুসুমকুমারী, সোনামণি, হরিপ্রিয়া প্রভৃতি।

মনোমোহন নাট্যমন্দির

(১৯২৪-১৯২৫)

মনোমোহন বন্ধ হওয়ার পর সেই মঞ্চে নিজস্ব সম্প্রদায় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। থিয়েটারের নাম দেওয়া হল— 'মনোমোহন নাট্যমন্দির'। শিশিরকুমার নিজেই লেসী ও প্রযোজক হলেন। সেটা ইংরেজীর ১৯২৪ সাল।

মনোমোহনের বিলুপ্তি এবং সেই মঞ্চেই নাট্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠা— ঘটনা দু'টির ইতিহাসের দিক থেকে তাৎপর্য আছে। স্বল্প পরবর্তী-কালে, আর্ট থিয়েটারের ছত্র ছায়ায় দানীপ্রতিভার শেষ রশ্মিটুকু বর্ণাঢ্য শোভায় দেদীপ্যমান হয়ে উঠলেও প্রকৃতপক্ষে, নতুন যুগের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দানীবাবুর পরাজয়েই মনোমোহনের পতন এবং গিরিশযুগের অবসান। আর নাট্যমন্দিরের আবির্ভাবে নব-যুগেরই সার্থক সূচনা ঘোষিত হয়েছিল কেননা, এই শতকের দ্বিতীয় দশকের সূত্রপাতে ম্যাডান, মিনার্ভা এবং ষ্টারে নবীনের তূর্যনিনাদ ধ্বনিত হলেও প্রার্থিত শিল্পসৃষ্টির সেইসব খণ্ডিত প্রয়াস পূর্ণতা ও চরিতার্থতা লাভ করেছিল নাট্যমন্দিরের মিলিত ধারায়। একই মঞ্চে, দানীবাবুর প্রস্থানের পর শিশিরকুমারের প্রবেশ, যেন অভিন্ন আকাশে সূর্যাস্তের পর নতুন ক'রে সূর্যোদয়।

পেশাদার নট ও পরিচালকরূপে শিশিরকুমারের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল ম্যাডানদের কর্ণওয়ালিশ রঙ্গমঞ্চে, ১৯২১ সালে। ক্ষীরোদ-প্রসাদের 'আলমগীর' নাটকের নামভূমিকায় শিশিরকুমারের অসাধারণ অভিনয়নৈপুণ্য সেদিনকার দর্শকমহলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু, শিশিরকুমারের নব্যরীতির অভিনয়ধারার সঙ্গে পুরাতনপন্থী সহশিল্পীদের বাচনভঙ্গী ও

অভিব্যক্তির অসঙ্গতি নাটকের সামগ্রিক আবেদনকে প্রার্থিত পর্যায়ে উন্নীত করতে দেয় নি। রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে এই সামঞ্জস্যহীনতা শিশিরকুমারকে নিরন্তর পীড়া দিত। তাই, যখন ম্যাডানদের আচরণের সর্বত্র শিল্পরুচি বিবর্জিত নিছক ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ ঘটতে সুরু করেছে, সেই সময় একদিন বাঙ্গালী জাতি সম্পর্কে ম্যাডান কোম্পানীর কর্ণধার রোস্তমজীর এক অসম্মানজনক উক্তির প্রতিবাদে তিনি তাঁদের সংস্পর্শ ত্যাগ করলেন।[১]

এরপর ১৯২৩-এর বড়দিনে ইডেন গার্ডেনের প্রদর্শনীতে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নিয়ে উনি আবার দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। এবারকার নট-নটীরা প্রায় সকলেই ওঁর হাতে গড়া। তাঁদের দলগত অভিনয়নৈপুণ্য, শিশিরকুমারের প্রযোজনদক্ষতা এবং অনন্য শিল্প-প্রতিভা কলারসিকদের বিস্ময়ে অভিভূত করলো। "সে অভিনয় দেখে সকলে বিমুগ্ধ হলেন।...শিশিরকুমারের প্রতিভার পায়ে সকলে জানালেন নতি। সকলে বুঝলেন, বাংলার নাট্যগগনে যে-সূর্য্যের উদয় সকলে প্রার্থনা করছিলেন, সে-সূর্য্য এই শিশিরকুমার।" (শিশির/ভাদ্র, ১৩৬৬— সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়) 'সীতা'র সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে শিশিরকুমার স্থির করলেন, এই নাটক এবং শিল্পীগোষ্ঠী নিয়েই তিনি স্বাধীন প্রযোজকরূপে সাধারণ রঙ্গালয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন। সেইমত আলফ্রেড থিয়েটার ভাড়া নেওয়া হল। সেখানে 'সীতা'র মুক্তি আয়োজন যখন প্রায় সম্পূর্ণ,

১ "মদন কোম্পানীর কর্ণধার রোস্তমজী একদিন কোন বাঙ্গালী অভিনেতার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে শিশিরকুমারের সামনেই বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে অসম্মানজনক উক্তি করেন। শিশিরকুমার তখনই তাঁর কাছ থেকে থিয়েটারের চিঠি লেখবার কাগজ চেয়ে নিয়ে কর্মত্যাগপত্র লিখে রোস্তমজীর হাতে অর্পণ করে তখনই অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন। রোস্তমজী কিছুতেই আর তাঁকে ফিরিয়ে নিতে পারেন নি।" (বিংশ শতকের বঙ্গ রঙ্গালয়/গল্পভারতী, ভাদ্র ১৩৬৭— শচীন সেনগুপ্ত)

প্রতিদ্বন্দ্বী আর্ট থিয়েটার কৌশলে নাটকের অভিনয় স্বত্ব থেকে শিশিরকুমারকে বঞ্চিত করলে। কিন্তু অপ্রত্যাশিত বিঘ্নে হতোদ্যম না হয়ে তিনি নির্দিষ্ট তারিখেই (২১।৩।১৯২৪) 'বসন্তলীলা' নামে সদ্যরচিত গীতিনাট্যের মাধ্যমে আলফ্রেড মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। অন্যায় প্রতিবন্ধকতায় 'সীতা' মঞ্চস্থ করার দৃঢ়তর সঙ্কল্পে নবাগত নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীকে তিনি নাটক রচনার কাজে নিয়োজিত করলেন। এই অবসরে আলফ্রেডে চলতে লাগলো 'আলমগীর' নাটকের পুনরভিনয়। ইতিমধ্যে, মনোমোহন পাঁড়ে থিয়েটার তুলে দেওয়ার সঙ্কল্প করায় শিশিরকুমার কালবিলম্ব না ক'রে প্রতিকূল পরিবেশের আলফ্রেড মঞ্চ ছেড়ে মনোমোহন থিয়েটার লিজ নিলেন। নাটক রচনা তখনো অসমাপ্ত, তাই মঞ্চ মিনার্ভা সম্প্রদায়কে সাময়িক-ভাবে ছেড়ে দেওয়া হল। ১৯২২-এর অক্টোবরে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে মিনার্ভা থিয়েটার ভস্মীভূত হয়।[২] সেই সময় হ'তে এই সম্প্রদায় ভ্রাম্যমাণ দল হিসাবে যত্রতত্র অভিনয়রত ছিল। মনোমোহন মঞ্চে ১৯২৪,১৪ জুন্ পর্যন্ত 'বঙ্গনারী', 'রাজা বাহাদুর' প্রভৃতি পুরানো নাটক পরিবেশনার পর মিনার্ভা শিশির-পরিত্যক্ত আলফ্রেড মঞ্চে আশ্রয় নেয়।

ইতিমধ্যে, শিশিরকুমার থিয়েটারবাড়ীর আমূল সংস্কার করিয়েছেন। "মনোমোহন থিয়েটারে মঞ্চের সামনে একটা পুরনো থাম ছিল। সেটি ভেঙে মঞ্চের আয়তন বাড়িয়ে নেওয়া হল। পুরনো আসনের বদলে দর্শকদের জন্যে নতুন আসনের ব্যবস্থা হল। নাট্য-শালায় পুরনো এ-বি-সি-ডি মার্কার বদলে এল নতুন ক-খ-গ-ঘ ইত্যাদি। টিকিটে পর্যন্ত বাংলা ভাষা। বিলেতী কনসার্টের বদলে দেশী রোসনচৌকি। 'সীতা'র নৃত্য পরিকল্পিত হল প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের আদর্শে। মঞ্চের দু-ধারে কলাগাছ, পূর্ণকলস।

---

২ ১৮ অক্টোবর, ১৯২২ বেলা ১১টায় মিনার্ভা থিয়েটারে অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং ২৬ এপ্রিল, ১৯২৫ বেলা ৯টায় মিনার্ভার নবনির্মিত গৃহের উদ্বোধন হয়।

প্রবেশপথে আম্রপল্লব, আলিঙ্গন (আলিম্পন?)। প্রেক্ষাগৃহে চন্দন-অগুরু, ধূপধুনা। তোরণপথে নহবত। আসনের নামকরণে, অনুষ্ঠান-লিপিতে, প্রবেশপথে— সর্বত্রই স্বদেশী সৌন্দর্য। সুসঙ্গত, চিত্তহারী।" (সাজঘর— ইন্দ্রমিত্র) এই শিল্পসম্মত, মনোমুগ্ধকর দেশীয় পরিবেশে মনোমোহন নাট্যমন্দিরের প্রথম নাট্যনিবেদন যোগেশ চৌধুরী বিরচিত 'সীতা' মঞ্চস্থ হল। শিশিরকুমারের গুণমুগ্ধ পৃষ্ঠপোষক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন। তারিখ — ১৯২৪ সালের ৬ আগস্ট। অভিনয় সুরু হওয়ার পূর্বে সম্মানিত অতিথি প্রবীণ নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু বললেন :— "···কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশে নাট্যকলা অত্যন্ত হীন হয়ে পড়েছিল। সারা জীবন ধরে আমি এই কলার সাধনা ক'রে এসেছি, শেষে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে নাট্যকলার এই অবনতি দেখে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হচ্ছিল। কিন্তু আজ যাঁরা বাংলার নাট্যশিল্পে নবযুগ এনেছেন— আর্ট থিয়েটারে যাঁরা অভিনয় করছেন এবং বিশেষ করে শিশিরবাবুই এই নবযুগের প্রবর্ত্তক। যে ব্যথা নিয়ে আমায় ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হচ্ছিল, সে বেদনা থেকে এরা আমায় মুক্তি দিয়েছেন।···"

'সীতা'র প্রথম রজনীর ভূমিকালিপি ছিল এইরকম :—রাম-শিশিরকুমার, লক্ষ্মণ-বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, ভরত-তারাকুমার ভাদুড়ী, শত্রুঘ্ন-তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বশিষ্ঠ-ললিতমোহন লাহিড়ী, বাল্মীকি-মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শম্বুক-যোগেশ চৌধুরী, লব-জীবন-কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, কুশ-ননীগোপাল সান্যাল (দ্বিতীয় রাত্রি থেকে রবীন্দ্রমোহন রায়), দুর্মুখ-অমিতাভ বসু (ঐ), বৈতালিক-কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক), ব্রাহ্মণ-নৃপেশনাথ রায়, কৌশল্যা-পান্নারানী, সীতা-প্রভা, উর্মিলা-উষারানী, তুঙ্গভদ্রা-নীরদাসুন্দরী এবং আত্রেয়ী-নিরুপমা। 'সীতা'র সুরসৃষ্টি করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। গীত রচনার কৃতিত্ব হেমেন্দ্রকুমার রায়ের। নৃত্য-

পরিচালক ছিলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় আর দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা পরিকল্পনার দায়িত্ব ছিল চারুচন্দ্র রায়ের উপর। অভিনয়, মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত, আবহসঙ্গীত প্রভৃতি সব কিছুর সমন্বয়ে সামগ্রিক-ভাবে এমন এক অখণ্ড নাট্যরসপ্রবাহের সৃষ্টি হল যাতে কলা-রসিকরা মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না। পরিপূর্ণতার আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলেন তাঁরা। চতুর্দিক্ থেকে প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা শিশিরকুমারের জয়ধ্বনি উঠলো। "কাব্যের দিক দিয়ে যোগেশচন্দ্রের সীতা দ্বিজেন্দ্রলালের সীতার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি নয়, ছন্দের বিচারে তা নিকৃষ্টতর ; কিন্তু মানবতার আবেদনে অধিকতর চিত্তস্পর্শী।" (বাংলার নাটক ও নাট্যশালা— শচীন সেনগুপ্ত) আর সেই মানব রামচন্দ্রকে অসাধারণ অভিনয়নৈপুণ্যে হৃদয়গ্রাহী ক'রে তুললেন শিশিরকুমার। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দিলীপকুমার রায় থেকে সুরু ক'রে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত 'সীতা'র প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। পত্র-পত্রিকাতেও জয়ধ্বনি উচ্চারিত হল। 'নবযুগ' (জুলাই-আগস্ট, ১৯২৪) লিখলে :— "··· রামের অংশে শিশিরকুমারের অভিনয় কেবল বাঙ্গালায় নয়, সমস্ত জগতে অতুলনীয়। হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতগুলি, কণ্ঠের স্বরবৈচিত্র্যে ও মুখমণ্ডলের ভাববৈচিত্র্যে ফুটাইয়া তোলা যে কতবড় হৃদয়বানের কাজ তাহা বলা কঠিন। অভিনয়ে শিশিরকুমার আপনাকে হারাইয়া, তাঁহার মস্তিষ্কপ্রসূত রাম চরিত্রে মিশিয়া গিয়াছেন তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী ছিল না। নারীচরিত্রের মধ্যে শ্রীমতী প্রভা "সীতা"-রূপে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন— পরলোকগত অভিনেত্রী শ্রীমতী সুশীলার ক্ষতিপূরণ করিবার ইনিই একমাত্র যোগ্যা। ভরত ও লক্ষ্মণের অংশে শিশিরবাবুর ভ্রাতাদ্বয় তাঁহার সম্মানরক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়েন নাই। ··· আশ্চর্য্য হইলাম শত্রুঘ্নের অভিনয়ে ··· শিশিরকুমারের অপূর্ব্ব শিক্ষাকৌশলে ইঁহার অভিনয়ে একটা বেশ উচ্চাঙ্গের গাম্ভীর্য্য (dignity) দেখিতে পাইলাম। দুর্ম্মুখের অংশও

অতি সুন্দর হইয়াছিল। মহর্ষি বাল্মীকির অভিনয়ে অভিনেতা নিজের ক্ষমতা ও শান্ত স্বাভাবিকতার পরিচয় দিয়াছেন। বশিষ্ঠের অংশ অত্যুত্তম না হইলেও তজ্জন্য নাট্যসৌন্দর্য্যের কোন ক্ষতি হয় নাই। লবকুশের অভিনয় কেবল যে স্বাভাবিক হইয়াছিল তাহা নহে— অদ্ভুত অপ্রত্যাশিতরূপে প্রতিভালোক দীপ্ত হইয়া মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছিল। ··· পুরাতন যুগের অভিনয়ের মত ইহাতে নৃত্যগীতের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও দুইখানি নৃত্যগীত অতীব সুন্দর হইয়াছিল। নৃত্য প্রবর্ত্তনায় শিল্পী এমন একটা ললিত ভাবের সন্নিবেশ করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার নৃত্যজ্ঞানের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়।···" এই নাটকে শিশিরকুমারের অভিনয় প্রসঙ্গে সমকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন :— "···প্রতিটি দৃশ্যে দর্শক বিমুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেছে তাঁর অভিনয়। ··· সব থেকে বড়ো চমক পেয়েছিলাম সেই দৃশ্যে, যে দৃশ্যের আরম্ভ হচ্ছে রামের এই স্বগতোক্তি দিয়ে— "সহস্র বান্ধব মাঝে রহিব একাকী, আমার প্রাণের দুঃখ কেহ বুঝিবে না, মৃত্যু হবে তীব্র নিরাশায়— ?" এই দৃশ্যটিতে আমরা সব বসেছিলাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো। বিশেষ করে সেই বিশেষ সময়টিতে, যখন লব এসেছে রাজধানীতে। রাম যখন পুনঃ প্রবেশ করছেন— "কার কণ্ঠস্বর, কার কণ্ঠস্বর!" তারপরে লবকে দেখে অবাক বিস্ময়ে বলে উঠছেন— "সেই নীল-নলিন-নয়ন দুটি!" মানুষ যেন তখন বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে উঠত! তারপরে আরও আছে। লব যখন দ্রুত বেরিয়ে গেল, তখন পিছন থেকে রামের চীৎকার— "ভরত, লক্ষ্মণ, ফিরাও— ফিরাও বালকে!" বলে, অজ্ঞান হয়ে পড়লেন রাম, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়ি যেন ভেঙে পড়ল হাততালিতে। ···" (নিজেরে হারায়ে খুঁজি— প্রথম পর্ব)

নিছক অভিনয়সৌকুমার্যে নয়, প্রযোজনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুণগত মৌল পরিবর্তনের কারণে 'সীতা' মঞ্চের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। বস্তুতঃ, এই অভিনয়ের মাধ্যমে বাংলা থিয়েটারে এমন

কতকগুলি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, যা নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালকে প্রভাবান্বিত করে। বৈশিষ্ট্যগুলি হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ভাষায় নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ—"··· দৃশ্যকে স্বাভাবিক করবার জন্যে রঙ্গমঞ্চের উপর থেকে সর্ব্বপ্রথমে পাদপ্রদীপ তুলে দেওয়া হয় "সীতা" পালায়। খোলা জায়গায় স্বাভাবিক আলো আসে উপর থেকে এবং ঘরের ভিতরে তা আসে এপাশ থেকে, ওপাশ থেকে। ···"সীতা"র সমস্ত দৃশ্যের উপরে আলো এসে পড়ত স্বাভাবিকভাবেই আকাশ বা এপাশ-ওপাশ থেকে। সুতরাং রঙ্গ-মঞ্চের আলোক-শিল্পের মধ্যে যুগান্তর আনার প্রথম যে গৌরব, তাও শিশিরকুমারেরই প্রাপ্য।··· মঞ্চের কোন দৃশ্যের মধ্যে কোথাও এমন দরজা বা পথ দেখানো উচিত নয়, যেখান দিয়ে সত্যিকার মানুষ আনাগোনা করতে অক্ষম হয়। "সীতা"র প্রত্যেক দৃশ্যেই এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছিল, তার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন পালাই এমন গর্ব্ব করতে পারে না। 'উইং' বা পার্শ্বপটও ছিল আর একটি অস্বাভাবিক সেকেলে উপসর্গ; "সীতা" নাট্যাভিনয়ে তাও পরিত্যক্ত হয়।··· "সীতা"র স্থাপত্যে ও সাজসজ্জায় কোথাও দেখা যায় নি··· বিসদৃশতা। সর্ব্বত্রই দেখেছি হিন্দু-ভারতের প্রাচীন ও একই আদর্শানুসারী স্থাপত্য এবং সাজসজ্জা। একটিমাত্র নর্ত্তকী পর্য্যন্ত উদ্ভট পোষাক প'রে এসে দর্শকদের চোখ চমকে দিয়ে ছন্দভঙ্গ করে নি।··· রঙ্গমঞ্চের উপরে পৌরাণিক যুগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, সাজপোষাক ও আসবাব-পত্র দেখাতে গেলে ভারতের প্রাচীন শিল্পকীর্ত্তিগুলির সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই। আগেকার মঞ্চশিল্পীরা তা করতেন না, "সীতা"র মঞ্চশিল্পীই প্রথমে তা করেছেন এবং এইখানেই "সীতা"র সার্থকতা।··· আমাদের রঙ্গমঞ্চে "সীতা" নাট্যাভিনয়ে শিশিরকুমারই সর্ব্বপ্রথমে দেখান সুনিয়ন্ত্রিত বৃহৎ জনতা। প্রাসাদ-অঙ্গনে উচ্চস্থানে প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা, নিম্নস্থানে জনসাধারণ, সকলের উপরে অলিন্দে উপস্থিত অন্তঃপুরচারিণীরা। কেউ উপবিষ্ট,

কেউ দণ্ডায়মান, কেউ চলমান এবং সকলেই করছে অভিনয়— কেউ ভাবে, কেউ ভাষায়।··· এই শেষ-দৃশ্যে দেখা দিতেন অন্ততঃ একশো জন নট-নটী, বাংলা রঙ্গালয়ে আর কখনো যা হয়েছে ব'লে শুনি নি। এই জনতা-নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও প্রকাশ পায় প্রয়োগকর্ত্তার অসাধারণ নৈপুণ্য।··· বিভিন্ন দৃশ্যের বিশিষ্টভাব প্রকাশের জন্য "সীতা"র অভিনয়ের সময় বিশেষভাবে সহযোগিতা করত যন্ত্রসঙ্গীত। এখানেও শিশিরকুমার প্রয়োগনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন পালাতেই আর কেউ অভিনয়ের রস ঘনীভূত করবার জন্য এমনভাবে যন্ত্রসঙ্গীতের সাহায্য গ্রহণ করেন নি। তার উপরে "সীতা"য় কৃষ্ণচন্দ্রের কণ্ঠসঙ্গীত। তাঁর সঙ্গে তুলনীয় আর কোন সঙ্গীত-শিল্পী গতযুগের রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ করেছেন বলে জানি না।···" (বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার)

আর্ট থিয়েটারের 'কর্ণার্জুন' (১৯২৩) আর নাট্যমন্দিরের 'সীতা' (১৯২৪)— এই দুই নাটকের প্রয়োগনৈপুণ্য বাংলা থিয়েটারের গতানুগতিকতা ভঙ্গ ক'রে যুগান্তর এনেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু শিল্প-মানের বিচারে 'সীতা', 'কর্ণার্জুনে'র চেয়ে মহত্তর সৃষ্টি। কেননা, প্রথমোক্ত নাটকের রূপায়ণের মাধ্যমে যে কাব্য সৃষ্টি হয়েছিল, যে সূক্ষ্ম শিল্পচেতনা প্রকাশ পেয়েছিল তাতে, রসিকমন গভীরভাবে আপ্লুত হয়ে যেত— 'কর্ণার্জুন' এ-অনুভূতি দর্শকদের মধ্যে সঞ্চার করতে পারতো না। 'সীতা'র কাহিনী-গত রোমান্টিক আবেদন অবশ্য, এ-ব্যাপারে প্রয়োগকর্তার সহায়ক হয়েছিল। বিপরীত ক্ষেত্রে, 'কর্ণার্জুনে'র নাটকীয় রসকে স্থূলতর করেছিল অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ, ঘটনাধিক্য এবং রথ-যুদ্ধ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের জটিলতা। এই সমস্ত নাট্যক্রিয়ায় আর্ট থিয়েটার কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট অভিনবত্ব ও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিলেও, এদের মধ্যে অভাব ছিল সেই ইঙ্গিতধর্মী সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার, যা দিয়ে শিশিরকুমার রসিকচিত্ত জয় করেছিলেন।[৩]

৩ "নাট্যাচার্যের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আর্ট থিয়েটারের দৃষ্টি-ভঙ্গির পার্থক্য

মনোমোহন নাট্যমন্দিরের দ্বিতীয় নাট্যনিবেদন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত 'পাষাণী'। ১০ ডিসেম্বর, ১৯২৪ নাটকখানি মঞ্চস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের বক্তব্য নিয়ে চতুর্দিকে তোলপাড় সুরু হল। অহল্যা ইন্দ্রের পরিচয় জানতে পেরে কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন— এই ছিল পৌরাণিক নাটক 'পাষাণী'র উপজীব্য। দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্মীকি রামায়ণ থেকে কাহিনী আহরণ করেছিলেন এবং এ-উপাখ্যান কৃত্তিবাসবিরোধী ও হিন্দুর সংস্কারবিরুদ্ধ হওয়ায় ১৯০০ সালে প্রকাশিত নাটকটি এ পর্যন্ত সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয় নি।[8] 'পাষাণী'র প্রযোজনায় শিশিরকুমার দুরন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং এর জন্য তাঁকে সমকালীন পত্র-পত্রিকার এক বৃহৎ অংশের সুতীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল।[৫] অবশ্য, তাঁর সমর্থনেও কেউ কেউ লেখনী ধারণ করে-

ছিল ; তাই সৃষ্টিতেও কিছু পার্থক্য দেখা যেত। আর্ট থিয়েটারের কর্ণার্জুনে আর নাট্যাচার্যের সীতায়, আর্ট থিয়েটারের শ্রীকৃষ্ণে আর নাট্যাচার্যের নর-নারায়ণে, এই পার্থক্যটা পরিষ্কার চোখে পড়েছিল। নাট্যাচার্যের প্রতিষ্ঠানে নাটকের ভিতর দিয়ে যে কাব্য সৃষ্টি হোতো, প্রযোজনায় যে শিল্প-চেতনা প্রকাশ পেত, যে আবেগ অন্তরকে দোলা দিত,— আর্ট থিয়েটারের সৃষ্টিতে তার অভাব দেখা যেত।" (বাংলার নাটক ও নাট্যশালা— শচীন সেনগুপ্ত)

৪ দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীলেখক নবকৃষ্ণ ঘোষ জানিয়েছেন :— "একবার ষ্টার থিয়েটারে নাটিকাখানি অভিনয় করাইবার প্রস্তাব হয়। উক্ত থিয়েটারে তৎকালীন অধ্যক্ষ নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন যে, ঐ নাটকের পাত্রপাত্রীদের নাম পরিবর্তন করিয়া কাল্পনিক নাম দিলে তিনি ঐ নাটিকা অভিনয় করিতে পারেন— নতুবা নহে।··· দ্বিজেন্দ্রলাল অমৃতবাবুর কথামত নাটিকার পাত্রপাত্রীদের নাম বদলাইয়া দিতে সম্মত হয়েন নাই। কবির জীবিতকালে ঐ নাটিকাখানি কোন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই।··· " (দ্বিজেন্দ্রলাল)

৫ কেবল নাট্যপরিচালক ন'ন, স্বয়ং নাট্যকারকেও একদা পুরাণকে বিকৃত করার অপরাধে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল। বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনার উত্তর

ছিলেন। অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'নবযুগ' (ডিসেম্বর '২৪—জানুয়ারি '২৫) লিখলে :—"শিশিরবাবুর ইন্দ্রের ও গৌতমের ভূমিকা ভালই হইয়াছিল; ইন্দ্রবেশে অহল্যাহরণ ও অহল্যা পরিত্যাগ দুইটি দৃশ্যেই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিশেষত্ব দেখা গিয়াছিল। গৌতমের ভূমিকায় পুত্রের নিকট বিদায়দৃশ্যটিও বেশ মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। ...রাজর্ষি জনকবেশে পুরাতন যুগের শ্রীযুক্ত হীরালাল দত্তর অভিনয় বেশ স্বাভাবিক ও মধুর হইয়াছিল...বাকী সমস্ত অভিনেতাই ভাদুড়ী মহাশয়ের অনুকরণ-সংস্করণ হওয়ায় তাঁহাদের অভিনয় যেন প্রাণহীন যন্ত্রচালিতবৎ বোধ হইতেছিল...দিলীপকুমার রায় মহাশয় গানে সুর দিবেন শুনিয়া সুরে কিছু বৈচিত্র্যের আশা করিয়াছিলাম কিন্তু কোন গানের সুরই এমন কোন একটা নূতন আস্বাদন দিতে পারে নাই; নৃত্যভঙ্গীতেও কিছু বিশেষত্ব ছিল না— নৃত্যপ্রকরণ একেবারেই মামুলী। বেশভূষা প্রাচীনকালোচিত ও সুন্দর হইয়াছিল, দৃশ্যপটে কিছু বিশেষত্ব না থাকিলেও আলোকনিক্ষেপ ও প্রয়োগনৈপুণ্যে অর্থাৎ সাজাইবার গুণে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ...মোটের উপর অভিনয় ভাল বলা যাইতে পারে। তবে, যে অসামান্য প্রয়োগনৈপুণ্যের কথা কয়েক সপ্তাহের আলোচনার বিষয় হইয়াছিল তাহার কোন সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারি নাই।..."

দিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'মন্দ্র' কাব্যের ভূমিকায়। তিনি লিখেছেন :—"... কোন এক পত্রিকার সম্পাদক মৎপ্রণীত 'পাষাণী' নাটকের সমালোচনায় কহিয়াছিলেন যে, আমি নাটকে রামায়ণের আখ্যান অনুসরণ করি নাই—যেহেতু, অহল্যাকে স্বেচ্ছায় ব্যভিচারিণীরূপে চিত্রিত করিয়াছি, কিন্তু পৌরাণিকী অহল্যা ইন্দ্রকে গৌতম বলিয়া ভ্রম করিয়া ভ্রষ্টা হইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্মীকির রামায়ণখানি উল্টাইয়া দেখিবার অবকাশ হয় নাই। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে তিনি দেখিতেন যে, বাল্মীকির অহল্যা শুদ্ধ ইন্দ্রকে ইন্দ্র বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে; দেবরাজ কিরূপ তাহা জানিবার জন্য কৌতুহলপরবশ হইয়া ("দেবরাজকুতূহলাৎ") কামরতা হইয়াছিলেন।..."

অন্তে পত্রিকাখানি নাটক সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করলে এই বলে :— "এই পুস্তক এতদিন কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই কেন— তাহার কারণ…সেকালের রঙ্গমঞ্চ এত ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে অভিভূত ছিল না।…এখন শিক্ষিত হিন্দুসমাজ নব্যতন্ত্রে উন্মত্ত তাই এখন এ শ্রেণীর পুস্তকের অভিনয় চলা সম্ভব হইয়াছে।…'পাষাণী'র অহল্যার চরিত্র এতই ভীষণ যে তাহাকে সাধারণ বারনারী ভিন্ন অন্য কিছু ভাবা অসম্ভব…এ অভিনয় নীরবে দেখাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। আশা করি শিশিরবাবু এ শ্রেণীর নাটক অভিনয় করিয়া হিন্দুদের মনে অযথা ব্যথা দিবেন না।" 'পাষাণী' নাটকে শিশিরকুমারের অভিনয় বিশ্লেষণ করেছেন কলারসিক হেমেন্দ্রকুমার রায়। তিনি লিখেছেন :— "গৌতম ও ইন্দ্র — 'পাষাণী'র এই দুটি ভূমিকায় তাঁর অভিনয় নিখুঁত হয়েছিল। সুরামত্ত, রূপলুব্ধ ও ভোগ-শেষে বিগত-কাম অবস্থায় শিশিরকুমারের অভিনয়ে লঘুচিত্ত ইন্দ্রের চিত্র উজ্জ্বল ও স্বাভাবিকরূপে ফুটে উঠেছিল। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, গৌতমের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ের সৌন্দর্য্য সকলে ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি। সাধারণ দর্শকরা 'সেন্সেসানাল' না হ'লে অভিনয় পছন্দ করে না— বিশেষতঃ বাংলাদেশে। ধীর, স্থির, গম্ভীর এবং সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত গৌতমের যে ধারণা শিশিরকুমার দিয়েছেন, সূক্ষ্ম রসের রসিককে তা মুগ্ধ করবে নিশ্চয়ই। এরকম ভূমিকায় চমকপ্রদ বা চিত্তোত্তেজক অভিনয় রস-বিকাশের পরিপন্থী। শিশিরকুমার এখানে হাততালির মোহ এড়িয়ে নিজের অসাধারণ রূপদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই সংযমের মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর কলাবিদ্‌দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।" (বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার) 'পাষাণী'তে ইন্দ্র ও গৌতমের যুগ্ম ভূমিকায় নামতেন শিশিরকুমার। নাটকের অন্যান্য শিল্পী ছিলেন :—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (চিরঞ্জীব), রবীন্দ্রমোহন রায় (রাম ও সূর্য), বিশ্বনাথ ভাদুড়ী (শতানন্দ), জীবন গঙ্গোপাধ্যায় (মদন), ঊষা (রতি), মনোরমা (মাধুরী)

এবং প্রভা (অহল্যা) প্রভৃতি। অভিনয় ও প্রযোজনা উপভোগ্য হলেও এ-নাটক বেশীদিন চালানো যায় নি। একরকম বাধ্য হয়েই শিশিরকুমার 'পাষাণী'র অভিনয় বন্ধ করেছিলেন।[৬]

'পাষাণী'র পর 'জনা' (গিরিশচন্দ্র)। মনোমোহন নাট্যমন্দিরে এ-নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ—৩ জুন, ১৯২৫। নাটকখানি প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল মিনার্ভায়, ১৮৯৩ সালে। সেই থেকে আর সব নাটকের মত 'জনা'ও একই কলেবরে এবং রীতিতে বরাবর অভিনীত হয়ে আসছে। শিশিরকুমারই প্রথম নাটকটিকে যুগোপযোগী ক'রে সাজালেন। সম্পাদনাকালে অকারণ ভক্তিরসের প্রাবল্য হ্রাস ক'রে বুদ্ধিগ্রাহ্যতার প্রতি জোর দিলেন তিনি। বিদূষক চরিত্রটি বাদ গেল। কৈলাস ও গোলোকের মত দৈব দৃশ্যগুলি বর্জিত হয়েছিল। বিবেক বা নিয়তির ট্র্যাডিসনও ত্যাগ করা হয়। নাটকের অন্তর্নিহিত মানবিক আবেদনটিকে পরিস্ফুট করার প্রয়াসে বিশেষ সচেষ্ট হলেন প্রযোজক শিশিরকুমার। সে যুগের পক্ষে এ দৃষ্টিভঙ্গী ছিল একান্তই অভিনব সন্দেহ নেই। গিরিশযুগের প্রখ্যাতা অভিনেত্রী তারাসুন্দরী তখন মঞ্চের বাইরে অবকাশ যাপন করছেন, নামভূমিকায় অভিনয়ের জন্য তাঁকে আনা হল। এযাবৎকাল উপেক্ষিত নীলধ্বজ চরিত্রটিকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়ার জন্য শিশিরকুমার নরেশচন্দ্র মিত্রের মত শক্তিশালী শিল্পী নির্বাচন করলেন। এইভাবে শিশিরকুমারের দ্বারাই সেদিন বাংলা থিয়েটারে নাটক সম্পাদনার সূত্রপাত হয়েছিল। মূল রসকে অবিকৃত রেখে নাটকের গতি ও আবেদনকে দুর্বার ক'রে তোলার সেই শিল্পসম্মত নাট্যপ্রয়াস সমকালীন দর্শকগোষ্ঠীর রক্ষণশীল অংশের অনুমোদন না পেলেও সেকালে এবং পরবর্তীযুগে

৬ প্রসঙ্গতঃ, শিশিরকুমার বলেছেন :—"পাষাণীতে শেষ দিনেও সাতশ' (৭০০) টাকা বিক্রী হয়েছিল। কিন্তু অন্য কারণে অভিনয় বন্ধ করতে হয়েছিল।" (শিশির-সান্নিধ্যে—রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু)

বিদগ্ধ রসিকজন এই কৃতিত্বকে অভিনবত্ব ও উপভোগ্যতার কারণে অভিনন্দন জানাতে দ্বিধা করেন নি। 'জনা'র প্রথম অভিনয়রাত্রের ভূমিকালিপি ছিল এইরকম :— জনা-তারাসুন্দরী, প্রবীর-শিশির-কুমার, নীলধ্বজ-নরেশচন্দ্র মিত্র (পরে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য), শ্রীকৃষ্ণ-রবীন্দ্রমোহন রায়, অর্জুন-ললিতমোহন লাহিড়ী, বৃষকেতু-বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, মদনমঞ্জরী-প্রভা, নায়িকা-চারুশীলা, গঙ্গারক্ষকদ্বয়-গোপালদাস ভট্টাচার্য ও অমিতাভ বসু (ঐ)। প্রতিদ্বন্দ্বী আর্ট থিয়েটারও এই সময় ষ্টারে 'জনা' মঞ্চস্থ করেছে। ওঁদের অভিনয় সুরু হয়েছিল নাট্যমন্দিরের দু'মাস আগে ৩ এপ্রিল, ১৯২৫ থেকে। ষ্টারে প্রথম রজনীতে বিদূষক, প্রবীর এবং জনার ভূমিকায় যথাক্রমে দানীবাবু, অহীন্দ্র চৌধুরী এবং সুশীলাসুন্দরী অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ওঁরা গিরিশচন্দ্রের নাটককে হুবহু অনুসরণ করেছিলেন। ষ্টারের বিজ্ঞাপনে নাট্যমন্দিরের নাটক সম্পাদনাকে কটাক্ষ ক'রে লেখা হয়েছিল :—

"হেথা অঙ্গহীন নহে বঙ্গ পূর্ব্ব অবয়ব
এস, দেখ যেই জনা গিরিশ গৌরব।"

কয়েকটি অভিনয়ের পব অহীন্দ্র চৌধুবী ষ্টারের ভ্রাম্যমাণ শিল্পীদলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য রেঙ্গুন যাত্রা করায় দানীবাবু ঐ চরিত্রের রূপ দিতে থাকেন। একদা এই ভূমিকায় দানীবাবুর অশেষ খ্যাতি থাকলেও, বার্দ্ধক্যে তাঁর "ষ্টারে প্রবীরের অভিনয়, নাতনীর বয়সী মদনমঞ্জরীর কাছে, কন্যার বয়সী জনার কাছে, এবং নাতির বয়সী অর্জুনের কাছে অদ্ভুত হাস্যরসের সৃষ্টি করেছিল।"[৭] (শিশিরকুমার ও বাংলা

---

৭ প্রসঙ্গতঃ, 'শিশির' (২৫।৪।১৯২৫) লিখেছিল :— " .. দুঃখ হয় মনে এই কথা ভাবিয়া যে বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, গিরিশচন্দ্রের পুত্র আজ এই সকল খামখেয়ালীর প্রশ্রয় দিতেছেন— বালক সাজিয়া কন্যার বয়সী অভিনেত্রীকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া তাহার নিকট আব্দার করিতেছেন। ..."

থিয়েটার— মণি বাগচি) তুলনায়, নবযুগের যৌবনদীপ্ত রূপকার শিশিরকুমারের চরিত্র রূপায়ণ অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল নিঃসন্দেহ। আর্ট থিয়েটারের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবীর অহীন্দ্র চৌধুরী স্বয়ং বলেছেন:— "...আমি নিজে না দেখলেও, শিশিরবাবুর 'প্রবীর'-এর যথেষ্ট সুখ্যাতি শুনেছিলাম।... কথাটা আমার বিশ্বাস-জনক মনে হয়েছিল। কারণ আমি জানতাম শৃঙ্গার-রসাত্মক অভিনয়ে তখনকার দিনে শিশিরবাবুর তুলনা ছিল না।" (নিজেরে হারায়ে খুঁজি— প্রথম পর্ব) শিশিরকুমার "... তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবীরদের পদাঙ্কের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে অগ্রসর হয়েও এই বহুখ্যাত ভূমিকাটির যশ-গৌরব কোথাও ক্ষুণ্ণ করা দূরে থাক, বরং দ্বিগুণ সৌন্দর্য্যেমণ্ডিত করে তুলেছিলেন। তাঁর মাতৃসন্নিধানে এসে বীরপুত্রের দুর্জ্জয় অভিমান প্রকাশ, তাঁর প্রিয়তমা পত্নীসকাশে প্রেমের অনবদ্য সহজলীলা, তাঁর নায়িকার রূপমোহে কামাতুর ও অসহায় অবস্থা, পরিত্যক্ত শ্মশান-প্রান্তে জীবনের ধিক্কৃত মুহূর্ত্তে তাঁর সেই শ্লেষাত্মক 'কৃষ্ণার্জ্জুন' সম্ভাষণ— সবই অনুপম কলানৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে এনেছিল বিমুগ্ধ দর্শকদের সামনে।" (নাচঘর) আর অনুপম অভিনয় করলেন 'জনা'র ভূমিকাভিনেত্রী ··রাসুন্দরী। "ষ্টারের সুশীলাসুন্দরীও এই চরিত্রের রূপায়ণে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। এই ভূমিকার অভিনয়শিক্ষা তাঁর স্বয়ং অপরেশচন্দ্রের কাছে। তবুও, তারাসুন্দরীর তুলনায় সে অভিনয় হীনপ্রভ ছিল সন্দেহ নেই।" (সাক্ষাৎকার— অহীন্দ্র চৌধুরী) বাংলা থিয়েটারে জনা চরিত্রের প্রথম রূপদাত্রী তিনকড়ি দাসীর অসাধারণ অভিনয়নৈপুণ্যের কথা নাট্যশালার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।[৮] তিনকড়ি এবং পরবর্তীকালে তারাসুন্দরী — অভিনেত্রী হিসাবে দুজনেই অসামান্যা। উভয়ের 'জনা' দেখবার সৌভাগ্য

৮ গিরিশচন্দ্র রচিত 'জনা' প্রথম অভিনীত হয় মিনার্ভায়, ১৮৯৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর। জনা, প্রবীর এবং বিদূষক সাজেন যথাক্রমে তিনকড়ি, দানীবাবু

হয়েছিল মুষ্টিমেয় যে ক'জন কলারসিকের, অমরেন্দ্র রায় তাঁদের একজন। তিনি 'শিশির' পত্রিকায় লিখলেন :— "... তিনকড়ির সেই চাপা অথচ সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, যাহা গ্যালারির শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়া দর্শকের মর্ম্মভেদ করিত, তাহা তারার নাই। তিনকড়ির সেই অতি দ্রুত, অথচ অতি পরিস্ফুট আবৃত্তি এখনও যেন কানে ঝঙ্কার দিতেছে। তাঁহার সেই গম্ভীর শোকপূর্ণ বাৎসল্যের ছবি এখনও যেন চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। শ্বা-দন্ত (Canine teeth) ঈষৎ সম্মুখে প্রকাশ করিয়া চোখে মুখে প্রতিহিংসার ছবি ফুটাইয়া যেন উল্কার মতন তিনি যে-ভাবে রঙ্গমঞ্চে আসিতেন ও যাইতেন, সত্যই তাহার তুলনা হয় না।..."(৬।৬।১৯২৫) তিনকড়ির পূর্বখ্যাতিকে ম্লান করতে না পারলেও, তারাসুন্দরীর চরিত্র রূপায়ণ যে শিল্পসৃষ্টি হিসাবে অতি উচ্চাঙ্গের এবং রমণীয় হয়েছিল তার সাক্ষ্য বহন করছে উপরোক্ত সাময়িকপত্রের একই সংখ্যায় প্রকাশিত পত্রিকার নিম্নোক্ত অভিমত :— "...প্রথম দিকটা তারাসুন্দরী তেমন জমাইতে পারেন নাই— কিন্তু শেষের দিকে তিনি অসামান্য অভিনয়নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। প্রথম দিকে জনসাধারণ যে পরিমাণ হতাশ হইয়াছিলেন, শেষের দিকে সেই পরিমাণে বিমোহিত হইয়াছিলেন। পুত্রহারা জনা যখন উন্মত্তপ্রায় হইয়া নীলধ্বজকে ভৎসনা করিতেছিলেন— তৃষা, তৃষা করিয়া ছুটিতেছিলেন, আকাশ বাতাস সমস্ত চরাচর তাহার সেই বুকের জ্বালায় যখন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল— সেখানকার সে অভিনয় পূর্ব্বে তিনকড়িতে সম্ভব হইয়াছিল ; আর আজ তারাসুন্দরীতে সম্ভব হইল। ..." অন্যান্য নট-নটী প্রসঙ্গে পত্রিকাখানি বললে : — "... জনার পরই নাম করিতে হয় শ্রীমতী চারুশীলার 'নায়িকা'র ভূমিকা। নায়িকা বহুবারই দেখিয়াছি, শ্রীমতী

এবং অর্দ্ধেন্দুশেখর। কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পর অর্দ্ধেন্দুশেখর মিনার্ভা ত্যাগ করলে গিরিশচন্দ্র স্বয়ং বিদূষক চরিত্রে রূপদান করতে থাকেন।

চারুশীলার অভিনয়ও বহুবার দেখিয়াছি। কিন্তু এরূপ অভিনয় পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।…"

"…প্রবীরের ভূমিকা—শিশিরবাবু স্বয়ং এই ভূমিকা লইয়াছেন—যৌবনের দানীবাবুর সঙ্গে তাঁহার তুলনা আমরা না করিয়াও একথা বলিতে পারি তাঁহার অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।…"

"…'মদনমঞ্জরী'র সার্থকতায় যোগদান করিয়াছিলেন শ্রীমতী প্রভা। তাঁহার অভিনয় বেশ হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণে'র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় বেশ অভিনয় করিয়াছেন—তাঁহার ভাবভঙ্গীতে interpretation চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বিশ্বনাথবাবুর 'বৃষকেতু' আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল, তারাকুমারবাবুর 'অগ্নি' ভাল হইয়াছে। অমিতাভবাবুর 'গঙ্গারক্ষক' বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল। দ্বিতীয় গঙ্গারক্ষকের ভূমিকায় গোপালবাবু তাঁহার নিকট দাঁড়াইতে পারেন নাই। মোটের উপব সমগ্র নাটকের সমালোচনা করিতে গেলে আমরা বলিতে বাধ্য যে অভিনয়ের দিক হইতে শিশিরবাবুব সম্প্রদায় বেশ সাফল্য লাভ করিয়াছেন।…"

"…সাজসজ্জা অতি সুন্দর হইয়াছিল। দেশীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া সমস্তই করা হইয়াছে—দেখিয়া মনে হয় এই বিভাগের ভার লইয়াছিলেন কোন কৃতবিদ্য রূপদক্ষ। দৃশ্যপট বেশ স্বাভাবিক অথচ বেশ মনোরম হইয়াছিল।…" অভিনয় সম্পর্কে সকলে প্রশংসামুখর হলেও, নাটক সম্পাদনার ব্যাপারে অনেকে শিশিরকুমারের সমালোচনা করেছিলেন। ভক্তিরসের প্রাবল্য হ্রাস ক'রে নাটকের অন্তর্নিহিত মানবিক আবেদনটিকে পরিস্ফুট করার আধুনিক প্রয়াস রক্ষণশীল সমাজের মনঃপূত হয় নি।[৯] বিশেষতঃ, বিদূষক-

৯ ১৩ জুন, ১৯২৫ 'সার্ভেণ্ট' লিখেছিল:— "In the final scene, for instance, 'Jana' commits suicide in Mr. Bhaduri's play, whereas in the original, the goddess Ganga appears from under the water and takes "Jana" into her bosom."

চরিত্র সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হওয়ায় কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় বিরূপ মন্তব্যের অন্ত ছিল না।[১০] প্রতিকূল আবহাওয়া বুঝে ১০ম অভিনয়ের পর থেকে চরিত্রটিকে সংক্ষিপ্তাকারে নাটকে রাখা হয়েছিল এবং নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। "শিশিরবাবু যদি প্রথম থেকেই এই ব্যবস্থা করতেন তাহলে হয়ত বিদূষকের অংশ বাদ দেওয়া রূপ বেয়াদবীর জন্য তাঁকে একাধিক কাগজওয়ালার হাতে নিগৃহীত হ'তে হোত না।" (নাচঘর—৭।৮।১৯২৫) এতেও কিন্তু প্রতিবাদের ঝড় নিঃশেষে মিলিয়ে যায় নি। ভূমিকাটির সংক্ষিপ্তকরণে এবং যে চরিত্রে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র রূপদান করতেন, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসুর মত কমিক-অভিনেতাকে সেই ভূমিকা দেওয়ায় কেউ কেউ আপত্তি তুলেছিলেন।[১১]

১৯২৫, ১৬ জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আকস্মিক মৃত্যুতে দেশবাসী একজন মহান নেতা এবং মনোমোহন নাট্যমন্দির তার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক হারালে। শিশিরকুমারের সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান ও নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল দেশবন্ধুর প্রেরণা।[১২] শোক প্রকাশ উপলক্ষে পরদিন, বুধবার রঙ্গালয় বন্ধ

১০ যেমন 'বাঙলা' (১৯।৬।১৯২৫) মন্তব্য করেছে:—"হিন্দু জনা হয়নি, ওটা ব্রাহ্ম জনা হয়েছে।"

১১ অহীন্দ্র চৌধুরী প্রসঙ্গতঃ বলেছেন:— "...সমালোচনার আধিক্য দর্শনে ৮।১০ রাত্রি পর শিশিরবাবু যখন বিদূষক চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত আবার তুলে আনলেন, তা-ও সবটা না রেখে, কিঞ্চিৎ ছোট করে, তখন নৃপেন বসু (বা নৃত্যবিদ্ নেপা বোস্‌কে) ঐ ভূমিকায় নামিয়েছিলেন। যে ভূমিকায় অবিস্মরণীয় অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন স্বয়ং গিরীশচন্দ্র এবং অর্ধেন্দুশেখর, যে ভূমিকায় পরবর্তীকালে অবতীর্ণ হয়ে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন দানীবাবু এবং অপরেশচন্দ্র, সেই ভূমিকা শিশিরকুমার চালিয়ে দিলেন নেপেন-বাবুর ওপর দিয়ে। লোকে এতেও ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। ..." (নিজেরে হারায়ে খুঁজি—১ম পর্ব)

১২ "দেশবন্ধু শুধু নাট্যমন্দিরের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না—

থাকে। ৫ জুলাই নাট্যমন্দিরে সাড়ম্বরে 'সীতা'র ১০০ ও ১০১তম অভিনয়ানুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হল। ষ্টারে 'কর্ণার্জুন' তখন দু'শ রজনী অভিমুখে। 'সীতা'র উৎসবানুষ্ঠানে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত থেকে নাট্য-মন্দিরের জয়যাত্রাকে শুভেচ্ছা জানালেন। ১৯২৫-এর ১৩ আগস্ট মঞ্চস্থ হল—'পুণ্ডরীক'। ভিক্টর হুগোর 'হাঞ্চব্যাক্ অফ্ নটারডাম' অবলম্বনে ব্যারিস্টার শ্রীশচন্দ্র বসু নাটকখানি রচনা করেছিলেন[১৩] এবং এই নাটকের প্রয়োগকর্তা ছিলেন নাট্যকার স্বয়ং। প্রথম অভিনয়রজনীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ দেশবন্ধুর স্মৃতিভাণ্ডারে দান করা হয়। সেই রাত্রের অভিনয়ে নিম্নলিখিত নট-নটীরা অংশ গ্রহণ করেন:—শিশিরকুমার (পুণ্ডরীক), নরেশচন্দ্র মিত্র (ভৃঙ্গার), গোপালদাস ভট্টাচার্য (কাশীমদ), বিশ্বনাথ ভাতুড়ী (ঊষানাথ), তারাকুমার ভাতুড়ী (নায়ক), তারাসুন্দরী (সাকী), চারুশীলা (রুস্তানা), সরলাবালা (কমলা) এবং শেফালিকা (অমলা)। অভিনয় দেখে 'নাচঘর' লিখলে:—"নাট্যমন্দিরে কাল…পুণ্ডরীকের প্রথম অভিনয় হয়ে গেছে।… পুণ্ডরীকের অভিজ্ঞান ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাতুড়ী স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে যে অদ্ভুত অভিনয়নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তাতে মনে হয় এ নাটকখানিকে তিনি দীর্ঘকাল চালাবেন বলে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। নিপুণ নট নরেশচন্দ্রের "ভৃঙ্গার", শ্রীমতী তারাসুন্দরীর "সাকী" ও শ্রীমতী চারুশীলার "রুস্তানা" যে এমনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় হবে এ বিষয়ে আমরা কৃতনিশ্চয় ছিলাম।

কলিকাতা শহরে একটি জাতীয় রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের কথা তিনিও সেদিন চিন্তা করেছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যু না ঘটলে হয়তো শিশিরকুমারের শেষ জীবনের আকাঙ্ক্ষা অচরিতার্থ থাকতো না।" (শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার—মণি বাগচি)

১৩ 'অভিনয়' পত্রিকার ডিসেম্বর-জানুয়ারি। শ্রীকুমার-কৃষ্ণ সেন জানিয়েছেন শ্রীশচন্দ্র বসু মূল ফরাসী থেকেই নাটকটি লেখেন।

কিন্তু শ্রীযুক্ত গোপালদাস ভট্টাচার্য্য যে কুৎসিৎ কুব্জ কাশীমদের ভূমিকায় এমন অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাবেন এ বোধহয় অনেকেই আশা করেন নি। এই সুদক্ষ অভিনেতার অপূর্ব্ব অভিনয়কৌশল দেখে সেদিন সকলে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছেন।…” (১৪।৮।১৯২৫) অভিনয় মনোজ্ঞ হলেও নাটকখানি ছিল দুর্বল—যার সর্বত্র অপটু হাতের ছাপ সুস্পষ্ট। শোনা যায়, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই শিশির-কুমারকে এটি মঞ্চস্থ করতে হয়েছিল আর সেজন্য তাঁর ভাগ্যে কম গঞ্জনা জোটে নি। অন্যান্য পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সুর মিলিয়ে ‘পুণ্ডরীক’ নাটকের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে তীব্র ভাষায় মন্তব্য করলে ‘শিশির’ (১৫।৮।১৯২৫) ঃ—“এগার মাস গর্ভযন্ত্রণার পর ‘পুণ্ডরীক’ প্রসব হইল। অনেক আশা লইয়াই গত বৃহস্পতিবার ‘পুণ্ডরীক’ দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিনয় দেখিয়া বুঝিলাম ভাদুড়ীমহাশয়ের এই গর্ভযন্ত্রণার কারণ। এতবড় rubbish নাটক অভিনয় করিতেছেন বলিয়া বোধহয় ভাদুড়ীমহাশয় নিজেই লজ্জিত হইতে-ছিলেন। প্রথমেই তিনি ভূমিকায় বলেন, দেশবন্ধুরাত্রে কি বই অভিনীত হইবে এই প্রশ্ন মীমাংসার সময় আসিলে দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু তাঁহার নাটক ‘পুণ্ডরীক’ বইখানি ঐ রাত্রে অভিনয় করিবার জন্য অনুরোধ করেন—এবং সেইজন্যই এই নাটকখানি দেশবন্ধুরাত্রে অভিনীত হইতেছে। নাটকখানি রুচির দিক দিয়া পাষাণীকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। লেখার মধ্যেও কাঁচা হাতের আভাস প্রতি লাইনে পাওয়া যাইতেছিল।…”

২০ আগস্ট, ১৯২৫ মনোমোহন নাট্যমন্দির ‘বসন্তলীলা’ গীতিনাট্য ও ‘পুনর্জন্ম’ এবং ‘চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে’ (প্রহসন) নামালে। প্রথম নাটকে কৃষ্ণচন্দ্র দে, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী এবং সরলাবালা যথাক্রমে বসন্তদূত, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকা সাজলেন। ‘পুনর্জন্ম’ প্রহসনে যাদব, অশ্বিনী ও সৌদামিনীরূপে যথাক্রমে নরেশচন্দ্র মিত্র, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী এবং চারুশীলা অবতীর্ণ হলেন। শেষের নাটকে চাটুজ্যে হলেন প্রদোষ-

কুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঁড়ুজ্যে নরেশচন্দ্র মিত্র। অভিনয় দেখে 'নাচ-ঘর' মন্তব্য করলে :—"নাট্যমন্দিরে 'সীতা' ও 'জনা'র অভিনয় দেখলে মনে হয় না যে, এই সম্প্রদায়ের এই সব ধীর স্থির গম্ভীর ও শান্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দল কোনও কালে কখনও কোনও হাস্য-রসাত্মক প্রহসন বা নক্সা অভিনয় করতে পারবেন। গত বৃহস্পতিবার কিন্তু সেখানে 'পুনর্জ্জন্ম' ও 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে'র অভিনয় যাঁদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে একমত হয়ে বলবেন যে বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হয়েছি তাঁদের 'পুনর্জ্জন্ম' ও 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে'র মতো দু'খানি বহু পুবাতন ক্ষুদ্রতম হাস্যরসাত্মক নক্সাকে এমন নবভাবে সুরসাল করে ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে অভিনয় করতে দেখে!" (২৮।৮।১৯২৫) ১৯২৫-এব শেষের দিকে 'আলমগীরে'র পুনরভিনয়ের আয়োজন করা হল।[১৩ক] ম্যাডান থিয়েটারে ও আলফ্রেড মঞ্চে শিশিরকুমারের সঙ্গে উদিপুরী সেজেছিলেন যথাক্রমে কুসুমকুমারী এবং মালিনী। পরবর্তীকালে এই চরিত্রে রূপ দিতেন প্রভা। তাঁর মৃত্যুব পরে রেবাদেবীকে শিশির-কুমারের সাথে আলোচ্য ভূমিকায় দেখা যেত। নাট্যমন্দিরের বর্তমান পর্যায়ের অভিনয়ে উদিপুরীরূপে অবতীর্ণা হলেন তারা-সুন্দরী। বলা বাহুল্য, নামভূমিকায় শিশিরকুমারকেই দেখা গেল। নবীন-প্রবীণার এই হৃদয়গ্রাহী সম্মিলন দর্শকরা সেদিন পরিপূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করেছিল। 'নবযুগ' (৪।১২।১৯২৫) জানালে :—"......'আলমগীর' দেখিয়া আমরা পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি।... উদিপুরীর ভূমিকায় তারাসুন্দরী বিজয়িনীরূপে দেখা দিয়াছেন।... ভাদুড়ী মহাশয়ের 'আলমগীর'ও রূপ রসে পরিপূর্ণ।...অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে 'এবাদৎ খাঁ', 'ভীমসিংহ' ও 'বিক্রম সোলাঙ্কী' অতি

১৩ক শিশিবকুমারের উদ্যোগে মনোমোহন মঞ্চে ২১ নভেম্বর, ১৯২৫ 'আলমগীর' নাটকের প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় এবং দর্শকদের অনুরোধে বেশ কয়েকরাত্রি নাটকখানির অভিনয় চলে।

সুন্দরভাবে অভিনীত হইয়াছিল।... মনোরঞ্জনবাবুর 'কামবক্‌সে'র অভিনয় ভাল হইয়াছিল।... দর্শকদের তৃপ্তি দিবার জন্য এই ঐকান্তিক প্রয়াস ও যত্ন নাট্যমন্দিরকে জয়যুক্ত করুক।" 'শিশির' বললেঃ— "... শিশিরবাবু এবং শ্রীমতী তারাসুন্দরী উভয়েরই বৈশিষ্ট্য 'আলমগীরে' খুবই বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অভিনয়ের কোথাও দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় নাই— প্রতি মুহূর্তেই মনে হয় বুঝিবা একজন আর একজনকে ছাড়াইয়া যাইতেছে। তারাসুন্দরী বেশ শান্ত সংযতভাবে সম্রাজ্ঞীর ন্যায়ই অভিনয় করিতেছিলেন; তাঁহার স্বরে, ভাবে, ভঙ্গীতে সেই ভাব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল। ভাতুড়ী মহাশয়েব অভিনয়েও সেই চিত্তচাঞ্চল্য, বিবেকের কষাঘাতে অধীরতা প্রতি মুহূর্তে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।..." (২৮।১১।১৯২৫) মনোমোহন মঞ্চে দেড় বৎসরেরও কম সময়ে শিশিরকুমার পূর্বোক্ত নাটকগুলি ছাড়া 'ভীষ্ম' (১১।১২।১৯২৪), 'রঘুবীর' (মে/১৯২৫), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১২।১২।১৯২৫), 'আলিবাবা' (২৮।১২।১৯২৫) প্রভৃতি বহু পুরানো নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। এইসব অভিনয়ের মাধ্যমে রসিকসমাজে' নাট্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠালগ্নটি যখন সমাগত প্রায়, ঠিক সেই মুহূর্তে তার জীবনে ঘনিয়ে এল এক দুরন্ত বিপর্যয়। সে সম্পর্কে বিস্তৃত-কথনের পূর্বে, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে নাট্যমন্দিরের অবদানের মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রয়াস পাবো।

অবদান

'কর্ণার্জুন' ও সীতা'র মাধ্যমে বাংলা থিয়েটারে যে নতুন যুগের উদ্বোধন হয়, তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল—প্রযোজনা। এই প্রথম, অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চস্থাপত্য, আলোক, সঙ্গীত, রূপসজ্জা প্রমুখ নাট্যআঙ্গিকের উপর যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হল এবং এদের সমানুপাতিক ও সুষ্ঠু সমন্বয় যাতে সমগ্র নাট্যানুষ্ঠানটি এক অখণ্ড

ভাবরূপ ধারণ করে মঞ্চাধ্যক্ষরা সে ব্যাপারে তৎপর হলেন। কেবল তাই নয়, মঞ্চপ্রকরণগুলিকে নির্দিষ্টকালানুসারী ও শিল্পরুচিসম্মত করার প্রয়াসও দেখা গেল এই সময়। বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে, মঞ্চস্থাপত্য যাতে নাটকে বর্ণিত নির্দিষ্ট যুগকে ইতিহাস ও কারু-কলার দিক থেকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে, আলোক যাতে সময় ও পরিবেশ অনুযায়ী শোভন ও সুন্দররূপে প্রক্ষেপিত হয়, সঙ্গীতে ভাষা ও সুরের সমকালীনতা ও সৌকুমার্য যাতে অব্যাহত থাকে এবং রূপসজ্জা যাতে স্বাভাবিক ও সু-মাত্রিক হয়ে দর্শকদের মনে বাঞ্ছিত বিভ্রম জাগায়, কর্তৃপক্ষ সে ব্যাপারে সজাগ রইলেন। হৃদয় এবং মস্তিষ্কজাত এই সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নাট্যপ্রক্রিয়া গিরিশ যুগে অবজ্ঞাত ছিল। সেকালে, আলোকসম্পাতকারী বা মঞ্চসজ্জাকর অথবা সঙ্গীতপরিচালকের উপর স্ব স্ব বিভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত হত আর পরিচালক (তখনকার ভাষায়, ম্যানেজার অথবা অভিনয়শিক্ষক) ব্যাপৃত থাকতেন কেবলমাত্র নট-নটীদের অভিনয় শিক্ষাদানের কাজে। ফলে, এই সব বিভাগের মধ্যে আবশ্যিক যোগাযোগের অভাবে এবং এদের উপর ব্যক্তিবিশেষের সামগ্রিক কর্তৃত্ব না থাকায়, বিভিন্ন নাট্যআঙ্গিকের সুষ্ঠু সমন্বয়ে গড়ে ওঠা শিল্পরসাশ্রিত অখণ্ড ভাবরূপ সে যুগে প্রায় কোনো সময়েই উপলব্ধি করা যেত না।[১৪]

আর্ট থিয়েটারের 'কর্ণার্জুন' এবং নাট্যমন্দিরের 'সীতা'—এই উভয় নাটকের সূত্রে 'প্রযোজনা'র আত্মপ্রকাশ ঘটলেও, প্রযোজনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারে শিশিরকুমারের তীক্ষ্ন দৃষ্টি, তাঁর বিদগ্ধজনোচিত

---

১৪ প্রসঙ্গতঃ, হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন:—"আগেকার দিনে বাংলা রঙ্গালয়ে নাট্যাচার্য্য ছিলেন, অভিনয় শিক্ষক ছিলেন, মঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন এবং ছিলেন আরো কোন কোন কর্ত্তা, কিন্তু নিজেকে "প্রয়োগ-কর্ত্তা" বলে কেউ কোন দিন দাবী করেন নি।······গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুর যুগের নাট্যাভিনয়েও প্রথম শ্রেণীর অপূর্ব্ব অভিনয়ের সঙ্গে যেখানে-সেখানে দেখা গিয়েছে প্রয়োগ দোষের পর প্রয়োগ দোষ।" (বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার)

শিল্পরুচি এবং অনন্য অভিনয়প্রতিভা 'সীতা' নাট্যাভিনয়কে এক দুর্লভ কাব্যরসে অভিসিঞ্চিত করেছিল যার সন্ধান প্রথম নাটকের অভিনয়ে মিলতো না। প্রযোজনাকে উন্নত মানের ও সূক্ষ্ম শিল্প-সৌন্দর্যমণ্ডিত করার কাজে প্রতিষ্ঠিত পেশাদার গীত রচয়িতা, সুরকার, চিত্র ও সঙ্গীত এবং কলাকুশলীদের চেয়ে তরুণ প্রতিভারই পক্ষপাতী ছিলেন শিশিরকুমার। সেই কারণে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, চারুচন্দ্র রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রমুখ সে সময়কার অপেক্ষাকৃত অ-প্রতিষ্ঠিত অথচ প্রভিভাবান ব্যক্তিদের সহায়তা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। নাট্যমন্দিরের কৃতিত্বের মূলে এইসব গুণীজনের অবদান বড় কম নয়। অভিনেতাদের মধ্যে দু' একজন ব্যতীত অধিকাংশ ছিলেন নবীন এবং শিশিরকুমারের দীক্ষায় দীক্ষিত। নাট্যমন্দির থেকে শিশিরকুমারের যে বুদ্ধি-দীপ্ত ও রসসমৃদ্ধ অভিনয়শৈলীর জন্ম, তার ধারক ও বাহক ছিলেন সেদিনের এইসব তরুণ নটেরা। পরবর্তীকালে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রমোহন রায়, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী প্রমুখ এঁদের অনেকেই বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। শিশির-শিষ্যা নাট্যমন্দিরের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী প্রভা তো দীর্ঘকালের নাট্য-সাধনায় অতুল যশ ও কীর্তির অধিকারিণী। নব্যরীতির অভিনয় ধারার প্রবর্তক হলেও পূর্বসূরীদের নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে শিশির-কুমারের শ্রদ্ধার অভাব ছিল না।[১৫] নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠাকালে উনি

১৫ দানীবাবুর মৃত্যুতে নাট্যনিকেতনে যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে পরলোকগত মহান নটের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে শিশিরকুমার স্বীকার করেন:—"কৈশোরে দানিবাবুর অভিনয় আমাকে অনেকখানি অভিভূত করিয়াছিল। যৌবনে তাঁহার হাত হইতেও আমি ত্রাণ পাই নাই এবং আজও তাঁহার কিছু কিছু আমার মধ্যে রহিয়াছে। তাঁহার সহিত একত্র অভিনয়ের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল এবং তজ্জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।" (আনন্দবাজার পত্রিকা — ১৩৷৩৷১৯৩৪)

পুরানো যুগের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ নট দানীবাবুকে যথাযোগ্য সম্মান সহকারেই নিজের সম্প্রদায়ে আবাহন করেছিলেন। যদিও নানা কারণে দানীবাবুর পক্ষে তৎকালে সে প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। গিরিশযুগের প্রখ্যাতা অভিনেত্রী তারাসুন্দরীকে অবকাশযাপনের নিরুদ্বিগ্ন পরিবেশ থেকে রসসৃষ্টির কর্মমুখর যজ্ঞশালায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব শিশিরকুমারের। 'জনা' ও 'আলমগীরে'র অভিনয়ে এই অস্তাচলগামিনী প্রতিভা সেদিন যে অদ্ভুত পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা আজো কোনো কোনো বয়োবৃদ্ধ নাট্যরসিকের হৃদয়ে চিরজাগরূক হয়ে আছে। নাট্যমন্দিরে নবীন ও প্রবীণা—শিশিরকুমার এবং তারাসুন্দরীর সম্মিলন উপভোগ্যতার দিক থেকে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

নাট্যমন্দিরে কেবলমাত্র কৃতী নট-নটীবই সমাবেশ হয়নি, তাকে উপলক্ষ ক'বে শিশিরকুমারের চতুর্দিকে বাংলাদেশের তাবৎ জ্ঞানীগুণী বিদগ্ধজনের দুর্লভ সমাবেশ ঘটেছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, শ্রীকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীদের সাহচর্যে এবং পরামর্শে শিশিরকুমারের নাট্যপ্রতিভা ও প্রযোজনাশক্তি যথেষ্ট পরিমাণেই বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এর ফলে সামগ্রিকভাবে বাংলা থিয়েটাবও যে উপকৃত হয়েছিল, সন্দেহ নেই।

মনোমোহন মঞ্চে সতের মাস অবস্থানকালে শিশিরকুমার প্রধানতঃ চারটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। নাটকগুলি যথাক্রমে 'সীতা', 'পাষাণী', 'জনা' (নব পর্যায়) ও 'পুণ্ডরীক'। লক্ষ্যণীয়, এদের প্রথম তিনটিই হল পৌরাণিক। বাংলা থিয়েটারে তখনও ভক্তিরসাশ্রিত নাটকের আধিপত্য চলেছে। তাই, আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্দির—যুগস্রষ্টা এই দুই সংস্থারই আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল পৌরাণিক নাটকের মাধ্যমে। জনরুচির চাপে নাটকের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে গতানুগতিকতাকে আশ্রয় করতে বাধ্য হলেও শিশিরকুমার

এদের বিন্যাস ও উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে কিন্তু মৌলিকতা এবং আধুনিক মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। পৌরাণিক নাটক মঞ্চস্থ করলেও তাঁর প্রযোজনায় অধ্যাত্মবাদ বা ভক্তিরসের প্রাবল্য কোনো সময়েই মুখ্য হয়ে ওঠে নি। তাদের অন্তর্নিহিত মানবিক আবেদনের শিল্পরসসমৃদ্ধ ও বুদ্ধিদীপ্ত ভাবরূপ দর্শকদের সামনে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন শিশিরকুমার। প্রেমিক-প্রেমিকার চিরন্তন বিরহলীলা ও শাশ্বত আকুতি (সীতা), নরনারীর জৈব বাসনা-কামনা এবং মোহভঙ্গ (পাষাণী) আর পুত্রহারা জননীর মর্মবেদনার (জনা) মত মানবিক আবেগ-অনুভূতিই ছিল তাঁর প্রধান উপজীব্য। এইসব নাটকের পরিবেশনের মধ্য দিয়ে তিনি দর্শকদের হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মস্তিষ্কের কাছেও আবেদন জানিয়েছিলেন। শিশিরকুমারের অভিনয়ধারার বিশেষত্ব ছিল এই-খানে যে, তা কেবল আবেগের বন্যায় দর্শকদের প্লাবিত না ক'রে তাদের চিন্তার জগতেও আঘাত হানতো—তাদের কল্পনাশক্তিকে উজ্জীবিত ক'রে তুলতো। বস্তুতঃ, অভিনয়ব্যাপারটিকে নিছক আবেগ-অনুভূতি-ভাবালুতার স্তর থেকে মননশীলতার পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়াসের ক্ষেত্রে তিনিই আমাদের দেশে পথিকৃৎ এবং প্রকৃত রসোপভোগের এই আবশ্যিক সর্তটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল নাট্যমন্দিরের পর্যায়েই। শিশিরকুমারের এই সংস্কারমুক্ত আধুনিকতা, বুদ্ধিআশ্রিত শিল্পরুচি ও পরিশীলিত মননের কাব্যিক মেজাজ সেকালের এক শ্রেণীর সংস্কারাচ্ছন্ন ও গতানুগতিকতাপ্রিয় দর্শককে খুব সঙ্গত কারণেই সন্তুষ্ট করতে পারে নি। তাই, প্রায় সমস্ত নাটকের অভিনয় রসিকজনের স্বীকৃতি ও অভিনন্দন পেলেও নাট্যমন্দিরের স্বল্প জীবনকালে টিকিট ঘরের পরিপূর্ণ আনুকূল্য পেয়েছিল মাত্র দু'টি নাটক—'সীতা' ও 'আলমগীর'। 'পাষাণী' ও 'জনা' এই আধুনিকতা এবং মননশীলতার কারণে সেকালের দর্শকরা গ্রহণ করে নি। দু'টি নাটকই কিছুকাল পরে বন্ধ হয়ে যায়। চলে নি

'পুণ্ডরীক'ও। এই ব্যর্থতার কারণ অবশ্য ভিন্ন। অভিনয় উপভোগ্য হওয়া সত্ত্বেও রচনার দোষে নাটকখানির প্রতি দর্শকেরা বিমুখ হয়েছিল। এসব সত্ত্বেও, অভিনয়ব্যাপারে বহুবিধ প্রচলিত ধ্যান-ধারণা-সংস্কারের বিনষ্টিতে শিশিরকুমারের দ্বারা নাট্যমন্দিরের যে নাট্যপ্রয়াস সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে যুগান্তরের সূচনা করেছিল, সুখের কথা, তাকে অভিনন্দিত করার মত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কলারসিকের অভাব সমকালীন বাংলায় ঘটে নি। এই সময়েই দিলীপকুমার রায়ের মত শিল্পবিদের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছে ঃ—"আমার বিশ্বাস যে বাংলার রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের দান যে কত বেশী সে সম্বন্ধে আমরা এখনও যথেষ্ট সচেতন হই নি। পরবর্ত্তীযুগ বুঝবে যে একজন লোকের মধ্যে নাট্যপ্রতিভা, Personality, অসামান্য অধ্যবসায়, কল্পনার পরিসর, Produce করবার সহজ জ্ঞান, সুদর্শন আকৃতি ও উদাত্ত সুকণ্ঠের এরূপ আশ্চর্য্য যোগাযোগ যে-কোনও দেশের রঙ্গালয়ের ইতিহাসেই বিরল"। (বিজলী/নাচঘর—২৮।৮।২৫)

পরিশেষে, আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্দিরের অবদানের ক্ষেত্রে তদানীন্তনকালের কয়েকটি পত্র-পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে ১৯২৩।২৪ সালে উপরোক্ত দুই সংস্থার আবির্ভাব ও নাট্যচর্চাকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের দেশে এক শ্রেণীর পত্র-পত্রিকার মননশীল ও রসসমৃদ্ধ সমালোচনার ধারা গড়ে উঠেছিল। হেমেন্দ্রকুমার রায়, নরেন্দ্র দেব, শচীন সেনগুপ্ত, পশুপতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সেকালের নাট্যবোদ্ধারা 'নাচঘর', 'বিজলী', 'নবশক্তি' প্রভৃতির পৃষ্ঠায় বিশ্লেষণাত্মক, সংবেদনশীল এবং গঠনধর্মী নাট্যসমালোচনার যে আদর্শ সেদিন কলারসিকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছিলেন তা, সামগ্রিকভাবে বাংলা থিয়েটারের মানোন্নয়নে সহায়ক হয়েছিল সন্দেহ নেই। বিশেষতঃ, শিশির-প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণে 'নাচঘর' পত্রিকার নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস

নাট্যমন্দিরের জনপ্রিয়তার অন্যতম সোপান, প্রতিবাদের আশঙ্কা না রেখেই একথা বলা চলে।

বিপর্যয়

মাত্র দেড় বৎসরের অভিনয়চর্চাতেই প্রতিষ্ঠা যখন করায়ত্ত, ঠিক সেই সময়েই নাট্যমন্দিরের জীবনে আসে বিপর্যয়। 'পাষাণী', 'জনা' ও 'পুণ্ডরীক' টিকিটঘরের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হলেও 'সীতা', 'আলমগীব' এবং অন্যান্য পুবানো নাটকের অভিনয় শিশিরকুমারকে খ্যাতির সঙ্গে প্রচুর অর্থও দিয়েছিল কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেন নি। ফলে, মনোমোহন মঞ্চে অবস্থানকাল দু'টি বৎসর পূর্ণ হওয়ার অনেক পূর্বেই ১৯২৫-এর শেষে শিশিরকুমারের ব্যবসায়-কুশলতার অভাবে নাট্যমন্দিরের পতনসম্ভাবনা দেখা দিল। অস্বীকাব ক'রে লাভ নেই, তিনি যে পরিমাণ কলানিপুণ ছিলেন হিসাবজ্ঞানেব অস্তিত্ব তাঁর মধ্যে সেই অনুপাতে ছিল না। 'নবযুগ' তো স্পষ্টই লিখেছিল:—"··· কলাকারুর দিকটা ভাদুড়ী মহাশয় যেমন বুঝেন ব্যবসায়ের দিকটা তেমন বুঝেন বলিয়া মনে করিবার বিশেষ সুযোগ আমরা পাই নাই।" (৩০।১। ১৯২৬) তাই, মনোমোহন নাট্যমন্দিরের স্বল্পায়ু জীবনে আয়ের প্রাচুর্য ঘটলেও, অপব্যয়ের মাত্রাধিক্যতা তার আর্থিক বনিয়াদকে ভিতরে ভিতরে শিথিল এবং অবশেষে ছিন্নমূল ক'রে তোলে। অনভিজ্ঞতা, বেহিসাবী খরচ ও সংশ্লিষ্টজনের বিশ্বাসভঙ্গতার কারণে প্রযোজক শিশিরকুমারকে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তই হতে হয়। এসম্পর্কে পরবর্তীকালে তাঁর নিজের উক্তি:—"···সীতা মঞ্চস্থ করতে আমার নব্বই হাজার টাকা খরচ হয়েছিল আর উঠেছিল···মাত্র পঁচাত্তর হাজার টাকা।···সীতাতে আমার লাভ হল না। অথচ মাসের পর মাস ৫৲/৭৲ টাকার টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে। এমন অন্য কোনো বইয়েতে দেখি নি। লাভ না হবার কারণ লোকে

প্রচুর ঠকিয়েছিল। তাছাড়া মিসম্যানেজমেণ্ট আর চুরিও ছিল।” (শিশির-সান্নিধ্যে—রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু) এইসব নানা কারণে নাট্যমন্দিরের একমাত্র স্বত্বাধিকারী শিশিরকুমার ভাতুড়ী ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন—ফলে থিয়েটারের অস্তিত্ব হয়ে উঠলো বিপন্ন। তখন সহায়তায় এগিয়ে এলেন শিশিরকুমারের কলানুরাগী ও সঙ্গতি-সম্পন্ন বন্ধুর দল। এঁদের প্রচেষ্টায় ১৯২৫-এর ২৩ ডিসেম্বর নাট্য-মন্দির লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হয়। মূলধন—পাঁচ লক্ষ টাকা। ডিরেক্টর হিসাবে রইলেন তুলসীচরণ গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও শিশিরকুমার ভাতুড়ী। শিশিরকুমার নিজস্ব ব্যবসা লিমিটেড কোম্পানীর কাছে বিক্রয় ক'রে নগদ পঁচাত্তর হাজার টাকা ও পঞ্চাশ হাজার টাকার শেয়ার পেলেন। কর্তৃত্ব পূর্বের মত ভাতুড়ী কোম্পানীরই রইল। লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয়ে নাট্য-মন্দির আর মনোমোহন মঞ্চে থাকলো না, ম্যাডানদের কর্ণওয়ালিশ রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করলো—সুরু হল শিশিরকুমারের বিজয়দীপ্ত অভিযানের আর এক পর্যায়।

পরিশিষ্ট

ক. অভিনয়-তালিকা

সীতা	যোগেশচন্দ্র চৌধুরী	৬।৮।১৯২৪
পাষাণী	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	১০।১২।১৯২৪
ভীষ্ম	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	১১।১২।১৯২৪
রঘুবীর	"	মে, ১৯২৫
জনা (নব পর্যায়)	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৩।৬।১৯২৫
পুণ্ডরীক	শ্রীশচন্দ্র বসু	১৩।৮।১৯২৫
বসন্তলীলা	—	২০।৮।১৯২৫
পুনর্জন্ম	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	"
চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে	অমৃতলাল বসু	"
আলমগীর	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	২১।১১।১৯২৫
চন্দ্রগুপ্ত	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	১২।১২।১৯২৫
আলিবাবা	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	২৮।১২।১৯২৫

খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায়

শিশিরকুমার ভাদুড়ী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, তারাকুমার ভাদুড়ী, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতমোহন লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশ চৌধুরী, জীবনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ননীগোপাল সান্যাল, রবীন্দ্রমোহন রায়, অমিতাভ বসু (এ), কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক), নৃপেশনাথ রায়, নরেশচন্দ্র মিত্র, গোপালদাস ভট্টাচার্য, প্রদোষকুমার চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, পান্নারানী, প্রভা, উষারানী, নীরদাসুন্দরী, নিরুপমা, মনোরমা, চারুশীলা, তারাসুন্দরী, সরলাবালা, শেফালিকা প্রভৃতি।

গ. বিজ্ঞাপন

মনোমোহন নাট্যমন্দির

৬৮ নং বিডন ষ্ট্রীট] [ফোন নং ১৭১৭ বড বাজার

অধিকারী-শিশিরকুমার ভাদুড়ী

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সৌজন্যে ও শুভাগমনে আমাদের প্রথম অভিনয় উদ্দীপিত ও উদ্বোধিত হইবে। মনোমোহন নাট্যমন্দির নূতন ভাবে গঠিত, বর্তমান যুগের সমুন্নত নাট্যকলাসম্মত নূতন সাজসজ্জায় ভূষিত, ভাবভাষার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, সুর-সঙ্গীতে মণ্ডিত নৃত্যছন্দে লীলায়িত, নূতন অভিনয় সম্ভার লইয়া বাংলাদেশের নাট্যকলানুরাগী দর্শকবৃন্দকে সাদরে আমন্ত্রণ করিতেছে।

উদ্বোধন রজনী

বুধবার ২১শে শ্রাবণ ৬ই আগস্ট সন্ধ্যা ৭॥০ টা

দেশবাসীগণের নিকট আমাদেব প্রথম অভিনয় উপহার

নবীন নাট্যকার শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুবী প্রণীত

ভারতের প্রাচীনতম যুগের করুণ কাহিনী

বর্ত্তমান যুগের নূতনতম নাট্য-প্রথানুসারে গ্রথিত।

সীতা

মহাসমারোহে প্রথম অভিনয় রজনী

রাম—শিশিরকুমার ভাদুড়ী

আগস্ট, ১৯২৪ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত।

মিত্র থিয়েটার

(১৯২৬-১৯২৭)

মনোমোহন থেকে নাট্যমন্দির কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে চলে এল। শূন্য মঞ্চে আসর পাতলো মিত্র থিয়েটার। এঁরা এলেন ১৯২৬-এর শেষে।

মিত্র থিয়েটার এর আগে ছিল আলফ্রেড মঞ্চে (বর্তমানের গ্রেস সিনেমা)। মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্র মিত্রের ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্র মিত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র শিশির মিত্র (মহেন্দ্র মিত্রের পুত্র) ১৯২৬, ২ এপ্রিল বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'শ্রীদুর্গা' দিয়ে ওখানে থিয়েটার চালু করেন। সেকালেব সব নামকরা নট-নটীদের নিয়ে যাত্রারম্ভ করলেও সে যাত্রায় মিত্র থিয়েটার সুবিধা করতে পাবে নি। পুরানো নাটকের সাবেকী ধাঁচের অভিনয়ে বেশীর ভাগ দর্শকই তখন বীতশ্রদ্ধ। তাছাড়া, দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয়ে কুখ্যাত এলাকার আলফ্রেড মঞ্চটিকে অনেকে সে সময় এড়িয়েই চলতেন। ছ' বছর আগে এই কারণে শিশিরকুমারকেও ওখান থেকে মনোমোহনে স'রে আসতে হয়েছিল।

উত্তর কলকাতার থিয়েটার পাড়ায় এসে মিত্র সম্প্রদায় বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে অভিনয় সুরু করলেন। জ্ঞানেন্দ্র মিত্রের মালিকানায় এবং নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসুর অধিনায়কত্বে ১৯২৬, ১ ডিসেম্বর ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডারবি টিকিট' এবং মনোমোহন গোস্বামীর 'সংসার' দিয়ে মনোমোহন মঞ্চে মিত্র থিয়েটারের উদ্বোধন হল। স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসের সুরে 'নবযুগ' (১১।১২।১৯২৬) লিখলে:—"শুভ সংবাদ, সন্দেহ নাই। পাঁড়ে-ভবনে মিত্র কোম্পানী 'সংসার' পাতিলেন। ভাগ্য-পরীক্ষায় এবার

তাঁহাদের প্রধান ভরসা 'ডারবির টিকিট',—যে সনাতন প্রথায় মন্দভাগ্যেরা রাতারাতি বড় মানুষ হইতে চায়। এবার ডারবির টিকিটখানিতে অশ্ব উঠিবে কি অশ্ব-ডিম্ব উঠিবে তাহা লইয়া নাটমহলে কল্পনা-জল্পনা চলিতেছে। আমরা নটনাথের নিকট প্রার্থনা করি শত্রু দলের মুখে ছাই দিয়া মিত্র দলের ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহাদের পানে হাসিমুখে ফিরিয়া চান।...মিত্র-গোষ্ঠী চিরকাল কলার সেবক হইলেও কলাবাগানে একটা অপয়া স্থানে পূজার আয়োজন করিয়া তাঁহারা কলালক্ষ্মীর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এইবার তাঁহারা ঠিক স্থানটি বাছিয়া লইয়াছেন।... মিত্র-গোষ্ঠী বিডন ষ্ট্রীটে আসিয়া বুদ্ধিমানের কাজই করিয়াছেন। তাহা ছাড়া আত্মীয়-জ্ঞাতিবর্গ খুব নিকটেই রহিল।...পাঁড়েজী- ততোধিক বুদ্ধিমান। এক ঢিলে দুই পাখী শিকার করিলেন। সেণ্ট্রাল এভিনিউ নামক নূতন রাস্তাটি মনোমোহন মঞ্চের সম্মুখে আসিয়া আজ কয় বৎসর থামিয়া রহিয়াছে। মনোমোহনের বক্ষ ভেদ করিয়া শীঘ্রই এই রাস্তার উত্তর দিকে বিস্তৃতি সম্ভাবনা। সুতরাং বুদ্ধিমান পাঁড়েজী প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের জরাজীর্ণ থিয়েটার ভবনটিকে একটু সংস্কৃত করিয়া তাহাতে থিয়েটার বসাইলেন। বুঝ লোক, যে জান সন্ধান।"

সে যাই হোক্, মিত্র থিয়েটারে অভিনয় চলতে রইলো। প্রবীণ নাট্যাচার্য অমৃতলাল, যিনি বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মিত্র থিয়েটারের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেছিলেন। বার্দ্ধক্যভারে জর্জরিত তিনি তখন, নাট্যশালাকে নতুন দিগন্তের সন্ধান দেবার দৈহিক ও মানসিক সামর্থ্য তাঁর সে সময় আর নেই। সেই কারণে এবং পুরাতনের প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববশতঃ সম্প্রদায় একালের দর্শকের পরিবর্তিত রুচি বিস্মৃত হয়ে আলফ্রেডের মত এখানেও অতীতের মঞ্চসফল নাটকগুলির দিকে ঝুঁকলেন্। পর পর অভিনীত হল :—'শ্রীদুর্গা' (৪।১২), 'কৃষ্ণকান্তের

উইল' (৫।১২), 'বঙ্গে বর্গী' (১২।১২), 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'আলিবাবা' (১৯।১২), 'প্রতাপাদিত্য' (২৪।১২), 'দেবলাদেবী' (২৫।১২), 'পরদেশী' (১।১।১৯২৭), 'রানী দুর্গাবতী' (১৬।১) প্রভৃতি। অভিনয়ে অংশ নিলেন অমৃতলাল বসু (কৃষ্ণকান্ত ও বিক্রমাদিত্য), নির্মলেন্দু লাহিড়ী (মহিষাসুর, গোবিন্দলাল, ভাস্কর, ওসমান, প্রতাপাদিত্য, খিজির এবং জগন্নাথ), ক্ষেত্রমোহন মিত্র (মোহনলাল, জগৎসিংহ, রডা, আলাউদ্দিন এবং বাজবাহাদুর), তারাসুন্দরী (শ্রীদুর্গা, মাধুরী, আয়েষা এবং লক্ষ্মীবাই), কুসুমকুমারী (রোহিণী, সিরাজ, মর্জিনা, বিজয়া, কমলা এবং রানী দুর্গাবতী), দুর্গাপ্রসন্ন বসু, ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় (পরবর্তীকালের বিখ্যাত চিত্র পরিচালক—ডি. জি), নীরদাসুন্দরী, নিভাননী প্রমুখ নট-নটী। এসব পুরানো নাটক আর তাদের গতানুগতিক অভিনয়ে নাট্যরসিকরা কিন্তু মোটেই খুশী হলেন না। নির্মলেন্দু, নিভাননী প্রমুখ দু' একজন ব্যতীত শিল্পীরা অধিকাংশই গিরিশযুগের—তাঁদের দেহে ও কণ্ঠে তখন বার্দ্ধক্যজনিত ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে, বয়সের কারণে এবং উপযুক্ত নির্দেশকের অভাবে নব্যযুগের অভিনয়-কৌশল তাঁদের আয়ত্তাধীন নয়, আধুনিক দর্শক তাঁদের গ্রহণ করবে কেন ?[১] শিল্পীদের মধ্যে দু'একজন প্রবীণ-

১ মিত্র থিয়েটার যখন আলফ্রেডে সেই সময় থেকে নির্মলেন্দু লাহিড়ী সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তরুণ নায়ক হিসাবে দলে কেবলমাত্র তাঁকেই রাখা হয়েছিল। তাঁর পাশে পুরানো যুগের অভিনেত্রীদের নায়িকারূপে কিরকম বিসদৃশ লাগতো, সে সম্বন্ধে অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর স্মৃতিচারণে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন :—"মিত্র থিয়েটারের এইসব দিনের অভিনয় দেখতে দেখতে দুঃখ হ'তো বেচারী নির্মলেন্দুর জন্য। অভিমন্যুর মতো তাকে যেন এসে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে পুরাতন রথীরা, তার ওপরে দুই পাশে দুই বর্ষিয়সী নায়িকা—তারাসুন্দরী ও কুসুমকুমারী। আমি ত ভাবতেই পারি না, 'ভ্রমর'-এ গোবিন্দলাল সে করেছিল কেমন করে ? যেখানে রোহিণী-তারাসুন্দরী, আর ভ্রমর-কুসুমকুমারী ?" (নিজেরে হারায়ে খুঁজি—প্রথম পর্ব)

প্রবীণা সনাতন প্রয়োগপদ্ধতির অনুসরণে সমালোচকের কাছে রীতিমত তিরস্কৃতই হলেন। 'রানী দুর্গাবতী'র সমালোচনা প্রসঙ্গে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (২৩।১।১৯২৭) কঠোর ভাষায় মন্তব্য করলে :— "···Miss Kusumkumari was in the title role. Her gestures were all monotonous and her delivery was always done in a high and sustained pitch which lacked the novelty and charm of a finished artist. Khettra Babu as "Baj Bahadur" played a part most ill suiting to the present age. He reminded us of an actor of a professional Jatra Party of a decade ago who would always like to play to the gallery. Khettra Babu should cultivate the habit of not sacrificing 'art' before gallery claps. Nirmalendu Babu was the only success of the evening. The other characters of the book were not generally successful. We hear the higher authorities will not allow the piece to be enacted".

পুরানো নাটকের প্লাবনে আর বাতিল হয়ে যাওয়া নট-নটীদের অক্ষম নাট্য প্রয়াসে উত্ত্যক্ত নাট্যামোদীদের জিজ্ঞাসা মূর্ত হয়ে উঠলো 'নবযুগে'র (১৫।১।১৯২৭) নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে :— "গত ৩।৪ বৎসর ধরিয়া আর্ট থিয়েটার, নাট্যমন্দির, মিনার্ভা প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ই অভিনয়কলাকে উন্নত ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া সামান্য কিছু ফল লাভ করিয়াছিলেন। হঠাৎ মিত্র সম্প্রদায় প্রাণপণ চেষ্টায় আবার সেই পুরাতন যুগকে ফিরাইয়া আনিতেছেন, ইহার কারণ কি?" কিন্তু এসব সমালোচনায় কর্ণপাত না ক'রে মিত্র থিয়েটার যথারীতি নাটকের পর নাটক নামিয়েই চললেন অভিনীত হল 'বাজীরাও'

(১২।২), 'চন্দ্রশেখর' (৬।৩), 'বিল্বমঙ্গল' (৬।৪), 'মেবারপতন' (১০।৪), 'জয়শ্রী' (১৫।৪), 'সধবার একাদশী' (১৬।৪), 'মোগল-পাঠান' (২৩।৪) ইত্যাদি, ইত্যাদি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অজস্র পুরানো নাটকের অভিনয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করলেন তাঁরা। কিন্তু আর্ট থিয়েটার ও শিশিরকুমারের আবির্ভাবে নতুন যুগের সূচনায় দর্শকদের রুচি তখন পরিবর্তিত হ'তে সুরু করেছে। পুরাতনের চর্বিতচর্বনে অধিকাংশের আর স্পৃহা নেই। বিশেষতঃ প্রস্তুতির ব্যাপারে উপযুক্ত সময় না দিয়ে অস্বাভাবিক ব্যস্ততার মধ্যে নাটক-গুলি মঞ্চস্থ করায় মিত্র সম্প্রদায়ের প্রয়োজনার সর্বত্র এমন এক কুশ্রী দৈন্যতা প্রকাশ পেত যাতে, নাট্যরসিকের মন বিরূপ না হয়ে পারতো না। উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এই অশোভন ব্যস্ততা এবং অমার্জনীয় অবহেলার প্রতি কটাক্ষ ক'রেই 'বাজীরাও' নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছিল :— "...In its mad rush for producing new plays the management has betrayed itself. The stamp of hasty preparation was all too evident and we can only advice the Company to be a bit slow but more sure..." (অমৃতবাজার পত্রিকা—২০।২।১৯২৭) কিন্তু সীমিত সংখ্যক নাটকের সুষ্ঠু প্রযোজনায় নিজেদের ব্যাপৃত না রেখে মিত্র সম্প্রদায় আরো বৃহৎ ও ব্যাপক পরিকল্পনায় হাত দিলেন আর এতেই তাদের ভরাডুবি ঘটলো।

মে মাসে শোনা গেল, ওঁরা খ্যাতনামা অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে অথবা কোনো সঙ্গীতকুশলা অভিনেত্রীকে এনে 'রামপ্রসাদ' খুলবেন। তারপর মঞ্চস্থ হবে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শঙ্খনাদ' এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'সোরাব-রুস্তম'। নবযুগের কৃতী অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী মিত্র থিয়েটারে যোগ দিয়ে ঐ দুটি নাটকের বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন—এরকম বিজ্ঞপ্তিও ঘোষিত

হল।[২] ২২ মে, ১৯২৭ তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' জানালে, মিত্র সম্প্রদায় 'গুণদা কি গুণ্ডা?'[৩] (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) ও 'রামপ্রসাদ' নিয়ে মনোমোহনে ৪ ও ৫ জুন পুনরায় আত্মপ্রকাশ করছেন। শেষোক্ত নাটকের নামভূমিকায় নামছেন গ্রামাফোন কোম্পানীর বিখ্যাত গায়ক মণ্টাবাবু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব পরিকল্পনার কোনটাই কাজে পরিণত হল না—১৯২৭ সালের মে মাসেই থিয়েটার উঠে গেল।

মিত্র থিয়েটারের বিলুপ্তি উপলক্ষে 'নাচঘর' যে মন্তব্য প্রকাশ করেছিল তাতে, সম্প্রদায়ের পতনের মূল কারণটির উল্লেখ আছে। পত্রিকাখানি লিখেছিল:—"...খুব উচ্চশ্রেণীর নাটকীয় রস জনসাধারণ হয়তো গ্রহণ করতে পারে না। আবার একেবারে ওঁচা নাটক অভিনয় করলেও যে রঙ্গালয় অচল হয়, 'মিত্র থিয়েটারে'র পতনে সেটা বোধহয় সকলে বুঝতে পেরেছেন। "শ্রীদুর্গা" বা "দেবলাদেবী"র মত নাটকের কাল এখন গিয়েছে।..." (১০।৬।১৯২৭)

মিত্র সম্প্রদায় মনোমোহনে অভিনয় করেছিলেন পাঁচ মাসের মত সময়। এই স্বল্প কালের মধ্যে তাঁরা কত নাটকই যে নামিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। তদানীন্তন দর্শকচাহিদার কথা না ভেবে, সমালোচকদের মতামতকে অগ্রাহ্য ক'রে নিজেদের খেয়ালখুশী মত অসার কতকগুলি নাটক অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্র গতিতে একের পর এক মঞ্চস্থ করেছেন আর প্রায় প্রতিটি নাটকই যথারীতি ব্যর্থ হয়েছে। শেষের দিকে অমৃতলাল বসু মিত্র থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্কছেদ

২ এই উদ্দেশ্যে মিত্র-কতৃপক্ষ অহীন্দ্র চৌধুরীকে ষ্টার থিয়েটার থেকে 'হরণ' ক'রে কিছুদিন বাইরে বাইরে নিজেদের হেপাজতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেই অজ্ঞাতবাসের কৌতুহলদ্দীপক কাহিনী শিল্পীর 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে বিবৃত হয়েছে।

৩ নাটকটি 'দেশের ডাক' নামে রূপান্তরিত হয়ে ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হয়েছিল।

করায় ওঁরা গিরিশযুগের আর একজন অভিনেতা ক্ষেত্রমোহন মিত্রকে পরিচালক ক'রে এনেছিলেন। কিন্তু ইনিও 'নিমজ্জমান' সম্প্রদায়কে 'ভাসমান' করতে পারেন নি। লোকসানের মাত্রা শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল যে, থিয়েটার তুলে দিয়েও নিস্তার নেই, বকেয়া দেনার দায়ে আর মামলা-মকদ্দমার চাপে জীবন অতিষ্ঠ হওয়ার উপক্রম! মিত্র সম্প্রদায়ের সেই করুণ পরিণতি সমকালীন উদীয়মান নট ও পরিচালক অহীন্দ্র চৌধুরীর স্মৃতিচারণে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হয়েছে। মিত্রেরা বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্ট থিয়েটার মঞ্চটি লিজ নিলে ওঁদের পক্ষ থেকে প্রবোধচন্দ্র গুহ ও অহীন্দ্র চৌধুরী মনোমোহনের কর্তৃত্বভার হাতে নেন। সুতরাং খুব সঙ্গত কারণেই প্রত্যক্ষদর্শী এবং তদানীন্তন নাট্যপ্রবাহের সঙ্গে জড়িত শিল্পী-লেখকের এই বিবরণ প্রামাণিকতার দাবী রাখে। তিনি লিখেছেন ঃ—

"... শেষ পর্যন্ত 'মিত্র' দাঁড়াতে পারলো না! তার কারণ ইদানীং তাঁরা যে সমস্ত অভিনয় করেছিলেন, তার একটাও জমাতে পারেন নি। ক্রমাগত লোকসানে ওঁদের মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়।... ওঁরা কতকগুলি মামলাতেও জড়িয়ে পড়েছিলেন।... তারাসুন্দরীর ছেলে মানিকলাল ছিল ওখানে স্টেজ-ম্যানেজার। তার ক' মাসের মাইনে বাকি পড়েছিল বলে... সেও দিল এক মামলা ঠুকে। অমৃতলাল বসু ওখানে অভিনয় করেছিলেন কিছুদিন, নাট্যাচার্যও ছিলেন। ওঁর 'সাগরিকা' নাটক হবার কথা ছিল—সে-নাটকও হলো না—তিনিও টাকার দাবী করে এক কেস জুড়ে দিলেন। শেষপর্যন্ত এমন হলো যে মানিকলাল মনোমোহনের পোষাক-আশাক ক্রোক করালে,...... তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী—এঁদেরও মাহিনা বাবদ বেশ কিছু বাকি ছিল, কিন্তু এঁরা আদালতের দরজায় যান্ নি, এমনিই কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর পাওনা ছিল ক্ষেত্রমোহন মিত্রের। তাঁকে সবাই মিত্রসাহেব বলে ডাকতেন। একেবারে শেষ অবস্থায় ইনি যোগদান করেছিলেন এ-থিয়েটারে

এবং বহু পুরনো বই—'রানী দুর্গাবতী' থেকে 'অহল্যাবাঈ' পর্যন্ত নাটকে অভিনয় করেছেন। তাড়াতাড়িতে এসব বই ভালো করে মহলা দেবার সময় পাওয়া যেত না, তারই মধ্যে যতটুকু পারতেন দেখাতেন ক্ষেত্র মিত্রমশাই। কিন্তু এত চেষ্টা করেও শেষরক্ষা করা গেল না। দর্শকের সংখ্যা যত কমতে লাগল পাওনাদারদের সংখ্যা তত বাড়তে লাগল। ফলে, একদিন সত্যই 'মিত্র' থিয়েটার উঠে গেল।… " (নিজেরে হারায়ে খুঁজি—দ্বিতীয় পর্ব)

মিত্র থিয়েটারের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সনাতনপন্থীদের শেষ দুর্গটির পতন হল। শূন্য মঞ্চে বিজয়কেতন উড়িয়ে প্রবেশ করলেন নতুন যুগের তরুণ অভিযাত্রী দল— আর্ট থিয়েটার লিমিটেড। আবির্ভাব ঘটলো আর এক শক্তিমান নট-পরিচালকের, নবীন শিল্পাদিত্যের—প্রদীপ্ত ভাস্করের মত যিনি সমকালীন নাট্যগগনকে স্বকীয় প্রতিভায় উজ্জ্বল ক'রে তুলেছিলেন—তিনি অহীন্দ্র চৌধুরী।

মনোমোহন আর্ট থিয়েটারের ইতিহাস কার্যতঃ এই প্রতিভাবান রূপকারেরই সার্থক আত্মপ্রকাশের ইতিহাস।

পরিশিষ্ট

ক. অভিনয়-তালিকা

ডারবি টিকিট	ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১।১২।১৯২৬
সংসার	মনোমোহন গোস্বামী	”
শ্রীদুর্গা	বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত	৪।১২।১৯২৬
কৃষ্ণকান্তের উইল	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫।১২।১৯২৬
বঙ্গে বর্গী	নিশিকান্ত বসুরায়	১২।১২।১৯২৬
দুর্গেশনন্দিনী	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৯।১২।১৯২৬
আলিবাবা	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	”
প্রতাপাদিত্য	”	২৪।১২।১৯২৬
দেবলাদেবী	নিশিকান্ত বসুরায়	২৫।১২।১৯২৬
পরদেশী	পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়	১।১।১৯২৭
রানী দুর্গাবতী	হরিপদ মুখোপাধ্যায়	১৬।১।১৯২৭
বাজীরাও	মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১২।২।১৯২৭
চন্দ্রশেখর	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬।৩।১৯২৭
বিল্বমঙ্গল	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৬।৪।১৯২৭
মেবারপতন	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	১০।৪।১৯২৭
জয়শ্রী	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	১৫।৪।১৯২৭
সধবার একাদশী	দীনবন্ধু মিত্র	১৬।৪।১৯২৭
মোগল-পাঠান	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩।৪।১৯২৭

খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায়

অমৃতলাল বসু, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, দুর্গাপ্রসন্ন বসু, ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় (ডি. জি), কুসুমকুমারী, তারাসুন্দরী, নীরদাসুন্দরী, নিভাননী প্রভৃতি।

আর্ট থিয়েটার লিমিটেড
(১৯২৭-১৯২৮)

মিত্র সম্প্রদায়ের পুরানো নাটকের সাবেকী রীতির অভিনয় নবযুগের দর্শকদের খুশী করতে পারলো না। ঋণগ্রস্ত হয়ে ১৯২৭-এর মে মাসের মাঝামাঝি ওঁরা থিয়েটার বন্ধ ক'রে দিতে বাধ্য হলেন। ১ জুন থেকে মনোমোহনের কর্তৃত্ব হাতে নিলেন আর্ট থিয়েটার লিমিটেড।

ষ্টারে তখন আর্ট থিয়েটারের বিজয় অভিযান অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। 'কর্ণার্জুনে'র অভাবনীয় সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঁরা স্থির করলেন, একই সঙ্গে ষ্টার ও মনোমোহন দুই মঞ্চ চালাবেন। ষ্টারের 'পলাতক' নট অহীন্দ্র চৌধুরীকে 'গ্রেপ্তার' ক'রে কার্যতঃ তাঁরই উপর মনোমোহনের দায়িত্ব দেওয়া হল। তত্ত্বাবধায়ক রূপে সঙ্গে রইলেন আর্ট থিয়েটারের অন্যতম কর্মকর্তা প্রবোধচন্দ্র গুহ। সম্প্রদায়ে যোগ দেওয়ার জন্য নাট্যমন্দির থেকে এলেন তরুণ নট জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। ষ্টার হ'তে নে‌ া হল দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, দুর্গাপ্রসন্ন বসু, আশ্চর্যময়ী, সুশীলাসুন্দরী (ছোট), রানীসুন্দরী প্রভৃতিকে। পরবর্তীকালের সুখ্যাত গায়ক মৃণালকান্তি ঘোষও এঁদের সাথে মিলিত হয়ে মঞ্চে প্রথম আবির্ভূত হলেন। সবার উপরে প্রযোজক-পরিচালকরূপে রইলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রায় চার বৎসর কাল ষ্টারের সঙ্গে যুক্ত থেকে যিনি ইতিপূর্বেই দর্শকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন।[১]

---

১ ১৯২৩ সালের ৩০ জুন ষ্টার মঞ্চে আর্ট থিয়েটারের পতাকাতলে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কর্ণার্জুন' নাটকে অর্জুনের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে আবির্ভূত হন।

১৯২৭, ১ জুলাই অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'শ্রীরামচন্দ্র' নাটক দিয়ে নব পর্যায়ে মনোমোহন থিয়েটারের উদ্বোধন হল। প্রথম রজনীর অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করলেন অহীন্দ্র চৌধুরী (রাবণ ও দশরথ), দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (রামচন্দ্র), ইন্দু মুখোপাধ্যায় (লক্ষ্মণ), দুর্গাপ্রসন্ন বসু (পরশুরাম), তুলসী চক্রবর্তী (মারুতি), জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় (ইন্দ্রজিৎ), মৃণালকান্তি ঘোষ (নারিক ?), ছোট সুশীলাবালা (সীতা), সুশীলাসুন্দরী (কৈকেয়ী), আশ্চর্যময়ী (শবরী ও রাজলক্ষ্মী) প্রভৃতি। সুপরিচালনার গুণে নট-নটীরা সকলেই নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন। মনোমোহন মঞ্চে আর্ট থিয়েটারের আবির্ভাবকে স্বাগত জানাতে নাট্যরসিকরা দ্বিধা করলেন না। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১৭।৭।১৯২৭) জানালে :—"The opening of a new theatrical Company in the shape of the Monomohon Theatre by Messrs Art Theatres Limited has proved a regular hit. .... Last Sunday saw the fifth performance of "Sri Ramchandra" before a packed house and the play may be safely said to have been caught on if the heavy booking be any criterion....." দশরথ এবং রাবণের দ্বৈত ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর অসামান্য অভিনয়দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা ক'রে পত্রিকাখানি বললে :—"...his re-appearance was warmly received by lusty cheers from the auditorium. Those who had grown almost impatient (whose number, we believe, is legion, because of the absence of Mr. Chowdhury from the stage for some months past) had every satisfaction when the great artist appeared in the double role of "Dasarath" and "Ravana." These two

characters are greatly opposite and it is admittedly a very difficult matter for one to handle such roles with any degree of success. But the master artist was there who managed the role with consummate ability and skill and one could hardly realise that the same man was playing the two roles." অন্যান্য শিল্পী সম্বন্ধেও সমালোচনায় প্রচুর সুখ্যাতি করা হল:— "Mr. Durgadas Banerjee as "Ram" was the pick among the stalwarts doing his role to a finish. His work in the title role was one of his finest performances worthy of this real actor and it was quite in the fitness of things that he also caught the eye most. Mr. Indu Bhusan Mookherjea proved a worthy "Lakhsman"···Mr. Durga Bose's "Parasuram" was a treat. While proceeding to discuss about the merits of the female players, the name that is uppermost in our mind is the name of Miss Sushila Bala. She was entrusted with the role of "Seeta" and quite a big amount of the briliance of the whole was due to her.···" 'নাচঘর' লিখলে:— "···রাম, লক্ষ্মণ, দশরথ, রাবণ, পরশুরাম, সীতা, কৈকেয়ী ও মন্দোদরীর ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাপ্রসন্ন বসু, শ্রীমতী সুশীলা—বড় ও ছোট'র অভিনয় ভাল লাগলো। মাঝির ভূমিকায় যে নূতন গায়ক-নটকে দেখলুম, তাঁর ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ ব'লে মনে হ'ল। দৃশ্যপটাদি কোন বিশেষ যুগের শিল্প-ভঙ্গীকে প্রকাশ করতে না পারলেও, জনসাধারণের পক্ষে অত্যন্ত

উপভোগ্য হবে। লঙ্কাদাহন দৃশ্যটি সকলকেই অভিভূত করবে।” (১৫।৭।১৯২৭)

কয়েক মাস ‘শ্রীরামচন্দ্র’ মনোমোহন মঞ্চ জমিয়ে রাখলো। দুই থিয়েটার একই কর্তৃত্বাধীন হওয়ায় মাঝে মাঝে উভয় মঞ্চের নট-নটীরা মিলেমিশে পর্যায়ক্রমে কখনো ষ্টারে, কখনো মনোমোহনে ‘সাজাহান’, ‘চন্দ্রগুপ্ত’, ‘রাজসিংহ’ প্রভৃতি পুরানো নাটকের অভিনয় করতে লাগলেন। ১৩ জুলাই এখানে নামলো ‘সাজাহান’। নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। দানীবাবুকে ঔরংজীবের রূপসজ্জায় দেখা গেল। দিলদার, পিয়ারা এবং জাহানারা সাজলেন যথাক্রমে তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, আশ্চর্যময়ী ও রানীসুন্দরী। পরদিন ষ্টারে ‘চন্দ্রগুপ্ত’ হয়েছে। সেখানকার চরিত্রলিপি ছিল এইরকম ঃ—চাণক্য-দানীবাবু, চন্দ্রগুপ্ত-দুর্গাদাস, কাত্যায়ন-নরেশ মিত্র, সেলুকাস-অহীন্দ্র চৌধুরী, আন্টিগোনস্-রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নন্দ-তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, মুরা-সুশীলা (বড়), ছায়া-আশ্চর্যময়ী এবং হেলেন-সরস্বতী। ১৭ জুলাই মনোমোহনে জনৈক অভিনয়-মুগ্ধ দর্শকের কাছ থেকে ‘সীতা’র ভূমিকাভিনেত্রী সুশীলাবালা সোনার রুদ্রাক্ষমালা উপহার পেলেন। জুলাই-এর শেষে ‘শঙ্করাচার্য’ অভিনীত হল। ষ্টার থেকে দানীবাবু এসে নামভূমিকায় অভিনয় ক’রে গেলেন। ২৪ আগস্টের নাটক ‘কর্ণার্জুন’। এই সময় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন ব’লে ‘শ্রীরাম-চন্দ্র’ প্রভৃতি নাটকে ওঁর ভূমিকায় তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নামানো হত। ৩১ আগস্ট মনোমোহনের অভিনয়সূচীতে ছিল কেবলমাত্র অপেরা থেকে নির্বাচিত দৃশ্য, সঙ্গীত এবং নৃত্যের পরিবেশন।

এই বছরের ১৪ সেপ্টেম্বর খোলা হল নতুন নাটক—মন্মথ রায়ের ‘চাঁদ সদাগর’। নামভূমিকায় ঃ—অহীন্দ্র চৌধুরী এবং অন্যান্য চরিত্রের রূপায়ণে সুশীলাবালা (বেহুলা), ইন্দু মুখোপাধ্যায় (লখিন্দর), নিভাননী (মনসা) প্রভৃতি অবতীর্ণ হলেন। নাটক-

খানি সেকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অভিনয়ে খুশী হয়ে 'নাচঘর' (২৩।৯।১৯২৭) লিখলে:— "... শ্রীমতী নিভাননী মনসার ভূমিকায় অভিনয় চমৎকার করেছেন। নেতার ভূমিকায় আশ্চর্য্যময়ীর অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। আস্তিকের ভূমিকায় সুকান্ত শ্রীমান জয়নারায়ণ সুন্দর অভিনয় করেছেন। জনৈকা 'নবীনা' অভিনেত্রীর 'তরুণী'র অভিনয়ও মন্দ হয়নি। কিন্তু সকলের চেয়ে ভাল লেগেছে আমাদের চাঁদ সদাগরের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর অনবদ্য অভিনয়। তাঁর রূপসজ্জাও যেমন সুন্দর হয়েছিল, তাঁর অভিনয়ও হয়েছিল তেমনি চমৎকার।..." বস্তুতঃ, এ-নাটকে অহীন্দ্র চৌধুরী অসাধারণ নাট্য-প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। 'চাঁদ সদাগরে'র ভূমিকায় অভিনয়, তাঁর পূর্বার্জিত সমস্ত খ্যাতিকে ম্লান ক'রে দিয়েছিল সন্দেহ নেই। তাঁর অনুপম অভিব্যক্তি, প্রতি দৃশ্যে চমকপ্রদ আবেগসৃষ্টির কৌশল এবং ব্যক্তিত্বমণ্ডিত বাচনভঙ্গিমা প্রকৃত শিল্পীজনোচিত নিষ্ঠার সঙ্গে একত্রিত হয়ে দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করতো। মনোমোহনের বর্তমান পর্যায়ে উৎসারিত তদীয় অননু-করণীয় অভিনয়ধারার বৈশিষ্ট্যটুকু ব্যক্ত হয়েছে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের পরবর্তীকালের রচনায়। অহীন্দ্র-প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণে তিনি লিখেছেন:— "... তিনি কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে অথবা আবৃত্তির গুণে প্রতিষ্ঠা করে নেন নি। কণ্ঠস্বর তাঁর কর্কশ নয়, আবৃত্তিও নিন্দনীয় নয়, কিন্তু তাঁর অভিনয়ে ও-দুটি বিষয় যেন গৌণ হয়ে যায়, মুখ্য হয়ে ওঠে চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে তার অনুপম কৌশল। নাটকের প্রতিটি মুহূর্তকে তিনি ইমোশন দিয়ে, আঙ্গিক অভিব্যক্তি দিয়ে, স্বরের ব্যঞ্জনা দিয়ে, দর্শকচিত্তে ঝড় তুলে দিতে পারেন। তাঁর নিজের মনে নাটকের চরিত্র যে-রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে, তাঁর মনের রংয়ের পরশ দিয়ে তাকে প্রজেক্ট করবার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ। যতক্ষণ তিনি মঞ্চে থাকেন, ততক্ষণ তিনি দুর্নিবার, চিত্ত তিনি জয় করে নেবেনই; হয় কণ্ঠ দিয়ে,

নয় দৃষ্টি দিয়ে, নয়ত বা বিশিষ্ট কোন ভঙ্গি দিয়ে; কিন্তু সব সময়েই গভীর আবেগের আবেদন দিয়ে। যুগপৎ সব কৌশল তিনি এক সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারেন। শুধু সহজাত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন না, তিনি অভিনয়কে ধ্যানের ও ধারণার বিষয় করে নিয়েছেন। তাই তাঁর ক্রম-বিবর্তন কখনো স্তব্ধ থাকে নি। যত বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন সংস্কৃতির, বিভিন্ন রসের, বিভিন্ন বয়সের ভূমিকা তিনি অভিনয় করেছেন, তাঁর সমসাময়িক আর কোন অভিনেতা তা করেন নি।…" (বাংলার নাটক ও নাট্যশালা) 'চাঁদ সদাগর' নাটকের অভিনয়ে ব্যক্তিগত সাফল্য সম্পর্কে অহীন্দ্রর নিজের উক্তি:—"…'চাঁদ সদাগর'-এর নাম হলো খুব, কাগজে কাগজে সুখ্যাতিও বেরুল প্রচুর।…মনে হলো এতদিন যাবৎ স্টারে কাজ করছি—সেই ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত। প্রশংসা, সহানুভূতি অনেক পেয়েছি, কিন্তু এ অভিনয় ও প্রযোজনায় যা পেলাম, তা হলো ঠিক প্রশংসা নয়—যাকে বলে শ্রদ্ধা। এরকমটি আর কখনও পাই নি। আর একটা কথা—নিজের ওপর এলো নির্ভরশীলতা। এই 'চাঁদ সদাগর' থেকেই আমার সত্তা এখানে সম্যক প্রতিষ্ঠিত হলো।" (নিজেরে হারায়ে খুঁজি—দ্বিতীয় পর্ব) নাটক দেখে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১৮।৯।১৯২৭) তাঁকে 'The Wizard Chowdhuri' আখ্যায় ভূষিত ক'রে প্রশস্তি গাইলে:—"The title role was entrusted to Mr. Ahindra Chowdhury and the whole credit of the evening went to him for his splendid representation of the character. Really this artist appeared in his brilliant form and no praise would be too high for him...." 'চাঁদ সদাগরে'র সর্বাঙ্গসুন্দর প্রযোজনা সম্পর্কে উপরোক্ত পত্রিকার উচ্ছ্বসিত অভিমত নীচের ভাষায় ব্যক্ত হল:—"Really no word of compliment can be too high for the management for their excellent

mounting of the play and the cheery entertainment given by the Company not only maintains its reputation but raises it to elysium heights of theatrical achievements." (২।১০।১৯২৭)

অবশ্য, প্রযোজনার ক্ষেত্রে এসময় অহীন্দ্র চৌধুরী আর নবাগত নন। ইতিপূর্বে ষ্টারে আর্ট থিয়েটারের একাধিক নাটকের প্রযোজক-রূপে তিনি নাট্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কিন্তু তাঁর সেইসব নাট্যকর্মের মধ্যে পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তা ও শিল্পপ্রতিভার পরিচয় মিললেও মনোমোহন মঞ্চে 'চাঁদ সদাগর'ই তাঁকে সর্বপ্রথম সফল প্রযোজকরূপে চিহ্নিত করে।[২] অহীন্দ্র-প্রযোজনার তৎকালীন বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত হয়েছে 'নাচঘর' পত্রিকার স্বল্প পরবর্তীকালের নিম্নোক্ত মন্তব্যে :— "প্রযোজনার সময়ে একটা বিশেষ দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ না রেখে অভিনয়কে সমগ্রভাবে সকল দিক দিয়ে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে শ্রীযুত অহীন্দ্র চৌধুরীর যে ঐকান্তিক প্রয়াস আমরা

---

২ প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার, অহীন্দ্র শুধু আর্ট থিয়েটারের অভিনেতাই ছিলেন না— ষ্টারে সম্প্রদায়ের জন্মলগ্ন থেকেই এখানকার প্রায় প্রতিটি নাটকের প্রযোজনা ও পরিচালনায় এই তরুণ এবং উদ্যমশীল না· কর্মীর সক্রিয় সহযোগিতা আর উদ্ভাবনী শক্তির স্বাক্ষর মিলতো। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত তাঁর 'বাংলার নাটক ও নাট্যশালা' গ্রন্থে লিখেছেন :—"অহীন্দ্রর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নূতনের প্রতি অনুরাগ, বিরাগ নয়।··· নূতনের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ আর্ট থিয়েটারে বার-বার প্রকাশ পেয়েছে। তখন পরিচালক বলে কারু নাম প্রচারের রেওয়াজ ছিল না। বড—অভিনেতৃরা মিলে-মিশে কাজ করতেন। কিন্তু কারু-কারু ঝোঁক থাকত নূতনকে স্থান দেবার। অহীন্দ্রর ছিল।······ সৌভাগ্যক্রমে অহীন্দ্র আর্ট থিয়েটারে প্র'বাধ গুহ মহাশয়ের প্রীতি পেয়েছিলেন।····· এই বোধচন্দ্রকে দিয়ে অহীন্দ্র আর্ট থিয়েটারে অনেক নূতনত্ব আমদানি করেন নাটকে, দৃশ্যপটে, পোশাক-পরিচ্ছদে, নাচে-গানে।"

লক্ষ্য করেছি তা রঙ্গমঞ্চকে উন্নতির পথে চালিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। দৃশ্যপট, সাজসজ্জা ও অভিনয়াদির একত্র সমাবেশে রঙ্গমঞ্চের সর্ব্বাঙ্গে যে সৌষ্ঠবশ্রী বিকশিত হয়ে ওঠে সারা নাট্যজগৎ তা উপলব্ধি করতে পেরেছে। অহীন্দ্র-প্রযোজনার ভিতরে সেই উপলব্ধির হয়ত প্রথম বিকাশ নয়—কিন্তু তাঁর অন্তরের একাগ্র ঐকান্তিকতার ফলে সেই একই অনুভূতি বিকাশে একটা স্বতন্ত্র, প্রাণবন্ত সত্ত্বার সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি কোন জিনিষকেই ছোট ক'রে দেখেন না, কিছুই বাদ দিতেও চান না। এই বিস্তরের মধ্যে তিনি একটা নিখুঁত রূপ আঁকবার চেষ্টা করেন। তাতে কলারসিক হয়ত সময়ে সময়ে ক্ষুণ্ণ হ'তে পারেন কিন্তু সাধারণে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর রূপসৃষ্টির পানে চেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে।"[৩] (১৯।১২।১৯৩০)

কেবলমাত্র অভিনেতা-প্রযোজক হিসাবে অহীন্দ্র চৌধুরীকেই নয়, নাট্যকাররূপে মন্মথ রায়কেও 'চাঁদ সদাগর' রাতারাতি বিখ্যাত ক'রে তোলে। মন্মথ রায়ের লেখা নাটক ইতিপূর্বে পাবলিক থিয়েটারে অভিনীত হলেও, প্রকৃতপক্ষে 'চাঁদ সদাগর' থেকে তাঁরও প্রতিষ্ঠার সুরু। অহীন্দ্র চৌধুরী ও মন্মথ রায়—এই দুই দিকপাল নাট্যরথীর জয়যাত্রার সূত্রপাত একই সময়ে, একই মঞ্চে আর একই নাটকের মাধ্যমে।

'চাঁদ সদাগরে'র নিয়মিত অভিনয়ের অবসরে ১৯২৭-এর অক্টোবরে শারদীয়া দুর্গাপূজার আকর্ষণ হিসাবে কর্তৃপক্ষ 'বঙ্গে বর্গী' নামালেন। জনপ্রিয় পুরানো নাটকের অভিনয়ে ভাস্কর সাজলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, মোহনলাল-তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গৌরী-আশ্চর্যময়ী। 'বঙ্গে বর্গী' বাংলা থিয়েটারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঞ্চসফল

৩ ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে মিনার্ভায় অভিনীত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেশের ডাক' নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে রচিত। নাটকটির প্রযোজক ও পরিচালক ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী।

নাটক, পাঁড়ে আমলের মনোমোহনে যা অভূতপূর্ব জনসমাদর লাভ করেছিল। এ-নাটকে ভাস্করের ভূমিকায় দানীবাবুর অতুলনীয় অভিনয় ইতিহাসে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। স্বল্প পরবর্তীকালে মিত্র থিয়েটারে তরুণ নট নির্মলেন্দু লাহিড়ীও এই চরিত্রের রূপায়ণে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু নবযুগের অগ্রণী রূপকার অহীন্দ্র চৌধুরীর 'ভাস্কর', পূর্ববর্তীদের প্রভাব অতিক্রম ক'রে মৌলিকতায় এমনই ভাস্বর ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠলো যে, রসজ্ঞ সমালোচকের স্বীকার না ক'রে উপায় রইলো না:— "His 'Bhaskar' was of a purely original type and at the same time highly effective and his make-up was decidedly an improvement on his predecessors in the role." (অমৃতবাজার পত্রিকা— ১৬।১০।১৯২৭) প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ-যোগ্য, রূপসজ্জায় তাঁর অবিসংবাদিত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এর পূর্বে ষ্টারে নব পর্যায়ে 'সাজাহানে'র আমলেই এবং সম্ভবতঃ এটা অত্যুক্তি হবে না, অভিনয়কর্মে রূপসজ্জার গুরুত্ব বাংলা থিয়েটারে তিনিই প্রথম সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের গবেষণাক্ষেত্রে তিনি যে কেবল অপ্রতিদ্বন্দ্বী তাই নয়, পথিকৃৎও বটে।[8]

এইভাবে পুরানো নাটকের অভিনয় চলতে থাকে। সেসময়

8 অভিনয়কুশলতার কথা বাদ দিলেও 'সাজাহান', 'চাঁদ সদাগর', 'চিরকুমার সভা', 'বেহুলা', 'ভোলা মাস্টার' প্রভৃতি বহু নাটকে তাঁর অভিনীত ভূমিকা কেবলমাত্র রূপসজ্জার গুণেই নাট্যামোদীদের স্মৃতিতে চিরজাগরূক হয়ে থাকবে। মিনার্ভায় 'বেহুলা' (১৯৩০) নাটকে অহীন্দ্র চৌধুরীর চন্দ্রধর চরিত্রের রূপায়ণ প্রসঙ্গে 'স্টেট্সম্যান' পত্রিকা মন্তব্য করেছিল :— " . He is second to none in India in the technique of make-up and has established his fame as the 'Indian LonChaney.' (দ্র. নিজেরে হারায়ে খুঁজি— ২য় পর্ব)

অহীন্দ্র চৌধুরীই ছিলেন কার্য্যতঃ মনোমোহনের প্রযোজক-পরিচালক। ওখানকার প্রধান অভিনেতাও ছিলেন তিনি। কিন্তু ষ্টার ও মনোমোহন একই কর্তৃত্বাধীন হওয়ায় তাঁকে এবং তাঁর সহশিল্পীদের উভয় থিয়েটারের অভিনয়ে (অনেক সময় একই দিনে) অংশগ্রহণ করতে হত। দুই মঞ্চে অভিনয়ের এই টানা-পোড়েনের ফলে নট-নটীরা স্বভাবতই অবসন্ন বোধ করতেন এবং সে কারণে তাঁদের এবং পরিচালকের পক্ষে সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে মনোমোহনের নাট্যপ্রযোজনায় নিজেদের লিপ্ত রাখা দিন দিন অসম্ভব হয়ে উঠছিল। ফলে, মনোমোহন থিয়েটারের তৎকালীন প্রযোজনার মান প্রার্থিত পর্যায়ে পৌঁছায় নি। দুরবস্থা দেখে কোনো কোনো পত্র-পত্রিকা এসময় মন্তব্য করেছে, আর্ট থিয়েটারের পক্ষে এখন আর একসঙ্গে দু'টি রঙ্গালয় চালানো উচিত নয়। এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে বড়দিনের আকর্ষণ হিসাবে ২৩ ডিসেম্বর, ১৯২৭ মনোমোহনে খোলা হল পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় রচিত 'আরবী হুর' নামে এক গীতিনাট্য। আর্ট থিয়েটারের পতাকাতলে মনোমোহন মঞ্চে নতুন নাটকের এই শেষ উদ্বোধন। 'আরবী হুর' ভিক্টর হুগোর বিখ্যাত নাটকের অনুসরণে লেখা। এ-নাটকের রূপায়ণে মনোমোহন নিন্দা ও খ্যাতি দুই-ই কুড়িয়েছিল। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'নাচঘর' লিখলে :— "··· 'মনোমোহন থিয়েটারে' গেল বুধবারে 'আরবী-হুর' বা 'ভিক্টর হুগো বধ' মহানাটক দেখে এসেছি। হুগোর "The King's Amusement" নামক পৃথিবী বিখ্যাত নাটকখানি অবলম্বন ক'রে "আরবী হুর" রচিত। কিন্তু একে অপটু হাতের কাঁচা ভাষা, তায় হুগোর ভাষার অনুবাদ বা অনুসরণও করা হয় নি। ফলে দাঁড়িয়েছে এই, এমন একখানি শ্রেষ্ঠ নাটকের ভাবের ধারাও মনকে মোটেই স্পর্শ করে না, মনের উপর দিয়ে কেবল ভেসে চলে যায় ধোঁয়ার মত, কুস্বপনের মত। ··· দৃশ্যপটের সুখ্যাতি করছি। নাচে নূতনত্ব জাহির করবার চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু প্রায় প্রত্যেক

নাচই একই রকম ভঙ্গি চালানোর জন্যে নাচও যারপরনাই একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ "আরবী হুরের" প্রয়োগ-নৈপুণ্যের সুখ্যাতি করেছেন। স্থানে স্থানে আমরাও প্রশংসা করতে পারি। … মুসার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় ভালো হ'লে কি হবে, নাটকের দোষে তাঁর সমস্ত চেষ্টাই বারবার ব্যর্থ হয়ে গেছে। … আমিনার ভূমিকায় শ্রীমতী সুশীলার অভিনয় ও গান ভাল লাগলো। আর কারুর অভিনয়ই উল্লেখযোগ্য নয়। মোট কথা, "আরবী হুর" দেখতে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, দুর্লভ মানব-জীবনের মূল্যবান কয়েকটি ঘণ্টা নষ্ট করা। তবে, বাঙালী যে বেরসিক ও বোকা নয়, "আরবী হুরে" শোচনীয় দর্শকাভাব দেখে সেটা বেশ ভাল ক'রেই বুঝতে পারলুম।" (১৩।১।১৯২৮) 'নাচঘরে'র নিন্দার পাশাপাশি নাটক ও অভিনয়ের সুখ্যাতিমূলক সমালোচনাও ছাপা হয়েছিল অন্য কাগজে। যেমন, ১৫ জানুয়ারি, ১৯২৮ তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লিখেছে ঃ— "Messrs Art Theatres Limited may be congratulated upon their presenting a nice play in 'Arbi Hur' at the Monomohon Theatre. The play is a success both as to its artistry and popular appeal and it may bea any too close inspection as a play. It is full of strange novelties and the funniest of them all is that it does not publicly acknowledge anybody as its author. Whoever might have written it, the play is well written and deserves to speed on to a very prosperous carreer. ...." ডিসেম্বরের শেষে পরপর কয়েকরাত্রি অভিনীত হল পুরানো নাটক বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় 'গোবিন্দলাল' আর সুশীলা-বালা 'ভ্রমর'। সেই সঙ্গে 'দুর্গেশনন্দিনী'। শেষের নাটকে

'ওসমান' সেজেছেন তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়। এইভাবে ১৯২৭ বিদায় নিল।

১৯২৮-এর গোড়ায় কর্তৃপক্ষ নাটকাভিনয় বন্ধ ক'রে মঞ্চে বায়স্কোপ দেখানো সুরু করলেন। ২৭ জানুয়ারি, ১৯২৮ 'নাচঘর' জানালে :—"... মনোমোহন থিয়েটারে'র জন্যে তাঁদের 'আর্টে'র চর্চ্চা ও খরচা এখন কিছুকালের জন্যে বন্ধ থাকবে। সেই অবসরে 'মনোমোহনে'র মঁাচায় 'ইষ্টার্ন ফিল্ম সিণ্ডিকেট' চলচ্চিত্রে 'দেবদাস'কে প্রকাশ করবেন (১লা ফেব্রুয়ারী থেকে)।" এই ফাঁকে বাছাই করা নট-নটী নিয়ে সম্প্রদায় বেরিয়ে পড়লো বাইরে অভিনয় করতে। তারপর কিছুকাল মঞ্চে থিয়েটার ও বায়স্কোপ একই সঙ্গে চলতে রইলো। তবে 'জয়দেব', 'লুলিয়া', 'লয়লা-মজনু' জাতীয় সেসব নাটকের অভিনয়ে মনোমোহনের আগের জলুস আর নেই। অহীন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ বড় বড় শিল্পীরা তখন মনোমোহন ছেড়ে কেবলমাত্র ষ্টারেই নিযুক্ত আছেন।[৫] সুশীলাসুন্দরী আর্ট থিয়েটার পরিত্যাগ ক'রে যোগ দিয়েছেন নাট্যমন্দিরে। অবস্থা দেখে 'নাচঘর' মন্তব্য করলে :—"মনোমোহন থিয়েটার যে-ভাবে 'চলছে', তা দেখলে তার 'সচলতা' সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। মেকী টাকাও সময়ে সময়ে বাজারে 'চলে' মনোমোহন থিয়েটারও 'চলছে'!" (৬।৪।১৯২৮)

এসব সমালোচনার জন্য হোক অথবা অন্য কোনো কারণেই হোক, শেষ চেষ্টা হিসাবে এপ্রিলে আর্ট থিয়েটার মনোমোহন মঞ্চে তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, নরেশচন্দ্র মিত্র, ক্ষেত্রমোহন মিত্র প্রমুখ নামজাদা সব অভিনেতা-অভিনেত্রী এনে পূর্ণ উদ্যমে পুরানো নাটকের অভিনয় সুরু করলেন। ২১ এপ্রিল মঞ্চস্থ হল— 'বিষবৃক্ষ'।

---

৫ অহীন্দ্র চৌধুরী মনোমোহন ছাড়েন ১৯২৮-এর গোড়ার দিকে। স্মৃতিচারণে তিনি লিখেছেন :— "আটাশ সালের প্রথম পর্বই হলো পাকাপাকি-ভাবে আমার স্টারে থাকা। মনোমোহন থেকে 'আরবী হুর' স্টারে চলে এলো।" (নিজেরে হারায়ে খুঁজি— ২য় পর্ব)

তারাসুন্দরী-সূর্যমুখী আর ছোট সুশীলা-কুন্দনন্দিনী। এইভাবে মে মাসের গোড়ায় 'প্রফুল্ল'তে তিনকড়ি চক্রবর্তী, নরেশ মিত্র আর তারাসুন্দরী যথাক্রমে যোগেশ, কাঙালীচরণ এবং উমাসুন্দরীরূপে দর্শকদের দেখা দিয়েছেন। ২ জুন নামলো 'শ্রীরামচন্দ্র' ও 'মগের মুলুক' এক সঙ্গে। অহীন্দ্র চৌধুরী ষ্টারে চলে যাওয়ায় প্রথম নাটকে ওঁর দ্বৈতভূমিকা তিনকড়ি চক্রবর্তী (দশরথ) ও দুর্গাপ্রসন্ন বসুর (রাবণ) মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হল। দ্বিতীয় নাটকে তিনকড়ি চক্রবর্তী নিলেন তাঁর পুরানো ভূমিকা 'শাহ সুজা'। ঐ রাত্রেই ষ্টারে 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় ছিল। মনোমোহনে 'দশরথ' ক'রে ষ্টারে গিয়ে তিনকড়ি চক্রবর্তী 'অক্ষয়' সেজেছেন একই রাতে। কিন্তু নামী-দামী নট-নটী এনেও শেষ পর্যন্ত আর্ট থিয়েটার মনোমোহন মঞ্চে সুবিধা করতে পারলে না। সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন নানারকম বিরোধ-বিসংবাদ দেখা দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রবোধচন্দ্র গুহই মনোমোহন দেখাশুনা করছিলেন। মফস্বলে দল পরিচালনার দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। মফস্বলপ্রদর্শনীর হিসাবনিকাশ নিয়ে এই সময় প্রবোধ গুহের সঙ্গে পরিচালকমণ্ডলীর এমনই সংঘাত বেঁধে উঠলো যে, সেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যে দু'টি রঙ্গালয় পরিচালনা সম্ভব নয় বুঝে আর্ট থিয়েটার কর্তৃপক্ষ ১৯২৮-এর জুন মাসে মনোমোহন মঞ্চ ছেড়ে দিলেন।[৬] তিনকড়ি চক্রবর্তী,

৬ এই সময় হ'তেই আর্ট থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রবোধচন্দ্র গুহের সঙ্গে সম্প্রদায়ের অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিরোধের সূচনা হয় এবং পরিণামে প্রবোধচন্দ্র আর্ট থিয়েটার ছেড়ে স্বয়ং মনোমোহন লিজ নেন। প্রসঙ্গতঃ, অহীন্দ্র চৌধুরী জানিয়েছেন :— "এদিকে আবার ডিরেক্টরদের সঙ্গে প্রবোধবাবুর মতবিরোধ হতে লাগলো। ঢাকা-সফরে টিকিট বিক্রয় হয়েছে বেশ, খরচও হয়েছে তেমনি আন্দাজে। কিন্তু লাভের ঘর একেবারে শূন্য কেন ?··· এই হলো প্রবোধবাবুর স্টার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার সূত্রপাত।···" (নিজেরে হারায়ে খুঁজি—২য় পর্ব)

নরেশচন্দ্র মিত্র, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, কুসুমকুমারী, নীরদাসুন্দরী প্রভৃতিকে নিয়ে জুন মাসের শেষের দিকে গড়া 'গ্র্যাণ্ড মনোমোহন থিয়েটার' বাইরে বাইরে অভিনয় ক'রে বেড়াতে লাগলো। বিডন স্ট্রীট থেকে সরে গিয়ে আর্ট থিয়েটার কেবলমাত্র মূল ঘাঁটি হাতিবাগানেই তাঁদের শক্তি সুসংহত করলেন—মনোমোহনের দরজা রইলো বন্ধ !

পরিশিষ্ট

ক. অভিনয়-তালিকা

শ্রীরামচন্দ্র	অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১।৭।১৯২৭
সাজাহান	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	১৩।৭।১৯২৭
শঙ্করাচার্য	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	জুলাই-এর শেষে
কর্ণার্জুন	অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৪।৮।১৯২৭
নির্বাচিত দৃশ্য,		
সঙ্গীত এবং নৃত্য	—	৩১।৮।১৯২৭
(কেবলমাত্র অপেরা থেকে)		
চাঁদ সদাগর	মন্মথ রায়	১৪।৯।১৯২৭
বঙ্গে বর্গী	নিশিকান্ত বসুরায়	অক্টোবর, ১৯২৭
আরবী হুর	পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়	২৩।১২।১৯২৭
কৃষ্ণকান্তের উইল	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ডিসেম্বরের শেষে
দুর্গেশনন্দিনী	”	”
বিষবৃক্ষ	”	২১।৪।১৯২৮
প্রফুল্ল	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	মে-র প্রথমার্দ্ধে
শ্রীরামচন্দ্র	অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২।৬।১৯২৮
মগের মুলুক	”	”

খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায়

অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, দুর্গাপ্রসন্ন বসু, তুলসী চক্রবর্তী, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, মৃণালকান্তি ঘোষ, দানীবাবু, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র মিত্র, ক্ষেত্রমোহন মি', তিনকড়ি চক্রবর্তী, সুশীলাবালা (ছোট), সুশীলাসুন্দরী, আশ্চর্যময়ী, নিভাননী, তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী প্রভৃতি।

মনোমোহন থিয়েটার
(১৯২৮-১৯২৯)

আর্ট থিয়েটার বিদায় নেওয়ার পর ১৯২৮-এর আগস্টে মনোমোহন লিজ নিলেন অনাদি বসু।[১] উনি ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের পথিকৃৎ প্রতিষ্ঠান অরোরা ফিল্মের কর্ণধার। পাঁড়ে আমলের মনোমোহনের শেষ পর্যায়ে অনাদি বসু মঞ্চাভিনয়ের অবসরে বায়স্কোপ দেখাতেন। মনোমোহন থিয়েটারের বিজ্‌নেস ম্যানেজার চারুচন্দ্র বসু ছিলেন ওঁর বন্ধু। সেই সূত্রে এই রঙ্গালয়ের সঙ্গে ওঁর ঘনিষ্ঠতা আগে থেকেই গড়ে উঠেছিল।

কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে প্রথমেই শক্তিশালী শিল্পীগোষ্ঠী গড়ায় উদ্যোগী হলেন অনাদি বসু। মনোমোহনের প্রাক্তন প্রধান শিল্পী ও অর্দ্ধাংশের মালিক দানীবাবুকে মিনার্ভা থেকে এনে পরিচালক করা হল। ওঁর সহকারী হিসাবে রইলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী। মঞ্চসজ্জার ভার নিলেন শিল্পী চারুচন্দ্র রায়। সঙ্গীত এবং নৃত্যপরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হল যথাক্রমে দেবকণ্ঠ বাগচী এবং জিতেন্দ্রনাথ ঘোষের উপর। শিল্পী সম্প্রদায়ে যোগ দিলেন দানীবাবু, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, গণেশচন্দ্র গোস্বামী, হীরালাল ভট্টাচার্য,

১ অনাদি বসু প্রবোধচন্দ্র গুহের সঙ্গে যুক্তভাবে লিজ নিয়েছিলেন মনে হয়। অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে একটি পুরানো বিজ্ঞপ্তি উদ্ধৃত করেছেন যাতে, লেখা আছে :—"In 1928 Monomohan Theatre was leased to Babus Anadi Bose of the Aurora Film and Probodh Ch. Guha who re-opened Monomohan Theatre with Mirabai on 11th. Aug., 1928." উদ্ধৃতিটির উৎস সম্পর্কে লেখক অবশ্য কিছু জানান নি।

জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দে, প্রকাশমণি, রানীসুন্দরী, আশালতা, সুবাসিনী প্রমুখ নট-নটীরা। সাড়ম্বরে ১৯২৮, ১১ আগস্ট বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'মীরাবাই' নাটক দিয়ে নব পর্যায়ে মনোমোহনের শুভ উদ্বোধন হল। সে রাত্রের ভূমিকালিপি ছিল এইরকম:—রাণা কুম্ভসিংহ-নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ভানুসিংহ-জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শেখর-সত্যেন্দ্রনাথ দে, গোবিন্দসিংহ-হীরালাল ভট্টাচার্য, মীরাবাই-সুবাসিনী ও লালবাই-আশালতা। যদিও 'ফরোয়ার্ড' (১৭।৮।১৯২৮) লিখেছিল:—"...It was a great success from start to finish...." এবং নামভূমিকায় সুবাসিনীর সঙ্গীতনৈপুণ্যে সমজদার দর্শকরা প্রীত হয়েছিলেন তবুও 'মীরাবাই' চলে নি। থিয়েটার ব্যবসায় নেমে প্রথম পদক্ষেপেই আঘাত পেলেন অনাদি বসু।

গতিক মন্দ দেখে সেপ্টেম্বর থেকে কর্তৃপক্ষ নতুন নাটকের সঙ্গে 'সরলা', 'জয়দেব', 'দক্ষযজ্ঞ', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'প্রফুল্ল' প্রভৃতির পুনরভিনয়ের আয়োজন করলেন। এই সব অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'নাচঘর' লিখলে:—"...দারার মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রদানের দৃশ্যে তাঁর অভিনয় আজও পর্য্যন্ত অননুকরণীয়।..."[২] ('সাজাহান' নাটকে দানীবাবুর ঔরংজীব সম্পর্কে) "...বেশে, দৃষ্টি[illegible], অঙ্গভঙ্গীতে,

২ মনোমোহনের অব্যবহিত পূর্বে ষ্টারে আর্ট থিয়েটারের 'সাজাহান' অভিনয়ে ঔরংজীবের ভূমিকায় দানীবাবুর অনবদ্য নাট্যনৈপুণ্যে 'শিশির' পত্রিকা অনুরূপ মন্তব্য করেছিল। পত্রিকাখানি লিখেছিল:—"...একমাত্র দানীবাবুই আজ পর্যন্ত এই উৎকট চরিত্রের অভিনয় করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। দারার মৃত্যুদণ্ডাদেশ স্বাক্ষর করা ও আদেশপত্র জিহনকে দেওয়ার দৃশ্যে যে অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়াছি, তাহার তুলনা হয় না।..." (১৫।১১।১৯২৪)

৩০ অক্টোবর, ১৯২৪ ষ্টারে 'সাজাহান' নাটকের এই নব পর্যায়ের অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নামভূমিকায় নবাগত অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরীর দক্ষতায় দর্শকরা মুগ্ধ হন।

কণ্ঠস্বরে জ্ঞানী-উন্মাদ, ব্যাধিগ্রস্ত, নিষ্ফল আক্রোশে আত্মহারা, ব্যথিত-হৃদয় সাজাহানের যে মর্ম্মদাহী ছবি তিনি চোখের সামনে ধরেছিলেন তা চোখে জল আনে, হৃদয়কে উচ্ছ্বসিত করে।…” (নির্মলেন্দু প্রসঙ্গে) “…“মীরাবাই”-য়ের রাণা কুম্ভের ভূমিকায় নির্ম্মলেন্দুবাবুর অভিনয় আমরা দেখি নি, কিন্তু উক্ত ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ঘোষের অভিনয় যতটা দেখলুম, মন্দ লাগলো না। “প্রফুল্লে” সুরেশের ভূমিকাতেও মণীন্দ্রবাবুর অভিনয় ভালো লাগলো। একজন তরুণ অভিনেতাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গোস্বামী।…‘দক্ষযজ্ঞে’র নন্দীর ভূমিকায় আর একটি নূতন অভিনেতার—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নৈপুণ্য দর্শকদের প্রশংসা অর্জ্জন করেছে।…” “মনোমোহন রঙ্গালয়েও আর এক তরুণী অভিনেত্রীর দেখা পাওয়া গেছে—শ্রীমতী সরযু। “প্রফুল্ল” ও “দক্ষযজ্ঞ” নাটকে যথাক্রমে প্রফুল্ল ও সতীর ভূমিকায় তাঁর সহজ, অনায়াস ও সুমধুর অভিনয় দেখে বুঝেছি যে, চর্চ্চা না ছাড়লে রঙ্গালয়ের ইতিহাসে ইনি নিজের নাম লিখে যেতে পারবেন।…” (৫।১০, ১৬।১১ ও ২৩।১১।১৯২৮)

এই বছরেরই ১৫ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হল নতুন নাটক—নিশিকান্ত বসুরায়ের ‘পথের শেষে’। অতি নাটকীয়তা দোষে দুষ্ট হলেও, করুণ রসাত্মক এই নাটকে নট-নটীদের অভিনয়শক্তি প্রদর্শনের অবকাশ ছিল প্রচুর আর তাঁরা পূর্ণমাত্রায় সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। প্রৌঢ় দানীবাবুর পরিণত নাট্যপ্রতিভা নাটকটির মাধ্যমে অসামান্যরূপে ফুটে ওঠে। ভাবালুতায় আচ্ছন্ন অকিঞ্চিৎকর নাটক ‘পথের শেষে’ বিশেষভাবে দানীবাবুর অভিনয়নৈপুণ্যেই সেকালে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়। প্রসঙ্গতঃ, অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন :— “এতে ‘দুর্গাশঙ্কর’-এর ভূমিকায় দানীবাবু অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন। বয়সের সঙ্গে যেমন মানিয়েছিল তেমনি একাত্ম করে নিয়েছিলেন নিজেকে ভূমিকাটির সঙ্গে। অদ্ভুত সাবলীল

অভিনয় করেছিলেন এই ভূমিকায়। বস্তুত এই অভিনয় থেকেই দানীবাবুর নাম আবার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এক-কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, বৃদ্ধবয়সে উনি যেন আবার দপ্ করে জ্বলে উঠলেন। আর অভিনয় করেছিলেন 'শুভদা'র ভূমিকায় প্রকাশমণি—অপূর্ব। মণি ঘোষের 'যোগেশ' ও সত্যেন দে-র 'অনাদি' চমৎকার, নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও সরযুবালাও মোটামুটি ভালোই অভিনয় করেছিলেন।"······ (নিজেরে হারায়ে খুঁজি— দ্বিতীয় পর্ব)

ব্যক্তিগত অভিনয়কুশলতায় নাটক জমলেও মনোমোহনের এই সময়কার প্রয়োগপদ্ধতি কিন্তু খুব উচ্চাঙ্গের ছিল না। 'নাচঘরে'র নীচের মন্তব্যে তার উল্লেখ রয়েছে। পত্রিকাখানি 'পথের শেষে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশ করেছিল ঃ—"···মনোমোহন থিয়েটারে কোন বিশেষ প্রয়োগকর্ত্তা আছেন কিনা জানি না। থাকলে, তাঁকে একটি কথা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। ব্যক্তিগত-ভাবে আপন আপন ভঙ্গিতে এখানকার অনেকেই সু-অভিনয় করেন, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে কেউ সঙ্গতি রক্ষার চেষ্টা প্রায়ই করেন না। প্রয়োগকর্ত্তার আসল কাজ হচ্ছে এইখানে—সমস্ত অভিনয়কে বিশেষ বিশেষ নাটকে তিনি, বিশেষ বিশেষ সুরে বেঁধে দেন। 'হার্ম্মনি' না থাকলে সমগ্রতার শ্রী ফোটে না এবং অভিনয় সকল দিক দিয়ে অখণ্ড বা পরিপূর্ণও হয়ে ওঠে না।···" (১১।১।১৯২৯) প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার, মনোমোহনের তদানীন্তন পরিচালক দানীবাবুর অভিনেতা হিসাবে যে পরিমাণ জনপ্রিয়তা ছিল, নির্দেশকরূপে তিনি কোনোদিনই সেই অনুপাতে কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন না। অভিনয়কর্মে তাঁর 'অশিক্ষিত পটুত্ব' সমালোচক ও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করতো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রায়-নিরক্ষর এই অসাধারণ প্রতিভাবান নট স্বাভাবিক সঙ্কোচবশতঃ প্রায়শঃই পরিচালনার মত জটিল ব্যাপার থেকে দূরে থাকতেন। শিল্পী-

জীবনের শেষ পর্যায়ে দানীবাবু যখন ষ্টারে (আর্ট থিয়েটারে) যোগ দেন, তাঁকে 'নাট্যাচার্য'রূপে বরণ করা হলেও নাট্যপরিচালনায় তিনি হস্তক্ষেপ করতেন না, যদিও এ-দায়িত্ব ছিল তাঁরই।[৩]

১৯২৯ সালের এপ্রিলে বিশ্বনাথ ভাদুড়ী মনোমোহনে যোগ দিলেন। ৩০ এপ্রিল বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'কর্মবীর' অভিনয়ের পর অনাদি বসু এমন এক নাটকের প্রযোজনায় উদ্যোগী হলেন অভিনবত্বের কারণে যা বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে।

১৯২৩-এ বাংলা থিয়েটারে নতুন যুগের সূচনা হয় পৌরাণিক নাটক 'কর্ণার্জুনে'র মাধ্যমে।[৪] নাট্যকার অপরেশচন্দ্র ছিলেন গিরিশ-ধারানুসারী। অভিনয় ও মঞ্চ-আঙ্গিকের বিবর্তন ঘটলেও নাটক রচনার ক্ষেত্রে কিন্তু তখনও পুরাতনের অনুবৃত্তি চলেছে। নাট্যরচনায় গিরিশোত্তর যুগে যিনি প্রথম বিপ্লব আনেন তিনি মন্মথ রায়। দীর্ঘায়ত পঞ্চাঙ্ক নাটকের প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে তিনি বাংলাভাষায় একাঙ্কিকার প্রবর্তন করেন।[৫] তাঁর লেখা প্রথম একাঙ্ক

---

৩ দ্র. নিজেরে হারায়ে খুঁজি (প্রথম পর্ব)—অহীন্দ্র চৌধুরী।

৪ কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করবার, 'কর্ণার্জুন' ও 'সীতা'—যে দু'টি নাটক দিয়ে বাংলা থিয়েটারের যুগপরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, তারা উভয়েই পৌরাণিক এবং অপরেশচন্দ্রের মত 'সীতা'-রচয়িতা যোগেশ চৌধুরীর উপরও গিরিশচন্দ্রের প্রভাব কম নয়। এই প্রসঙ্গে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত লিখেছেন :—"ক্ষীরোদপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তীকালের লেখক হলেও যোগেশচন্দ্রের উপর গিরিশের প্রভাব বড় কম ছিল না।" (বাংলার নাটক ও নাট্যশালা)

৫ "বাংলা নাটকেও আধুনিক ধরণের একাঙ্কিকা রচিত হয়েছে বর্তমান শতকের তৃতীয় পাদের গোড়ার দিকেই। বাঙলা সাহিত্যে এই বিশেষ রূপাদর্শের প্রবর্তন করেছেন খ্যাতনামা নাট্যকার মন্মথ রায়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'মুক্তির ডাক' একাঙ্কিকাই এযুগের সর্বপ্রথম একাঙ্কিকা।..." (সমীপেষু/শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬৬—রথীন্দ্রনাথ রায়)

নাটক 'মুক্তির ডাক' মঞ্চস্থ করেছিল সেই আর্ট থিয়েটার বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়ে নতুন যুগের প্রবর্তনায় যাঁদের কৃতিত্ব স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯২৩-এর বড়দিনে ষ্টারে প্রথম অভিনীত 'মুক্তির ডাক' কেবলমাত্র আকার-আঙ্গিকে নয়, বিষয়বস্তু ও সংলাপের দিক থেকেও গতানুগতিকতা ভঙ্গ করেছিল। বৌদ্ধযুগের পট-ভূমিকায় রচিত এ-নাটকের প্রশংসায় প্রমথ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ নাট্যবোদ্ধারা সেদিন পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। তবু, 'মুক্তির ডাক' চলে নি। কারণ, তখনও সাধারণ দর্শকের (অন্ততঃ নাটকের ক্ষেত্রে) সংস্কারবিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠার দেরী ছিল। তারপর কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে মঞ্চ-নাটক নিয়ে কেউ আর উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন নি, এমনকি মন্মথ রায়ও তখন এ-ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী নন। 'মুক্তির ডাকে'র করুণ পরিণতি বোধহয় তাঁদের সবাইকে হতোদ্যম করেছিল। উপরোক্ত ঘটনার দীর্ঘ ছ'বছর পরে বাংলা থিয়েটারে আর এক দুঃসাহসী পুরুষের আবির্ভাব ঘটে, পেশায় যিনি ছিলেন সাংবাদিক। এই তরুণ নাট্যকারের নাম শচীন সেনগুপ্ত। শিল্পীবন্ধুদের অনুরোধে নাট্যরচনায় ব্রতী হয়ে নতুন যুগের চাহিদায় নতুন কিছু করার মানসে ইনি 'রক্তকমল' নামে এক ˙ টক লিখলেন যা, আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তু উভয় ক্ষেত্রেই বৈশিষ্ট্যের দাবী নিয়ে এল। আর, এই 'রক্তকমল' মঞ্চস্থ করলেন অনাদি বসু মনোমোহন মঞ্চে ১৯২৯ সালের ১ জুন তারিখে।

'রক্তকমল' মাত্র সওয়া দু'ঘণ্টার নাটক। 'মুক্তির ডাকে'র আগে বা পরে প্রহসন বা নক্সাজাতীয় রচনা ছাড়া সত্যিকারের হ্রস্বাকারে কোনো পূর্ণাঙ্গ নাটক রচিত এবং অভিনীত হয় নি। সেদিক থেকে এ-নাটক ছিল প্রচলিত ধারার ব্‌ তিক্রম। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে 'রক্তকমল'কে যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক বলতে দ্বিধা নেই। পতিতার মানবতাকে উপজীব্য ক'রে 'পুরুষের

বেলা লীলা-খেলা, পাপ লিখেছ নারীর বেলা' জাতীয় দুঃসাহসিক বক্তব্য রেখেছিলেন নাট্যকার তাঁর প্রথম নাট্যসৃষ্টির মাধ্যমে। কেবল তাই নয়, গঠন-কৌশল এবং উপস্থাপনাতেও এ-নাটক প্রশংসনীয় অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও 'মুক্তির ডাকে'র মতই ব্যর্থতা বরণ করতে হল 'রক্তকমল'কে। নাটক চললো না। অনাদি বসু ক্ষতিগ্রস্ত হলেন।

প্রসঙ্গতঃ, নাট্যকার স্বয়ং তাঁর প্রথম নাট্যরচনার ইতিবৃত্ত, স্বরূপ ও পরিণতি সম্পর্কে লিখেছেন:—"·· নাটকখানি সাপ্তাহিকের পাতা থেকে সংগ্রহ করে রবীন্দ্রমোহন রায় অনাদিবাবুকে দেখান। তিনি ওখানি অভিনয়ের আগ্রহ প্রকাশ করেন। মাত্র পাঁচটি দৃশ্যের নাটক, পাঁচটিই সেট। তারপর আবার একই সঙ্গে তিনটি ঘরে অভিনয় চলছে। কি করে অভিনয় করা যাবে? রিভলভিং ষ্টেজ তখন ছিল না, ওয়াগন ষ্টেজও কল্পনায় আসে নি। কর্ণার্জুনের দীর্ঘ-বিরতির কথা স্মরণ করে প্রতি দৃশ্যের পর যবনিকা ফেলা আমার কাছে ভীতির বিষয় হয়ে উঠেছিল। ঠিক করলাম প্রতি দৃশ্য অভিনীত হবার পর পরবর্তী দৃশ্যের মুড্ নিয়ে একটি গান দিলে সেট্ সাজাবার সময় পাওয়া যায়। সে-গান নাটকেব কোন চরিত্র গাইবে না, গাইবে একটি কল্পিত নারী, নিয়তিরই মতো, অথচ নিয়তি নয়। তার কাজ হবে অনেকটা সূত্রধরের মতো। নাটকের ইউনিটি ওই করে বজায় রাখা যাবে এবং একটানা সওয়া দুই ঘণ্টা অভিনয় করে নাটক শেষ করা যাবে। নজরুলকে বললাম গান বেঁধে দিতে হবে। নজরুল ওই নাটকের জন্য সাতখানা গান লিখে দিলেন; চারখানা গাইবে প্রতি-দৃশ্যের শেষে কল্পিত চরিত্রটি, আর তিনখানা গাইবে নাটকের দুটি চরিত্র। নজরুল নিয়ে এলেন সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী ইন্দুবালাকে, কল্পিত চরিত্রটির গান গাইবার জন্য। ইন্দুবালার সেই চারখানি গান রক্তকমলের বড় আকর্ষণ হয়ে উঠল। রক্তকমলে অভিনয় করেছিলেন নির্মলেন্দু, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, গণেশ গোস্বামী,

শেফালিকা, সরযুবালা। নাটকে অতিরিক্ত আর একটি পরিচারিকা ছিল। শেফালিকা দু'খানি, আর সরযুবালা একখানি গান গাইতেন। রক্তকমলের এই সাতখানি নজরুল-গীতিই খুবই জনপ্রিয় হয়। নূতন দর্শকরা একটা নূতন কিছু পেয়ে খুসিই হলেন, কিন্তু পুরাতন দর্শকরা গান পেয়েও তেমন খুসি হলেন না। তাঁদের দুটি আপত্তি; প্রথমত বিষয়বস্তু, দ্বিতীয়ত সওয়া দুই ঘণ্টার বই। বিষয়বস্তুতে পতিতার মানবত্তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। বার্ণাড শ' যে-ভাবে মিসেস ওয়ারেন্‌স্ প্রোফেশন লিখে সমাজ-ব্যবস্থার গলদ দেখিয়েছিলেন, সে-ভাব নিয়ে ও-নাটক আমি লিখি নি। পুরুষের বেলা লীলা-খেলা পাপ লিখেছ নারীর বেলা, এইরকম একটা প্রতিবাদ নিয়ে নাটকখানা লিখেছিলাম কাব্য করে এবং কাব্য করেই মানবতার কথা বড় করে তুলেছিলাম।...আপত্তির দ্বিতীয় কারণ নাটকের আয়তন। মাত্র সওয়া দুই ঘণ্টার নাটক তখনকার দর্শকদেরকে পরিতৃপ্ত করত না। পাঁচ ঘণ্টা না হলে আবার নাটক কি? মাত্র কয়েকটি রাত একক অভিনীত হবার পর ওর সঙ্গে আর একখানি নাটক জুড়ে দেবার কথা হোলো। কিন্তু তাতেও বিপত্তি ঘটল এই যে, দানীবাবু তখন ওই থিয়েটারে কাজ করছেন। রক্তকমলে তাঁর কোন ভূমিকা ছিল না। নাটক জুড়ে দিলেও দানীবাবুকে দ্বিতীয় নাটকে নামতে বলা যায় না। তাই রক্তকমলকেই নেজুড় করা হোলো। যাঁদের নূতন ধরনের নাটক দেখবার আগ্রহ জন্মেছিল, তাঁরা তাই দেখবার আগে একখানা পূর্ণাঙ্গ পুরাতন নাটক দেখবার দুর্ভোগ ভুগতে রাজী ছিলেন না।... রক্তকমল শুকিয়েই গেল। হয়ত অমনিও যেত। কিন্তু তারও পরখ হোলো না।..." (বাংলার নাটক ও নাট্যশালা)

বর্তমান বৎসরের ২৭ জুন খোলা হল জলধর চট্টোপাধ্যায় রচিত 'প্রাণের দাবী'। অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বেঙ্গলী' লিখলে :—
"The opening performance of Sri Jaladhar Chatta-

padhyya's social drama "Praner Dabi" at the Monomohon Theatre on Thursday last (June 27) was throughly attractive from all standpoints. The management deserves the thanks of the theatre-going public for having taken so much pains to make the play a conspicuous success. Sri Nirmalendu Lahiri in the role of Keshab gave a splendid show. While Robi Roy in the role of Keshab's brother. Monindra Ghose in the role of servant and Miss Saraju Bala in the role of "Achola" were also quite remarkable. We hope that the theatre-loving public will not fail the next opportunity of witnessing the play." (২৯।৬।১৯২৯)

১৯২৯-এর অক্টোবরে বিশ্বনাথ ভাদুড়ী এবং রবীন্দ্রমোহন রায় মনোমোহন ছেড়ে নাট্যমন্দিরে যোগ দিলেন এবং এই সময়েই (২৫।১০।১৯২৯) মনোমোহন থিয়েটারে সুধীন্দ্র রাহার 'সমুদ্রগুপ্ত' অভিনীত হল। অভিনয় দেখে 'নাচঘর' জানালে :—"···নাটকখানি পুরাতন আদর্শে রচিত এবং নাট্যকার নবীন হলেও, লেখায় রসের ও নূতন চরিত্র-সৃষ্টি-চেষ্টার অভাব নেই।··· ··'সমুদ্রগুপ্তে'র ভূমিকা যতটুকু ফোটা দরকার, নির্ম্মলেন্দু তা ফুটিয়ে তুলে নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এ ভূমিকায় আর কোন অভিনেতা এর চেয়ে ভালো অভিনয় করতে পারেন ব'লে মনে হয় না।······ অভিনয়ের দিক দিয়ে 'সমুদ্রগুপ্তে'র সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ভূমিকা পেয়ে শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গোস্বামী নিজেকে অনায়াসেই ভাগ্যবান ব'লে মনে করতে পারেন। এবং উক্ত ভূমিকায় তিনি যে যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন, তাও পরম উপভোগ্য। তাঁর আবৃত্তি ও ভাব-ভঙ্গি যথার্থই উচ্চ শ্রেণীর উপযোগী হয়েছে।······শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঘরাজ' অঙ্গসজ্জার কৌশলে হয়েছে ভয়াবহরূপে সুন্দর। দেখলেই বুক ছাঁত ক'রে ওঠে। এবং অভিনয়েও তিনি ভূমিকার ভীষণ ও বীভৎস ভাব ঠিক মত জাগিয়ে তুলে বাহাদুরি দেখিয়েছেন। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র ঘোষের 'অমরক' ভূমিকায় বিশেষ কিছু দেখাবার নেই—চলনসৈ ভূমিকা, চলনসৈ অভিনয়। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র সরকারের 'রঘুবর' সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়—যদিও ঐ ভূমিকায় দেখাবার জিনিষ আছে। শ্রীযুক্ত হীরালাল দত্ত (অনন্ত সেন) ও শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র 'লো-কমিক' অভিনয়ে বিশেষ নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শক্তিপদ ভৌমিক, শ্রীযুক্ত কালিপদ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত বিজয়কার্ত্তিক দাসের অভিনয় চলন-সৈয়ের কোঠায় পড়তে পারে। অভিনেত্রীদের ভিতরে সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন 'মনোমোহনে'র উদীয়মানা তারকা শ্রীমতী সরযুবালা, মণিয়ার ভূমিকায়। এঁর দরদভরা অভিনয় ও ভাবমধুর কণ্ঠস্বর আমাদের মনকে মুগ্ধ করেছে। শ্রীমতী ঊষাবতীর 'দত্তা'ও মন্দ হয় নি। কালনাগিনীর ভূমিকায় শ্রীমতী আঙ্গুরবালা মূক অভিনয়ে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'সর্প-নৃত্যে'ও তিনি এমন চমৎকার নেচেছেন যে, মুক্তকণ্ঠে সুখ্যাতি না ক'রে থাকা যায় না।" (৮। ১।১৯২৯)

এই 'সমুদ্রগুপ্ত' অভিনয়ের পরেই অনাদি বসু মনোমোহনের কর্ত্তৃত্বভার ত্যাগ করেন। যাঁদের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে বাংলা দেশে চলচ্চিত্র শিল্পের জন্ম অনাদি বসু ছিলেন তাঁদেরই একজন। চলচ্চিত্র ব্যবসায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখলেও, নাট্যজগতে এসে উনি দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি। আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষার অক্ষমতা তাঁর পতনের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভাগ্যদেবীও অনাদি বসুর সঙ্গে ছলনা করেছিলেন। প্রথম নাটক 'মীরাবাই'য়ের অসাফল্য তাঁকে সুরুতেই হতোদ্যম করেছিল আর সেই হতাশা চরমে পৌঁছায় 'রক্তকমলে'র নিদারুণ ব্যর্থতাতে। 'পথের শেষে' ছাড়া প্রায় প্রতিটি

নাটকের প্রযোজনাতে তিনি আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হন। লোকসানের মাত্রা যখন তিরিশ হাজারের কাছাকাছি, তখন তিনি লিজ হস্তান্তরের প্রয়াস পেলেন। প্রার্থী মিলতে দেরী হল না। আর্ট থিয়েটারের প্রাক্তন কর্মকর্তা প্রবোধচন্দ্র গুহ (উদ্যোগপর্বে যিনি ছিলেন অনাদি বসুর প্রধান সহায়ক এবং অংশীদার (?)) সাগ্রহে এগিয়ে এলেন এককভাবে মনোমোহন থিয়েটারের দায়িত্ব নিতে। 'নাচঘর' (৬।১২।১৯২৯) জানালে ঃ—"ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টে'র গর্ভে নিঃশেষে নির্ব্বাণ লাভ করবার আগে 'মনোমোহনে'র নড়্‌বড়ে দেয়ালগুলো আর একবার—খুব সম্ভব এই শেষবারের জন্যে-হাত বদলালো। গুজব, অতঃপর তার কর্ণধারণ করবেন 'ষ্টারে'র স্বনাম-ধন্য ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ। তাঁর হাতে 'মনোমোহনে'র রূপ কতটা বদ্‌লায়, সেইটেই দ্রষ্টব্য।......"

হাতিবাগান থেকে বিডন স্ট্রীটে এলেন প্রবোধ গুহ। বাংলা থিয়েটারে নবযুগের হোতা নতুন ষ্টার ছেড়ে পুরানো 'ষ্টারে' আশ্রয় নিলেন। নির্বাপিত হওয়ার আগে মনোমোহন শেষবারের মত প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো—বড় বিচিত্র বর্ণদ্যুতিময় সে পূত অগ্নিশিখা!

পরিশিষ্ট

ক. অভিনয়-তালিকা

মীরাবাই	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	১১।৮।১৯২৮
পথের শেষে	নিশিকান্ত বসুরায়	১৫।১২।১৯২৮
কর্মবীর	বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত	৩০।৪।১৯২৯
রক্তকমল	শচীন সেনগুপ্ত	১।৬।১৯২৯
প্রাণের দাবী	জলধর চট্টোপাধ্যায়	২৭।৬।১৯২৯
সমুদ্রগুপ্ত	সুধীন্দ্র রাহা	২৫।১০।১৯২৯

খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায়

দানীবাবু, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, গণেশচন্দ্র গোস্বামী, হীরালাল ভট্টাচার্য, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দে, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, রবীন্দ্রমোহন রায়, ব্রজেন্দ্র সরকার, হীরালাল দত্ত, কুমারকৃষ্ণ মিত্র, নীলমাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাচরণ ভট্টাচার্য, শক্তিপদ ভৌমিক, কালীপদ গুপ্ত, বিজয়কাতিক দাস, প্রকাশমণি, রানীসুন্দরী, আশালতা, সুবাসিনী, সরযুবালা, ইন্দুবালা, শেফালিকা, উষাবতী ও আঙ্গুরবালা।

৬৮ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা

মনোমোহন থিয়েটার

(১৯২৯-১৯৩১)

১৯২৯-এর ডিসেম্বরে প্রবোধ গুহের হাতে অনাদি বসু মনোমোহনের কর্তৃত্ব তুলে দিলেন। প্রবোধচন্দ্র গুহ ছিলেন আর্ট থিয়েটারের অন্যতম উদ্যোক্তা এবং কর্মকর্তা। অপরেশচন্দ্র ও প্রবোধ গুহ মিলে আর্ট থিয়েটারের মাধ্যমে বাংলা থিয়েটারে নবযুগের সূচনা করেছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটায় প্রবোধচন্দ্র সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের পত্তন করলেন।

নতুন ব্যবস্থাপনায় মনোমোহনের আগের আমলের শিল্পীরা প্রায় সবাই রয়ে গেলেন। নতুনের মধ্যে কেবল দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে আনা হল। পূর্বের মত ম্যানেজার ও তাঁর সহকারী হিসাবে রইলেন দানীবাবু এবং নির্মলেন্দু লাহিড়ী। একক দায়িত্বভার হাতে নিয়ে প্রবোধ গুহ পরপর দু'খানি নাটক—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাহাঙ্গীর' (২৫।১২।১৯২৯) এবং মন্মথ রায়ের 'মহুয়া' (৩১।১২।১৯২৯) খুললেন। নাটক হিসাবে দু'খানিই সুলিখিত, নট-নটীরা সকলেই কৃতী এবং প্রবোধচন্দ্রও প্রযোজনার ব্যাপারে পরিশ্রম ও অর্থের কার্পণ্য করেন নি। ফলে, 'জাহাঙ্গীর' এবং 'মহুয়া'—বিশেষভাবে শেষেরটি প্রচুর জনসমাদর পেল। প্রথম নাটকের সমালোচনায় 'নাচঘর' (১০।১।১৯৩০) লিখলে:—"…জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে সাজাহানের বিদ্রোহ, পিতা ও পুত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নূরজাহানের চক্রান্ত এবং পরিশেষে মৃত্যুন্মুখ পিতার সঙ্গে অনুতপ্ত পুত্রের মিলন, এই হ'ল নাটকের মূলকথা। বৃদ্ধ জাহাঙ্গীরের ভূমিকায় দানীবাবুকে

মানিয়েছিল বেশ চমৎকার। দানীবাবু হচ্ছেন পুরাতন দলের সর্ব্বশেষ নট—যাঁর একদা-বিপুল প্রতিভার মন্ত্রশক্তি আজও প্রেক্ষাগারকে শূন্য রাখে না। এবং জাহাঙ্গীরের ভূমিকায় একাধিক স্থলে তিনি প্রমাণিত করেছেন যে, বার্দ্ধক্য তাঁর প্রতিভার আগুনকে আজও ভস্ম-ভূষণে আবৃত করতে পারে নি।...সমুজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর 'সাজাহান'। ভারতের ভাবী সম্রাটোচিত তেজ, গর্ব্ব, বীরত্ব ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়েছি তাঁর অভিনয়ের সর্ব্বত্রই।...যশোবন্ত সিংহের ক্ষুদ্র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।... শারিয়ার ও পারভেজের ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীযুক্ত বঙ্কিম দত্তের ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় ভালো লাগলো। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদের 'আসফ খাঁ'ও মন্দ নয়। পুরুষের ভূমিকায় যে-কয়টি নারী অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের ভিতরে সবচেয়ে ভালো অভিনয় করেছিলেন শ্রীমতী ইন্দু ('হুসিয়ার')। তাঁর গানগুলিও এই অভিনয়ের অন্যতম উপভোগ্য ব্যাপার। গম্ভীর, জোরালো ও ভাবাভিরাম কণ্ঠস্বরের জন্যে শ্রীমতী ইন্দু এখনকার বাংলা রঙ্গালয়ে অদ্বিতীয়তার দাবী করতে পারেন। শ্রীমতী আঙ্গুরবালার 'আওরঙ্গজেব'ও বেশ। নূরজ ানের ভূমিকা পেয়েছেন শ্রীমতী শশিমুখী।...পুরাতন ভঙ্গী হিসাবে তাঁর অভিনয় নিন্দনীয় নয়—একেলে ভঙ্গীর সঙ্গে যদিও তা খাপ খায় না।... লয়লীর ভূমিকায় শ্রীমতী সরযূর কাছ থেকে আমরা আশানুরূপ আনন্দ লাভ করেছি। তাঁর গান ও অভিনয় দুই-ই আমাদের ভালো লেগেছে।..."

মন্মথ রায় বিরচিত 'মহুয়া'রও খুব প্রশংসা করলে 'নাচঘর'। লিখলে ঃ— "...'মহুয়া' পাঠ ক'রে ামরা বড় খুসী হয়েছি। এই নাটকখানিকে আধুনিক নাট্যসাহিত্যের অন্যতম রত্ন বলতেও আমাদের আপত্তি নেই। মন্মথবাবুর লেখনী অক্ষয় হোক্।...হুম্‌ড়ো

সর্দ্দারের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী তাঁর বহুমুখী শক্তির আর একটি বিচিত্রতার বিকাশ দেখিয়েছেন।…শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নদেরচাঁদ'ও তাঁর পূর্ব্বখ্যাতিকে কিছুমাত্র ম্লান করে নি। তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর সাধারণ দর্শকের কর্ণকে যে পরিতৃপ্ত করে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। যদিও এ-রকম কণ্ঠস্বর প্রেমিক ও কোমলপ্রাণ নদেরচাঁদের ভূমিকার পক্ষে ঠিক উপযোগী নয়, তবু এরি মধ্যে তিনি বারংবার পেলব মাধুর্য্যের সৃষ্টি করতে অক্ষম হ'ন নি—এইতেই তাঁর ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়। দুর্গাদাসকে পেয়ে 'মনোমোহন' সব দিক দিয়ে লাভবান হবেন।… শ্রীমতী সরযূবালার 'মহুয়া' যে কত সুন্দর হয়েছে, সকলকেই তা দেখতে অনুরোধ করি। এই নবীনা নটীর শক্তি আমাদের বিস্মিত করেছে।…তবে নাচে ও গানে তাঁকে আরো উন্নত হ'তে হবে—এই দুই বিভাগে এখনো তিনি নিন্দনীয় না হ'লেও চলনসৈ।…পালঙ্কের ভূমিকায় শ্রীমতী ফুল্লনলিনীর অভিনয় আমাদের মনের মত হ'লে খুসী হতাম।…'মহুয়া'র নাচগুলির জন্যে আমরা 'মনোমোহনে'র নৃত্যশিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বিশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি। তাঁর পরিকল্পিত নৃত্যগুলির ভিতরে এমন নূতনত্ব ও মাধুর্য্য আছে, বাংলা রঙ্গালয়ে যা দুর্লভ। শ্রীমান নজরুল ইসলাম স্বরচিত গানগুলিতে যে-সব সুর দিয়েছেন, বাংলা রঙ্গালয়ের পেশাদার সঙ্গীত-শিক্ষকদের তা লজ্জা দিতে পারে।…" (১০।১।১৯৩০)

ফাল্গুন, ১৩৩৬ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯৩০) নাগাদ রাধিকানন্দ, নিভাননী ও সুশীলাসুন্দরী মনোমোহনে যোগ দিলেন। এই সময় 'অলীকবাবু' (৮।৩), 'রাজসিংহ' (৪।৫), 'গৃহলক্ষ্মী' (১০।৫) প্রভৃতি অভিনয়ের পর ১৭ মে, ১৯৩০ রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়' মঞ্চস্থ হল। এ-নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন রাধিকানন্দ (ফকির), দুর্গাদাস (মাখন), নিভাননী (আদ্যাশক্তি), আশালতা (মহাকালী) এবং মনোমোহনে সদ্য আগতা

নীহারবালা[১] (হৈমবতী)। ২৪ মে 'সীতারাম' নাটকের নাম-ভূমিকায় নির্মলেন্দু, শ্রী ও জয়ন্তীবেশে যথাক্রমে সুশীলাসুন্দরী এবং নীহারবালা দর্শকদের অভিবাদন করলেন। 'মুক্তির উপায়' খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। বিশেষভাবে, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় এ-নাটকে প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

সন ১৯৩০। সারা দেশে তখন আইন অমান্য আন্দোলন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। বিদেশী শাসকের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে আসমুদ্রহিমাচল কম্পমান। মাতৃভূমির সেই ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে জাতীয়তাবাদী মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিকায় প্রবোধ গুহের এক যুগান্তকারী নাট্যপ্রযোজনা সমগ্র জাতিকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুললো। মনোমোহনে মারাঠাবীর শিবাজীর জীবনী অবলম্বনে রচিত শচীন সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা'র অভিনয় বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। নাট্যকারের নিপুণ রচনাসৌকুমার্যে, শিল্পী-গোষ্ঠীর ঐকান্তিক অভিনয়প্রচেষ্টায় এবং প্রযোজকের নির্ভিক সংগঠনীশক্তির গুণে এ-নাটক তদানীন্তনকালে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। 'গৈরিক পতাকা'র উদ্বোধনের তারিখ—২৮ জুন, ১৯৩০। অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে সাংবাদিকশ্রেষ্ঠ সত্যে··নাথ মজুমদার 'বঙ্গবাণী'র পৃষ্ঠায় লিখলেন ঃ—"···মনোমোহন রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ, এই স্বদেশিকতার পূণ্য আদর্শে অনুপ্রাণিত নাটকখানি অভিনয়ার্থ গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান জাতীয় ভাবধারা বহনে রঙ্গমঞ্চের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন করিয়া নাট্যামোদীদের প্রশংসাভাজন হইলেন সন্দেহ নাই।··· অভিনয়ের দিক দিয়াও নাটকখানি আশ্চর্য্যরূপে সাফল্যলাভ করিয়াছে। প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী জাতীয়তার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যেন প্রাণের দরদ দিয়া অভিনয় করিয়াছেন। প্রথম

১ ১৯৩০ সালের মে মাসে নীহারবালা মিনার্ভা থেকে মনোমোহনে আসেন।

হইতে শেষ পর্য্যন্ত দর্শকমণ্ডলীর উত্তেজনাপূর্ণ করতালি ও সাধুবাদে বহুবার প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হইয়াছিল। 'শিবাজী'র ভূমিকায় প্রিয়দর্শন ও প্রথিত-যশা নট নির্ম্মলেন্দুবাবুর অনাড়ম্বর অভিনয় অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।...তানাজীর ভূমিকার অভিনয় প্রথম রজনীতে তেমন প্রাণস্পর্শী হয় নাই, আরো ভাল হওয়া দরকার। ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় বিখ্যাত অভিনেতা রাধিকাবাবু কৃতিত্বের সহিতই অভিনয় করিয়াছেন।...'জীজাবাই'-এর ভূমিকায় প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী সুশীলা-সুন্দরী অবতীর্ণা হইয়াছিলেন—স্নেহে, বীর্য্যে, দৃঢ়তায় পরম সুন্দর মাতৃমূর্ত্তিতে তাঁহার যশঃ তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। প্রত্যাখ্যাতা প্রণয়-বঞ্চিতা অথচ অভিজাতের গরিমায় আত্মস্থা, ভাগ্যবিড়ম্বিতা, প্রতিহিংসাপরায়ণা 'বীরাবাই'-এর জটিল-চরিত্রে, নীহারবালার অভিনয় অতি মনোহর হইয়াছিল।...'শ্যামলী'র ভূমিকায় সরযুবালার অভিনয় বেশ চটুল ও হৃদয়গ্রাহী। সঙ্গীত ও নৃত্যাদিও আধুনিক রুচি অনুযায়ী সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। 'গৈরিক পতাকা'র অভিনয়ের জন্য স্থান ও কালানুযায়ী নূতন দৃশ্যপটগুলিও স্বাভাবিক ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। বিশেষভাবে কামান দাগিয়া দুর্গ ধ্বংস ও আলোকসম্পাতে নেপথ্যের যুদ্ধ প্রদর্শন অভিনয় উল্লেখযোগ্য। রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে, মনোমোহনের 'গৈরিক পতাকা' অন্যতম জনপ্রিয় নাটকরূপে গৌরব ও সাফল্য অর্জ্জন করিবে সন্দেহ নাই।" (৫।৭।১৯৩০) ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়েছিল। পরবর্তীকালে 'গৈরিক পতাকা' অসংখ্য রজনী অভিনীত হয়ে জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ তারিখে মনোমোহন থিয়েটার এ-নাটকের পঞ্চাশৎ অভিনয়োৎসবের আয়োজন করে। একই নাটকের সপ্তাহে চারদিন অভিনয়ের প্রথম গৌরব বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে 'গৈরিক পতাকার'ই প্রাপ্য। 'গৈরিক পতাকা'র প্রচারভঙ্গিমায় যথেষ্ট অভিনবত্ব ছিল। বিজ্ঞাপনে লেখা হত:— "...চিত্তে যাঁহারা উত্তেজনার নৃত্যনূপুরের চিক্কণ

শুনিতে চান, রক্তে যাঁহারা উন্মাদনার বন্যাপ্রবাহ বহাইতে চান, চক্ষে যাঁহারা অগ্নির শ্মশান-জাগানো তাণ্ডব দেখিতে চান, তাঁহারা এই 'গৈরিক পতাকা'র মূলে আসিয়া সমবেত হউন।...” (নাচঘর—৪।৭।১৯৩০)

দেশাত্মবোধের মর্মবাণী সংবলিত ঐতিহাসিক নাটক 'গৈরিক পতাকা'র অভাবনীয় সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রবোধচন্দ্র এই বছরের ২৪ ডিসেম্বর উপস্থাপিত করলেন আর এক অগ্নিগর্ভ মঞ্চকথা —'কারাগার'। এ-নাটকের রচয়িতা মন্মথ রায় তখন বাংলা থিয়েটারের দর্শকদের কাছে একটি পরিচিত এবং প্রিয় নাম। ইতিমধ্যে, এই মনোমোহনে 'চাঁদ সদাগর' (১৯২৭) ও 'মহুয়া'র (১৯২৯) সাফল্য তাঁকে প্রতিভাবান স্রষ্টার স্বীকৃতি দিয়েছে। বিষয়বস্তু ছাড়া 'কারাগার' নাটকের রচনাশৈলীতেও নাট্যকার যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রচলিত পৌরাণিক নাটকের তুলনায় এর ভাষা ও ভঙ্গীকে অধিকতর কাব্যসুষমামণ্ডিত, ব্যঞ্জনাময় এবং ভাবদ্যোতক ব'লে অভিহিত করতে সমকালীন সমালোচক দ্বিধা করেন নি। আর, সেযুগের দর্শকের রায়ে 'কারাগার' নাটকের সবচেয়ে বড় সম্পদ—তার অন্তর্নিহিত দেশপ্রেম। পৌরাণিক নাট্যসৃষ্টির মাধ্যমে নাট্যকার মন্মথ রায় পরাধীন জা[illegible] র অন্তরবেদনা এমন সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন এবং আধ্যাত্মিকতার প্রচ্ছন্ন আবরণে 'কারাগারে'র সংলাপ ও চরিত্রসৃষ্টি এমনই হৃদয়গ্রাহী আর প্রাণবন্ত হয়েছিল যে, প্রবল পরাক্রান্ত বিদেশী শাসকেরও প্রমাদ না গুণে উপায় ছিল না। নাটকখানির জনমানসে প্রভাব বিস্তারকারী অপরিমেয় শক্তিতে ভীত, ত্রস্ত ইংরেজ সরকার অচিরাৎ অভিনয়-বন্ধের নিষেধাজ্ঞা জারী করতে বাধ্য হয়েছিল। অকৃত্রিম স্বদেশ-হিতৈষণায় 'ছত্রপতি শিবাজী', 'সিরাজ দৌলা', 'মীরকাসিম' প্রভৃতির যোগ্য উত্তরসাধক হিসাবে 'কারাগার' বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে।

ইতিমধ্যে ৫ নভেম্বর মনোমোহনে 'মেঘনাথ' (গোষ্ঠবিহারী দে) নামে এক সামাজিক নাটকের অভিনয় হয়ে গেছে। এর বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ভূমেন রায়, সন্তোষ দাস, মণীন্দ্র ঘোষ, নিভাননী প্রভৃতি। পরবর্তী নাটক 'কারাগারে'র ভূমিকালিপি ছিল এইরকম ঃ—-বসুদেব-দানীবাবু, কংস-নির্মলেন্দু, কঙ্কন-ভূমেন রায়, বিদুরথ-সন্তোষ দাস, নরক-মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, কঙ্কা-সরযুবালা, দেবকী-সুশীলাসুন্দরী এবং মদিরা-শেফালিকা। অভিনয় প্রসঙ্গে চারিদিকে জয়-জয়কার। 'নায়ক' লিখলে ঃ—"···এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সময়োপযোগী অভিনয় নাট্যামোদীদের অদৃষ্টে কদাচিৎ মিলিয়া থাকে। দর্শকের আসনগুলির একখানাও শূন্য ছিল না। মহিলাদের আসনগুলিও পূর্ণমাত্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে দর্শকগণের মধ্য হইতে করতালি এবং প্রশংসার উচ্চধ্বনিতে রসভঙ্গ হইতেছিল, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সত্য সত্যই ওরূপ স্থলে বিস্ময়ের বহির্বিকাশ একেবারে সংযমিত করিয়া রাখাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।···" (৩১।১২।১৯৩০) 'নাচঘর' (২।১।১৯৩১) বললে ঃ—"···'কারাগার' কেবল নাটকের দিক দিয়েই অপূর্ব্ব হয় নি—অভিনয়ে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, দৃশ্যপটে, পোষাক-পরিচ্ছদে এবং প্রযোজনায় 'মনোমোহনে'র 'কারাগার' হয়েছে রঙ্গালয়ের বিশেষ একটি সৃষ্টি, বিশিষ্ট একটা সম্পদ। কেবল বড়দিনের উৎসবকেই নয়, রঙ্গালয়ের জীবন-উৎসবকেই 'কারাগার' দিয়েছে একটা শ্রী, যার সাধনাই হচ্ছে রঙ্গালয়ের সত্যিকারের সাধনা। 'কারাগারে'র নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের লেখায় যে কেবল জোরই আছে, তা নয়। তাতে আছে বর্ণের বিচিত্র সমাবেশ। আর তা আছে বলেই তাঁর লেখা মানুষের মনকে যেমন নাড়া দিতে পারে, তেম্নি পারে তার চোখের সামনে পরিপূর্ণ একটা রূপকে জীবন্ত করে ফলিয়ে ধরতে। অবশ্য এর সঙ্গে সূক্ষ্ম রসবোধ, মার্জ্জিত রুচি, উচ্চ আদর্শবোধ এবং কবির মন যে রয়েছে—তা বলাই বাহুল্য।

কেননা ওসবাকার সুষ্ঠু সমাবেশ না হলে নাটক সফল হয় না।” ‘নবশক্তি’র মতে ঃ—“…Conventionকে অতিক্রম করে যে শিল্পী নিজের সৃষ্টিতে প্রাণ দিতে পারেন তিনি যথার্থ শক্তিমান। ‘কারাগারে’র অনেক যায়গাতেই তাঁর, নাট্যকারের এই শক্তির পরিচয় পেয়েছি।” (২।১।১৯৩১)

কিন্তু পত্র-পত্রিকার প্রশংসা, শিল্পরসিকের স্বীকৃতি, জনতার অজস্র অভিনন্দন কোনো কিছুই ‘কারাগার’কে দীর্ঘায়ু করতে পারলো না—অভিনয়সংখ্যা বিশের কোঠায় পৌঁছানোর পূর্বেই ইংরেজ সরকারের নিষেধাজ্ঞায় নাটকের প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে গেল। সেই সনাতন অজুহাত, শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির অভিযোগ! ১৯৩১ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি এক ফরমানে ঘোষণা করা হল ঃ—

The Government of Bengal

Political Department

Political Branch

No. 1695 P.

Calcutta, the 4th February, 1931

Whereas it appears to the Governor- -Council that the play entitled ‘Karagar’ by Manmatha Ray, M. A, printed by him at the Sree-Gouranga Press at No. 71/1, Mirzapur Street, Calcutta, and published at Barada Bhaban, Balurghat (Dinajpur) which has been performed at Monomohon Theatre, Calcutta, is likely to excite feelings of disaffection towards the Government established L law in British India. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Dramatic Performances Act,

1876 (XII of 1876), The Governor-in-Council hereby prohibits the performance of the said play in any public place.

By order of the Governor-in-Council

Sd/- R. N. Reid

Offg. Chief Secretary to the Government of Bengal

বিদেশী শাসকের এই স্বেচ্ছাচারী আচরণ কিন্তু সেদিন দেশবাসী নির্বিচারে মেনে নেয় নি, নাট্যশালার কণ্ঠরোধে এবং স্বাধীন শিল্প-সৃষ্টির প্রতিবন্ধকতায় চারিদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, যেমন উঠেছিল ১৮৭৬ সালে কুখ্যাত 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' প্রণয়নের সময়। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' (৯।২।১৯৩১) লিখলে :—"···এই হতভাগ্য পরশাসিত দেশে সবই সম্ভবপর। 'কারাগার' একখানি পৌরাণিক নাটক, দ্বাপরের অত্যাচারী মথুরার রাজা 'কংসে'র কাহিনী অবলম্বন করিয়া লিখিত। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তারা ইহার অভিনয়ে এমন কি আপত্তির কারণ দেখিতে পাইলেন ?—অথবা দ্বাপর যুগের 'কারাগারে'র সঙ্গে এই কলিযুগের 'কারাগারে'র সাদৃশ্য অনুভব করিয়াই কি তাঁহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন ?" 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মতে :—"···If germs of sedition can be discovered in this book then we believe very little in the ancient epics and Puranas of the Hindus can be considered safe by the authorities.···Is it then the belief of the censoring authorities in Bengal that loyalty can be endangered in the mind of a people in this twentieth century by excluding from it all that is great and noble ?" (১১।২।১৯৩১) 'বঙ্গবাণী' (৭।৩।১৯৩১) বললে :—"···১৮ রজনী অভিনয়ের পর হঠাৎ বাঙ্গলা সরকার এক ফতোয়াবলে অভিনয় বন্ধ করিয়া দিয়া একদিকে

যেমন থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষতি করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি নাট্যকলার উপর অযথা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। অবিলম্বে ইহার প্রতিকার হওয়া কর্ত্তব্য।”

আঠারো রাত্রি অভিনয়ের পর মনোমোহনে 'কারাগার' বন্ধ হয়ে গেল। শেষ অভিনয়ের তারিখ—১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১। আর ঠিক এই সময়েই রঙ্গালয়গৃহের বিলুপ্তিলগ্ন সমাগত হওয়ায় প্রবোধচন্দ্র গুহ মনোমোহন মঞ্চ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নবগঠিত সড়ক চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউয়ের প্রসারের উদ্দেশ্যে থিয়েটার বাড়ী ভেঙ্গে ফেলার জন্য অনেক দিন থেকেই তোড়জোড় চলছিল। নানা কারণে, সেই পরিকল্পনা এতকাল কার্যকরী হয় নি—এই সময়েই তা রূপায়িত হয়। 'গৈরিক পতাকা'র বিজয় অভিযান তখন অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এমত অবস্থায় প্রবোধচন্দ্র মনোমোহন ছেড়ে রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটে নিজের তৈরী 'নাট্যনিকেতন' মঞ্চে চলে এলেন। মনোমোহন থিয়েটারের শেষ অভিনয় ১ মার্চ, ১৯৩১ অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন 'গৈরিক পতাকা' মঞ্চস্থ হয়েছিল। পরবর্তীকালে 'গৈরিক পতাকা' নাট্যনিকেতনেও অনেক দিন চলেছে। প্রবোধ গুহ এখানে 'কারাগার'ও পুনরায় মঞ্চস্থ করেছিলেন

“মনোমোহন থিয়েটারের দরজা বন্ধ হ'ল। গেল রবিবারের “গৈরিক পতাকা”র অভিনয়ই ওখানকার শেষ অভিনয়। “গৈরিক পতাকা” আর পাঁচ রাত্রের অভিনয়ের পরেই শত রজনীর সাফল্য-

২ প্রসঙ্গতঃ, নাট্যকার মন্মথ রায় গ্রন্থকারকে এক পত্রে লিখেছেন:—”…মনোমোহন থিয়েটারে কারাগারের অভিনয় নিষিদ্ধ হবার পর, পরে, প্রবোধ গুহমহাশয় নাট্যনিকেতন খুলে, তদানীন্তন সরকারের মতে আপত্তিকর অংশগুলি বাদ দিয়ে কারাগার নাটকের পুনরভিনয়ের অনুমতি অর্জন করেন। আমি তখন কলিকাতা নিবাসী ছিলাম না। গ্রন্থকার হিসাবে আপত্তি করার সুযোগ পাই নি।”

গৌরব অর্জ্জন করবে—মনোমোহন থিয়েটারের পক্ষে যা অপূর্ব্ব গর্ব্বের বিষয় হ'ত। কিন্তু "মনোমোহনে"র ভাগ্যে সে গৌরবলাভের সুযোগ আর ঘ'টে উঠল না।…" (নাচঘর—৬।৩।১৯৩১)

মনোমোহন থিয়েটারের বিলুপ্তি ঘটলো। পথের দাবীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল অর্দ্ধ শতাব্দীর ঐতিহ্যমণ্ডিত রঙ্গালয়গৃহ—সেই সঙ্গে পরিসমাপ্তি হল বাংলা থিয়েটারের এক গৌরবময় অধ্যায়ের। ১৮৮৩ সালে মাড়ওয়ারী ধনী গুর্মুখ রায় নটী বিনোদিনীর প্রণয়ে মুগ্ধ হয়ে ৬৮ নম্বর বিডন স্ট্রীটে 'ষ্টার' নামে যে নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন, কালক্রমে তা এমারেল্ড (১৮৮৭), ক্লাসিক (১৮৯৭), কোহিনূর (১৯০৭) এবং মনোমোহন থিয়েটারে (১৯১৫) রূপান্তরিত হয়। মনোমোহনের নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তি ঘটে ১৯৩১ সালে। ১৮৮৩ থেকে ১৯৩১—এই দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দী কালে এখানে গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, দানীবাবু, সুকুমারী দত্ত (গোলাপ), বিনোদিনী, তিনকড়ি, তারাসুন্দরী প্রমুখ বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম যুগের প্রথিতযশা নট-নটী থেকে সুরু ক'রে পরবর্তীকালের শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নীহারবালা, প্রভা, সরযুবালা, নিভাননী প্রভৃতি কৃতী শিল্পীবৃন্দ মঞ্চাবতরণ করেছেন। এই পাদপীঠেই দানীবাবুর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরানো যুগের অবসান এবং শিশিরকুমার তথা 'সীতা' নাটকের মাধ্যমে বাংলা থিয়েটারে নবযুগের সূচনা হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, বিজয় গোস্বামী, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ দেশবরেণ্য কত মনীষী যে এই রঙ্গালয়ে বিভিন্ন সময়ে পদার্পণ করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। স্বাধীন শিল্পসৃষ্টির অধিকারহরণের উদ্দেশ্যে বিদেশী শাসক বারংবার

স্থানা দিয়েছে এই নাট্যপীঠে। বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ নট-নটী, মঞ্চকুশলী, সঙ্গীতশিল্পী, নাট্যকার, প্রযোজকের শিল্পপ্রতিভার বিকাশ ঘটেছে এই নাটমঞ্চের মাধ্যমে। রঙ্গালয় বিলুপ্ত হলেও ইতিহাসের বুক থেকে এই কলাতীর্থের স্মৃতি কোনোদিনই মুছে যাবে না।

পরিশিষ্ট

ক. অভিনয়-তালিকা

জাহাঙ্গীর	মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫।১২।১৯২৯
মহুয়া	মন্মথ রায়	৩১।১২।১৯২৯
অলীকবাবু	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮।৩।১৯৩০
রাজসিংহ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪।৫।১৯৩০
গৃহলক্ষ্মী	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১০।৫।১৯৩০
মুক্তির উপায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭।৫।১৯৩০
সীতারাম	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৪।৫।১৯৩০
গৈরিক পতাকা	শচীন সেনগুপ্ত	২৮।৬।১৯৩০
মেঘনাথ	গোষ্ঠবিহারী দে	৫।১১।১৯৩০
কারাগার	মন্মথ রায়	২৪।১২।১৯৩০

খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায়

দানীবাবু, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ভূমেন রায়, সন্তোষ দাস, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, শশিমুখী, সরযুবালা, ফুল্লনলিনী, নিভাননী, সুশীলাসুন্দরী, আশালতা, নীহারবালা, শেফালিকা প্রভৃতি।

গ. সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

৬৮ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা

প্রথম অভিনয়—২১ জুলাই, ১৮৮৩ (ষ্টার : দক্ষযজ্ঞ)
শেষ অভিনয়—১ মার্চ, ১৯৩১ (মনোমোহন : গৈরিক পতাকা)

ষ্টার (১৮৮৩-১৮৮৭)

স্বত্বাধিকারী—গুর্মুখ রায়। পরে অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু (ওয়ার্কিং পার্টনার), হরিপ্রসাদ বসু ও দাশুচরণ নিয়োগী।

এমারেল্ড (১৮৮৭-১৮৯৭)

স্বত্বাধিকারী—গোপাললাল শীল। পরে বিভিন্ন সময়ে লেসী :—মতিলাল সুর, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, ব্রজলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল বসু, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, বেনারসী দাস এবং নীলমাধব চক্রবর্তী (সিটি)।

ক্লাসিক (১৮৯৭-১৯০৬)

লেসী—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

কোহিনূর (.১৯০৭-১৯১২)

স্বত্বাধিকারী—শরৎকুমার রায়। অবর্তমানে, শিশিরকুমার রায় (ভ্রাতা) ও মৃণালিনী দেবী (পত্নী)।

মনোমোহন (১৯১৫-১৯২৪)

স্বত্বাধিকারী—মনোমোহন পাঁড়ে। পরে যুক্ত হন দানীবাবু (ওয়ার্কিং পার্টনার)।

মনোমোহন নাট্যমন্দির (১৯২৪-১৯২৫)

লেসী—শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

মিত্র থিয়েটার (১৯২৬-১৯২৭)

লেসী—জ্ঞানেন্দ্র মিত্র ও শিশির মিত্র।

আর্ট থিয়েটার (১৯২৭-১৯২৮)

লেসী—আর্ট থিয়েটার লিমিটেড।

মনোমোহন (১৯২৮-১৯২৯)

লেসী—অনাদি বসু প্রভৃতি।

মনোমোহন (১৯২৯-১৯৩১)

লেসী—প্রবোধচন্দ্র গুহ প্রভৃতি।

৩৮ মেছুয়াবাজার রোড, কলকাতা

বীণা রঙ্গভূমি

(১৮৮৭—?)

বীণা রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠা করেন কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪)। সাহিত্যপ্রতিভা ছাড়াও রাজকৃষ্ণের একাধিক গুণ ছিল। সেতারবাদন এবং অভিনয়ে ইনি নিপুণ ছিলেন। মূকাভিনয়েও এঁর দক্ষতা প্রশংসা পেয়েছে। রাজকৃষ্ণ রায়ের উদ্যোগে পাণ্ডুয়া স্টেসনের সন্নিকটস্থ সবাই গ্রামে এক নাট্যসম্প্রদায়ের জন্ম হয়। এখানকার অভিনয়ে তিনি অংশ নিতেন। মাহেশে, কলকাতায় এবং অন্যান্য স্থানেও তিনি অভিনয় করেছেন। কলকাতায় আর্য্য-নাট্য-সমাজের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজকৃষ্ণ স্বরচিত 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নাটকে অবতীর্ণ হন। অভিনয় সুচারু হওয়ায় উদ্যোক্তারা অপেরা হাউস ভাড়া নিয়ে দু'রাত্রি নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলেন। 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নাটকে হিরণ্যকশিপুর ভূমিকায় রাজকৃষ্ণ রায়ের অভিনয়নৈপুণ্য সেকালের পত্রপত্রিকায় বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছিল এবং এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি স্বয়ং নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। থিয়েটার ব্যবসায় লিপ্ত হওয়ার মত আর্থিক সঙ্গতি অবশ্য রাজকৃষ্ণের ছিল না। আজীবন তাঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। অশেষ ক্লেশ আর বিপুল ঋণের বিনিময়ে শেষ পর্যন্ত তিনি আরব্ধ কাজটি সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। অদম্য মনোবল এবং অকৃত্রিম নাট্যানুরাগ তাঁকে শক্তি যুগিয়েছিল। নট, নাট্যকার ও নাট্যশালাস্থাপয়িতা —এই ত্রয়ীর ভূমিকায় বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে কেবলমাত্র একজনকেই দেখা গিয়েছে, তিনি রাজকৃষ্ণ রায়। নিছক অর্থোপার্জনের তাগিদে তিনি থিয়েটারে যোগদান

করেন নি।[১] কলালক্ষ্মীর সেবার সাথে তাঁর বাসনা ছিল রঙ্গালয় হতে প্রচলিত কুরুচি ও দুর্নীতি দূর করা। অভিনেত্রীপ্রথাকে রাজকৃষ্ণ সর্বদোষের আকর মনে করতেন। তাই, তাঁদের বাদ দিয়েই দল গড়লেন তিনি। ১৮৮৭ সালে যখন কলকাতা সহরে একাধিক নাট্যশালায় পূর্ণ উদ্যমে স্ত্রীসহযোগে অভিনয় চলেছে, আদর্শবাদী রাজকৃষ্ণ তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলেন কেবলমাত্র পুরুষশিল্পী সম্বল ক'রে। বছরের শেষে থিয়েটার বাড়ী তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হল। উদ্বোধনী নাটকের মহলা চলতে রইলো গভীর উৎসাহে। এসময় 'নববিভাকরসাধারণী'তে যে সংবাদ

---

১ অবশ্য, নাট্যশালা নির্মাণের পিছনে অর্থনৈতিক কারণ যে একেবারে ছিল না, তা নয়। 'বীণা রঙ্গভূমি' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি যে নিজের আর্থিক অবস্থারও কিছুটা উন্নতি করতে চেয়েছিলেন, তার উল্লেখ আছে 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' গ্রন্থে। গ্রন্থকার জানিয়েছেন:— "সন ১২৯২ সালের ২৬শে আশ্বিন "বঙ্গ রঙ্গভূমি"তে ইহাঁর "প্রহ্লাদ-চরিত্র" নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। নাট্যামোদী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন; রাজকৃষ্ণের এই প্রহ্লাদচরিত্র "বঙ্গ রঙ্গভূমি"র উজ্জ্বল রত্ন। এই পুস্তকের অভিনয়েই "বঙ্গ রঙ্গভূমি"র কর্ত্তৃপক্ষগণ এক সময়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন।......কিন্তু ইহা প্রথম অভিনয়কালে তাদৃশ আদরনীয় হয় নাই। শুনিয়াছি, রাজকৃষ্ণের সহিত বঙ্গ রঙ্গভূমির কর্ত্তৃপক্ষগণের বন্দোবস্ত ছিল যে, প্রথম দশটি অভিনয়রজনীতে যত টাকার টিকিট বিক্রয় হইবে, তিনি তাহার শতকরা দশটাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। কিন্তু ভালরূপ টিকিট বিক্রয় না হওয়ায় তিনি ইহাতে লাভবান্ হইতে পারিলেন না। ইহার উপর উক্ত রঙ্গভূমিতে প্রহ্লাদচরিত্র নাটকের অভিনয় আরম্ভের পর ৩।৪ মাসকাল উক্ত রঙ্গভূমির কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার নিকট হইতে আর কোন পুস্তক লইলেন না। ইহাতে তাঁহার বড় অসুবিধা হইল। তিনি বঙ্গ রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণের নিকট একটি প্রথম শ্রেণীর অংশ প্রার্থনা করিলেন। তখন ঐ অংশের মূল্য প্রায় ১০০৲ টাকা, সুতরাং অধ্যক্ষগণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। ইহারই ফলে রাজকৃষ্ণের বীণা থিয়েটারের সৃষ্টি।......"
(বঙ্গ-ভাষার লেখক/প্রথম ভাগ—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়)

প্রকাশিত হয়েছে তাতে, রাজকৃষ্ণের অভিনব প্রয়াসের উল্লেখ ও সমর্থন আছে। পত্রিকাখানি লিখলে :—"আমরা বিগত ৮ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বীণা রঙ্গগৃহে চন্দ্রহাস নামক একখানি নবনাটকের মহলা দেখিতে গিয়াছিলাম। সকলেই অবগত আছেন, উক্ত রঙ্গালয়টি শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় কর্তৃক স্থাপিত। অন্যান্য রঙ্গালয়ে যেরূপ স্ত্রীলোকের অভিনয় বারাঙ্গনা কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে, এই নব-প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ে সেরূপ হয় না। এই পার্থক্যই বীণা রঙ্গালয়ের বিশেষ চিহ্ন ও এই পার্থক্য রক্ষা করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব। বাবু রাজকৃষ্ণ রায়, বহু যত্নে, বহু পরিশ্রমে, বহু অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া, এই রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বীণা রঙ্গালয় এখনও সম্পুর্ণ হয় নাই, কিন্তু এই অসম্পূর্ণাবস্থায় যাহা দেখিলাম তাহাতেই ইহা প্রশংসার যোগ্য। দৃশ্যপটগুলি মহামূল্যের না হইলেও, অতি পরিপাটি হইয়াছে—তবে, কমদামের জিনিসে যেমন আভ্যন্তরিক গুণ অপেক্ষা বাহ্যিক চাকচিক্য অধিক থাকে, ইহাতেও সেইরূপ বাহ্যিক চাকচিক্যের আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা গুণহীন নহে।" (১২।১২।১৮৮৭)

১৮৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ৩৮ নম্বর মেছুয়াবাজার রোডে (বর্তমান 'জওহর' সিনেমা যেখানে) রাজকৃষ্ণ রায়ের নিজের লেখা 'চন্দ্রহাস' নাটক দিয়ে বীণা রঙ্গভূমির উদ্বোধন হল। প্রথম প্রয়াস হিসাবে 'চন্দ্রহাস' দর্শকদের প্রশংসাই লাভ করেছে। অভিনয় দেখে 'অনুসন্ধান' (১৪।১২।১৮৮৭) জানালে :—"বীণা-রঙ্গ-ভূমি।—কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় বীণা-রঙ্গ-ভূমির একমাত্র অধিকারী ও পরিচালক। সাধারণ থিয়েটারে যে যে কুরুচি আছে, তাহাই দূর করা তাঁহার উদ্দেশ্য; সুতরাং এ থিয়েটারে বারাঙ্গনা নাই,—পুরুষ দ্বারা স্ত্রীঅংশ অভিনীত হয়। আর, ইহাই এ থিয়েটারের নূতনত্ব। সংপ্রতি 'চন্দ্রহাস' নামক একখানি হরিভক্তিময় নাটক ইহাতে অভিনীত হইতেছে। অভিনয় দোষশূন্য না হইলেও. সমিতির অনেক মেম্বর

অভিনয় দেখিয়া বিশেষ তুষ্ট হইয়াছেন। এখন, দেশের সদাশয় ব্যক্তিগণ রাজকৃষ্ণবাবুকে উৎসাহ দেন ও তাঁহার আশা পূর্ণ হয়, ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা।" ১০ ডিসেম্বর বীণা রঙ্গভূমি মঞ্চস্থ করলে দু'টি কৌতুক নাটিকা 'চতুরালী' এবং 'চন্দ্রাবলী'। দু'টিরই রচয়িতা রাজকৃষ্ণ রায়। প্রথম নাটিকার 'হায়, হায়, একি শুনি ভাই! আটক পড়েছে আমার বিনোদিনী রাই!' এবং দ্বিতীয়টির 'তুমি যে কত ভাল, চিকন কালো, বল্‌বো কত একটি মুখে?'—এই দুই গান অভিনয়ের মাধ্যমে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে এইভাবে বীণা রঙ্গভূমিতে 'প্রহ্লাদ-চরিত্র', 'হরধনুর্ভঙ্গ', 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রভৃতি নামলো। 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' মঞ্চস্থ হয়েছে ১৮ ডিসেম্বর, ১৮৮৭। নিজের দলে যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত অভিনেতা না থাকায় এই নাটকের অভিনয়ে রাজকৃষ্ণ আর্য্য-নাট্য-সমাজের সহায়তা নিয়েছিলেন। রাজকৃষ্ণ রায় নিজে সাজলেন হিরণ্যকশিপু। আর্য্য-নাট্য-সমাজের সম্পাদক অক্ষয়কালী কোঙারকে ষণ্ডের ভূমিকায় দেখা গেল। আর, প্রহ্লাদ হলেন শরৎ কর্মকার। 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' সেসময় বীণায় খুবই সুখ্যাতি অর্জন করেছে। 'ইণ্ডিয়ান মিরার' লিখলে :—"The author acted Hiranyakasipoo and played his part admirably and displayed his power of representation to the greatest advantage. He carried the house with him without a single break. All the necessary qualifications of a successful actor he appeared to possess in a great degree. No unnecessary gesture or gesticulation was even seen in his acting. The boy-hero vied with him for the credit of supremacy and he carried it off to the delight of the audience. His sweet and melodious voice and devotional postures and attention produced a charming effect on the

audience. He held the whole house breathless over his noble fate throughout. The mother of the hero did contribute not a little to the success of the play. Her piteous solicitude to save the life of her blessed child was most admirably rendered. She had the entire sympathy of the audience. As each scene followed the other, the excitement of the audience increased more and more, and at last it reached its highest climax and the audience were enchanted. All credit is due to Babu Rajkristo Roy." (The Indian Stage, vol. III—Hemendra Nath Das Gupta) অন্যান্য নাটকের অভিনয়ও প্রশংসা থেকে বঞ্চিত হল না। 'অনুসন্ধান' (২৮।১।১৮৮৮) মন্তব্য করলে ঃ—"বীণা-রঙ্গভূমি।—কবিবর রাজকৃষ্ণ-বাবুর নব রঙ্গভূমিরও দিন দিন বিশেষ উন্নতি দেখিতেছি। এ পর্য্যন্ত রঙ্গভূমিতে চন্দ্রহাস, প্রহ্লাদ-চরিত্র, হরধনুর্ভঙ্গ, দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি কএকখানি নাটকের অভিনয় হইতেছে। এ সকলগুলিরই অভিনয় দেখিয়া আমরা তুষ্ট হইয়াছি। বিশেষ রঙ্গভূমি বেশ্যাশূন্য থাকায় ভদ্রলোক মাত্রেরই ইহাতে সহানুভূতি দেখা যায়। ফলতঃ রাজকৃষ্ণ-বাবুর আশা পূর্ণ হয়, এই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।"

অভিনেত্রীসংস্রবশূন্য এই নাট্যপ্রয়াস সৎ বিবেচনায় দেশের কোনো কোনো ধনী ব্যক্তির অর্থসাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করেছে। রঙ্গপুর তাজহাটের জমিদার রাজা গোবিন্দলাল রায় দিয়েছেন আড়াইশ টাকা এবং কুচবিহারের মহারানী দু'শ। কিন্তু তাতে সমস্যার কোনো সুরাহা হয় নি। কেননা, অভিনয় প্রশংসিত ও প্রচেষ্টা অভিনন্দিত হলেও দর্শনী মারফৎ বীণা রঙ্গভূমির আশানুরূপ অর্থাগম হচ্ছিল না। যদিও, অভিনেতারা সকলেই ছিলেন অবৈতনিক কিন্তু আনুষঙ্গিক ব্যয়ের প্রচুর্য এসময়

স্বত্বাধিকারী রাজকৃষ্ণ রায়কে বিব্রত করেছে। অভিনেত্রীবিহীন অভিনয়ে তদানীন্তন দর্শকের নিস্পৃহতা বীণা রঙ্গভূমি তথা রাজকৃষ্ণ রায়ের 'কাল' হল।[২] দর্শকের অভাবে ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে ঋণগ্রস্ত হয়ে রাজকৃষ্ণ থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। এই সময় তিনি অভিনয়কালীন এক দুর্ঘটনায় আহত হন। যাঁদের সহানুভূতি ও সহযোগিতার আশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কাজে নেমেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁদেরই অসহযোগিতা এবং বৈরীতা তাঁকে হতোদ্যম করেছে। সেই বেদনা আর ক্ষোভ রাজকৃষ্ণ প্রকাশ করেছেন অন্যত্র। 'দুঃখের কথা'য় তিনি লিখেছেনঃ—"অনেক কাল চেষ্টা করিযা, বড় সাধের আশায় মজিয়া বীণা-রঙ্গভূমি স্থাপন করি। একা, কেহই সহায় নাই। মুখের কথায় অনেকে আমাকে হিমালয়ের এভারেষ্ট শৃঙ্গে তুলিয়াছিল ; কিন্তু কাজের কথার বেলায় সবাই বোবা। কি করিয়া জানিব যে, তোমরা আমার সাধের চারা গাছটির কীট—আমার মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খাইবে—প্রথমে কুটিল স্বার্থপরতাবারুদ ও গোলা গোপনে গোপনে মন-কামানে ঠাসিয়া শেষে আমার প্রাণে দাগিবে? নটের হাটে কি কেবল "সর্পাদপি ভয়ঙ্করো" জীব? ...৫ শ্রাবণ ১২৯৫।" ("হরিদাস ঠাকুর") থিয়েটার পরিচালনায় ব্যর্থ হয়ে রাজকৃষ্ণ রায় বীণা রঙ্গভূমির দায়িত্বভার আর্য্য-নাট্য-সমাজের হাতে তুলে দিলেন। নাট্যশালা স্থাপনের পূর্বে এই আর্য্য-নাট্য-সমাজের সঙ্গে উনি অবৈতনিক অভিনয় করেছেন। ওঁর 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' সেসময় কলকাতার অপেরা হাউসে এঁদের দ্বারা অভিনীত হয়ে খুব সুখ্যাতি পেয়েছিল। বস্তুতঃ, এই প্রশংসায় অনুপ্রাণিত হয়েই রাজকৃষ্ণ বীণা রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠা করেন।

---

২ "স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায় বালক লইয়া অভিনয় করিতে গিয়া, বহু আয়াস-সঞ্চিত সম্পত্তি বিনাশ করিয়াছিলেন।" (নটের আবেদন / রঙ্গালয়, ১৭ ফাল্গুন ১৩০৭— গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

আর্য্য-নাট্য-সমাজ

১৮৮৮-র মে মাসে আর্য্য-নাট্য-সমাজ বীণা রঙ্গভূমিতে আসর পাতলে। এখানে আসার আগে এঁরা কয়েক মাস যাবৎ পার্শী থিয়েটারগৃহে অভিনয় করছিলেন। বীণা রঙ্গভূমিতে আর্য্য-নাট্য-সমাজের অভিনয় সম্পর্কে ২৭ মে, ১৮৮৮ 'অনুসন্ধান' লিখলে :—"আর্য্য-নাট্য-সমাজ।—আজকাল আবার বীণা থিয়েটারে উহাঁরা 'চৈতন্যলীলা' ও 'চন্দ্রহাস' প্রভৃতির অভিনয় করিতেছেন। অভিনয়ে 'আর্য্য-নাট্য-সমাজে'র পূর্ব্বাপর যেরূপ যশ-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা অনেকেরই অবিদিত নাই। সুতরাং সে সম্বন্ধে আর নূতন করিয়া কিছু বলা বাহুল্যমাত্র। আর, উহাঁদের এবারকার অভিনয় দেখিয়াও আমরা পূর্ব্বমত পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এখন, আর্য্য-নাট্য-সমাজ বরাবর আপনাদের উদ্দেশ্য বজায় রাখিয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।" ১৭ জুন এঁরা রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরিদাস ঠাকুর' মঞ্চস্থ করলেন। নাটকখানি ঢাকায় রচিত এবং এই বছরের এপ্রিল মাসে সর্বপ্রথম সেখানে অভিনীত হয়েছিল। এই সময় 'বৈশাখী চাঁপা' নামে একটি প্রহসনও বীণায় অভিনীত হয়েছে। 'অনুসন্ধান' জানালে :—"বীণা-রঙ্গ-ভূমি।—বীণা-রঙ্গ-মঞ্চে আজকাল আর্য্য-নাট্য-সমাজ 'চন্দ্রহাস', 'হরিদাস ঠাকুর' প্রভৃতি ধর্ম্মমূলক নাটকের ও 'বৈশাখী চাঁপা' প্রহসনের অভিনয়ে পূর্ব্বরূপই গৌরবান্বিত আছেন। তবে লোকের রুচিবিকারই ইহাঁদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিতেছে না, এই ক্ষোভ। ফলতঃ এক মেয়েমানুষের নাচুনী-কাঁদুনী এখানে নাই ; তা'ছাড়া আর যা' আছে, তাহা নিশ্চয়ই দেখিবার জিনিস। কিন্তু লোকের তাহাতে সক্ মিটে কৈ ? তাই সেরূপ উৎসাহ নাই। যাইহোক, সাধারণে এ অভিনয়ে যে তুষ্ট হইবেন, একথা আমরা স্পষ্টতঃই বলিতে পারি।" (১৪।৭।১৮৮৮) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

'ভ্রান্তিবিলাস' নামলো এখানে ২৫ আগস্ট, ১৮৮৮ তারিখে। অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'অনুসন্ধান' (৩০।৮।১৮৮৮) মন্তব্য করলে :—"আর্য্য-নাট্য-সমাজ।—সম্প্রতি উক্ত সমাজ সেক্ষপীয়রের কমেডি অব্ এররসের "Comedy of Errors এর" অনুবাদ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "ভ্রান্তি-বিলাস" নাটকাকারে গ্রথিত করিয়া অভিনয় করিতেছেন। অভিনয়দর্শনে দর্শকবৃন্দের ঘনঘন করতালি ও উচ্চহাস্যে রঙ্গগৃহ প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। আর, প্রকৃত হাস্যরসোদ্দীপক নাটকের অভিনয় দেখিয়া আমরাও অনেকদিন এরূপ বিমল আনন্দ উপভোগ করি নাই। প্রথম অভিনয়ে যে একটু আধটু ত্রুটি হইয়াছিল, তাহাও ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। তবে নাটক-সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক। বিজাতীয় ও বিধর্ম্মীয় আচার ব্যবহার, আমাদের দেশীয় আচার ব্যবহার হইতে অনেকাংশে ভিন্ন। আমাদের বিবেচনায়, উপস্থিত নাটককারের সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল। আর, সেই জন্যই শেষ মিলন-দৃশ্যটি যেন কেমন কেমন হইয়াছে।" ২ সেপ্টেম্বর এঁরা মঞ্চস্থ করেছেন 'দশরথের মৃগয়া বা বালক সিন্ধুবধ' এবং 'কলির প্রহ্লাদ'। রাজকৃষ্ণের পদানুসরণে আর্য্য-নাট্য-সমাজও অভিনেত্রীবিহীন শিল্পীগোষ্ঠী নিয়ে অভিনয় করেছেন আর তাঁদের সেই অভিনয় প্রশংসিতও হয়েছে। এক সময় অর্দ্ধেন্দুশেখরের মত দিকপাল অভিনেতাও এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের সহায়তায় বীণা রঙ্গভূমিতে 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় সাফল্য-মণ্ডিত হয়। ৯ নভেম্বর, ১৮৮৮ তারিখের 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' পত্রিকা লিখলে :—"সম্প্রতি আমরা বীণা রঙ্গভূমিতে আর্য্য-নাট্য-সমাজ কর্ত্তৃক সুপ্রসিদ্ধ নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। বীণা রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠাতা বাবু রাজকৃষ্ণ রায় স্বয়ং এখন অভিনয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। রঙ্গভূমিতে তাঁহার ন্যায় একজন খ্যাতনামা অভিনেতার অভাব বিশেষ

ক্ষতিজনক; কিন্তু আর্য্য-নাট্য-সমাজ যেরূপ সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিতেছেন তাহাতে অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে তাঁহারা যে রাজকৃষ্ণবাবুর মহৎ উদ্দেশ্যও পূর্ণ করিতে পারিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজকাল সহরে বেশ্যাসংযুক্ত থিয়েটার সকলের পশার ও প্রতিপত্তি যেরূপ, তাহাতে কেবল পুরুষ অভিনেতা লইয়া স্থায়ী থিয়েটার স্থাপন করা অনেক সাহস ও বলের কার্য্য; তাহার পথে বিস্তর বিঘ্ন বাধা। কিন্তু এ সকলের মধ্যেও আর্য্য-নাট্য-সমাজ যে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা আমরা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না।···বিখ্যাত অভিনেতা বাবু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি আর্য্য-নাট্য-সমাজে যোগ দিয়াছেন। তাঁহার সহায়তায় নীলদর্পণের অভিনয় যে বড়ই স্বাভাবিক হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য।" কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখরের যোগদানে সমাজের স্থায়িত্ব বাড়ে নি। রাজকৃষ্ণ রায়ের মত কেবলমাত্র পুরুষ অভিনেতাদেব নিয়ে থিয়েটার চালানোর প্রয়াসে আর্য্য-নাট্য-সমাজও ব্যর্থ হল। দর্শকেব অভাবে কিছুদিনের মধ্যে এঁদের অভিনয়ও গেল বন্ধ হয়ে। ১৮৮৮ সালেব নভেম্বর মাসে এঁরা বীণা রঙ্গভূমি থেকে বিদায় নিলেন। আর্য্য-নাট্য-সমাজ এখানে 'হরধনুর্ভঙ্গ', 'কুমার বিক্রম', 'হবিদাস ঠাকুর' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করেছিল।

নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার

আর্য্য-নাট্য-সমাজের পর বীণা রঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হলেন নট ও নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস। ইনি ছিলেন সেকালের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী শ্রীনাথ দাসের পুত্র। ১৮৭৫ সালে উপেন্দ্রনাথ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন কিন্তু 'জগদানন্দ' শীর্ষক ঘটনার পর Performance Act এবং মামলা-মকদ্দমার

ফলে তাঁকে শেষ পর্যন্ত বিলাত যাত্রা করতে হয়। প্রবাসেও তাঁর নাট্যানুরাগে ভাটা পড়ে নি। বিদেশ হতে প্রত্যাবর্তনের পর উপেন্দ্রনাথ বীণা রঙ্গভূমির দায়িত্বভার গ্রহণ ক'রে সেখানে নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার খুললেন। যদিচ, 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' মামলা তাঁকে কিছুটা হতমান করেছিল তবুও, নতুন থিয়েটার খোলার সময় তাঁর পৃষ্ঠপোষকের অভাব হল না।[৩] বীণা রঙ্গভূমিতে রাজকৃষ্ণ রায় এবং আর্য্য-নাট্য-সমাজের ব্যর্থতার মূল কারণ উপেন্দ্রনাথ অনুধাবন করেছিলেন। তাই, প্রথম থেকেই অভিনেত্রী সহযোগে মঞ্চাবতরণের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। রাজকৃষ্ণ রায়-প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ে তাঁরই আদর্শের পরিপন্থী কাজ হতে দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' লিখলেনঃ—"বাবু রাজকৃষ্ণ রায় অতি সৎ উদ্দেশ্য লইয়াই বীণা থিয়েটার স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণের নিকট বিশেষ সহানুভূতি না পাইয়া এবং নিজেরও নানা অসুবিধা ও অভিনয়-সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপ গোলযোগ ঘটায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অভিনয় বন্ধ করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, তৎপরে আর্য্য-নাট্য-সম্প্রদায় রাজকৃষ্ণবাবুর সে উদ্দেশ্য পালন করিয়া সন্নীতিপরায়ণ ভদ্রলোকদিগের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন। আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে আর্য্য-নাট্য-সম্প্রদায়ও রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের পক্ষে ইহা একটি কম ঘৃণা এবং লজ্জার কথা নহে, যে বাঙ্গালীরা আজিও সন্নীতির পোষকতা করিতে শিখে নাই। তাহা না হইলে এক কলকাতা সহরেই "বেঙ্গল", "ষ্টার", "এমারেল্ড" বেশ্যা অভিনেত্রীমিশ্রিত এই তিনটী রঙ্গভূমি বহুকাল

৩ "……যখন থিয়েটার উপলক্ষে তিনি শেষ আয়োজন করেন, তখন তাঁহার সম্বন্ধে সকল গ্লানিই প্রচারিত হইয়াছিল, স্কুলের ছেলেরাও উপেন্দ্রনাথের চরিত্রের বিপরীত দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিত, কিন্তু সে অবস্থায়ও তিনি তাঁহার থিয়েটারের জন্য কলিকাতা সমাজের প্রায় সকল বড় বড় নামই পৃষ্ঠপোষকরূপে পাইয়াছিলেন।…" (বন্ধুকৃত্য/পূর্ণিমা, শ্রাবণ ১৩০৭)

হইতে নির্ব্বিবাদে চলিয়া কি প্রকারে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে? গত বৎসর কলিকাতার ষ্টার থিয়েটার কতকগুলি বেশ্যা লইয়া অভিনয় করিবার জন্য ঢাকায় গিয়াছিল, কিন্তু তথাকার ভদ্রলোক-দিগের প্রতিবন্ধকতায় তথায় অভিনয় করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাতে বোধ হয়, কলিকাতার লোক অপেক্ষা ঢাকার লোকেরা অধিক নীতিপরায়ণ। আমরা শুনিতেছি "ন্যাশন্যাল" থিয়েটারের ভূতপূর্ব্ব কার্য্যাধ্যক্ষ বহুবাজারনিবাসী বাবু উপেন্দ্রনাথ দাশ সম্প্রতি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া "নিউ ন্যাশনাল" নামে একটী থিয়েটার খুলিতেছেন এবং আপাততঃ বীণা থিয়েটারের ঘর ভাড়া লইয়া সেই স্থানেই অভিনয় করিবেন। উপেন্দ্রবাবু নাকি বেশ্যা অভিনেত্রী দ্বারা অভিনয় করাইবেন। তবে কি রাজকৃষ্ণবাবু সামান্য ভাড়ার খাতিরে তাঁহার মহদুদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন।..." (৭।১২।১৮৮৮)

এই মন্তব্যে মর্মাহত হয়ে রাজকৃষ্ণ রায় ঐ পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় (১৪।১২।১৮৮৮) জবাব দিলেনঃ—"মহাশয়! গত ২৩শে অগ্রহায়ণ শুক্রবারের সুলভ সমাচারে দেখিলাম আমার বীণা থিয়েটার ভাড়া দেওয়া সম্বন্ধে আপনি একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আপনি দুঃখিত হইয়াছেন, আমিও দুঃখিত হইয়াছি। আমি কেবল অত্যন্ত ঋণের দায়ে আমার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের বহির্ভূত কার্য্য করিয়াছি। আমি দরিদ্র হইয়াও যাঁহাদের জন্য নিজের যাহা কিছু ছিল তাহা খোয়াইয়া, শক্তির অতীত ঋণ করিয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, যার জন্য প্রাণ মন দেহ যত্ন চিন্তা পরিশ্রম একসঙ্গে জড়াইয়া ডুব দিয়াছিলাম, তাঁহারা তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না—বুঝিয়াও বুঝিলেন না। এক বৎসরের মধ্যেই আমার সাধের আশা, সাধের যত্ন, সাধের চেষ্টা মরিয়া গেল—আমাকেও মারিয়া গেল। এখন ঋণ ও সুদের বিভীষিকায় আমি নিতান্ত অস্থির হইয়াছি। মহাজনেরা অর্থাৎ ঋণদাতারা আমার নিকট অনেক টাকা পাইবেন।

আমি বই কে তাঁহাদিগকে টাকা দিবে ? অথচ টাকা দিতে পারি না। সুতরাং তাঁহারা ঋণ পরিশোধের জন্য, যাহাতে বেশী টাকা আদায় হয়, সেইরূপ হিসাবে আমার বীণা থিয়েটার ভাড়া দেওয়াইলেন। আর বেশী কি বলিব, এখন আমি প্রাণ থাকিতেও মৃত। আজ যদি কেহ আমার এই দুর্ব্বিষহ ভার শিথিল করিয়া দেন, তা হইলে আমি আবার পূর্ব্বের ন্যায় আপনাকেও সন্তুষ্ট ও আপনাদিগকেও সন্তুষ্ট করিতে পারি। ঋণ যে বিষের অপেক্ষাও অতি তীব্র, তা যে ঋণ-বিপন্ন, সেই বুঝিতে পারে। আপনি এক স্থানে বলিয়াছেন, "তবে কি রাজকৃষ্ণবাবু সামান্য ভাড়ার খাতিরে তাঁহার মহদুদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন ?" কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, তা নয়, তা নিশ্চিত নয়। "সামান্য ভাড়ার খাতিরে" নয়, আমার পক্ষে অসামান্য ঋণের যন্ত্রণায় এই কার্য্য হইয়াছে। আপনি ত জানেন "Debt is the worst kind of poverty." ভগবান্ যদি দিন দেন, তবে এই ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, ইচ্ছামত কার্য্য করিব। আপনি জানেন, মুখের কথায় অনেকে আমাকে আকাশে তুলিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের বেলায়—ম্যাও ধরিবার বেলায় তাহারাই আবার আমাকে পাতালের নিম্নতম তলায় ফেলিয়া দিল। এখন বলুন দেখি আমার অপরাধ, না তাহাদের অপরাধ ? দেশে ত অনেক রাজা, উজির, জমিদার ও বড়, মেজো, ছোট কর্ম্মচারী ও ব্যবসায়ী আছেন, অনেকরূপ ধর্ম্মসম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা যদি—বেশী নয় দুই চারি আনা এমন কি দুই চারি পয়সাও মাসে মাসে দিয়া আমার সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে কি আমি আজ ধনে প্রাণে সারা হইতাম ? অথবা আমার যদি প্রয়োজনোপযোগী টাকা থাকিত, তাহা হইলেও আমার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতাম। আমার গন্তব্য পথে কাঁটা পড়িয়াছে। আমার মন আছে, ধন নাই ; ভক্তি আছে, শক্তি নাই। আমি এক বীণা থিয়েটার করিয়া মানবচরিত্রের কত রকম ভোজবাজী ভেল্কিবাজী দেখিলাম, তাহার সীমা নাই। বীণা

থিয়েটার না হইলে বোধ হয় সংসার থিয়েটারের এইসকল সং রং দেখিতে পাইতাম না। একান্ত বশম্বদ শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।"

সে যাই হোক্, উপেন্দ্রনাথ দাস শেষ পর্যন্ত এই বীণা রঙ্গভূমিতে 'নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার' (জাতীয় নব-রঙ্গালয়) খুললেন। ম্যানেজার হলেন শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। ৮ ডিসেম্বর, ১৮৮৮ উপেন্দ্রনাথের লেখা 'দাদা ও আমি'[৪] নাটক দিয়ে নতুন থিয়েটারের উদ্বোধন হল। এতে তিনি নিজে দাদা (ধীরেন্দ্রকুমার) সাজেন এবং ভাই (অনন্তকুমার) হন বিনোদ সোম। প্রহসন হিসাবে 'দাদা ও আমি' খুব উন্নতমানের ছিল না। ব্যক্তিগত আক্রমণের সুর নাটকখানিকে ক্লিষ্ট করেছে। যদিও নাটিকার প্রারম্ভে সন্নিবেশিত নিম্নোক্ত কবিতাটিতে নাট্যকারের বিনীত এবং দৈন্যভাবই পরিস্ফুট :—

"অর্দ্ধমৃত ক্ষোভে, শোকে, লাজভয়ে,
কি বলে প্রবেশি ভারত সমাজে।
কত না যাতনা জানে না জগতে,
কত না লাঞ্ছনা সহে না দেহে রে॥

* * *

আর্য্যগুণে, আর্য্যগণ, সকরুণে,
লহিবেন্, তাঁরে সাদরে মাতৃভূমে।
বাঁধিবেন্ অধমে কৃতজ্ঞতাপাশে,
জীবনে বাঁধিবেন্ শরণাগতারে॥" (বিদেশিনী)

'দাদা ও আমি'র জবাবে অতুলকৃষ্ণ মিত্র 'গাধা ও তুমি' লিখেছিলেন এবং সে-নাটক এমারেল্ড থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল। 'গাধা ও তুমি'র উদ্দিষ্ট পুরুষ বলা বাহুল্য, উপেন্দ্রনাথ দাস। ১৬ ডিসেম্বর নিউ ন্যাশনালে অভিনীত হল 'শরৎ-সরোজিনী' এবং ২৫ ডিসেম্বর

৪ "উপেন্দ্রনাথের শেষ নাটক 'দাদা ও আমি' প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। নাটকটি 'ব্রাদার জিল অ্যাণ্ড আই' নামক একটি ইংরেজী প্রহসন অবলম্বনে ইংল্যাণ্ড-প্রবাসকালে রচিত।" (ভারতকোষ / প্রথম খণ্ড)

'সধবার একাদশী'। প্রথম ও দ্বিতীয় নাটকে উপেন্দ্রনাথ নিজে যথাক্রমে 'শরৎ' এবং 'নিমচাঁদ' সেজেছেন। এইভাবে বীণা রঙ্গভূমিতে নিউ ন্যাশানালের পতাকাতলে, ক্রমে ক্রমে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' (১৯।১।১৮৮৯), 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (২০।১।১৮৮৯), 'নবীন তপস্বিনী' প্রভৃতি মঞ্চস্থ হয়। এসব নাটকের অভিনয় সমালোচনায় 'অনুসন্ধান' (২৭।১।১৮৮৯) মন্তব্য করলেঃ—"নিউ ন্যাস্ন্যাল থিয়েটার—বীণা রঙ্গমঞ্চে উক্ত কোম্পানীর দ্বারা আজকাল 'দাদা ও আমি', 'শরৎ-সরোজিনী' এবং 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হইতেছে। বিলাত-প্রত্যাগত খ্যাতনামা লেখক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উক্ত থিয়েটারটি পরিচালিত। উপেন্দ্রবাবু একজন শিক্ষিত এবং অভিনয়কার্য্যে দক্ষ লোক। সুতরাং তাঁহার পরিচর্য্যায় অভিনয় পারিপাট্যের বিশৃঙ্খলা যে অল্পই হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। আর মোটের উপর, অভিনয়ও যে সুন্দর হইতেছে, ইহা অবশ্যই বলিতে পারা যায়। তবে কথা এই যে, লোকের বর্ত্তমান রুচি বুঝিয়া বিষয় নির্ব্বাচন না করিলে ও তাহা সেইরূপ সুন্দররূপে অভিনীত না হইলে, রঙ্গমঞ্চে যে লোকাধিক্য হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। আশা করি, এই বিষয়ে উপেন্দ্র-বাবু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিবেন।" ১৮৮৯, ২ ফেব্রুয়ারি এই মঞ্চে 'হিরণ্ময়ী' অভিনীত হয়। পরদিন (৩।২) নামে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' ও 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা'। ফেব্রুয়ারির ২৫ তারিখে 'অনুসন্ধান' পত্রিকার অভিমতঃ—"জাতীয় নব-রঙ্গালয়।—আজকাল 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' ও 'হিরণ্ময়ী' নাটক উক্ত রঙ্গালয়ে বেশ অভিনীত হইতেছে। অদ্য স্থানাভাব; বিশেষ কথা বারান্তরে আলোচ্য।" ১২ মার্চের 'অনুসন্ধান' মারফৎ জানা গেল নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার বীণা রঙ্গভূমিতে সুনামের সঙ্গে অভিনয় করছে। ঐ তারিখে পত্রিকাখানি লিখলেঃ—"জাতীয় নব-রঙ্গালয়।—বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় উক্ত রঙ্গালয়েরও দিন দিন বেশ পসার করাইতেছেন।

ইতিমধ্যে 'নবীন তপস্বিনী'র অভিনয় দেখিয়া আমরা তুষ্ট হইয়াছি। জলধর, ঠিক যেন কবির অঙ্কিত জলধর বলিয়াই বোধ হইল। তদ্ভিন্ন অপরাপর অনেক অংশও বেশ দক্ষতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল। উপসংহারে আমরা উক্ত রঙ্গালয়ের উন্নতি প্রার্থনা করি।" কিন্তু প্রার্থনায় কোনো কাজ হল না। অভিনয় সুখ্যাতি পেলেও দর্শকের অভাব উপেন্দ্রনাথকেও আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল। ছ'মাস যেতে না যেতে উনিও থিয়েটার তুলে দিয়ে বীণা রঙ্গভূমি থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হলেন।

আবার রাজকৃষ্ণ রায়

উপেন্দ্রনাথ দাসের বিদায়ের পর বীণা রঙ্গভূমির স্বত্বাধিকারী রাজকৃষ্ণ রায় পুনরায় স্বয়ং থিয়েটার পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলেন। অভিনেত্রীবিহনে তাঁর প্রথম উদ্যোগ সফল হয় নি। সেই অভিজ্ঞতা তিনি স্মরণে রেখেছিলেন। তাই, দ্বিতীয় পর্বের সুরুতেই উপযুক্ত নায়িকার সন্ধানে তৎপর হলেন রাজকৃষ্ণ। পরবর্তীকালের প্রখ্যাতা নটী তিনকড়ি দাসী তখন সবে মঞ্চে দেখা দিয়েছেন। এই উদীয়মানা অভিনেত্রীর নাট্যপ্রতিভা আবির্ভাবলগ্নেই রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে তাঁকে রাজকৃষ্ণ রায় শিল্পী-গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত করলেন। সেই সঙ্গে যোগ দিলেন আর্য্য-নাট্য-সমাজের সদস্যবৃন্দ। মহাসমারোহে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'মীরাবাই' নাটকের মহলা চলতে লাগলো। ২৮ জুন, ১৮৮৯ তারিখের 'অনুসন্ধান' জানালে :—"সুপ্রসিদ্ধ কবি ও নাটককার শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় পুনরায় স্বয়ং স্বহস্তে তাঁহার 'বীণা রঙ্গভূমি'র ভার লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন। কএক মাস বন্ধে নূতন নাটক লিখিয়া সুনিপুণ অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের দ্বারা তাহা অভ্যস্থ করাইয়া, বর্তমান মাসের শেষতকই তিনি তাঁহার নিজের

রঙ্গালয়টি আবার খুলিতেছেন। এবার স্ত্রীলোক লইয়া তাঁহার থিয়েটারে অভিনয় হইবে। অধিকন্তু আর্য্য নাট্য সমাজের সেই সুদক্ষ অভিনেতাগণও, শুনিলাম, উহাতে যোগ দিয়াছেন।…”

১৮৮৯ সালের ২০ জুলাই 'মীরাবাই' নাটক দিয়ে রাজকৃষ্ণ আবার বীণা থিয়েটার চালু করলেন। নব পর্যায়ের বীণা রঙ্গভূমি প্রসঙ্গে 'নববিভাকরসাধারণী'তে মন্তব্য করা হল :—“কলিকাতার রঙ্গমঞ্চগুলি লোকের মনে এমন একটি মন্দ ধারণা করিয়া দিয়াছেন, যে নাট্টসমাজে বেশ্যা না থাকিলে, মন উঠে না। বেশ্যার রঙ্গভঙ্গ বেশ্যার চক্ষুর পালট নাট্টামোদীগণের বড়ই ভাল লাগে। নির্ম্মল আমোদে মন সরে না—কিন্তু কীর্ত্তিটি নাট্টসমাজ হইতেই ঘটিয়াছে ; রাজকৃষ্ণবাবু অনেক ব্যয় করিয়া, নির্ম্মল আমোদের জন্য বীণা রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরাও ভাবিয়াছিলাম—বীণা সুগীতি বাজাইবে কিন্তু নাট্টামোদীদের কর্ণে এবং চক্ষে পুরুষের চীৎকার পুরুষের নৃত্য ভাল লাগিবে কেন ? ক্রমে ক্রমে ব্যয় কুলাইতে না পারিয়া বীণার তার ছিঁড়িয়া গেল। অনেক বিবেচনার পর রাজকৃষ্ণবাবু বুঝিলেন, বিদ্যাধরীর করে একালে বীণা বাজান লোকের ভাল লাগিবে না। তাই এবার অবিদ্যার হস্তে বীণা দিয়াছেন। গত শনিবার হইতে মীরাবাই নামক নাটক অভিনয়ার্থ প্রথম খুলিয়াছেন। ভাল, দেখা যাক্—এবার বীণা কেমন বাজে !” (২২।৭।১৮৮৯) 'মীরাবাই' দর্শকদের সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। নামভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনকড়ি দাসী আর অক্ষয়কালী কোঙার রাণা কুম্ভ সেজেছিলেন। এঁদের দু'জনার অভিনয়ই প্রশংসিত হয়। নাট্যকারের নিজের লেখা গানগুলির মধ্যে—'খেলার ছলে হরি ঠাকুর গড়েছেন এই জগৎখানা। চাদ্দিকে তাই খেলার মেলা, খেলায় খালি আনা-গোনা' বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে। রাজকৃষ্ণ এই নাটকের উপস্থাপনায় অভিনবত্ব দেখিয়েছিলেন। অভিনয়ের প্রশংসা ক'রে 'অনুসন্ধান' (৩০।৭।১৮৮৯) লিখলে :—

"কবিবর রাজকৃষ্ণবাবুর নূতন নাটক 'মীরাবাই' উক্ত রঙ্গালয়ে আজকাল বড়ই দক্ষতার সহিত অভিনীত হইতেছে। নাটকের কতকগুলি গান—বিশেষতঃ তানসেনের গীত—বড়ই মনোমুগ্ধকর ; অথচ তাল-লয়-সংযুক্ত। আজকালকার থিয়েটারের বাজারে এরূপ গান প্রায়ই হয় না। বস্তুতঃ, ইহা বড় অল্প প্রশংসার কথা নহে। অধিকন্তু, এবারের দৃশ্য-সৌন্দর্য্য আরও মনোহর। কোথায় গান হইতেছে, অথচ বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া-যোগে সেই গান দর্শকের কানের কাছে কে যেন আসিয়া গাহিয়া যাইতেছে,—এই যে সুন্দর কৌশলটি, এটি বাঙ্গালার থিয়েটারে সম্পূর্ণ নূতন। এ দৃশ্যে সকল দর্শককেই মোহিত হইতে হয়। তদ্ভিন্ন, জ্যোতির্ম্ময় বালকের আবির্ভাব ও শেষ-দৃশ্যের পট-পরিবর্ত্তন-প্রণালীটিও উল্লেখযোগ্য। ফলতঃ 'মীরাবাই' দেখিবার জিনিস বটে।" বীণা রঙ্গভূমিতে অভিনেত্রী-নিয়োগ কোনো কোনো মহলের মনঃপুত হয় নি। রাজকৃষ্ণ রায়কে নিজের আদর্শের পরিপন্থী কাজে লিপ্ত দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' মন্তব্য করলে ঃ—"···আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, কবিবর রাজকৃষ্ণবাবু অভিনেত্রী লইয়া বীণা থিয়েটারের অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন। মধ্যে যখন উপেন্দ্রবাবুকে অভিনেত্রী লইয়া বীণা থিয়েটার গৃহে অভিনয় করিবার জন্য রাজকৃষ্ণবাবু ভাড়া দেন, তখন তাঁহার সঙ্গে আমাদের এ বিষয় লইয়া অনেক লেখালেখি হইয়াছিল। সে সময়ে রাজকৃষ্ণবাবু আমাদিগকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াছিলেন যে, ঋণদায়ে পড়িয়া আমি এই কার্য্য নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও করিতে বাধ্য হইয়াছি। রাজকৃষ্ণবাবুর নিকট আমরা ইহাও আভাস পাইয়াছিলাম যে, এইরূপ ভাড়া দিয়া তিনি ঋণমুক্ত হইয়া পুনঃ পূর্ব্বের ন্যায় নিজে অভিনয় কার্য্য আরম্ভ করিবেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি তিনি নিজেই অভিনেত্রী লইয়া থিয়েটার খুলিলেন। যদিও তাঁহার এখনও সেই উত্তর যে, ঋণদায়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে এরূপ কার্য্য করিতে হইতেছে। কিন্তু আমরা কখনই আশা করি

নাই যে, রাজকৃষ্ণবাবুর মত লোক এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, আমরা রাজকৃষ্ণবাবুর এই কার্য্যে আন্তরিক দুঃখিত হইলাম। বীণা থিয়েটারের ঋণশোধের কি তিনি আর কোন সদ্‌উপায় বাহির করিতে পারিলেন না ?...” (২৬।৭।১৮৮৯)

‘সুলভ সমাচার ও কুশদহ’ যাই বলুক, বীণার অভিনয় কিন্তু ভালই চলতে রইলো। ৩ আগস্ট মঞ্চস্থ হল—‘লীলাবতী’। ২১ সেপ্টেম্বরের অভিনীত নাটক ‘শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা’। পরদিন (২২।৯।১৮৮৯) বীণায় ‘সধবার একাদশী’, ‘মীরাবাই’ এবং ‘ভ্রান্তিবিলাস’ পরিবেশিত হয়। কিছু কিছু পত্র-পত্রিকায় এই সময় বীণা রঙ্গভূমির সুখ্যাতি করা হয়েছিল। ৩০ অক্টোবর, ১৮৮৯ তারিখে ‘অনুসন্ধান’ লিখেছে :—“দেখিয়া আশা হইতেছে, অনেক বিঘ্ন-বিপত্তির পর, এইবার বুঝি বীণা-থিয়েটারটি স্থায়ী হইল! সেদিন রবিবারে বীণায় অভিনয় দেখিয়া আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি ; দর্শকগণও সকলেই বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন। অধিকন্তু, সেদিন বীণায় আদর-আপ্যায়িত-ভদ্রতারও চরম দেখা গেল। দর্শকমাত্রকেই তাহাতে তুষ্ট হইতে হয়। যাইহোক, সাধারণকে আমরা অনুরোধ করি, ষ্টার ও বেঙ্গলের ন্যায় সকলে বীণাতেও এক একবার অভিনয় দেখিয়া আমোদ উপভোগ ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে বীণার অধিকারীকেও উৎসাহিত করুন।” নভেম্বর, ১৮৮৯-তে মঞ্চস্থ হল রাজকৃষ্ণ রায়েরই লেখা ‘চমৎকার’। ‘অনুসন্ধান’ পত্রিকায় এই অভিনয়েরও প্রভূত প্রশংসা বেরুল। পত্রিকাখানি লিখলে :—“সম্প্রতি বাবু রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের রঙ্গালয়ে ‘চমৎকার’ নামক এক নূতন নাটকের অভিনয় হইতেছে। ‘চমৎকার’ নাটকের ঘটনা-কৌশল প্রকৃতই ‘চমৎকার’ বটে! এরূপ সুন্দর অথচ স্বাভাবিক ঘটনার সমাবেশ গ্রন্থকারের বড় অল্প নিপুণতার পরিচায়ক নহে। বিশেষতঃ অভিনয়াংশেও নাটকখানির স্থানে স্থানে বড়ই জমজমা হইয়াছিল। ধনেশ্বর সিংহরায়ের অভিনয়—বিশেষতঃ দস্যু কর্তৃক

অর্থাপহরণের সংবাদপ্রাপ্তির পর, বড়ই সুন্দর ও স্বাভাবিক মুদীর দোকান, মুদীর সাজ-সজ্জা, কথাবার্ত্তা, লুটপাট ব্যাপার, সমস্তই পরিপাটী বলিতে হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা শেষ মিলনদৃশ্য! সেইটেতেই নাটকের সম্পূর্ণ সার্থকতা, সেই দৃশ্যেই চমৎকার!! এ রচনা-কৌশল এক 'অপূর্ব্ব কারাবাস' ব্যতীত আমরা আর কোন পুস্তকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ফলতঃ এরূপ অভিনয়ের আবার সম্পূর্ণ প্রতিপোষণ প্রার্থনা করি। উপসংহারে উক্ত রঙ্গালয়ের নূতন অভিনীত আর একখানি প্রহসন—'ঘোষের পো'! সেখানিও বড় মজাদার! দেখিতে-শিখিতে অনেক জিনিস তাহাতে আছে। আমরা সে সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলি না—যাঁহাদের জন্য সেখানি রচিত, তাঁহারাই তাহাতে শিক্ষা পাইবেন।" (২৯।১১।১৮৮৯) ডিসেম্বরের ১৪ ও ১৫ তারিখে এখানে যথাক্রমে 'রুক্মিণীহরণ' ও 'খোকাবাবু' এবং 'মীরাবাই' ও 'ঘোষের পো' মঞ্চস্থ হয়। পরবর্তী ২৮ তারিখে বীণায় 'হরধনুর্ভঙ্গ' এবং 'খোকাবাবু' ও ২৯ ডিসম্বর 'মেড়ার মেলা' আর 'মীরাবাই' অভিনীত হয়েছে।

১৮৯০ সালের প্রথমার্দ্ধে বীণা রঙ্গভূমিতে অভিনীত নাটকের তালিকায় আছে:—'রাজা বিক্রমাদিত্য' (১১।১), 'হরধনুর্ভঙ্গ' ও 'খোকাবাবু' (১৫।৩), 'মীরাবাই' (১৬।৩) প্রভৃতি। 'বীণা'র প্রতিষ্ঠার উপর রাজকৃষ্ণ রায়ের অস্তিত্ব নির্ভর করছিল। থিয়েটারকে দাঁড় করাবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। নানান জায়গা থেকে সংগ্রহ ক'রে একদল শক্তিশালী শিল্পী গড়ে তুলেছিলেন তিনি, যাঁদের অন্যতম প্রতিভাবান অভিনেতা ও সুরকার হিঙ্গুল খাঁ। মধ্যবিত্ত দর্শকের সীমিত সাধ্যের প্রতিও রাজকৃষ্ণের দৃষ্টি ছিল। ধনী-দরিদ্র সকলের পক্ষেই যাতে রঙ্গালয়ের পোষকতা করা সম্ভব হয় এবং অভিনয়ানুরাগ যাতে সর্বসাধারণের মধ্যে অবাধে বিস্তৃতিলাভ করে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি অতি সুলভ মূল্যে দর্শনীর হার বেঁধে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া, নিত্য নতুন নাটক

মঞ্চস্থ ক'রে তিনি দর্শকদের কৌতূহল অব্যাহত রাখার প্রয়াস পেতেন। প্রসঙ্গতঃ, 'অনুসন্ধান' (২৮।৬।১৮৯০) মন্তব্য করেছিল :—"কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় সকল জিনিসেরই সস্তার চূড়ান্ত দেখাইয়া গেলেন। পুস্তক-পত্রিকার ব্যাপারের তো কথাই নাই ; এখন আবার তিনি থিয়েটার দেখানর বাজারেও সেই চাল চালিয়াছেন। /০ এক আনায় ৵০ আনায় থিয়েটার দেখান ভারতবর্ষে আর হয় নাই। রাজকৃষ্ণবাবুর এই সস্তার বাজারে গরীব দুঃখী সকলেরই থিয়েটার দেখার সখ মিটিতেছে। রাজকৃষ্ণবাবু প্রকৃতই বাহাদুর বটেন। একে ঐ দর্শনী, তায় নিত্য নিত্য অভিনয়—নূতন নূতন জিনিস—মন্দ কি?" ১৮৯০ সালের ২৬ জুলাই 'চন্দ্রাবলী', ১ নভেম্বর 'প্রহ্লাদ-মহিমা', ২ নভেম্বর 'মীরাবাই' ও 'লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র' এবং ১৫ নভেম্বর 'জটিল' ও 'চন্দ্রাবলী' মঞ্চস্থ হয়েছে। এই সময়কার বীণা রঙ্গভূমি সম্পর্কে 'অনুসন্ধান' জানালে :—"কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের 'বীণা থিয়েটার'টি বাস্তবিকই লোকের উৎসাহ পাইবার সামগ্রী। বিশেষতঃ আজকাল 'বীণা'য় অভিনয়াদিও সুন্দর হইতেছে, বেশীর ভাগ 'বীণা'র দর্শনী সস্তার চূড়ান্ত। আমরা রঙ্গ-দর্শনাভিলাষী সকলকেই রাজকৃষ্ণবাবুর 'বীণা থিয়েটার'টিও এক একবার দেখিতে অনুরোধ করি।" (১৫।১১।১৮৯০)

নাটক ভাল, অভিনয় সুন্দর, টিকিটের হার অবিশ্বাস্য রকমের কম তবুও শেষ পর্যন্ত রাজকৃষ্ণ রায় বীণা রঙ্গভূমি চালাতে পারলেন না। বাংলা দেশে চীপ থিয়েটারের স্রষ্টা তিনি, যদিও তাঁর এই প্রয়াস সেদিন সূতিকাগারেই মৃত্যুবরণ করেছিল। মঞ্চকে জনপ্রিয় করার তাগিদে হ্রাস মূল্যে দর্শকআকর্ষণের প্রচেষ্টা দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন রাজকৃষ্ণ রায়ের ঋণের বোঝা-ই বাড়িয়ে তুলেছে। নানা গুণের অধিকারী অভিনয়সমর্পিতপ্রাণ এই মানুষটির ব্যবসায়িক দূরদৃষ্টির অভাব ছিল, তাই আবার তাঁকে থিয়েটার ব্যবসায় থেকে

সরে দাঁড়াতে হল। তবে, এবারকার পরিস্থিতি আগের চেয়ে আরো সঙ্গীন! চরম আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে রাজকৃষ্ণ রায় বীণা ছাড়লেন চিরকালের মত। আকণ্ঠ ঋণে জর্জরিত এবং সর্বস্বান্ত হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর রইলো না। মঞ্চহারা তথা সর্বহারা অবস্থায় এসময় দেশবাসীর কাছে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেছেন রাজকৃষ্ণ। ২৯ ডিসেম্বর ১৮৯০ 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় প্রকাশিত এক আবেদনে লেখা হল :—

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায়

এই হতভাগ্য বাঙ্গালা-দেশের একজন কবি। দুর্ভাগ্যক্রমে কি এক কুক্ষণে তিনি কবিতা-কানন ছাড়িয়া, দেশীয় রঙ্গভূমির সংস্কার করিতে যান। আজ তাই তিনি সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়া বিপন্ন অবস্থায় পতিত। এমনকি, এখন যদি দেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণ তাঁহাকে কিছু কিছু সাহায্য না করেন, তবে আর তাঁহার কোনো আশাই নাই। তাই আজ তিনি সাধারণের নিকট কৃপাপ্রার্থী। এখন সকলেই যাহার যেমন সাধ্য, রাজকৃষ্ণবাবুকে কিছু কিছু সাহায্য করিয়া তাঁহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করেন, সাধারণের প্রতি আমাদের এই অনুরোধ। রাজকৃষ্ণবাবুর ঠিকানা, ৩৮ নং মেছুয়াবাজার রোড, কলিকাতা।"

থিয়েটার ব্যবসায় নেমে দেনার দায়ে রাজকৃষ্ণ রায় সর্বস্ব হারিয়ে প্রায় ভিক্ষুকে পরিণত হলেন। বাংলা ১২৯৭ সালের শেষাশেষি অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে তাঁর বড় সাধের বীণা রঙ্গভূমি হস্তান্তরিত হয়। চরম দারিদ্র্য এবং অপরিসীম মনোবেদনায় জর্জরিত রাজকৃষ্ণ এরপর আর বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। প্রচণ্ড অর্থকষ্টের সময় (১৮৯১) ষ্টার তাঁকে মাসিক একশত টাকা বেতনে নাট্যকাররূপে নিযুক্ত করে। রাজকৃষ্ণ

রায়ের তৎকালীন দুরবস্থার উল্লেখ আছে 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' গ্রন্থে। গ্রন্থকার লিখেছেন :—"বীণা থিয়েটার হইতে তিনি বিলক্ষণ ঋণজালে জড়িত হইলেন। স্ত্রীপুত্রের যে কিছু অলঙ্কার ছিল, তাহা বিক্রীত হইল, তদ্ভিন্ন থিয়েটার গৃহ ও ছাপাখানা বেচিয়া বড় বড় মহাজনদের দেনা কোনরূপে পরিশোধ করিয়াছিলেন। এই ঋণের জ্বালায় কাগজ ছাপাইয়া তাঁহাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থীও হইতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, তাহাতে বিশেষ কিছু ফল পাওয়া যায় নাই। এই সময় নানারূপ দুশ্চিন্তায় ও দুর্ভাবনায় ইহাঁর মানসিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়,—তাহারই ফলে, দেহও যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকল জ্বালা জুড়াইবার জন্য আত্মহত্যা করিবার সংকল্পও তিনি কখন কখন করিতে লাগিলেন। নিয়তই কাতরকণ্ঠে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন,—'প্রভো, আমার অদৃষ্টে কি মৃত্যু নাই ?' ঠিক এই সময় ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় রাজকৃষ্ণের সহায় হইলেন। সেই সহায়তার ফলে ষ্টার থিয়েটারে তাঁহার আশ্রয় মিলিল।…" (বঙ্গ-ভাষার লেখক/প্রথম ভাগ—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়) ষ্টারে তাঁর লেখা 'নরমেধযজ্ঞ', 'লয়লা-মজনু', 'বনবীর', 'ঋষ্যশৃঙ্গ', 'বেনজীর-বদ্‌রেমুনী'র প্রভৃতির অভিনয় হয়। মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা থিয়েটারের অকৃত্রিম হিতৈষী কবি-নাট্যকার, অভিনেতা ও রঙ্গালয়-স্বত্বাধিকারী রাজকৃষ্ণ রায় পরলোকগমন করেন।

ইণ্ডিয়ান থিয়েটার

রাজকৃষ্ণ রায়ের বীণা রঙ্গভূমি ত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে 'ইণ্ডিয়ান থিয়েটার' নামে এক সম্প্রদায় এখানে কিছুকাল আসর পাতে। এঁরা 'লক্ষহীরা' মঞ্চস্থ করেছিলেন বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই। ২৭ জানুয়ারি ১৮৯১ তারিখের 'অনুসন্ধান' পত্রিকা লিখেছে :—"ইণ্ডিয়ান

থিয়েটার' ভূতপূর্ব্ব 'বীণা থিয়েটারে'। সম্প্রতি উক্ত রঙ্গমঞ্চে 'লক্ষহীরা' নামক এক নূতন নাটকের অভিনয় হইতেছে। নাটকখানি কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়েরই লেখনীপ্রসূত। এ নাটকখানির অভিনয় দেখিয়া আমরা কিন্তু আশাতীত প্রীত হইয়াছি। এমনকি, 'বীণা-রঙ্গমঞ্চে' এরূপ সুন্দর অভিনয় আর যে হইয়াছিল, এমনও মনে হয় না। অথচ নাটকখানি বড়ই শিক্ষাপ্রদ—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের দেখিবার পক্ষে আরও উপযোগী। আমরা এ নাটকের সম্যক প্রতিষ্ঠার আশা করি।" পরবর্তীকালে এঁরা অভিনয় করেছেন 'লক্ষহীরা' ও 'কমলাকান্ত বা উকিল বিভ্রাট' (৭।২।১৮৯১), 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' এবং 'চতুরালী' (৮।২।১৮৯১), 'মীরাবাই' ও 'ঘোষের পো' (১১।২।১৮৯১) 'মীরাবাই' এবং 'ভণ্ড দলপতিদণ্ড' (২২।২।১৮৯১), 'লক্ষহীরা' (২৯।৩।১৮৯১) প্রভৃতি। এসময় দলের ম্যানেজার ছিলেন জে. চ্যাটার্জী।

সিটি থিয়েটার

পূর্বেই বলা হয়েছে, মার্চ-এপ্রিল ১৮৯১-তে বীণার স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়। আর সেই সময় এখানে জন্ম নেয় এক নতুন সম্প্রদায়—'সিটি থিয়েটার'। এই বছর ১৬ মে 'চৈতন্যলীলা' নাটক দিয়ে বীণা রঙ্গভূমিতে সিটি তার যাত্রা সুরু করে। প্রসঙ্গতঃ, এই সংস্থার জন্মেতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

১৮৯১ সালে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যুর পর শিশুপুত্রের কঠিন অসুখের জন্য গিরিশচন্দ্রের পক্ষে নিয়মিত ষ্টারে হাজিরা দেওয়া সম্ভব হত না। নিজেও তিনি তখন অসুস্থ। ফলে, অধ্যক্ষ হিসাবে গিরিশচন্দ্র সেসময় তাঁর কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে পারছিলেন না। এই সময় নবকুমার রাহা নামে এক ব্যক্তি ষ্টারে অবৈতনিক কর্মাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরই ভেদমন্ত্রপ্রভাবে

থিয়েটারের স্বত্বাধিকারীরা অযোগ্যতা এবং গাফিলতির অভিযোগে গিরিশচন্দ্রকে কর্মচ্যুতির পত্র দেন।[৫] নিজের হাতে গড়া শিষ্যদের কাছ থেকে এই রকম হৃদয়হীন দুর্ব্যবহার পেয়ে গিরিশচন্দ্র বিশেষ-রূপে মর্মাহত হন[৬] এবং তাঁর প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে ষ্টার কর্তৃপক্ষের আচরণের প্রতিবাদস্বরূপ নীলমাধব চক্রবর্তী, অঘোরনাথ পাঠক, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, রাণুবাবু, দানীবাবু, প্রমদাসুন্দরী, মানদাসুন্দরী প্রমুখ পনেরোজন (মতান্তরে এগারোজন)[৭] নট-নটী এই থিয়েটার পরিত্যাগ করেন। এঁদের দলপতি ছিলেন নীলমাধব চক্রবর্তী। ইনি ষ্টারের তৎকালীন প্রধান অভিনেতা অমৃতলাল মিত্রকে মনে মনে ঈর্ষা করতেন। তাঁর ধারণা ছিল নট হিসাবে তাঁর স্থান অমৃতলালের নীচে নয় এবং ভূমিকাবণ্টনের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতি অবিচার ও অমৃতলালের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ক'রে থাকেন। এই নীলমাধব চক্রবর্তী উদ্যোগী হয়ে উপরোক্ত শিল্পীদের সাহায্যে

৫ দ্র. গিরিশচন্দ্র—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

৬ বিডন স্ট্রীটের ষ্টারের চারজন স্বত্বাধিকারী অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, হরিপ্রসাদ বসু এবং দাসুচরণ নিয়োগী পরবর্তীকালে হাতিবাগানের ষ্টারেরও মালিকানা লাভ করেন। এঁরা সকলেই গিরিশচন্দ্রের শিষ্য অথবা শিষ্যপ্রতিম ছিলেন। গোপাললাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটারের ম্যানেজার হওয়ার দরুণ গিরিশচন্দ্র যে কুড়ি হাজার টাকা বোনাস পেয়েছিলেন, তার মধ্য থেকে ষোল হাজার টাকা তিনি তুলে দিয়েছিলেন এই শিষ্যদের হাতে হাতিবাগানে ষ্টারের বাড়ী তৈরীর জন্য। সেই কারণে এই আঘাত গিরিশচন্দ্রের বুকে প্রচণ্ডভাবে বেজেছিল। কেবল বরখাস্ত ক'রেই ষ্টারের তদানীন্তন মালিকরা নিরস্ত হন নি, তাঁর পূর্বে গিরিশচন্দ্রের নামে মস্তিষ্কবিকৃতির অপবাদও রটনা করেছিলেন। (দ্র. রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

৭ 'গিরিশচন্দ্র'রচয়িতা অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় শিল্পীসংখ্যা পনেরো ছিল ব'লে জানিয়েছেন। অপরেশচন্দ্রের 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থে এই সংখ্যা এগারো।

বীণা রঙ্গভূমিতে সিটি থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করলেন। দলের ম্যানেজারও হলেন তিনি। প্রসঙ্গতঃ, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ— "নীলমাধববাবু, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, অঘোর পাঠক, দানীবাবু, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে লইয়া হঠাৎ ষ্টার থিয়েটার পরিত্যাগ করিলেন। সীতার বনবাস অভিনয় হইবে, যবনিকা তুলিবার আগে দেখা গেল এগার জন অভিনেতা ও অভিনেত্রী নাই! শুনিয়াছি এই রাত্রে লোকাভাবে ষ্টারের সুযোগ্য ষ্টেজ ম্যানেজার ৺দাশুচরণ নিয়োগীকে শত্রুঘ্নের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। নীলমাধববাবু যে দল লইয়া বাহির হইলেন তাহার নাম হইল "সিটী থিয়েটার"। ছোট ষ্টেজ বীণা রঙ্গমঞ্চ ভাড়া লইয়া ইহাঁরা থিয়েটার খুলিলেন; গিরিশবাবু নেপথ্যে থাকিয়াই ইহাঁদিগকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। কাগজে কলমে তাঁহার নাম বিজ্ঞাপিত হইল না। না হইবার একটি কারণ ছিল। ষ্টারের কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত তাঁহার একটি এগ্রিমেণ্ট হয়। তাহাতে এই সর্ত্ত ছিল, গিরিশবাবু ইচ্ছা করিয়া যদি ষ্টার থিয়েটার ত্যাগ করেন তাঁহাকে ৫০০০৲ টাকা দিতে হইবে; আর ষ্টার থিয়েটার যদি তাঁহাকে ত্যাগ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে ষ্টারের পক্ষ হইতে মাসিক একশত টাকা দিতে হইবে।" (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর)

সিটি থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হলেন তিনজন—নীলমাধব চক্রবর্তী, অঘোরনাথ পাঠক এবং প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। গিরিশচন্দ্র অন্তরাল থেকে অর্থ, পরামর্শ ও নাটক দিয়ে এঁদের সাহায্য করতে রইলেন। সিটি থিয়েটার বীণা রঙ্গভূমিতে ১৮৯১ সালের ১৬ মে থেকে অভিনয় সুরু করলো। সেইদিন এঁরা 'চৈতন্যলীলা' মঞ্চস্থ করেছিলেন। পরদিন (১৭।৫) এখানে অভিনীত হয়েছে 'সরলা'। নতুন থিয়েটার সম্বন্ধে 'অনুসন্ধান' (২৮।৫।১৮৯১) জানালে ঃ— "ষ্টার থিয়েটার' হইতে ভাঙ্গিয়া আসিয়া একটি থিয়েটারের দল হইয়াছে; নাম হইয়াছে তার, 'সিটি থিয়েটার'। 'বীণা থিয়েটার'

ভাড়া লইয়া, এখন সেইখানেই তাঁহারা অভিনয় করিতেছেন। গত পূর্ব্ব রবিবারে উক্ত থিয়েটারে আমরা 'সরলা' নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলামও, অভিনয় সুন্দর। যেমনটি পূর্ব্বে ষ্টার থিয়েটারে দেখিয়াছিলাম, যেন তেমনটিই। 'সরলা'র অভিনয় যতই দেখি, ততই যেন নূতন। এ কোম্পানীরও অভিনয়ে বাহাদুরী আছে।..."

এঁরা এখানে 'চৈতন্যলীলা', 'বুদ্ধদেব-চরিত', 'মলিনা-বিকাশ', 'সীতার বনবাস', 'বিল্বমঙ্গল', 'বিবাহ বিভ্রাট',[৮] 'তরুবালা' প্রভৃতি পুরানো নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। ৩১ মে, ১৮৯১ এখানে মঞ্চস্থ হয়েছে 'বিল্বমঙ্গল' ও 'বিবাহ বিভ্রাট'। ২৪ জুন এবং ৯ আগস্টের নাটক যথাক্রমে 'বিল্বমঙ্গল' এবং 'তরুবালা'। 'লীলা' নামে একটি নতুন নাটকের উদ্বোধন হয় ৩ অক্টোবর তারিখে। এরপর ১৮৯১, ২৫ ডিসেম্বর সিটি থিয়েটারের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হল বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী'। নাট্যরূপ অতুলকৃষ্ণ মিত্রের দেওয়া। এই সব অভিনয়ের মাধ্যমে সম্প্রদায় যখন প্রতিষ্ঠা অর্জনে সুরু করেছে, বিপদ বেঁধে উঠলো ঠিক সেই সময়। 'ষ্টার' ভেঙ্গে 'সিটি' গড়ে ওঠার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সিটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দেখে ষ্টার এই সময় প্রতিদ্বন্দ্বী থিয়েটারকে জব্দ করার জন্য গিরিশ-চন্দ্রের লেখা নাটকের উপর নিজেদের একমাত্র অভিনয়-স্বত্ব দাবী ক'রে নীলমাধব চক্রবর্তী ও গিরিশচন্দ্রের নামে হাইকোর্টে মামলা রুজু ক'রে দিলে। মামলা চলার কিছুদিনের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে ষ্টারের মিটমাট হয়ে গেলেও, নীলমাধব চক্রবর্তী তথা সিটির সাথে মামলা চলতে রইলো। শেষ পর্যন্ত আদালতের বিচারে সাব্যস্ত হল মুদ্রিত নাটক বাজারে বিক্রী হতে সুরু করলে তা, সব থিয়েটারেই

---

৮ এই প্রহসনে ঝিয়ের ভূমিকায় অভিনয়ে তিনকড়ি দাসী বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন।

বিনা বাধায় মঞ্চস্থ হতে পারবে।[৯] মামলায় জিতে সিটি পূর্ণ উদ্যমে তার অভিযান সুরু করলে। ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯২ অভিনীত হল 'লক্ষহীরা'। এই সময়কার 'অনুসন্ধান' লিখেছে :—"সিটি থিয়েটার।— ষ্টার থিয়েটার হইতে একটী দল বহির্গত হইয়া আসিয়া এই 'সিটি থিয়েটারে'র সৃষ্টি। এক্ষণে ইহাঁরা 'বীণা রঙ্গালয়' ভাড়া লইয়া তথায় অভিনয়াদি করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁদের নিজেরও একটা রঙ্গ-ভূমির প্রতিষ্ঠা হইতেছে।[১০] যাই হোক ইহাঁদের অভিনয়াদি দেখিয়া আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাঁরা সর্ব্বথা উৎসাহ পান, এই বাসনা।" (১১।৪।১৮৯২) এদিকে তখন গিরিশচন্দ্র প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়ের অর্থে গ্রেট ন্যাশনালের জমিতে মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছেন। পূর্ব সিদ্ধান্ত মত, সিটি সম্প্রদায় এই সময় বীণা রঙ্গভূমি ছাড়তে বাধ্য হল। কেননা, কথা ছিল এঁদের নিয়েই হবে নতুন রঙ্গালয় মিনার্ভার উদ্বোধন।

৯ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন :—"হাইকোর্টে নীলমাধববাবুই জয়লাভ করিয়াছিলেন। জাষ্টিস্ উইলসন সাহেব বিচার করিয়া রায় প্রকাশ করেন,—যে কোনও মুদ্রিত নাটক বাজারে বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইলেই সে নাটক সকল থিয়েটারেই বিনা বাধায় অভিনীত হইতে পারিবে। বহুকাল পরে নূতন আইন প্রবর্ত্তনের ফলে নাটকাভিনয়ের এই স্বাধীনতা রহিত হয়।" (গিরিশচন্দ্র)

১০ মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠার (১৮৯৩) পূর্বে স্থির হয়েছিল, সিটি সম্প্রদায়ের অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে এর উদ্বোধন হবে। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থে জানিয়েছেন :—"বীণা ষ্টেজে স্থান সংকুলান হয় না, এদিকে ষ্টারের ব্যবহারে মর্মাহত গিরিশচন্দ্রের মাসে মাত্র একশত টাকা লইয়া বাড়ী বসিয়া থাকা অসহ্য হইয়া উঠিল; সুতরাং তিনি একটী নূতন থিয়েটার গঠনের সংকল্প করিলেন। মিনার্ভা সৃষ্টির ইহাই কারণ।"

ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউস

মিনার্ভায় যোগদানের জন্য বীণা রঙ্গভূমি থেকে সিটি বিদায় নেওয়ার পর ১৮৯২ সালের শেষের দিকে থিয়েটার বাড়ী কিনে নিলেন 'সুধাসিন্ধু'র স্বত্বাধিকারী প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়। ইনি মালিক হয়ে 'ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউস' নামে বীণা রঙ্গভূমির নতুন নামকরণ করলেন। কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদের দ্বারা অভিনয় করিয়ে এখানকার কর্তৃপক্ষ অভিনবত্বসৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন। 'অনুসন্ধান' (২৯।১১।১৮৯২) জানালে ঃ— "ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউস।— শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই রঙ্গভূমির স্বত্বাধিকারী। কবিবর রাজকৃষ্ণবাবুর 'বীণা থিয়েটার'টি ক্রয় করিয়া লইয়া, তিনি তাহার সম্পূর্ণ সংস্কার করিয়া লইয়াছেন; এবং 'ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউস' এই নামে তাহা পরিচিত হইতেছে। এখন ইহার দৃশ্যপট, সাজসজ্জা প্রভৃতি সমস্তই নূতন—প্রিয়নাথবাবু বহুল অর্থব্যয় করিয়া রঙ্গভূমির এই অভিনব সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। আরও একটা কথা এই উপলক্ষে বলা উচিত যে, আপাততঃ এখানে কেবলই স্ত্রীলোক দ্বারা অভিনয়-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে; আগে যেমন স্ত্রীলোকের সংস্রব ছিল না, এখন এখানে সেইরূপ পুরুষের সংস্রব নাই। সুতরাং এও একটা নূতনত্ব বলিতে হইবে।" কিন্তু এ-নতুনত্ব বেশীদিন টেঁকে নি। রাজকৃষ্ণ রায়ের স্ত্রী-বর্জিত অভিনয়প্রচেষ্টা যেমন প্রাথমিক পর্যায়েই ব্যর্থ হয়েছিল, এঁদের পুরুষ-বিরহিত নাট্যচর্চারও তেমনি অঙ্কুরে বিনাশ ঘটলো। কিছুদিনের মধ্যেই প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় 'ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউস' তুলে দিতে বাধ্য হলেন। সিটি সম্প্রদায় পুনরায় এসে আসর পাতলো বীণা রঙ্গভূমিতে।

আবার সিটি

গিরিশচন্দ্র, ষ্টার থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়ের অর্থানুকূল্যে ভূতপূর্ব গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের জমিতে ১৮৯৩ সালের ২৮ জানুয়ারি মিনার্ভা নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষুদ্রায়তন বীণা রঙ্গভূমিতে পর্যাপ্ত দর্শকের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও সিটি সম্প্রদায়ের যথেষ্ট অর্থ সমাগম হচ্ছিল না। এই অসুবিধা দূর করার সংকল্প নিয়ে গিরিশচন্দ্র নতুন রঙ্গালয় স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সিটিও পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বীণা রঙ্গভূমি ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওঁদের সঙ্গে মিনার্ভা কর্তৃপক্ষের বনিবনা হল না। সিটির কর্ণধার নীলমাধব চক্রবর্তী শেয়ার ভিন্ন মিনার্ভায় চাকুরী গ্রহণে অসম্মত হলেন।[১১] ফলে, সম্প্রদায়ের মিনার্ভাতে যোগদানের পরিকল্পনা কার্য্যকরী না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ওঁরা নীলমাধব চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পুনরায় বীণা রঙ্গভূমিতে ফিরে এলেন। অবশ্য, দানীবাবু, প্রমদাসুন্দরী প্রভৃতি ওঁদের কয়েকজন মিনার্ভাতেই যোগদান করেছিলেন।

৭ অক্টোবর, ১৮৯৩ 'সরলা' দিয়ে বীণা রঙ্গভূমিতে নব পর্যায়ে

১১ স্বত্বাধিকারী নাগেন্দ্রভূষণ লভ্যাংশ প্রদানের স্বীকৃতি দেওয়ায় নীলমাধব চক্রবর্তী তাঁর সিটি সম্প্রদায় সহ মিনার্ভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু রঙ্গালয় নির্মাণে ঋণগ্রস্ত হয়ে পরে নাগেন্দ্রভূষণ বলেন, ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত লভ্যাংশ প্রদান তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে, উভয়পক্ষে বিরোধ দেখা দেয়। মধ্যস্থ হিসাবে গিরিশচন্দ্র তখন প্রস্তাব দেন, ঋণ পরিশোধের পর নাগেন্দ্রভূষণ লভ্যাংশ দেবেন—এই মর্মে উভয়পক্ষে চুক্তি সম্পাদিত হোক্। নাগেন্দ্রভূষণ রাজী হলেও নীলমাধব এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় সিটি সম্প্রদায় পুনরায় বীণা রঙ্গভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে। (দ্র. গিরিশচন্দ্র —অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

সিটি থিয়েটারের উদ্বোধন হল। পরের দিন ওঁরা মঞ্চস্থ করলেন 'ধ্রুবচরিত্র' এবং 'বিবাহ বিভ্রাট'। এই অভিনয় দেখে 'অনুসন্ধান' লিখলে ঃ— "সিটি থিয়েটার।—নব আয়োজনে, নব উদ্যমে, নবীন উৎসাহে, এই রঙ্গভূমি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রঙ্গগৃহ পূর্ণ সংস্কৃত ; রঙ্গমঞ্চ সুন্দররূপে সুসজ্জিত ; বেশভূষারও সমূহ পারিপাট্য ; দৃশ্যতঃ এবার ইহাঁদের কোন অভাব পরিলক্ষিত হইল না। অভিনেতাগণ সুদক্ষ, সুশিক্ষিত, সুনির্ব্বাচিত। অভিনেত্রীগণও প্রথিতনামা ও প্রতিষ্ঠাপন্না। সুতরাং সে পক্ষেও এবার যে ইহাঁরা কোনই ক্রটি রাখেন নাই, তাহাও বুঝা যায়। গত ২৩এ আশ্বিন, রবিবার আমরা এই রঙ্গালয় পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সেদিন 'ধ্রুবচরিত্র' নাটক ও 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয়ও যাহা দেখিলাম, সুন্দর। অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ, কেহই কোন অংশে কম নহেন। হবার'ও কথা অবশ্য ছিল না। 'ষ্টার থিয়েটারে'র সেই সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা বাবু নীলমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বয়ং 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র বরকর্ত্তা সাজিয়াছিলেন ; বাবু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিলাত-ফেরত যুবক সাজিয়াছিলেন ; মিসেস কারফর্ম্মাও পাকা ; ঝিও সেই পুরাতন। সুতরাং না হইবে কেন ? 'বিবাহ-বিভ্রাট' অতি সুন্দর অভিনীত হইয়াছিল। 'ষ্টার থিয়েটারে' প্রথম-প্রথম 'বিবাহ-বিভ্রাট' যেরূপ সুচারুরূপে অভিনীত হইত, বুঝিলাম, ইহাঁরাও ঠিক সেই ভাবই উদ্দীপিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য বড়ই প্রশংসার কথা, এবং 'সিটি'র অভিনেতাদিগের সম্যক গুণপনার পরিচায়ক। 'ধ্রুবচরিত্রে'ও অবশ্য অভিনয়াংশে কোন ক্রটি দেখিলাম না। যা কিছু ক্রটি— সে পুস্তকের! নহিলে, এরূপ দক্ষতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল যে, তাহা বলিবার নহে। রাজা, সুনীতি সুরুচি— দুই রানী, ধ্রুব, সকলকেই প্রশংসা করিতে হয়। ফলতঃ সিটি থিয়েটার, দল-সংগঠন ও রঙ্গভূমি-সংস্করণ—উভয় কার্য্যেই প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছেন। ইহাঁদের অভিনয়-দর্শনে

সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন, আশা করি।" (১৬।১০।১৮৯৩) ১৮৯৩ সালে এঁরা 'আনন্দলহরী বা হরিলীলা' এবং 'কষ্টিপাথর' নামে আরও দু'খানি নাটক মঞ্চস্থ করেন।

১৮৯৪-এর গোড়ার দিকে সিটিতে 'প্রফুল্ল', 'সরলা', 'বেহদ্দ বেহায়া', 'নল-দময়ন্তী', 'চোরের উপর বাটপাড়ি' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হল। এসব অভিনয় দেখে 'পুরোহিত' (এপ্রিল-মে, ১৮৯৪) অভিমত প্রকাশ করলে :—"সিটি থিয়েটার।— আমরা সিটি থিয়েটারে "নল-দময়ন্তী" ও "চোরের উপর বাটপাড়ী" অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সেদিন নল, দময়ন্তী, বিদূষক ও কলির অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইয়াছিল। রাজকুমারী সুনন্দার অংশের অভিনয়কারিণীর কণ্ঠস্বর অতি মধুর; গীতে দর্শকবৃন্দ-মাত্রেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। সে গান, অন্যত্র শুনিয়াছি; এমন সুচারু হয় নাই। সিটি থিয়েটারের অভিনেতারা ও অভিনেত্রীরা অনেকেই সুদক্ষ। নিজ নিজ অংশ অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে তাঁহারা সকলেই সযত্ন। বিষয় পুরাতন হইলেও, সুদক্ষ অভিনেতা অভিনেত্রী দ্বারা অভিনীত "নল-দময়ন্তী" দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। "চোরের উপর বাটপাড়ী" অভিনয়ে আমরা আরও সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। প্রহসন অভিনয়ে "সিটি থিয়েটারে"র অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ যে বিশেষ নিপুণ, তাহা "চোরের উপর বাটপাড়ী" দেখিয়া জানা গিয়াছে। অন্যত্র ইহার যে অভিনয় দেখা গিয়াছিল, তদাপেক্ষা ইহা অনেক উন্নত। এখানকার "প্রফুল্ল", "সরলা", "বেহদ্দ-বেহায়া" দেখিবার জিনিষ। উহাদের কাহাকে রাখিয়া কাহার প্রশংসা করিব, বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। বিস্তৃত সমালোচন পরে প্রকাশ্য। "বেহদ্দ-বেহায়া" উত্তম প্যাণ্টোমাইম ও প্রহসন।" 'সরলা' প্রসঙ্গে পত্রিকাখানি জানালে :—"সিটি-থিয়েটারে—প্রসিদ্ধ সরলার অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। সরলায় সিটির প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বাড়িতেছে দেখিয়া

আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। 'সরলা' তারকনাথের অক্ষয় কীর্ত্তি। তাহার অভিনয়ে সিটি থিয়েটার, গ্রন্থকারের প্রতিপত্তি সম্পূর্ণ অক্ষত রাখিয়াছেন।…প্রধানা নায়িকা প্রমদার অংশ ও নায়ক শশিভূষণের অংশ, বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। বিধুভূষণ এক বিচক্ষণ অভিনেতা। এই নাটকের মেরুদণ্ডস্বরূপা সরলার অংশও বেশ সঙ্গতরূপে অভিনয় হইয়াছে। ঠাকরুণদিদি ও শ্যামা, বিচক্ষণতার বেশ পরিচয় দিয়াছেন।…" (মে-জুন, ১৮৯৪)

এরপর বীণা রঙ্গভূমিতে সিটি সম্প্রদায়ের অভিনয় কিছুদিন বন্ধ থাকে। ১৮৯৬ সালে আবার অভিনয় সুরু হয়। সেই সময়কার মঞ্চস্থ নাটকের মধ্যে 'মোহমুক্তি বা সুধন্যবধ' (৩০।৫।১৮৯৬) উল্লেখ-যোগ্য। কিছুদিন বাদে বীণা মঞ্চ থেকে সিটি থিয়েটার পুনরায় বিদায় নেয়। রঙ্গমঞ্চ শূন্য পড়ে থাকায় এই সময় এখানে 'প্যাণ্ডোরা থিয়েটার' নামে এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। রঙ্গভূমির মালিক তখনও প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়। হিঙ্গুল খা (অপেরামাস্টার), পরবর্তীকালের কৃতী নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পেশাদার হিসাবে এই তাঁর প্রথম মঞ্চাবতরণপ্রচেষ্টা) প্রভৃতি এই প্রয়াসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' দিয়ে মহলা আরম্ভ হলেও, নানা কারণে অভিনয় সুরু করার পূর্বেই [illegible]টি ভেঙ্গে যায়। সেই সময় অমরেন্দ্রনাথ দত্তও বীণা রঙ্গভূমিতে নিজস্ব সম্প্রদায় নিয়ে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করছিলেন কিন্তু তিনিও একাজে সফল হন নি। শেষ পর্যন্ত সিটি থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা নীলমাধব চক্রবর্তীই ভিতরে ভিতরে সমস্ত ব্যবস্থা চূড়ান্ত ক'রে পুনরায় বীণা রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হলেন। তবে, 'সিটি'র পরিবর্তে এবার তাঁর সম্প্রদায়ের নাম হল—'গেইটী'। কিন্তু গেইটী এখানে সুবিধা করতে পারে নি, কয়েক মাসের মধ্যেই থিয়েটার উঠে য[illegible]। এঁরা বীণা রঙ্গভূমিতে 'মকরে নিতাই', 'প্রলয়ঙ্করী', 'নৈরাকার' প্রভৃতি অভিনয় করেছিলেন। মনে হয়, অন্য থিয়েটারকে বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যেই যেন এঁরা

আবির্ভূত হয়েছিলেন।[১২] কয়েক মাস বাদে সেইটী থিয়েটার বীণা মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে পুনরায় 'সিটি' নাম ধ'রে এমারেল্ড মঞ্চে অভিনয় করতে রইলো আর ৩৮ নম্বর মেছুয়াবাজার রোডের রাজকৃষ্ণ রায়ের সাধের বীণা রঙ্গভূমি পড়ে রইলো শূন্য, অবহেলিত, অনাদৃত। এর অনেক পরে এখানে অবশ্য আবার জনসমাগম হ'তে সুরু হয়েছিল। তবে, মঞ্চে তখন নাটকাভিনয় বন্ধ হয়ে গেছে—পরিবর্তে আত্মপ্রকাশ করেছে সদ্য আবিষ্কৃত বায়স্কোপ। রঙ্গগৃহের বর্তমান রূপটি সেই ধারানুসারী।

১২ "অন্য থিয়েটারকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যেই যেন ইহা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হয়। যেমন ষ্টার করিলেন স্ত্রীবুদ্ধি, তাহারা করিল প্রলয়ঙ্করী। মিনার্ভা করিল কর্মেতিবাই, তাহারা করিল মকরে নিতাই। একাকারের প্রত্যুত্তরে করিল নৈরাকার—এইরূপ। তবে তাহারাও বেশীদিন চালাইতে পারে নাই।" (ভারতীয় নাট্যমঞ্চ—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত)

পরিশিষ্ট

ক. অভিনয়-তালিকা

চন্দ্রহাস	রাজকৃষ্ণ রায়	ডিসেম্বর, ১৮৮৭
চতুরালী	"	১০।১২।১৮৮৭
চন্দ্রাবলী	"	"
প্রহ্লাদ-চরিত্র	"	১৮।১২।১৮৮৭
চৈতন্যলীলা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	মে, ১৮৮৮
চন্দ্রহাস		"
হরিদাস ঠাকুর	রাজকৃষ্ণ রায়	১৭।৬।১৮৮৮
ভ্রান্তিবিলাস	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	২৫।৮।১৮৮৮
দশরথের মৃগয়া বা বালক সিন্ধুবধ	রাজকৃষ্ণ রায়	২।৯।১৮৮৮
কলির প্রহ্লাদ	"	"
দাদা ও আমি	উপেন্দ্রনাথ দাস	৮।১২।১৮৮৮
শরৎ-সরোজিনী	"	১৬।১২।১৮৮৮
সধবার একাদশী	দীনবন্ধু মিত্র	২৫।১২।১৮৮৮
সুরেন্দ্র-বিনোদিনী	উপেন্দ্রনাথ দাস	১৯।১।১৮৮৯
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ	মধুসূদন দত্ত	২০।১।১৮৮৯
হিরণ্ময়ী	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	২।২।১৮৮৯
সুরেন্দ্র-বিনোদিনী		৩।২।১৮৮৯
বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা	—	"
মীরাবাই	রাজকৃষ্ণ রায়	২০।৭।১৮৮৯
লীলাবতী	দীনবন্ধু মিত্র	৩।৮।১৮৮৯
শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা	রাজকৃষ্ণ রায়	২১।৯।১৮৮৯
সধবার একাদশী		২২।৯।১৮৮৯
মীরাবাই		"
ভ্রান্তিবিলাস		"
চমৎকার	রাজকৃষ্ণ রায়	নভেম্বর, ১৮৮৯
ঘোষের পো	—	"

রুক্মিণীহরণ	—	১৪।১২।১৮৮৯
খোকাবাবু	রাজকৃষ্ণ রায়	”
মীরাবাই		১৫।১২।১৮৮৯
ঘোষের পো	—	”
হরধনুর্ভঙ্গ	রাজকৃষ্ণ রায়	২৮।১২।১৮৮৯
খোকাবাবু		”
মেড়ার মেলা	—	২৯।১২।১৮৮৯
মীরাবাই		”
রাজা বিক্রমাদিত্য	রাজকৃষ্ণ রায়	১১।১।১৮৯০
হরধনুর্ভঙ্গ		১৫।৩।১৮৯০
খোকাবাবু		”
মীরাবাই		১৬।৩।১৮৯০
চন্দ্রাবলী		২৬।৭।১৮৯০
প্রহ্লাদ-মহিমা	রাজকৃষ্ণ রায়	১।১১।১৮৯০
মীরাবাই		২।১১।১৮৯০
লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র	রাজকৃষ্ণ রায়	”
জটিল	—	১৫।১১।১৮৯০
চন্দ্রাবলী		”
লক্ষহীরা	রাজকৃষ্ণ রায়	জানুয়ারি, ১৮৯১
লক্ষহীরা		৭।২।১৮৯১
কমলাকান্ত বা উকিল বিভ্রাট	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	”
প্রহ্লাদ-চরিত্র		৮।২।১৮৯১
চতুরালী		”
মীরাবাই		১১।২।১৮৯১
ঘোষের পো	—	”
মীরাবাই		২২।২।১৮৯১
ভণ্ড দলপতি দণ্ড	যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	”
লক্ষহীরা		২৯।৩।১৮৯১
চৈতন্যলীলা		১৬।৫।১৮৯১

সরলা	তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' অবলম্বনে অমৃতলাল বসু কৃত নাট্যরূপ	১৭।৫।১৮৯১
বিল্বমঙ্গল ঠাকুর	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৩১।৫।১৮৯১
বিবাহ বিভ্রাট	অমৃতলাল বসু	”
বিল্বমঙ্গল ঠাকুর		২৪।৬।১৮৯১
তরুবালা	অমৃতলাল বসু	৯।৮।১৮৯১
লীলা	—	৩।১০।১৮৯১
দেবী চৌধুরাণী	নাট্যরূপ-অতুলকৃষ্ণ মিত্র	২৫।১২।১৮৯১
লক্ষহীরা		৭।২।১৮৯২
সরলা		৭।১০।১৮৯৩
ধ্রুবচরিত্র	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৮।১০।১৮৯৩
বিবাহ বিভ্রাট		”
মোহমুক্তি বা সুধন্যবধ	—	৩০।৫।১৮৯৬

খ. অভিনেতৃ সম্প্রদায়

রাজকৃষ্ণ রায়, অক্ষয়কালী কোঙার, শরৎ কর্মকার, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, উপেন্দ্রনাথ দাস, বিনোদ সোম, নীলমাধব চক্রবর্তী, অঘোরনাথ পাঠক, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু), দানীবাবু, তিনকড়ি দাসী, প্রমদাসুন্দরী, মানদাসুন্দরী প্রভৃতি।

গ. সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

৩৮ মেছুয়াবাজার রোড, কলকাতা

বীণা রঙ্গভূমি

প্রথম অভিনীত নাটক—(চন্দ্রহাস) ডিসেম্বর, ১৮৮৭

শেষ নাটক—(প্রহ্লাদ-চরিত্র) ১৮।১২।১৮৮৭ (প্রথম পর্যায়)

প্রথম অভিনীত নাটক—(মীরাবাই) ২০।৭।১৮৮৯

শেষ নাটক—(চন্দ্রাবলী) ১৫।১১।১৮৯০ (দ্বিতীয় পর্যায়)

আর্য্য-নাট্য-সমাজ

প্রথম অভিনীত নাটক—(চৈতন্যলীলা) মে, ১৮৮৮

শেষ নাটক—(কলির প্রহ্লাদ) ২।৯।১৮৮৮

নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার

প্রথম অভিনীত নাটক—(দাদা ও আমি) ৮।১২।১৮৮৮

শেষ নাটক—(বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা) ৩।২।১৮৮৯

ইণ্ডিয়ান থিয়েটার

প্রথম অভিনীত নাটক—(লক্ষহীরা) জানুয়ারি, ১৮৯১

শেষ নাটক—(লক্ষহীরা) ২৯।৩।১৮৯১

সিটি থিয়েটার

প্রথম অভিনীত নাটক—(চৈতন্যলীলা) ১৬।৫।১৮৯১

শেষ নাটক—(লক্ষহীরা) ৭।২।১৮৯২ (প্রথম পর্যায়)

প্রথম অভিনীত নাটক—(সরলা) ৭।১০।১৮৯৩

শেষ নাটক—(মোহমুক্তি বা সুধন্যবধ) ৩০।৫।১৮৯৬ (দ্বিতীয় পর্যায়)

ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউস

(সিটি থিয়েটারের উভয় পর্যায়ের অভিনয়ের মধ্যে ১৮৯২ সালের শেষের দিকে নতুন মালিকানায় বীণা রঙ্গভূমির নতুন নামকরণ হয়—'ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউস'। এঁদের অভিনীত নাটকের নাম ও তারিখ পাওয়া যায় নি। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে।)

প্যাণ্ডোরা থিয়েটার

(সিটি থিয়েটারের দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিনয় শেষ হওয়ার পর এই সম্প্রদায় গঠিত হয় কিন্তু কোনো নাটক অভিনয়ের পূর্বেই দল ভেঙ্গে যায়।)

গেইটী থিয়েটার

(সিটি থিয়েটারের পরবর্তীকালে পরিবর্তিত নাম। এই সম্প্রদায় অবশ্য কিছু কিছু নাটক বীণা রঙ্গভূমিতে অভিনয় করেছিল কিন্তু তাদের অভিনয়-তারিখ অজ্ঞাত।)

* শেষ নাটক বলতে নাট্যসম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত সম্ভাব্য শেষ নাটক বলা হচ্ছে। এরপরেও কর্তৃপক্ষ অন্য কোনো নাটক অভিনয় ক'রে থাকতে পারেন, কিন্তু সূত্র অজানা থাকায় জ্ঞাত শেষ নাটককেই 'শেষ নাটক' বলা হয়েছে।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

মঞ্চসেবী পরিচিতি

অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭-১৯১২)

নাট্যকার ও সাংবাদিক। ১৮৫৭, ২২ নভেম্বর কলকাতায় ঠনঠনিয়ায় জন্ম। পিতা—রাজকৃষ্ণ মিত্র। শৈশবে পিতৃবিয়োগ ঘটে। সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম যুগের অভিনয় দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে কৈশোরে সমবয়স্কদের নিয়ে অবৈতনিক নাট্যসমাজ গঠন ও 'পাগলিনী' নামে এক নাটক রচনা করেন। প্রতিবেশী ও বন্ধু রঙ্গালয়ের সুরশিল্পী রামতারণ সান্যালের উৎসাহে ও সহায়তায় অতুলকৃষ্ণের একাধিক গীতিনাট্য সাধারণ রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ হয়। রামতারণ অতুলকৃষ্ণের গানে সুরসংযোজনা করতেন। গীতিনাট্যকার হিসাবে অতুলকৃষ্ণ মিত্র সেকালে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ১৮৮৩-র মধ্যভাগে প্রকাশিত 'আন্দোলন' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। রঙ্গালয় থেকে বিদায় নেওয়ার পর বন্ধুবর উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—প্রবর্তিত সাপ্তাহিক বসুমতীর (প্রথম প্রকাশ —১৮৯৬, ৮ আগস্ট) ভার নেন। 'আদর্শ সতী', 'নন্দবিদায়', 'বাপ্পারাও', 'শিরী-ফরহাদ', 'লুলিয়া', 'তুফানি', 'পাষাণে প্রেম', 'প্রাণের টান', 'মোহিনী-মায়া' প্রভৃতি অতুলকৃষ্ণ রচিত বহু নাটক ও গীতিনাট্য বিভিন্ন থিয়েটারে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। মৃত্যু : ৭ অক্টোবর, ১৯১২।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৭৫-১৯৩৪)

নট, নাট্যকার ও নাট্যালয়াধ্যক্ষ। অল্প বয়সে রঙ্গালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। এ্যামেচার অবস্থায় মহেন্দ্রলাল বসুর কাছে অভিনয় শিক্ষা করেন। পরবর্তী-কালের নাট্যগুরু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। ১৯০৪-এ মিনার্ভায় 'কপালকুণ্ডলা'তে নবকুমারের ভূমিকায় পেশাদার নটরূপে প্রথম আবির্ভাব ঘটে। বিভিন্ন সময়ে মিনার্ভা, কোহিনূর, ষ্টার প্রভৃতি নাট্যশালার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বহু মঞ্চসফল নাটকের স্রষ্টা। ১৯২৩ সালে ষ্টারে আর্ট থিয়েটারের পতাকাতলে 'কর্ণার্জুন' রচনা ও প্রযোজনায় অপরেশচন্দ্র বাংলা থিয়েটারে নবযুগের সূচনা করেন।

"...অপরেশচন্দ্র ছিলেন এখনকার বাংলা নাট্যজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নাট্যকার।...অপরেশচন্দ্রের শক্তি ঐ নাটকগুলিকে সফল ক'রে আমাদের নাট্যজগতে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করেছিল :—'অযোধ্যার বেগম', 'কর্ণার্জ্জুন', 'ইরানের রানী', 'চণ্ডীদাস', 'মন্ত্রশক্তি', 'পোষ্যপুত্র' ও 'মা।'

…অভিনেতারূপেও অপরেশচন্দ্র বাংলা নাট্যজগতের উপরে একটি বিশিষ্ট ছাপ রেখে গেছেন।…বিভিন্ন ভূমিকায় হাস্য ও করুণ রস সৃষ্টিতে তিনি যে বিচিত্র শক্তির পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন তা অপূর্ব্ব ব'ললেও অত্যুক্তি হবে না।… নিজের নট-জীবনের অধিকাংশ ভাগই তিনি অধ্যক্ষতা ক'রে কাটিয়ে গেছেন। …কেবল অধ্যক্ষরূপেই বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকতে পারতেন।…" (নাচঘর)

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬)

নট, নাট্যকার ও রঙ্গালয়াধ্যক্ষ। ১ এপ্রিল, ১৮৭৬ জন্ম। পিতা দ্বারকানাথ রেলি ব্রাদার্সের মুৎসুদ্দি ছিলেন। মধ্যম অগ্রজ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত দার্শনিকরূপে প্রসিদ্ধ। অমরেন্দ্রনাথ ১৬ এপ্রিল, ১৮৯৭ ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'নল-দময়ন্তী' নাটকে নলের ভূমিকায় প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হন। বিভিন্ন সময়ে গ্র্যাণ্ড, নিউ ক্লাসিক, ষ্টার, মিনার্ভা ও গ্রেট ন্যাশনাল (১৯১১) প্রভৃতি নাট্যশালার সঙ্গে স্বত্বাধিকারী, পরিচালক এবং অভিনেতা হিসাবে জড়িত ছিলেন। 'সৌরভ', 'রঙ্গালয়' ও 'নাট্যমন্দির' নামে তিনখানি সাময়িক-পত্রের স্রষ্টা। এঁর রচিত 'কাজের খতম', 'দোললীলা', 'শ্রীকৃষ্ণ', 'মজা', 'দুটী প্রাণ', 'প্রণয় না বিষ' (নাট্যরূপ) প্রমুখ পঞ্চরং, গীতিনাট্য এবং নাটক সেকালের রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। হরিরাজ (হরিরাজ), হুসেন (আলিবাবা), গোবিন্দলাল (ভ্রমর), ভীম (পাণ্ডব-গৌরব), কুলীরক (সওদাগর) প্রভৃতি অমরেন্দ্রনাথ অভিনীত প্রসিদ্ধ ভূমিকা। ১২ ডিসেম্বর, ১৯১৫ ষ্টারে ঔরংজীব (সাজাহান) রূপে শেষ অভিনয়। সমকালীন রঙ্গমঞ্চের সংস্কারসাধনে এঁর আন্তরিক প্রয়াস সপ্রশংস উল্লেখের দাবী রাখে। মৃত্যু: ৬ জানুয়ারি, ১৯১৬।

"অতীতকালে অমরেন্দ্রনাথই একমাত্র নট—যাঁহার নামে দর্শক আকৃষ্ট হইত।" (বাঙলা)

অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)

নট, নাট্যকার ও নাট্যাধ্যক্ষ। সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৭২, ৭ ডিসেম্বর পাবলিক থিয়েটারের প্রথম অভিনয় 'নীলদর্পণ' নাটকে

সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। নটজীবনের আদি পর্ব কাটে গ্রেট ন্যাশনাল ও ন্যাশনাল থিয়েটারে। ১৮৭৫ সালে কয়েক মাসের জন্য প্রথমোক্ত রঙ্গালয়ের ম্যানেজার ছিলেন। ১৮৮২-তে কিছুদিনের জন্য বেঙ্গল থিয়েটার লিজ নেন। ষ্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার সময় (১৮৮৩) থেকে দীর্ঘকাল এই মঞ্চের সঙ্গে জড়িত থাকেন। ইনি ছিলেন ষ্টারের অন্যতম অংশীদার, ম্যানেজার, নাট্যকার ও বিশিষ্ট অভিনেতা। সুদীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল অমৃতলাল যোগ্যতা এবং সুনামের সঙ্গে ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষতা করেন। এঁর রচিত প্রথম নাটক 'মডেল স্কুল' ৮ মার্চ, ১৮৭৩ ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। "প্রহসন-জাতীয় সাহিত্যে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পকার ছিলেন।" অমৃতলাল রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক :—'বিবাহ বিভ্রাট' (১৮৮৪), 'তরুবালা' (১৮৯১), 'বাবু' (১৮৯৪), 'খাস-দখল' (১৯১২), 'ব্যাপিকাবিদায়' (১৯২৬) প্রভৃতি। অভিনেতা হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। দোকড়ি সেন (বেল্লিক বাজার), কৃষ্ণকান্ত (কৃষ্ণকান্তের উইল), নীলকমল (সরলা), নিতাই (খাস-দখল), রমেশ (প্রফুল্ল), বিহারী খুড়ো (তরুবালা) প্রমুখ চরিত্রে অমৃতলালের অভিনয় স্মরণীয় হয়ে আছে। রঙ্গালয়ে তিনি 'ভুনীবাবু' নামে পরিচিত ছিলেন।

"হাস্যরসাভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুবাবু, বেলবাবু এবং ভুনীবাবু এই তিনজনেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।···যে চরিত্রে শ্লেষ আছে—তাহার অভিনয়ে ভুনীবাবু অতুলনীয়।···" (গিরিশচন্দ্র)

"···অমৃতলাল খুব বড়লোক ছিলেন। তিনি একজন খুব ব[illegible] প্রতিভা, বড় বাগ্মী, বড় লেখক, বড় নাট্যকার, বড় নট। কিন্তু তাঁর একটা রূপ আমার কাছে সবচেয়ে বেশী নিকট, বেশী অন্তরতম—সে হচ্ছে তাঁর নটরূপ। তিনি নটশ্রেষ্ঠ ছিলেন, নটনায়ক ছিলেন, তাই তিনি নটজাতিকে উন্নত করবার চেষ্টা করেছিলেন, সমাজের কাছ থেকে তাঁর আসন আদায় করে নিয়েছিলেন।··· অমৃতলাল তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দিয়ে নটকে জাতির মধ্যে বসিয়েছিলেন, সেইজন্য তাঁকে স্মরণ করি।"···(শিশিরকুমার)

অমৃতলাল মিত্র (?-১৯০৮)

নাট্যাভিনেতা। গিরিশ-সখা গোপাল মিত্রের পুত্র। ন্যাশনাল থিয়েটারে (১৮৭৩) 'কপালকুণ্ডলা' নাটকে নবকুমারের ভূমিকায় মহেন্দ্রলাল বসুর অভিনয় দেখে নাট্যকলায় অনুরক্ত হন। গিরিশচন্দ্রের যৌবনকালে রচিত প্রায়

প্রতিটি বিয়োগান্ত নাটকের নায়ক অমৃতলাল। ১ ডিসেম্বর, ১৮৭৭ ন্যাশনালে 'মেঘনাদবধ' নাটকে রাবণ চরিত্রে প্রথম আবির্ভাব। ষ্টারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ছিলেন এবং আমৃত্যু এই মঞ্চে অভিনয় করেন। বিখ্যাত ভূমিকা :—মহাদেব (দক্ষযজ্ঞ), নল (নল-দময়ন্তী), বুদ্ধ (বুদ্ধদেব-চরিত), বিল্বমঙ্গল (বিল্বমঙ্গল ঠাকুর), চন্দ্রশেখর (চন্দ্রশেখর) ও যোগেশ (প্রফুল্ল)। অমৃতলাল মিত্র ক্যানসার রোগে ২৭ জুন, ১৯০৮ মারা যান।

"……অমৃতলালের কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট ছিল। করুণ ও বীররসের অভিনয়ে তাঁহার সমান পটুতা ছিল; তিনি কথা কহিলে লোকের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিত।…অমৃতলালের কণ্ঠস্বরে এমন একটা সুরের মাধুর্য্য ছিল—যাহা তাঁহার কণ্ঠেই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত, এবং সত্যই সেটি তাঁহার স্বাভাবিক সম্পদই ছিল। তাহা নিতান্তই অননুকরণীয়।…" (অপরেশচন্দ্র)

অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (?-১৮৯০)

নৃত্যগীতনিপুণ নট। 'বেলবাবু' বা 'কাপ্তেন বেল' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রথম দিকে স্ত্রীভূমিকায় অভিনয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। হাল্কা এবং গম্ভীর—উভয় শ্রেণীর চরিত্রাভিনয়ে এঁর দক্ষতা ছিল। ভজহরি (প্রফুল্ল), গদাধরচন্দ্র (সরলা), সেলিম (আনন্দ রহো), চৈতন্য (রূপ-সনাতন) প্রভৃতি বেলবাবু অভিনীত প্রসিদ্ধ ভূমিকা। ১৮৯০, ১১ মার্চ তিনি আত্মহত্যা করেন।

"…প্যান্টোমাইম অভিনয়ে কাপ্তেন বেল অদ্বিতীয় ছিলেন।…ক্লাউন সাজিবার বেলবাবুর অসাধারণ দক্ষতা ছিল।…'সরলা'য় গদাধরচন্দ্রের অভিনয়—বেলবাবুর অক্ষয় কীর্ত্তি। 'বেলবাবু' নিজে Paint করিয়া মনোমত সাজিতেন, অতি সুন্দর সাজিতেন, সাজিবার তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। হাস্যরসাভিনয়ে বেলবাবুর একাধিপত্য ছিল; গম্ভীর ভূমিকার অভিনয়েও প্রতিভা স্ফুরিত হইত।…" (গিরিশচন্দ্র)

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী (১২৫৮-১৩১৫ বঙ্গাব্দ)

অমৃতলাল বসুর ভাষায় :—"অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী—বিধাতার হাতে গড়া একটার ও অতুলনীয় নাট্যশিক্ষক।" জন্ম : ১২৫৮, ১০ মাঘ (মতান্তরে ১২৫৬, ১৮ মাঘ)। পিতা—শ্যামাচরণ মুস্তফী। প্রথম অভিনয় ১৮৬৭, ২

নভেম্বর 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনে দন্তবক্র, মুরাদ আলী ও চন্দনবিলাসের ভূমিকায়। ১৯০৮, ৯ আগস্ট কোহিনূর থিয়েটারে 'নবীন তপস্বিনী' ও 'প্রফুল্ল' নাটকে যথাক্রমে জলধর ও যোগেশরূপে শেষ অভিনয় করেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর-অভিনীত কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকা:—জলধর (নবীন তপস্বিনী), ধনদাস (কৃষ্ণকুমারী নাটক), গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ (দুর্গেশনন্দিনী) ও আবু হোসেন (আবু হোসেন)। মৃত্যু: ১৩১৫, ৩১ ভাদ্র।

"...অর্দ্ধেন্দুশেখর দুরন্ত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ..অর্দ্ধেন্দুশেখর অভিনেতা হিসাবে গিরিশচন্দ্রের প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি গিরিশচন্দ্রের চেয়ে অধিকতর কৃতকার্য হয়েছিলেন।..." (শিশিরকুমার)

"...বাঙ্গালায় অর্দ্ধেন্দুশেখর একজন বড় অভিনেতা ছিলেন। যাঁহারা ইউরোপে নানা দেশীয় রঙ্গমঞ্চে বড় বড় অভিনেতার অভিনয় দেখিয়াছেন, আর বাঙ্গালায় অর্দ্ধেন্দুশেখরকেও অভিনয় করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, ইউরোপে জন্মিলে তিনি ইউরোপের নট-তালিকায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারিতেন।......শিক্ষকতায় তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল।..." (অপরেশচন্দ্র)

অহীন্দ্র চৌধুরী

অভিনেতা ও পরিচালক। জন্ম: ২১ শ্রাবণ, ১৩০২। ষ্টারে আর্ট থিয়েটারের পতাকাতলে ১৯২৩ সালে যে নবাগত শিল্পীদল বাংলা থিয়েটারে যুগান্তর আনয়ন করেন, তাঁদের পুরোধা। পরবর্তীকালে ষ্টার ব্যতীত মনোমোহন, মিনার্ভা, রঙমহল, নাট্যনিকেতন, নাট্যভারতী প্রভৃতি সমকালীন প্রায় সমস্ত রঙ্গালয়ের সঙ্গে কোনো না কোনো সময় জড়িত ছিলেন। নানা বিচিত্র ভূমিকার রূপায়ণে এঁর দক্ষতা সর্বজনবিদিত। মঞ্চের ইতিহাসে চরিত্রোপযোগী নিখুঁত রূপসজ্জার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। প্রসিদ্ধ ভূমিকা:—সাজাহান (সাজাহান), আবন (মিশরকুমারী) অরবিন্দ (মা), মৃগাঙ্ক (মন্ত্রশক্তি), ডা: ভোস (তটিনীর বিচার), চন্দ্রবাবু (চিরকুমার সভা), অধিকারী (কপালকুণ্ডলা), চাঁদ সদাগর (চাঁদ সদাগর), কৈলাস খুড়ো চন্দ্রনাথ), শকুনি (চক্রব্যূহ), ভোলামাস্টার (ভোলামাস্টার) প্রভৃতি। ১৯৫৭ সালে মঞ্চ ও চিত্রজগৎ থেকে অবসর নেন। আমাদের দেশে শিক্ষার উচ্চতম পর্যায়ে অভিনয়কলার বিজ্ঞান-সম্মত পাঠক্রম রচনা ও প্রবর্তনার কৃতিত্ব তাঁরই। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে

অভিনয় ও চারুকলার 'ডীন' ছিলেন। সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধিলাভ করেন। পদ্মশ্রী ও অন্যান্য খেতাবও পান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশ-লেকচারার (১৯৫৭)। রচিত গ্রন্থ:—'বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র' এবং 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' (স্মৃতিকথা)।

"…নাটকের প্রতিটি মুহূর্তকে তিনি ইমোশান দিয়ে, আঙ্গিক অভিব্যক্তি দিয়ে, স্বরের ব্যঞ্জনা দিয়ে, দর্শক চিত্তে ঝড় তুলে দিতে পারেন। তাঁর নিজের মনে নাটকের চরিত্র যে-রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে, তাঁর মনের রংয়ের পরশ দিয়ে তাকে প্রজেক্ট করবার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ।…যত বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন সংস্কৃতির, বিভিন্ন রসের, বিভিন্ন বয়সের ভূমিকা তিনি অভিনয় করেছেন, তাঁর সমসাময়িক আর কোন অভিনেতা তা করেন নি।…যেগুলিতে তিনি সফল হয়েছেন, সেগুলি জনচিত্ত-জয়ে অজেয় হয়েই রয়েছে।…" (শচীন সেনগুপ্ত)

উপেন্দ্রনাথ দাস (১২৫৫-১৩০২ বঙ্গাব্দ)

নট, নাট্যকার, নাট্যপরিচালক ও সমাজসংস্কারক। বিখ্যাত আইনজীবী শ্রীনাথ দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। 'দুর্গাদাস দাস' ছদ্মনামে এঁর লেখা 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' ও 'শরৎ-সরোজিনী' নাটক সেকালে বিশেষ জনপ্রিয় হয়। ১৮৭৫ সালের শেষে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন। এখানে 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' শীর্ষক প্রহসন মঞ্চস্থ করার জন্য ইংরেজ সরকারের কোপে পড়েন এবং এই অভিনয়সূত্রেই শেষ পর্যন্ত 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' (১৮৭৬) চালু হয়। পরবর্তীকালে রাজকৃষ্ণ রায়ের বীণা রঙ্গভূমিতে 'নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন।

কুসুমকুমারী (?-১৯৪৮)

নৃত্যগীতপটিয়সী অভিনেত্রী। মিনার্ভায় প্রতিষ্ঠালাভ করেন। অতঃপর, ক্লাসিক থিয়েটারের জন্ম হলে সেখানে যোগ দেন এবং 'আলিবাবা' (১৮৯৭) গীতিনাট্যে 'মর্জিনা'র চরিত্রে নাচে-গানে-অভিনয়ে অসামান্য কৃতিত্ব দেখান। অন্যান্য বিখ্যাত ভূমিকা:—ভ্রমর (ভ্রমর), সরলা (সরলা), গঙ্গাবাই (ভ্রান্তি), ফুলজানি (প্রতাপাদিত্য) প্রভৃতি। নৃত্যগীতবহুল চরিত্রের অভিনয়ে সেকালে এঁর জুড়ি ছিল না। শিল্পীজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ক্লাসিক, গ্র্যাণ্ড, মিনার্ভা, ষ্টার, কোহিনূর, মিত্র প্রভৃতি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বাংলা থিয়েটারে প্রথম মহিলা নৃত্যপরিচালিকা (অভিশাপ/ক্লাসিক/১৯০১) ইনিই। মৃত্যু : ২৯ নভেম্বর, ১৯৪৮।

"………কুসুমকুমারী সে যুগের নামকরা অভিনেত্রী। স্বর্গত অমর দত্ত যখন নায়ক সাজতেন, তখন তাঁর বিপরীতে থাকতেন কুসুমকুমারী। 'আলিবাবা' নাটকের মর্জিনার ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ের কথা রঙ্গশালার ইতিহাসে চিরদিন লিপিবদ্ধ থাকবে। মৃত্যুকালে কুসুমকুমারীর বয়স হয়েছিল চুয়াত্তর বছর।" (অহীন্দ্র চৌধুরী)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭)

নাট্যকার। পিতা—গুরুচরণ ভট্টাচার্য। ১৮৮৯ সালে রসায়ন শাস্ত্রে এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কয়েক বৎসর (১৮৯২-১৯০৩) অধ্যাপনা করেন। এই সময় নাটক রচনায় ব্রতী হন। প্রথম নাটক 'ফুলশয্যা' (১৮৯৪) এমারেল্ড থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। পরবর্তীকালে অধ্যাপনা ছেড়ে পরিপূর্ণভাবে নাট্য-সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ রচিত 'আলিবাবা' (১৮৯৭), 'প্রতাপাদিত্য' (১৯০৩), 'রঘুবীর' ('৯০৩), 'চাঁদবিবি' (১৯০৭), 'কিন্নরী' (১৯১৮), 'আলমগীর' (১৯২১), 'নরনারায়ণ' (১৯২৬) প্রভৃতি বহু নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে সুনামের সঙ্গে অভিনীত হয়।

"……বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ক্ষীরোদপ্রসাদ বহু ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক নাটকের সাহায্যে বাংলা দেশের ···িক-সমাজকে শুধু নয়, জনসাধারণকেও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের তিনিই রচয়িতা। তাঁহার শেষ রচনা 'নরনারায়ণ' নাটক সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে বিশিষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছে ; ইহা বাংলা কাব্য-সাহিত্যের গৌরবরূপে আজিও গণ্য হয়। তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি 'আলিবাবা' রঙ্গনাট্য। তিনি যদি আর কিছু না রচনা করিতেন, এই রঙ্গনাট্যটিই তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখিত। 'আলিবাবা' চিরনূতন চির-আনন্দদায়ক হইয়া আজিও এই শ্রেণীর নাট্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ স্থানে বিরাজ করিতেছে।…" (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা)

ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (১২৬৩ বঙ্গাব্দ-?)

নাট্যাভিনেতা। জন্ম—১২৬৩, অগ্রহায়ণ। সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনেত্রী-নিয়োগের পূর্বে যেসব পুরুষ অভিনেতা স্ত্রীভূমিকায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে স্থান ক'রে নিয়েছেন, ক্ষেত্রমোহনের নাম তাঁদের সবার উপরে। সৌখিন অভিনয়ে এবং ন্যাশনাল ও গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে (প্রথম পর্বে) বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় অভিনীত স্ত্রীভূমিকা :— মনোরমা (মৃণালিনী), কপালকুণ্ডলা (কপালকুণ্ডলা), তিলোত্তমা (দুর্গেশনন্দিনী), সরলা (নয়শো-রূপেয়া), হেমলতা (হেমলতা), সরলা (প্রণয়পরীক্ষা), কৌশল্যা (রামা-ভিষেক), এলোকেশী (মোহান্তের এই কি কাজ!) এবং সুলোচনা (বিধবা-বিবাহ)।

"......অভিনেত্রী-যুগ প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে বঙ্গের প্রকাশ্য নাট্যশালার আদি নায়িকা (Heroine) এই ক্ষেতু (ক্ষেত্রমোহন) একদিন সহস্র সহস্র দর্শককে মোহিত করেছিল। পরলোকগতা বা জীবিতা বহু রূপবতী অভিনেত্রীকে আমি দেখেছি, এক এক জনের অভিনয়-কলার ভাব ও ভাষা অক্ষয় অক্ষরে আমার স্মৃতি ও প্রাণে মুদ্রিত আছে, কিন্তু তবু বলছি যে, কৃষ্ণকুমারী, নবীন-তপস্বিনী, কপালকুণ্ডলা এবং আরও দুএকটা স্ত্রী-চরিত্রে আজ পর্য্যন্ত কোন রঙ্গমঞ্চ-চঞ্চরী-ই অভিনয়ের কথা কি বল্‌ছি—সেই অষ্টাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণবালককে রঙ্গরূপের ছটাতেও পরাজিত করতে পারে নি।......" (অমৃত-লাল বসু)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)

নট, নাট্যকার, নাট্যশিক্ষক এবং রঙ্গালয়পরিচালক। সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম জীবনে সৌখিন অভিনয়ে প্রশংসা পান। পরবর্তী-কালে ন্যাশনাল, ষ্টার, এমারেল্ড, ক্লাসিক, কোহিনুর, মিনার্ভা প্রভৃতি থিয়েটারে অধ্যক্ষতা ও অভিনয় করেন। ১৮৮৪-তে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসেন এবং সেই সূত্রে সাধারণ রঙ্গালয়ে (বিডন স্ট্রীটের ষ্টারে) পরমহংসদেবের পাদ-স্পর্শ ঘটে। 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদ (এ্যামেচার—১৮৬৮), 'কৃষ্ণকুমারী'তে ভীমসিংহ (ন্যাশনাল—১৮৭৩), 'মৃণালিনী'তে পশুপতি (গ্রেট ন্যাশনাল— ১৮৭৪),

'মেঘনাদবধে' রাম ও মেঘনাদ (ন্যাশনাল—১৮৭৭), 'ম্যাকবেথে' ম্যাকবেথ (মিনার্ভা—১৮৯৩), 'প্রফুল্ল'তে যোগেশ (মিনার্ভা—১৮৯৫), 'সীতারামে' সীতারাম (মিনার্ভা—১৯০০) ও 'বলিদানে' করুণাময় (মিনার্ভা—১৯০৫) গিরিশচন্দ্র অভিনীত বিখ্যাত ভূমিকা। তাঁর রচিত প্রায় ৯০টি নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছে।

"......কেবলমাত্র অভিনয় প্রতিভা লইয়া জন্মাইলেই নাট্যশালার সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। নাট্যবাণীর পূজার প্রধান উপকরণ—ইহার প্রাণ-ইহার অন্ন—নাটক। গিরিশচন্দ্র এদেশের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মানে—তিনি অন্ন দিয়া ইহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, বরাবর স্বাস্থ্যকর আহার দিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন ; ইহার মজ্জায় মজ্জায় রস সঞ্চার করিয়া ইহাকে আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন ; আর এই জন্যই গিরিশচন্দ্র Father of the Native Stage—ইহার খুড়া জ্যাঠা আর কেহ কোন দিন ছিল না।..." (অপরেশচন্দ্র)

গেরাসিম স্টেপানোভিচ্ লেবেডেফ্ (১৭৪৯-১৮১৭)

বাংলা থিয়েটারের জনক। প্রতিভাবান এই রুশ মনীষী বৈচিত্র্যমণ্ডিত জীবনের অধিকারী ছিলেন। ইউক্রেনের এক কৃষকের সন্তান লেবেডেফ্ প্রথম জীবনে রুশ রাজদূত হিসাবে নেপলস্ যান। তারপর প্যারিস ও লণ্ডনে কিছুকাল অতিবাহিত ক'রে ভারতে (মাদ্রাজে) আসেন। দু'বছর মাদ্রাজে অবস্থানের পর ১৭৮৭ সালে তিনি কলকাতায় উপস্থিত হন। সুদীর্ঘ বিশ বৎসরকাল তিনি একাদিক্রমে কলকাতায় ছিলেন। এখানে তিনি দেশীয় পণ্ডিতদের কাছে বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা করেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্র আর পুরাণেও তাঁর অনুরাগ দেখা যায়। এরপর লেবেডেফ্ গোলোকনাথ দাস, জগমোহন বিদ্যাপঞ্চানন, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রমুখ পণ্ডিতদের সহায়তায় The Disguise এবং Love is the Best Doctor নামে দু'খানি ইংরেজী নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন। ১৭৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে এঁর উদ্যোগে প্রথম নাটকটি কলকাতায় স্বপ্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী থিয়েটারে দু'রাত্রি অভিনীত হয়। দেশীয় নট-নটী ও বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে দেশীয় পরিবেশে অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই কাজে লেবেডেফ্‌কে তাঁর ভাষাশিক্ষক গোলোকনাথ দাস বিশেষ সাহায্য করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কতিপয় কর্মচারীর ষড়যন্ত্রক্রমে গেরাসিমের

পরবর্তী নাট্যপ্রয়াস ব্যর্থ হয়। লেবেডেফ্ একজন উত্তম বেহালাবাদক ছিলেন। ইনি কয়েকখানি মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থও প্রণয়ন করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :— The Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects (১৮০১), An Impartial contemplation of the East Indian System of Brohmins (১৮০৫) এবং A Collection of Indosthani and Bengali Aryas (?)। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' এবং বাংলা শুভঙ্করীর রুশ অনুবাদ লেবেডেফের স্মরণীয় কীর্তি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)

নাট্যকার। যাঁদের রচনা-সাহায্য ব্যতিরেকে বাংলাদেশে পাবলিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব ছিল না ইনি তাঁদের অন্যতম। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা 'পুরু-বিক্রম নাটক', 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক', 'অশ্রুমতী নাটক', 'স্বপ্নময়ী নাটক' প্রভৃতির সাফল্যমণ্ডিত অভিনয় দর্শকরুচি গ'ড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। 'পুরু-বিক্রম' ও 'সরোজিনী' সর্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চ হতে দর্শকদের মনে জাতীয়তার বীজ বপন করে এবং স্বদেশপ্রেমে দীক্ষা দেয়। গিরিশচন্দ্র নাটক রচনায় ব্রতী হলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্য নাট্যসৃষ্টিতে বিরত হন।

তারাসুন্দরী (?-১৯৪৮)

নাট্যাভিনেত্রী। অমৃতলাল মিত্রের কাছে প্রথম অভিনয়শিক্ষা। পরবর্তীকালের নাট্যগুরু অর্দ্ধেন্দুশেখর। সাত বৎসর বয়সে ষ্টারে 'চৈতন্যলীলা' নাটকে বালকবেশে প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন (১৮৮৪)। বিভিন্ন সময়ে ষ্টার (বিডন ষ্ট্রীট ও হাতিবাগান), ক্লাসিক, মিনার্ভা, বেঙ্গল প্রভৃতি মঞ্চের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯২৫ সালে শিল্পীজীবনের শেষ পর্যায়ে বাংলা থিয়েটারে নবযুগের সূচনায় মনোমোহন নাট্যমন্দিরে শিশিরকুমারের সঙ্গে জনা (জনা) ও উদিপুরীর (আলমগীর) চরিত্রাভিনয়ে স্মরণীয় অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তারাসুন্দরী অভিনীত বিখ্যাত ভূমিকা :—রিজিয়া (রিজিয়া), আয়েষা (দুর্গেশনন্দিনী), কল্যাণী (প্রতাপাদিত্য), জহরা (সিরাজদ্দৌলা), শৈবলিনী (চন্দ্রশেখর), জাহানারা (সাজাহান), গুলনেয়ার (দুর্গাদাস),

ধারা (রাখীবন্ধন), বেগম (অযোধ্যার বেগম), জনা (জনা) ও উৎপল (কিন্নরী)। মৃত্যু : ১৯ এপ্রিল, ১৯৪৮।

"......অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে গম্ভীর রসের ভূমিকায় যত অভিনেত্রীকে দেখেছি, তারাসুন্দরীর স্থান নির্দেশ করতে পারি তাঁদের সকলেরই উপরে।... তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল চমৎকার ও উচ্চারণ ছিল অতি স্পষ্ট,...। ...কি 'মেলোড্রামা'য় আর কি বাস্তব নাটকে তারাসুন্দরী সমান দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করতে পারতেন।..... তারাসুন্দরীর আর্টের মধ্যে আমরা লাভ করতুম আন্তরিকতার সঙ্গে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও ক্রিয়াশীল মনীষার প্রভাব।..." (হেমেন্দ্রকুমার রায়)

তিনকড়ি দাসী

নাট্যাভিনেত্রী। বালিকাবয়সে বিডন স্ট্রীটের ষ্টারে 'বিল্বমঙ্গল' (১৮৮৬) নাটকে নির্বাক সখীর ভূমিকায় প্রথম মঞ্চে নামেন। বীণা, এমারেল্ড ও সিটি থিয়েটারে কর্মের পর গিরিশচন্দ্রের অভিনয়শিক্ষায় ১৮৯৩ সালে মিনার্ভায় 'ম্যাকবেথ' নাটকে লেডী ম্যাকবেথের চরিত্রে প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠা পান। পরবর্তীকালে তারা (মুকুল-মুঞ্জরা), দাই (আবু হোসেন), করমেতি (করমেতিবাই), শ্রী (সীতারাম), বিমলা (দুর্গেশনন্দিনী), তারা (মীরকাসিম) প্রভৃতি ভূমিকায় তিনকড়ির অনবদ্য অভিনয়নৈপুণ্য তাঁকে খ্যাতির চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করে। 'জনা' নাটকের নাম-ভূমিকায় তাঁর অসাধারণ অভিনয় বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

দানীবাবু (১৮৬৮-১৯৩২)

নাট্যাভিনেতা। নটগুরু গিরিশচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ওরফে দানী-বাবুর (এই নামেই উনি রঙ্গজগতে পরিচিত ছিলেন) জন্ম : ১১ ডিসেম্বর, ১৮৬৮। অমৃতলাল মিত্রের কাছে অভিনয় শিক্ষা। গিরিশচন্দ্রের 'চণ্ড' নাটকে রঘুদেবের ভূমিকায় ২৬ জুলাই, ১৮৯০ ষ্টারে প্রথম মঞ্চাবতরণ। ১৯৩২, ২৬ মার্চ এই ষ্টার থিয়েটারেই 'পোষ্যপুত্র' নাটকে শ্যামাকান্ত চরিত্রে শেষ অভিনয় করেন। দীর্ঘকাল মনোমোহন মঞ্চের সঙ্গে অংশীদার ও প্রধান অভিনেতারূপে জড়িত ছিলেন। স্মরণীয় অভিনয় :—প্রবীর (জনা), সিরাজদ্দৌলা (সিরাজদ্দৌলা), মীরকাসিম (মীরকাসিম), ওসমান (দুর্গেশনন্দিনী),

প্রসন্নকুমার (শাস্তি কি শাস্তি ?), ঔরংজীব (সাজাহান), চাণক্য (চন্দ্রগুপ্ত), শঙ্করাচার্য (শঙ্করাচার্য), খিজির (দেবলাদেবী), ভাস্কর (বঙ্গে বর্গী), দুর্গাশঙ্কর (পথের শেষে) প্রভৃতি। মৃত্যু : ২৮ নভেম্বর, ১৯৩২।

"…সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের কথা মনে করলেই গর্ডন ক্রেগের কথা আমাদের মনে পড়ে। অভিনেতা বলতে আমরা যা বুঝি, তিনি তার চেয়েও বড় ছিলেন। তিনি একটি প্রাকৃতিক শক্তি।…

তিনি ছিলেন কলাবিদ, তিনি ছিলেন স্রষ্টা। তাঁর মতন শিল্পী পৃথিবীর যে কোন জাতির গর্ব্বের নিধি। এই জন্যই তাঁর নাম বাংলাদেশে চিরস্মরণীয় হওয়া উচিত।…" (নাচঘর)

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

কবি ও নাট্যকার। দীনবন্ধুর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' দিয়েই সাধারণ রঙ্গালয়ের পত্তন হয়। এঁর রচিত নাটক :—'নীলদর্পণং নাটকং' (১৮৬০), 'নবীন তপস্বিনী নাটক' (১৮৬৩), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'লীলাবতী' (১৮৬৭), 'জামাই-বারিক' (১৮৭২) এবং 'কমলে কামিনী নাটক' (১৮৭৩)।

গিরিশচন্দ্র তাঁর 'শাস্তি কি শাস্তি ?' নাটকের উৎসর্গপত্রে দীনবন্ধুকে রঙ্গালয়-স্রষ্টার স্বীকৃতি দিয়েছেন। দীনবন্ধুর উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন :—"বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্ম মহাশয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন।…যে সময়ে 'সধবার একাদশী' অভিনয় হয়, সেই সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত; কারণ, পরিচ্ছদ প্রভৃতির যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্ব্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজ-চিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেইজন্য সম্পত্তি-হীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া 'ন্তাশনাল থিয়েটার' স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।"

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (?-১৯৪৩)

অভিনেতা। ১৯২৩-এ ষ্টারে 'কর্ণার্জুন' নাটকে বিকর্ণের ক্ষুদ্র ভূমিকায় প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন। পরে, ঐ মঞ্চেই 'চিরকুমার সভা', 'আলমগীর' প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ ক'রে ক্রমশঃ খ্যাতিমান হন। বিভিন্ন সময়ে প্রধান অভিনেতারূপে ষ্টার, মিনার্ভা, রঙমহল, চীপ থিয়েটার, নাট্যনিকেতন, নাট্য-ভারতী প্রভৃতি রঙ্গালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'মাটীর ঘর', 'রক্তের ডাক', 'অভিষেক', 'পি-ডব্লউ-ডি', 'আবুল হাসান' প্রভৃতি নাটকে এঁর অভিনয় প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। ১৯৪২-এ মিনার্ভায় শচীন সেনগুপ্তের 'কাঁটা ও কমল' নাটকে শেষ অভিনয় করেন। মৃত্যু : ১২ জুন, ১৯৪৩।

"...মঞ্চে তিনি যে তারুণ্যের পরিচয় দিতেন, তা সত্যই বিস্ময়কর। 'হিরো' হয়েই যেন দুর্গাদাস পৃথিবীতে এসেছিলেন। মঞ্চে তিনি যে পৌরুষের পরিচয় দিতেন, আজকার তরুণ অভিনেতৃদের মধ্যেও তা বিরল।..."

"...দুর্গাদাসের গদ্য আবৃত্তি সুমধুর ছিল। কিন্তু তারও আকর্ষণ আবৃত্তির জন্য ততটা নয়, যতটা তাঁর কণ্ঠের মাধুর্যের জন্য, বিশেষত যখন তিনি খাদে আবৃত্তি করতেন। তাঁর অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল, তাঁর পুরুষোচিত সুঠাম দেহ, তাঁর গাঢ় কালো চোখ, তাঁর অনুপম চলা-ফেরা। মঞ্চে অমন করে দাঁড়াতে, অমন চলা-ফেরা করতে, আর কাউকে আমি দেখিনি। প্রত্যেকটি মুহূর্ত এক একটি ছবি ফুটিয়ে তুলত।..." (শচীন সেনগুপ্ত)

ধর্মদাস সুর (১৮৫২-১৯১০)

রঙ্গভূমিসজ্জাকর। "ধর্মদাস সুর ছিল মামুলী গৃহস্থ ছোকরা ; স্কুলে পড়া এন্‌ট্রেন্স অবধি, কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তার আঙ্গুলগুলির ব্যবহারে একটা পারিপাট্য দৃষ্ট হ'ত ; হাতের লেখা অতি পরিষ্কার, খাতায় রুল টানত সুন্দর, ম্যাপ আঁকত চমৎকার, আর সরস্বতী পূজার সময় কুমারটুলী থেকে ঠাকুর কিনে এনে নিজের হাতে সাজিয়ে চৌকীর উপর বাগান রচনা ক'রে, যখন প্রতিমাখানি তার উপর বসাত, তখন বড় বড় কারিগরও তার তারিফ না ক'রে থাকতে পারত না।" (অমৃতলাল)

বাংলাদেশে পাবলিক থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম স্টেজ ম্যানেজার। ১৮৫২-তে জন্ম। পিতা—রাধানাথ সুর। ১৮৬৭, ২ নভেম্বর মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জোড়াসাঁকো কয়লাহাটার বাড়িতে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'কিছু কিছু বুঝি' নামক প্রহসনে প্রথম স্টেজ ম্যানেজাররূপে যোগ দেন। ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, ষ্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, কোহিনূর প্রভৃতি নাট্যমঞ্চের পরিকল্পনা, নির্মাণ ও সংস্কারের মূলে ছিলেন ধর্মদাস। তাঁর শেষ কৃতিত্ব মিনার্ভায় 'শঙ্করাচার্য' (১৯১০)। এই বছরেই ৫৮ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

"...বঙ্গ রঙ্গশালা-সৃষ্টির ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের পরই যদি কাহারও স্থান নির্দ্দেশ করিতে হয়, তবে ৺সুর মহাশয়ের।..." (বাঙলা)

"...ধর্ম্মদাস আমাকে কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ করিয়াছে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব যে সকল অভিনেতা রঙ্গমঞ্চ হইতে দর্শকের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বর্গগত এবং যাঁহারা জীবিত, সকলেই সেই ঋণ-পাশে আবদ্ধ।" (গিরিশচন্দ্র)

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৫৭-১২৮৯ বঙ্গাব্দ)

নট, নাট্যকার ও রঙ্গালয়াধ্যক্ষ। বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয় যাঁদের উদ্যোগে ও অধ্যবসায়ে গড়ে উঠেছে তাঁদের অন্যতম। অসাধারণ সংগঠনশক্তির অধিকারী ছিলেন। অমৃতলাল এঁর সম্পর্কে বলেছেন:—"স্বতঃসিদ্ধ যোগাড়ে অর্থাৎ অর্গানাইজ করবার অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী এবং একজন বিশিষ্ট নট।" ন্যাশনাল ও গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের কর্ণধাররূপে অসীম যোগ্যতার পরিচয় দেন। নাট্যকাররূপেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর লেখা (?) বাংলা থিয়েটারে অভিনীত প্রথম অপেরা নাটক 'সতী কি কলঙ্কিনী?' সেকালে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অন্যান্যের মধ্যে 'গুইকোয়ার নাটক' উল্লেখযোগ্য।

নরেশচন্দ্র মিত্র

অভিনেতা ও পরিচালক। জন্ম: ১৮৮৮, ১৮ মে (মতান্তরে ৬ মে)। ১৯১১ ও ১৯১৪-তে যথাক্রমে বি. এ এবং বি. এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২২ সালে মিনার্ভায় 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্যের ভূমিকায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। দীর্ঘকালের মঞ্চসেবায় বহু চরিত্রের রূপায়ণে এঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। পরিচালক হিসাবেও সুনামের অধিকারী ছিলেন। শকুনি (কর্ণার্জুন), কাত্যায়ন (চন্দ্রগুপ্ত), শ্রীমন্ত (কেদার রায়), বেহারী

(চরিত্রহীন), গুপী (দুই পুরুষ) প্রভৃতি ভূমিকা প্রসিদ্ধ।

"…নানা টাইপ চরিত্রের অভিনয়েই তাঁর প্রতিভা স্বাভাবিক স্ফূর্তি পেত। যেমন : শ্রীমন্ত বা কাত্যায়ন বা শকুনি। তাঁর অভিনয়ে এইসব জটিল চরিত্র বাংলা মঞ্চে অমর রূপ পেয়েছে। তাঁর শারীর ভঙ্গীতে, সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে গর্ভবতী নীরবতায়, মুখের প্রতিটি পেশীকে মনের ভাব প্রকাশের কাজে অনায়াস ব্যবহারে, বিকৃত বা জটিল, ক্রূর বা অসুস্থ মানসিকতার প্রকাশে সমগ্র অভিনয়কে খাপ খাইয়ে নিতে তাঁর তুল্য অভিনেতা তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে শিশিরকুমার ছাড়া কেউ ছিলেন না।…" (কালী বন্দ্যোপাধ্যায়)

নির্মলেন্দু লাহিড়ী (?-১৯৫০)

অভিনেতা ও পরিচালক। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভাগিনেয় নির্মলেন্দু লাহিড়ী সৌখিন অভিনয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন ক'রে ১৯২২-এ পেশাদার নটরূপে ম্যাডান থিয়েটারে যোগ দেন। ১৯২৯ সালে এঁর সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় :—"…মনোমোহনে নির্ম্মলেন্দুর প্রতিভাবৈচিত্র্যও আমাদের বিস্মিত করেছে। নাট্যজগতে তাঁকেও আজ আমরা বীরের সম্মান দিতে পারি। রকম-বেরকমের ভূমিকায় রকম-বেরকমের অভিনয় ক'রে নির্ম্মলেন্দু এখন এতটা বড় হয়ে উঠেছেন যে, বিশ্বনিন্দুকও আর তাঁর প্রতিভাকে অস্বীকার করতে পারবে না। এই শিশির-যুগেও নির্ম্মলেন্দু (ও অহীন্দ্র) যে নিজের বিশেষত্বে রসিকদের আকর্ষণ করেছেন, এইটেই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ।…" (নাচঘ :) দীর্ঘকালের নাট্যচর্চায় সমকালীন বাংলার প্রায় প্রতিটি রঙ্গালয়ের সঙ্গে কোনো না কোনো সময় অভিনেতা বা পরিচালকরূপে জড়িত ছিলেন। অজস্র এবং বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্রের রূপদানে প্রভূত যশলাভ করেন। স্মরণীয় অভিনয় :—চাণক্য (চন্দ্রগুপ্ত), ভাস্কর (বঙ্গে বর্গী), দিলদার (সাজাহান), শিবাজী (গৈরিক পতাকা), সিরাজদ্দৌলা (সিরাজদ্দৌলা) প্রভৃতি। মৃত্যু : ১৯৫০, ২৮ ফেব্রুয়ারি।

"নির্মলেন্দু লাহিড়ীর আবৃত্তির খ্যাতি ছিল। আবৃত্তিবহুল ভূমিকাগুলি অভিনয় করে তিনি শ্রোতৃদেরকে মাতিয়ে তুলতে অদ্বিতীয় ছিলেন। কিন্তু তা কেবল সুষ্ঠু আবৃত্তির গুণেই নয়, বাক্-বিভূতির বা oration-এরও গুণে।" (শচীন সেনগুপ্ত)

নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু (১২৭৪-১৩৩৪ বঙ্গাব্দ)

নৃত্যপরিচালক ও অভিনেতা। সেকালে থিয়েটারমহলে নেপা বোস নামেই পরিচিত ছিলেন। ক্লাসিক থিয়েটারে 'আলিবাবা' (১৮৯৭) নাটকের নৃত্যপরিচালনায় বাংলা থিয়েটারে নবযুগের স্থচনা করেন। অভিনেতারূপে হাল্‌কা এবং গম্ভীর উভয় শ্রেণীর ভূমিকাতেই দক্ষতার পরিচয় দেন। জন্ম : ১৪ আশ্বিন, ১২৭৪। মৃত্যু : শ্রাবণ, ১৩৩৪।

"নৃপেন্দ্রচন্দ্রের নৃত্য-প্রতিভার প্রধান প্রমাণ তাঁর নূতনত্ব। অমরেন্দ্রনাথের যুগে ক্লাসিক থিয়েটারে বাংলা নাচের শ্রী তিনি একেবারেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পিত নাচের গুণেই 'আলিবাবা' আজ পর্য্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে আছে। এখনো বাংলা রঙ্গালয়ের নাচ প্রধানত তাঁর ছাঁচেই ঢালা হয়। শুধু নৃত্য-পরিকল্পনায় নয়, নৃত্য-নিপুণতায়ও আর কোন বাঙ্গালী নর্ত্তক এখনো নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে অতিক্রম করতে পারেন নি। আবদালা (আলিবাবায়), ঘেষেড়া পাণ্ডব-গৌরবে), গোপ (দোল-লীলায়), উৎপল (কিন্নরীতে), আলাদিন (আলাদিনে) ও নাগরিক (বসন্ত-লীলায়) প্রভৃতি ভূমিকায় নৃপেন্দ্রচন্দ্রের নৃত্য-কৌশল দেখবার স্থযোগ যাঁদের হয়েছে, তাঁরা কখনো তাঁকে ভুলতে পারবেন না। তাঁর অভিনয়-শক্তিও বড় কম ছিল না। আবদালা (আলিবাবায়), হামজাদ (শিরী-ফরহাদে), গঙ্গাজী (ছত্রপতি শিবাজীতে), জগন্নাথ (শঙ্করাচার্য্যে) ও কাঙালীচরণ (প্রফুল্লে) প্রভৃতি ভূমিকায় আজও তাঁর অভিনয়কুশলতা মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে আছে।..." (নাচঘর)

প্রবোধচন্দ্র গুহ (১৮৮৫-১৯৬৯)

নাট্যপ্রযোজক। ১৯২৩-এ অপরেশচন্দ্রের সহায়তায় আর্ট থিয়েটারের মাধ্যমে 'কর্ণার্জুন' নাটকের প্রযোজনায় নবযুগের স্থচনা করেন। মনোমোহন লিজ নেন ১৯২৯ সালে। এইখানে তাঁর প্রযোজিত 'গৈরিক পতাকা' ও 'কারাগার' নাটক দুটি জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের গুণে বিশেষ সমাদৃত হয়। নাট্যনিকেতনের (১৯৩১) প্রতিষ্ঠাতা। জন্ম : ২২ জানুয়ারি, ১৮৮৫। মৃত্যু : ২ জুলাই, ১৯৬৯।

"...প্রবোধচন্দ্র গুহ বাংলা থিয়েটারের নবযুগের দ্বিতীয় পর্বে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি শুধু প্রতিভাবান প্রযোজকই ছিলেন না,

আর্ট থিয়েটারের অভিজ্ঞতাকেও তিনি নাট্যনিকেতনের উন্নতিকল্পে কাজে লাগিয়েছিলেন ; এঁর থিয়েটারেও বহু জ্ঞানী, গুণী ও বিদগ্ধজনের সমাগম হোতে দেখেছি। থিয়েটারের ব্যবসায়ী তিনি ছিলেন সত্য, কিন্তু শিল্পকে হত্যা করে তিনি ব্যবসা করেন নি। প্রত্যেক নাটকেই তিনি অজস্র খরচ করতেন এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করার দিকে তাঁর একটা প্রবল ঝোঁক ছিল। থিয়েটারে showmanship জিনিসটি তিনি খুব ভাল বুঝতেন এবং নাট্যনিকেতনে অভিনীত প্রায় প্রত্যেকখানি নাটকেই তিনি এর পরিচয় দিয়েছিলেন।…নূতন নাট্যকার, নূতন অভিনেতা-অভিনেত্রীর সন্ধানেও তিনি ব্যস্ত থাকতেন।… …নবযুগের দ্বিতীয় পর্বে নাট্যনিকেতনের স্মরণীয় নাট্যপ্রয়াস হিসাবে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', তারাশঙ্করের 'কালিন্দী', শচীন্দ্রনাথের 'সিরাজদ্দৌলা' এবং মন্মথ রায়ের 'কারাগার' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।" (মণি বাগচি)

প্রভা (১৯০৮-১৯৫২)

অভিনেত্রী। ম্যাডান থিয়েটারে আত্মপ্রকাশ ঘটলেও শিশিরকুমারের শিক্ষায় 'নাট্যমন্দিরে' 'সীতা'র নামভূমিকায় সর্বপ্রথম দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হাল্‌কা এবং গম্ভীর—উভয় শ্রেণীর চরিত্ররূপায়ণে দক্ষতা ছিল। কণ্ঠ-মাধুর্যের গুণে নাট্যামোদীদের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। অসংখ্য বিভিন্নমুখী ভূমিকায় কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয়ে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারিণী। জন্ম : ১৯০৮। মৃত্যু : ৮ নভেম্বর, ১৯৫২।

"…প্রভার মত অভিনেত্রী আর হয় নি।…" (শিশিরকুমার)

"…প্রভার কণ্ঠস্বর আমি অন্তত ভুলতে পারবো না…" (ধূর্জটিপ্রসাদ)

বিনোদিনী দাসী (১৮৬৩?-১৯৪১?)

নাট্যাভিনেত্রী। "বিনোদিনীর জন্ম আনুমানিক ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় (দ্র. বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী, উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ১৩২৬)। মাত্র ১১।১২ বছর বয়সে ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রথম রঙ্গালয়ে (গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার) প্রবেশ করেন 'শত্রু-সংহার' নাটকে দ্রৌপদীর সখীর একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায়। অতঃপর ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল, ন্যাশনাল ও ষ্টার থিয়েটারে সেকালীন যাবতীয় শ্রেষ্ঠ নাটকের প্রধান নারীচরিত্রে অভিনয় ক'রে চূড়ান্ত

যশ লাভ করেন। মাত্র ২৩।২৪ বছর বয়সে তিনি তাঁর খ্যাতি ও ক্ষমতার চরম সিদ্ধির লগ্নে রঙ্গালয়ের সংশ্রব চিরতরে ত্যাগ করেন।" (ভূমিকা—বিনোদিনী দাসী রচিত 'আমার কথা ও অন্যান্য রচনা', সুবর্ণরেখা, ১৩৭৬)

অসামান্য নাট্যপ্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। সেকালে জটিল ও মনস্তত্ত্ব-মূলক চরিত্রের রূপায়ণে এঁর তুলনা ছিল না। বিনোদিনী দাসীর নিঃস্বার্থ ত্যাগের ফলেই ১৮৮৩ সালে বিডন স্ট্রীটে ষ্টার থিয়েটারের জন্ম হয়। এই মঞ্চে তিনি গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' নাটকের নামভূমিকায় যুগান্তকারী অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ লাভ করেন। সহকর্মীদের অবিচারে এবং অন্যান্য নানাবিধ কারণে ১৮৮৬ সালে মঞ্চজগতের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ ঘটে। মাত্র ১২ বৎসরের অভিনয়কালে ইনি প্রায় ৫০টি নাটকে ৬০টিরও অধিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সাহিত্যপ্রতিভার গুণেও বিনোদিনী স্মরণীয়া। তৎরচিত আত্মচরিত 'আমার কথা' নানা বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। মৃত্যু : ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ (?)।

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯০১)

নট, নাট্যকার ও রঙ্গালয়াধ্যক্ষ। পিতা—ঝাঁপ্পালাল চট্টোপাধ্যায়। কৃতী ছাত্ররূপে সুনাম ছিল। কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন এঁর সহপাঠী এবং বন্ধু। কিছুকাল গ্লাডস্টোন ওয়াইলির অফিসে এবং রেল বিভাগে চাকুরী করেন। বাংলাদেশে পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পূর্বে সৌখিন নাট্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য অংশ নেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালা (১৮৫৮), মেট্রোপলিটান থিয়েটার (১৮৫৯) এবং শোভাবাজার নাট্যশালায় (১৮৬৭) যথাক্রমে 'রত্নাবলী', 'বিধবা-বিবাহ' ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে এঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়।

বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় অন্যতম উদ্যোক্তা। বহুকাল এই মঞ্চের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত থেকে রঙ্গালয়ের উন্নতিকল্পে প্রভূত পরিশ্রম করেন। 'বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি'র খ্যাতির মূলে ছিল বিহারীলালের অক্লান্ত প্রয়াস। নটরূপেও এখানে কৃতিত্ব দেখান। এঁর লেখা বহু নাটক বেঙ্গল থিয়েটারে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। "এই থিয়েটারে তিনি যে যে অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন, সকলগুলিই উৎকৃষ্ট। 'মৃণালিনী'র মাধবাচার্য্য, 'মেঘনাদবধে'র মহাদেব ও 'ভীষ্মের শরশয্যা'য় ভীষ্ম এই তিনটি অতুলনীয়।..." (গিরিশচন্দ্র) বিহারীলাল রচিত নাটকের তালিকায় আছে 'রাবণবধ' (১৮৮২), 'দ্রৌপদীর

স্বয়ংবর' (১৮৮৪), 'প্রভাস মিলন' (১৮৮৭), 'জন্মাষ্টমী' (১৮৮৯), 'খণ্ডপ্রলয়' (১৮৯৩), 'মুই হ্যাঁদু' (১৮৯৪), 'হরি-অন্বেষণ' (১৮৯৪), 'যমের ভুল' (১৮৯৪), 'রক্ত-গঙ্গা' (১৮৯৫), 'ধ্রুব' (১৮৯৬) প্রভৃতি।

"...গিরিশচন্দ্রের জীবন অর্থে যেমন বঙ্গের সাধারণ নাট্যশালার জীবন বুঝায়, বিহারীলালের জীবন অর্থে বঙ্গের...বিশিষ্ট নাট্যশালা Bengal Theatre-এর জীবন বুঝায়।..." (কিরণচন্দ্র দত্ত)

মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

কবি ও নাট্যকার। ১৮৫৮-তে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত 'রত্নাবলী নাটকে'র অভিনয় দেখে নাট্যরচনায় উদ্বুদ্ধ হন। মধুসূদন রচিত প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' সৌখিন রঙ্গমঞ্চে (বেলগাছিয়া নাট্যশালায়) ১৮৫৯, ৩ সেপ্টেম্বর এবং সাধারণ রঙ্গালয়ে (বেঙ্গল থিয়েটারে) ১৮৭৩, ১৬ আগস্ট প্রথম অভিনীত হয়। বাংলা দেশের প্রথম স্থায়ী সাধারণ নাট্যশালা 'বেঙ্গল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল মধুসূদনের প্রেরণা। বাংলা থিয়েটারে প্রথম অভিনেত্রীনিয়োগ তাঁর পরামর্শেই ঘটে। মধুসূদন দত্ত রচিত প্রায় সব ক'টি নাটকই সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়। বস্তুতঃ দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—এই তিন দিকপালের রচনা-সাহায্য ব্যতিরেকে প্রথম যুগের বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব ছিল।

মন্মথ রায়

নাট্যকার। জন্ম : ১৬ জুন, ১৮৯৯। সাফল্যের সঙ্গে এম. এ এবং বি. এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাংলা থিয়েটারে (ষ্টারে) অভিনীত প্রথম একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক' এঁরই লেখা। বাংলা ভাষায় একাঙ্ক নাটকের স্রষ্টা। এঁর রচিত 'চাঁদ সদাগর' (১৯২৭), 'দেবাসুর' (১৯২৮), 'মহুয়া' (১৯২৯), 'কারাগার' (১৯৩০), 'সাবিত্রী' (১৯৩১), 'খনা' (১৯৩৫), 'মীরকাসিম' (১৯৩৮), 'জীবনটাই নাটক' (১৯৫৩) প্রভৃতি বহু নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। দেশপ্রেমমূলক নাটক 'কারাগারে'র অভিনয় ১৯৩১ সালে ইংরেজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। চিত্রকাহিনী রচনাতেও সিদ্ধহস্ত। 'সোভিয়েত দেশ' পুরস্কারপ্রাপ্তিতে রাশিয়া যান।

শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে আকাদেমী পুরস্কারও লাভ করেন। সাম্প্রতিককালের সংস্কৃতিচর্চায় এঁর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

"তাঁর নতুন আঙ্গিকের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক এবং বিশেষ ক'রে তাঁর একান্ত নিজস্ব বিস্ময়কর একাঙ্কিকাবলীর ধারাবাহিকতাকে অনুসরণ করলে একক মন্মথ রায়কেই একটি যুগ বলে আখ্যাত করা যেতে পারে।" (আনন্দবাজার পত্রিকা)

মহেন্দ্রলাল বসু

নট ও নাট্যাধ্যক্ষ। মহেন্দ্রনাথ নামেও পরিচিত। ১৭৭৫ শকাব্দ, ১১ কার্তিক জন্ম। পিতা—ব্রজেন্দ্র বসু। গিরিশচন্দ্র পরিচালিত 'লীলাবতী' (১৮৭২) নাটকের সৌখিন অভিনয়ে ভোলানাথ চৌধুরীর ভূমিকায় প্রথম আবির্ভাব। কৃতী গিরিশশিষ্য। সাধারণ রঙ্গালয়ের উদ্বোধনরজনীতে 'নীলদর্পণ' নাটকে 'পদী ময়রাণী' চরিত্রের রূপায়ণে প্রশংসা পান। প্রসিদ্ধ ভূমিকা :— শরৎ (শরৎ-সরোজিনী), সিরাজ (পলাশীর যুদ্ধ), লক্ষ্মণ (রাবণবধ ও সীতার বনবাস), অলর্ক (বিষাদ), বৃহন্নলা (পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস), কুমার সেন (রাজা ও রানী) ও কৃষ্ণকান্ত (ভ্রমর)। বিষাদমূলক প্রেমের অভিব্যক্তিতে এঁর তুলনা ছিল না। সেই কারণে 'ট্রাজেডিয়ান' উপাধিতে ভূষিত হন। নটজীবনের বিভিন্ন পর্বে গ্রেট ন্যাশনাল, ন্যাশনাল, এমারেল্ড, রয়েল বেঙ্গল, ক্লাসিক প্রভৃতি মঞ্চের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৮৯১ সালে এমারেল্ড থিয়েটার লিজ নেন। 'চিতোর রাজসতী পদ্মিনী' (১৮৭৫) নামে একখানি নাটক লেখেন। ১৯০০, ৩০ জুন ক্লাসিক থিয়েটারে 'সীতারাম' নাটকে গঙ্গারামের ভূমিকায় শেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয়। মৃত্যু : ২৪ ফাল্গুন, ১৩০৭।

"...প্রতি ভূমিকায়ই মহেন্দ্রলাল সুদক্ষ অভিনেতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।...এককথায় পাঠককে বুঝাই যে, অদ্যাবধি সকল ভূমিকাই তাঁহার অনুকরণেই চলিতেছে, কেহই তাঁহার কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া অভিনয় করিতে সক্ষম হন নাই।...মহেন্দ্রলাল যে কেবল অভিনয় কার্য্যে দক্ষ ছিলেন, তাহা নয়, তাঁহার পরামর্শে অনেক রঙ্গমঞ্চ অনেক সময়ে সুন্দর চিত্রপটে সুসজ্জিত হইয়াছিল। ..মহেন্দ্রলাল মুক্ত-হস্ত পুরুষ ছিলেন। পরদুঃখ মোচনে ও সুহৃদ সেবায় তিনি তাঁহার অনেক সম্পত্তি ব্যয় করিয়াছিলেন।...বিদ্যাদানে কখনও কাতর হইতেন না।...তাঁহার বিয়োগে বঙ্গ রঙ্গালয়ের যে ক্ষতি

হইয়াছে, তাহা পূর্ণ হইবার নহে; অপর মহেন্দ্রলালের জন্মগ্রহণ সময়-সাপেক্ষ।…" (গিরিশচন্দ্র)

রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪)

নট, নাট্যকার ও রঙ্গালয়স্বত্বাধিকারী। অভিনেতা হিসাবেও সুনাম ছিল। প্রথম নাটক 'অনলে বিজলী' (১৮৭৮)। পরবর্তীকালে অসংখ্য নাটক রচনা করেন এবং তাদের অনেকগুলি সাধারণ মঞ্চে জনপ্রিয় হয়। এঁর লেখা 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' সেকালে বিশেষভাবে দর্শকসমাদৃত হয়েছিল। অন্যান্য মঞ্চসফল নাটক :—'চন্দ্রহাস' (১৮৮৮), 'হরিদাস ঠাকুর' (১৮৮৮), 'মীরাবাই' (১৮৮৯ ?), 'লক্ষহীরা' (১৮৯১), 'নরমেধ যজ্ঞ' (১৮৯১) প্রভৃতি। ১৮৮৭-তে বীণা রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু ব্যবসায়িক অসাফল্যের দরুণ শেষ পর্যন্ত সর্বস্বান্ত হন। সেই দুর্দিনে ষ্টার কর্তৃপক্ষ তাঁকে নিজস্ব নাট্যকাররূপে নিযুক্ত করেন (১৮৯১)। নাটকে ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনার কৃতিত্ব গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে রাজকৃষ্ণ রায়েরও প্রাপ্য।

রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়

নট ও পরিচালক। ১৯২২ সালে মিনার্ভায় 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে আন্টিগোনসের চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে স্বকীয় প্রতিভার গুণে দর্শকদের চমৎকৃত করেন। এই ভূমিকায় "…তাঁর সংলাপ, দৈহিক ভঙ্গিমা, মৌখিক ভাবের ব্যঞ্জনা এবং প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ সমস্তই হলো এমন অভিনব যে দর্শকরা উপলব্ধি করলে অভাবিত আনন্দ। নাট্যগগনে যে একটি নূতন তারকার সন্ধান পাওয়া গেল, সে সম্বন্ধে আর কারুর কোনো সন্দেহ রইলো না।…" (হেমেন্দ্রকুমার রায়) পরবর্তীকালে বিশিষ্ট অভিনেতারূপে ষ্টার ও মনোমোহনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। নাট্যমন্দির এবং নাট্যনিকেতনেও কিছুকাল অভিনয় করেন। ইঙ্গ-বঙ্গ চরিত্রে ও সিরিও-কমিক ভূমিকায় সেকালে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা ছিলেন। ক্যানসার রোগে মৃত্যু হয়।

"…রাধিকানন্দ চরিত্রকে প্রতিষ্ঠা দিতে অসাধারণ নিপুণ ছিলেন। মঞ্চে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই…নাটকের চরিত্র হয়ে উঠতেন।…রাধিকানন্দের …কণ্ঠস্বর কিছুটা ভগ্ন ছিল, কিন্তু বাণী ছিল বিশুদ্ধ, অভিনয়ে ইমোশনের চেয়ে ইনটেলেক্‌ট প্রয়োগ করতেন বেশি। যেমন প্রাচীন বাংলার সামাজিক

শিক্ষিতের, তেমন ইঙ্গ-বঙ্গ অভিজাতের, তেমনই ফেরঙ্গ-বয়াটের চরিত্র সমানভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলতে পারতেন।…” (শচীন সেনগুপ্ত)

শচীন সেনগুপ্ত

নাট্যকার। সাংবাদিকতা ছেড়ে নাট্যরচনায় ব্রতী হন। প্রথম নাটক ‘রক্তকমল’ বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের দিক থেকে অভিনব ছিল। নাটকখানি ১৯২৯-এ মনোমোহনে মঞ্চস্থ হয়। স্বদেশপ্রেমের নাটক ‘গৈরিক পতাকা’ (১৯৩০) অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এটিও মঞ্চস্থ হয় মনোমোহনে। নাট্যনিকেতনে অভিনীত ‘ঝড়ের রাতে’ মৌলিকতার গুণে সুখ্যাতি পায়। পরবর্তীকালে এঁর লেখা ‘সতী তীর্থ’, ‘জননী’, ‘দশের দাবী’, ‘আবুল হাসান’, ‘নরদেবতা’, ‘প্রলয়’, ‘স্বামী-স্ত্রী’, ‘কালের দাবী’, ‘সিরাজদ্দৌলা’, ‘তটিনীর বিচার’ প্রভৃতি অসংখ্য নাটক বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছে। শরৎচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপদানেও যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখান। সঙ্গীত-নাটক আকাদেমীর সদস্য ছিলেন। সংস্কৃতিসফরে বিদেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯)

অভিনেতা ও প্রযোজক-পরিচালক। অবৈতনিক অভিনয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে অধ্যাপনা ছেড়ে ১৯২১-এ পেশাদার অভিনেতারূপে ম্যাডান থিয়েটারে (কর্ণওয়ালিশ মঞ্চে) ক্ষীরোদপ্রসাদের ‘আলমগীর’ নাটকের নামভূমিকায় প্রথম অবতীর্ণ হন। ১৯২৪ সালে মনোমোহন মঞ্চে ‘নাট্যমন্দিরে’র প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখানে ‘সীতা’ অভিনয়ের মাধ্যমে তৎকর্তৃক বাংলা থিয়েটারে নবযুগের সূচনা হয়। ১৯৩০-এ সদলবলে আমেরিকা যান এবং প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরে ষ্টারে ‘নব নাট্যমন্দিরে’র পত্তন করেন (১৯৩৪)। নটজীবনের শেষ পর্যায়ে ১৯৪১ সালে তাঁর উদ্যোগে ‘শ্রীরঙ্গম’ জন্ম নেয়। ১৯৫৯-এ সরকারী ‘পদ্মভূষণ’ খেতাব প্রত্যাখ্যান করেন। শিশিরকুমার অভিনীত কয়েকটি প্রসিদ্ধ ভূমিকা :— আলমগীর (আলমগীর), রাম (সীতা), নাদির শাহ (দিগ্বিজয়ী), জীবানন্দ (ষোড়শী), দিগম্বর (রীতিমত নাটক), রাসবিহারী (বিজয়া), মাইকেল (মাইকেল) প্রভৃতি। বুদ্ধিদীপ্ত, মননশীল ও সূক্ষ্মরসাশ্রিত অভিনয়শৈলীর প্রবর্তনায় ক্ষেত্রে পথিকৃৎ এবং নবযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার ও নির্দেশক।

"...আমার বিশ্বাস যে বাংলার রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের দান যে কত বেশী সে সম্বন্ধে আমরা এখনও যথেষ্ট সচেতন হই নি। পরবর্ত্তী যুগ বুঝবে যে একজন লোকের মধ্যে নাট্যপ্রতিভা, Personality, অসামান্য অধ্যবসায়, কল্পনার পরিসর, Produce করবার সহজ জ্ঞান, সুদর্শন আকৃতি ও উদাত্ত সুকণ্ঠের এরূপ আশ্চর্য্য যোগাযোগ যেকোনও দেশের রঙ্গালয়ের ইতিহাসেই বিরল।..." (দিলীপকুমার রায়)

সরযূবালা

অভিনেত্রী। এই শতকের তৃতীয় দশকে মনোমোহন থিয়েটারে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকচিত্ত জয় করেন। তদানীন্তনকালের অভিনয়-দর্শনে 'নাচঘর' (২৩।১১।১৯২৮) জানায়:—"...মনোমোহন রঙ্গালয়েও আর-একটি তরুণী অভিনেত্রীর দেখা পাওয়া গেছে—শ্রীমতী সরযূ। "প্রফুল্ল" ও "দক্ষযজ্ঞ" নাটকে যথাক্রমে প্রফুল্ল ও সতীর ভূমিকায় তাঁর সহজ, অনায়াস ও সুমধুর অভিনয় দেখে বুঝেছি যে, চর্চ্চা না ছাড়লে রঙ্গালয়ের ইতিহাসে ইনি নিজের নাম লিখে যেতে পারবেন।" পরবর্তীকালে সমালোচকের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত ক'রে বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্রচিত্রণে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ইনি বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। চারের দশকে খ্যাতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে ওঠেন।

"...এই অভিনেত্রী প্রফুল্লে (পুরাতন) প্রফুল্ল, সাজাহানে (পুরাতন) জাহানারা, দেবদাসে পার্ব্বতী ও ধাত্রীপান্নায় পান্নার ভূমিকায় যে উচ্চাঙ্গের কলানৈপুণ্যের পরিচয় দেন, তাহাতে বর্ত্তমান বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে তাঁহার অদ্বিতীয় স্থান নির্দ্ধারিত হয়। ইনি স্বাভাবিকভাবে অভিনয় করেন এবং মৃদু ও ঝাঁজালো দুই রকম অভিনয়েই পারদর্শিনী।..." (হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত)

সুকুমারী দত্ত

সঙ্গীতকুশলা অভিনেত্রী। প্রথম জীবনে 'গোলাপ' নামে পরিচিতা ছিলেন। সঙ্গীতে বিশেষ খ্যাতি ছিল। গানের মুজরাসূত্রে শরৎচন্দ্র ঘোষ এঁকে আবিষ্কার করেন। প্রথম কর্মস্থল বেঙ্গল থিয়েটার। এখানে বিমলা (দুর্গেশ-নন্দিনী), মালিনী (বিদ্যাসুন্দর), ঐলবিলা (পুরু-বিক্রম) প্রভৃতি চরিত্রের রূপায়ণে দক্ষতা দেখান। পরবর্তীকালে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দেন এবং

অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষকতায় অধিকতর সুনাম অর্জন করেন। গ্রেট ন্যাশনালে 'শরৎ-সরোজিনী' (১৮৭৫) নাটকে সুকুমারীর ভূমিকায় প্রভূত যশ লাভে গোলাপের 'সুকুমারী' নামকরণ হয়। উক্ত থিয়েটারের তদানীন্তন ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাসের প্রচেষ্টায় সম্প্রদায়ের অন্যতম অভিনেতা গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে 'সুকুমারী দত্ত' নামে পরিচিতা হন। বিবাহের পর অভিনয়ে ইস্তফা দেন এবং সংসারে মনোনিবেশ করেন। একটি কন্যার জন্মের পর স্বামী দেশান্তরী হলে অনন্যোপায় সুকুমারীকে পুনরায় মঞ্চে যোগ দিতে হয়। অভিনেত্রীজীবনের বিভিন্ন সময়ে বেঙ্গল, গ্রেট ন্যাশনাল, ন্যাশনাল, এমারেল্ড প্রভৃতি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আশুতোষ দাস নামক জনৈক ব্যক্তির সহযোগিতায় 'অপূর্ব সতী' নামে নাটক লেখেন। অভিনেত্রী রচিত এই প্রথম নাটকখানি ১৮৭৫, ২৩ আগস্ট গ্রেট ন্যাশনালে মঞ্চস্থ হয়। সুকুমারী দত্ত (গোলাপ) অভিনীত বিশিষ্ট কয়েকটি ভূমিকা :— 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিমলা (বেঙ্গল—১৮৭৩), 'শরৎ-সরোজিনী'তে সুকুমারী (গ্রেট ন্যাশনাল— ১৮৭৫), 'অশ্রুমতী'তে মলিনা (বেঙ্গল—১৮৮১) ও 'পূর্ণচন্দ্র'তে (এমারেল্ড—১৮৮৮)। শিল্পীজীবনের শেষ পর্যায় কাটে ক্লাসিকে।

নিম্নলিখিত গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকা থেকে উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে

গ্রন্থ

অথ নট ঘটিত—সূত্রধার

অস্তরালের শিশিরকুমার—তারাকুমার মুখোপাধ্যায়

অভিনয় : প্রযোজনা : পরিচালনা—ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায়

অভিনেতৃ-কাহিনী—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত

অমৃত-মদিরা—অমৃতলাল বসু

অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য—ডঃ অরুণকুমার মিত্র

আমার কথা ও অন্যান্য রচনা—বিনোদিনী দাসী (সুবর্ণরেখা সং)

আমার জীবন—মধু বসু

গিরিশচন্দ্র—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

গিরিশ-প্রতিভা—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

গিরিশ রচনাবলী (১ম ও ২য় খণ্ড)—ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

ঘরোয়া—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ

চায়ের ধোঁয়া—উৎপল দত্ত

জীবনী অভিধান—সুধীরচন্দ্র সরকার সঙ্কলিত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

দি ইণ্ডিয়ান স্টেজ (১ম-৪র্থ খণ্ড)—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

দীনবন্ধু রচনাবলী—ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত

দৃশ্য-কাব্য পরিচয়—সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী (১ম ও ২য় খণ্ড)—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার—শঙ্কর ভট্টাচার্য

নিজেরে হারায়ে খুঁজি (১ম ও ২য় পর্ব)—ডঃ অহীন্দ্র চৌধুরী

পুরাতন প্রসঙ্গ— বিপিনবিহারী গুপ্ত (২য় বিদ্যাভারতী সং)

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও দানীবাবু—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা থিয়েটারে অভিনয়—শঙ্কর ভট্টাচার্য
বাংলা নাটকে গান—প্রভাতকুমার গোস্বামী
বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র—ডঃ অহীন্দ্র চৌধুরী
বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার—হেমেন্দ্রকুমার রায়
বাংলার নাটক ও নাট্যশালা—শচীন সেনগুপ্ত
বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
বিশ্বকোষ (রঙ্গালয়)—নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত
ভারতকোষ (১ম-৪র্থ খণ্ড)—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত
ভারতীয় নাট্যমঞ্চ—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
ভারতীয় নাট্যমঞ্চ (১৫২৫-১৯৪৫)—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
মধুসূদন রচনাবলী—ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত
মনে এলো—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
যাঁদের দেখেছি—হেমেন্দ্রকুমার রায়
রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ—রমাপতি দত্ত
রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
রত্নাকর গিরিশচন্দ্র—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
রবীন্দ্র রচনাবলী (১৪শ খণ্ড)—শতবার্ষিকী সং, প. ব. সরকার
শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার—মণি বাগচি
শিশির-সান্নিধ্যে—রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (২য়, ৩য় ও ৫ম খণ্ড)—শ্রীম
সাজঘর—ইন্দ্র মিত্র
সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা (৪র্থ ও ৬ষ্ঠ খণ্ড)—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা—মন্মথ রায়
হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আর্য সাহিত্য-সমিতি সং, ১৩০০)

পত্র-পত্রিকা

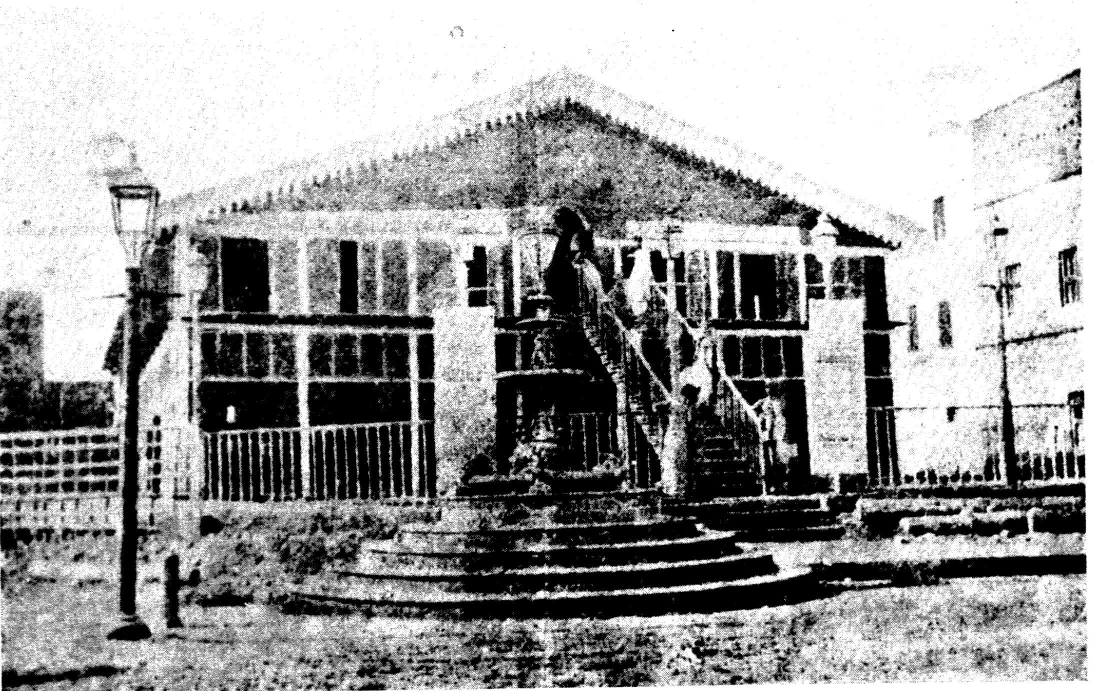
অনুসন্ধান
অভিনয়
অমৃত
অমৃতবাজার পত্রিকা
আনন্দবাজার পত্রিকা
ইংলিশম্যান
ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ
ইণ্ডিয়ান মিরার
এ্যাডভান্স
কবিতা
গল্পভারতী
দৈনিক চন্দ্রিকা
নববিভাকর-সাধারণী
নবযুগ
নবশক্তি
নাচঘর
নাট্যমন্দির
নায়ক
পঞ্চপুষ্প
পরিচয়
পুরোহিত
পুরোহিত ও অনুশীলন
পূর্ণিমা
ফরোয়ার্ড
বঙ্গবাণী
বঙ্গবাসী
বঙ্গভূমি
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা
বসন্তক
বাঙলা
বান্ধব
বাসন্তী
বেঙ্গলী
মজলিশ
মাসিক বসুমতী
মিহির ও সুধাকর
রঙ্গভূমি
রঙ্গমঞ্চ
রঙ্গালয়
রূপ ও রঙ্গ
রূপমঞ্চ
রেইজ অ্যাণ্ড রায়ৎ
লিবার্টি
সংবাদ প্রভাকর
সচিত্র শিশির
সমাচারচন্দ্রিকা
সমীপেষু
সাধারণী
সাহিত্য ও সংস্কৃতি
সুলভ সমাচার
স্টেটস্‌ম্যান
হিন্দু পেট্রিয়ট

নির্ঘণ্ট

পরিশিষ্টসমূহে উল্লিখিত নট-নটী, নাট্যকার, নাটক প্রভৃতির তালিকা



লেখক ও নটসূর্য



গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার



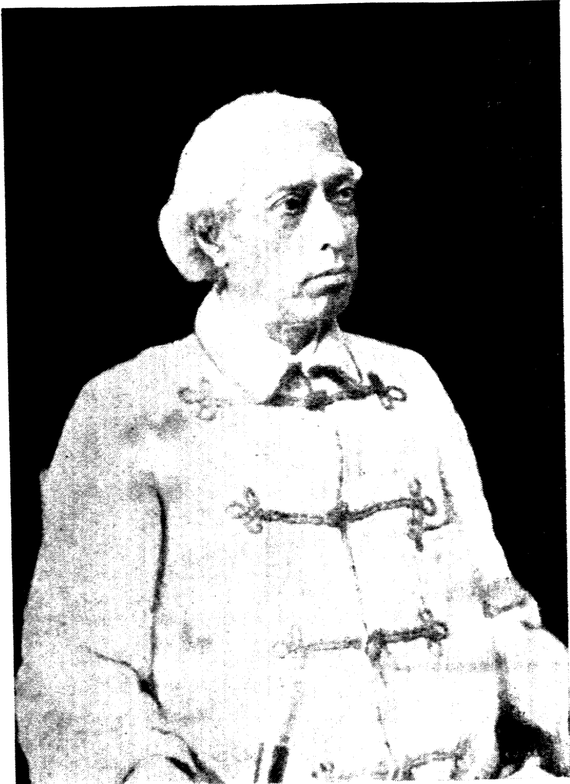
গিরিশচন্দ্র ঘোষ



'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্যের রূপসজ্জায়

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

ফটো : পরিমল গোস্বামী (১৯৫১)



অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী



অমৃতলাল বসু



'শ্রীরামচন্দ্র' নাটকে রাবণের রূপসজ্জায়
অহীন্দ্র চৌধুরী



বিনোদিনী দাসী



'মনের মতন' নাটকে মির্জানের রূপসজ্জায়
সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)



'নল-দময়ন্তী' নাটকে নলের রূপসজ্জায়
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত



তিনকড়ি দাসী



'দুর্গেশনন্দিনী' নাটকে আয়েষার রূপসজ্জায়
তারাসুন্দরী